প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত দ্বি-বার্ষিক স্নাতক (Two-year Degree Pass Course) পাঠক্রম অনুসারে লিখিত পাঠ্যপুস্তক।

নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন

প্রথম পত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

[দ্বি-বার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীপ্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, এম. এ. (দর্শন ও বাংলা),
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ,
হেতমপুর, বীরভূম।

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১-এ কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১-এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৭৯ (২·২)

—লেখকের কতিপয় স্নাতক শ্রেণীর গ্রন্থ—

ভারতীয় দর্শন ১ম—৯ম সংস্করণ
ভারতীয় দর্শন ২য়—৩য় সংস্করণ
ভারতীয় দর্শন ৩য়—(বেদ ও উপনিষদ)
ধর্মদর্শন (Philosophy of Religion)
নীতিবিজ্ঞান—৯ম সংস্করণ
সমাজদর্শন—৯ম সংস্করণ
পাশ্চাত্ত্য দর্শন—১২শ সংস্করণ
মনোবিদ্যা—৯ম সংস্করণ
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—(থেলস্-অ্যারিস্টটল)
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (বেকন-হিউম)—৪র্থ সংস্করণ
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—(কাণ্ট)
পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবিজ্ঞান (প্রতীকী সহ)
Handbook of Social Philosophy—3rd edition
সমাজ মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)—২য় সংস্করণ

মুদ্রাকর :
প্রিণ্টস্মিথ
১১৬ বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : তেইশ টাকা মাত্র

[Paper used for the Printing of this book was made available by the Govt. of India at a concessional rate.]

[PS—All.]

ভূমিকা

স্নাতক শ্রেণীর জন্য দ্বি-বার্ষিক পাঠক্রম শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তনের সূচনা করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বি-বার্ষিক পাঠক্রম অনুসারে দর্শনের যে নতুন পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট করেছে, সেই নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বর্তমান গ্রন্থ 'নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন' রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি দর্শনের পাঠ্যসূচীর প্রথম পত্রের অন্তর্ভুক্ত। ত্রি-বার্ষিক পাঠক্রম অনুযায়ী দর্শনের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসরণে 'নীতিবিজ্ঞান' এবং 'ভারতীয় দর্শন' নামে আমার যে গ্রন্থগুলি রচিত, আলোচ্য গ্রন্থটি তারই পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ। আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত অতিরিক্ত দু-একটি বিষয়ের আলোচনা ছাড়া, অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়নি। ভাষা যাতে সরল ও সহজবোধ্য হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বাংলা পরিভাষার পাশে প্রয়োজনমত ইংরেজী শব্দটি বসান হয়েছে।

ত্রি-বার্ষিক পাঠক্রম অনুসারে লিখিত 'নীতিবিজ্ঞান' এবং 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থগুলি যেমন সকলের সমাদর লাভ করেছে, দ্বি-বার্ষিক পাঠক্রম অনুসারে লিখিত 'নীতিবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থটিও অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমাদর লাভ করবে, এই আশা করি। পরিশেষে জানাচ্ছি—গ্রন্থটির উন্নতি কল্পে যে-কোন অভিমত সাদরে গৃহীত হবে।

ব্যানার্জী পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

ইতি—

হেতমপুর,
১০ই জুলাই, ১৯৭৯

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

Syllabus

CALCUTTA UNIVERSITY

Two-year Degree (*Pass Course*)

Paper—I

Group—A

ETHICS

Full Marks—50

1. Nature of Ethics.
2. Nature and object of Moral Judgment.
3. Moral Standards—Hedonism, Rigorism, Perfectionism.

Paper—I

Group—B

INDIAN PHILOSOPHY

Full Marks—50

System of Nayaya, Vaisesika, Sankara and Ramanuja Vedanta.

সূচীপত্র

নীতিবিজ্ঞান

বিষয় পৃষ্ঠা

ভারতীয় দর্শন

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পত্র

'ক'—বিভাগ

নীতিবিজ্ঞান

(ETHICS)

প্রথম অধ্যায়

নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকৃতি
(Nature of Ethics)

১। ভূমিকা (Introduction) :

আমরা অনেক সময় এরকম বলে থাকি, 'রামের এ কাজ করা উচিত হয়নি' ; 'মধু ঠিক কাজই করেছে' ; 'শ্যামের ব্যবহার ভাল' ; 'যদুর স্বভাব খারাপ' ; 'দুঃস্থ লোককে সাহায্য করা উচিত', 'সত্য কথা বলা সব সময়ই ভাল' ইত্যাদি। আমরা যখন এরকম কথা বলি তখন অনেক সময় দেখি অনেকে আমাদের এসব কথা মেনে নিতে রাজী হন না ; কোন কোন ক্ষেত্রে কেউ কেউ আবার আমাদের মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। যখন আমি বলি, 'রাম খুব ভাল লোক' এবং আমার কোন বন্ধু বলে, 'রাম মোটেই ভাল লোক নয়,' তখন বুঝতে হবে, কোন-না-কোন কারণে সে আমার সঙ্গে একমত হতে পারছে না। হয়ত সে রামের সম্পর্কে এমন কোন কথা জানে যা আমার জানা নেই এবং এ সকল কথা জানলে আমিও হয়ত রামের সম্পর্কে আমার মত পরিবর্তন করতে পারতাম। কিংবা এমনও হতে পারে যে, রামের সম্পর্কে আমরা দুজনে একই কথা জানি, তবু আমি মনে করি, রাম খুব ভাল লোক এবং আমার বন্ধুটি মনে করে, রাম খুবই খারাপ লোক। তাহলে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি 'ভাল' এবং 'মন্দ'—এ দুটি শব্দের পার্থক্য স্বীকার করে নিলেও এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ আছে। সে যাই হোক, এখানে এই যে 'ভাল' ও 'মন্দ'-র (বা 'উচিত' ও 'অনুচিত', 'ঠিক' ও 'বেঠিক' প্রভৃতির) পার্থক্য আমরা করছি একেই বলা হয় **নীতিগত** বা **নৈতিক পার্থক্য** (moral distinction)। 'ভাল', 'মন্দ', উচিত' ও 'অনুচিত' সম্পর্কে আমাদের যে চেতনা বা জ্ঞান তাকে বলা হয় নৈতিক জ্ঞান বা নৈতিক চেতনা (moral consciousness)। যখন আমরা বলি 'রামের আচরণ হয় ভাল' তখন এটি হল একটা নৈতিক অবধারণ বা বচন (moral judgment)। উপরের বচনটিতে 'ভাল' এই বিধেয়কে বলা হয় নৈতিক বিধেয় (moral predicate) এবং 'ভাল' 'মন্দ' 'উচিত' 'অনুচিত' এই জাতীয় নৈতিক বিধেয়র ব্যবহারের দ্বারা যে গুণাগুণের কথা বলা হয় তাকে বলা হয় নৈতিক গুণাগুন

ভাল ও মন্দ, উচিত ও অনুচিত প্রভৃতির পার্থক্যই নীতিগত পার্থক্য

(moral qualities)। যেমন পূর্বোক্ত উদাহরণটিতে রামের আচরণের নৈতিক গুণের কথা প্রকাশ করা হয়েছে এবং রামের আচরণ সম্পর্কে আমাদের নৈতিক জ্ঞান ব্যক্ত করা হয়েছে।

নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে নীতিবিজ্ঞানের অর্থ, নীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, নীতিবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা ও নীতিবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে আমাদের কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এই আলোচনাগুলি নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকৃতিকে ভাল করে বুঝে নিতে সাহায্য করবে।

২। নীতি-বিজ্ঞানের অর্থ (Meaning of Ethics) :

মানুষের যে একটা নৈতিক জীবন আছে, অর্থাৎ সে যে নিজের বা অপরের কাজ বা আচরণ সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বা ঐ জাতীয় পার্থক্য করে একথা অস্বীকার করা যায় না। নৈতিক জীবনে মানুষের বিশ্বাস আছে বলেই মানুষ ভাল-মন্দ, সদাসৎ, ন্যায়-অন্যায়, নীতি-দুর্নীতি, পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস করে। এসব নৈতিক ধারণা আমরা আমাদের সামাজিক পরিবেশ থেকে লাভ করি এবং সাধারণতঃ এসব ধারণার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি না করে, বিনা বিচারেই এ সকল ধারণাকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু এ সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আমরা যতক্ষণ না একমত হতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত কারও আচরণ সম্পর্কে আমাদের মতামতের কোন তুলনামূলক বা বিজ্ঞানসম্মত বিচার সম্ভব নয়।

নৈতিক ধারণার প্রকৃত অর্থ না জেনে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা হয়

এ সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এবং দৈনন্দিন জীবনে যখন কোন লোকের কোন কাজকে ভাল বা মন্দ বলি তখন কোন্ নিয়ম বা আদর্শের মাপকাঠিতে আমরা ভাল-মন্দ বিচার করি, উচিত-অনুচিত, সদাসৎ, ন্যায়-অন্যায়—এ জাতীয় কথারই বা প্রকৃত অর্থ কি, এ সকল বিষয়ই নীতিবিজ্ঞান আলোচনা করে। লিলি (*Lillie*) বলেন, "দৈনন্দিন কথাবার্তায় 'ভাল', 'ঠিক', 'উচিত' প্রভৃতি যেসব শব্দ অহরহ ব্যবহৃত হয় তার যথার্থ অর্থ কী—এ জাতীয় প্রশ্ন নিয়েই নীতিবিজ্ঞান আলোচনা করে।"[1]

নৈতিক ধারণাগুলির প্রকৃত অর্থ নীতি-বিজ্ঞানের আলোচ্য-বিষয়

সুতরাং, 'ভাল এবং মন্দ', 'উচিত এবং অনুচিত', 'ন্যায় এবং অন্যায়'—এ জাতীয় লৌকিক ধারণাগুলিকে বিচার করে এর প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা এবং যে আদর্শের

1. "This is just the kind of question with which ethics deals—what is the true meaning of such words as 'good' and 'right' and 'ought' which are used so commonly in every day conversation."

—*William Lillie* : An Introduction to Ethics ; Page 1.

মাপকাঠিতে মানুষের আচরণ ভাল কি মন্দ বিচার করা হয় সেই আদর্শের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া নীতিবিজ্ঞানের কাজ।

৩। নীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Ethics):

বিভিন্ন লেখক নীতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ নিয়ে আলোচনা করে যে বিজ্ঞান তাই হল নীতিবিজ্ঞান। ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) বলেন, "নীতিবিজ্ঞান হল আচরণের মঙ্গল বা ঔচিত্যের আলোচনা।"[1] মানুষের আচরণই নীতিবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং মানুষের কাজের ভাল-মন্দ বিচার করাই নীতিবিজ্ঞানের কাজ। মানুষের আচরণের বা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার (voluntary action) নৈতিক মূল্য বিচার করে যে বিজ্ঞান তাই হল নীতিবিজ্ঞান।

Mackenzie-র সংজ্ঞা

ইংরেজী 'Ethics' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে গ্রীক শব্দ '*ethica*' থেকে। Ethica—এ শব্দটি এসেছে '*ethos*' কথাটি থেকে যার প্রকৃত অর্থ হল 'চরিত্র', 'আচার-ব্যবহার', 'রীতিনীতি' বা 'অভ্যাস (customs, usages or habits)। Ethics-কে 'Moral Philosophy' বা নীতিদর্শন নামেও অভিহিত করা হয়। 'Moral' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ '*mores*' থেকে যার অর্থ হল 'রীতিনীতি' বা 'অভ্যাস'। সুতরাং, Ethics বা নীতিবিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝব মানুষের রীতিনীতি বা অভ্যাস সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। মানুষের অভ্যাসজাত আচরণই নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অভ্যাসের মাধ্যমেই মানুষের চরিত্র প্রকাশিত হয়। মানুষের চরিত্র বলতে আমরা বুঝি মানুষের মনের অভ্যাসজাত স্থায়ী কর্মপ্রবণতা যা তার আচরণের সাহায্যে অর্জিত ও প্রকাশিত হয়। সুতরাং নীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, 'নীতিবিজ্ঞান হল মানুষের চরিত্র বা আচার সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।' নীতিবিজ্ঞান মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার, অভ্যাসের এবং চরিত্রের নৈতিক মূল্য বিচার করে, অর্থাৎ এদের ভালত্ব, মন্দত্ব, ঔচিত্য, অনৌচিত্য প্রভৃতির লক্ষণ ও নিয়ম নির্ণয়ের চেষ্টা করে।

নীতিবিজ্ঞান মানুষের চরিত্র বা আচার সম্পর্কীয় বিজ্ঞান

নীতিবিজ্ঞানকে মানুষের জীবনের পরমার্থ সম্পর্কীয় বিজ্ঞানও বলা যেতে পারে (Ethics is the science of the highest good of human life)। 'ন্যায় এবং অন্যায়', 'ভাল ও মন্দ', 'সৎ এবং অসৎ' প্রভৃতি ধারণাগুলি মানুষের জীবনের

1. "Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct."
—*Mackenzie*: A Manual of Ethics; Page 1.

চরম লক্ষ্য বা পরমকল্যাণের, অর্থাৎ পরমার্থের সঙ্গে যুক্ত। মানুষের সদাচারণের দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় এবং অসৎ বা অন্যায় আচরণের দ্বারা মানুষের অকল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য বা পরমকল্যাণের আদর্শটি কী, যাকে সামনে রেখে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করবে? নীতিবিজ্ঞান মানবজীবনের এই চরম লক্ষ্য বা পরমকল্যাণের, অর্থাৎ পরমার্থের আদর্শটি নির্ধারণ করার চেষ্টা করে।

নীতিবিজ্ঞান মানুষের জীবনের পরমার্থ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান

আমরা পরে দেখব যে, মানুষের যা পরমকল্যাণ তা কোন বহিরাগত বস্তু নয়, তার জীবনের অন্তরস্থিত বিষয়। এ দিক থেকে বিচার করে *Mackenzie* বলেন, "মানুষের জীবনের অন্তরস্থিত আদর্শের সাধারণ আলোচনা বা বিজ্ঞানই হচ্ছে নীতিবিজ্ঞান।"[1] যে আদর্শকে সামনে রেখে আমরা আমাদের আচরণ ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়, সৎ কি অসৎ বিচার করি, সে আদর্শ আমাদের সত্তার মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে এবং সেখানেই সন্ধান ক'রে তার স্বরূপটি নির্ধারণ করা দরকার। নীতিবিজ্ঞানকে সেজন্য আমাদের জীবনের অন্তরস্থ আদর্শের বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

নীতিবিজ্ঞান মানুষের জীবনের অন্তরস্থিত আদর্শের বিজ্ঞান

Lillie নীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "নীতিবিজ্ঞান হল সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান মানুষের আচরণকে উচিত কি অনুচিত, ভাল কি মন্দ সত্য কি মিথ্যা বা অনুরূপভাবে বিচার করে।"[2]

Lillie-র সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নীতিবিজ্ঞান হল একটি বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নির্ভুল, সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করাই এর উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, নীতিবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান; অর্থাৎ যে আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করলে আমাদের আচরণ যথোচিত হবে, তা নির্ধারণ করা নীতিবিজ্ঞানের কাজ। তৃতীয়তঃ, নীতিবিজ্ঞান মানুষের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা

Lillie-র সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

1. 'Ethics is the science or general study of the ideal involved in human life".
—*Mackenzie* : A Manual of Ethics ; Page 1.

2. "We may define ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies—a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way."
—*William Lillie* : An Introduction to Ethics ; Page 2.

করে। আচরণ শব্দটি ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সমষ্টিগত নাম (Conduct is a collective name for voluntary action)। ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলতে বুঝি এমন ক্রিয়া যে ক্রিয়া মানুষ পূর্ব থেকে সঙ্কল্প করে সম্পাদন করে ; অর্থাৎ যদি সে অন্য রকম সঙ্কল্প করত তবে সে-কাজ সে অন্যভাবে করতে পারত। মানুষের আচরণই নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। মনুষ্যেতর জীবের আচরণ নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়। নীতিবিজ্ঞান যে মানুষের আচরণ আলোচনা করে সে মানুষ সমাজে বসবাসকারী বা সামাজিক জীব। সামাজিক পটভূমিকা আছে বলেই মানুষের কাজের মূল্যায়ন করা এবং সকল আচরণের ভাল-মন্দ বিচার করা সম্ভব হয়। এই সংজ্ঞা থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, নৈতিক আদর্শের সাহায্যে মানুষের আচরণ বিচার করার জন্য আমরা ভাল বা মন্দ, যথোচিত বা অনুচিত, সৎ বা অসৎ—এ ধরনের নানা শব্দ ব্যবহার করে থাকি।

৪। নীতিবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা: যথোচিত ও অনুচিত, ভাল ও মন্দ, পরমার্থ, কর্তব্য, সততা এবং চরিত্র (Fundamental concepts of Ethics : Right and, Wrong, Good and Bad, The Highest Good : Duty, Virtue and Character) ঃ

(ক) যথোচিত ও অনুচিত (Right and Wrong) ঃ মানুষের কাজের বা আচরণের নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করার জন্য আমরা যথাচিত এবং অনুচিত, যথার্থ এবং অযথার্থ, ঠিক এবং বেঠিক প্রভৃতি কথা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হল—এ জাতীয় শব্দের প্রকৃত অর্থ বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি? যখন বলি এ কাজটা ঠিক হয়েছে, তখন কি করে বুঝব কেমন করে কাজ ঠিক বা বেঠিক হয়? এজন্য এ জাতীয় শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ধারণ করাও নীতিবিজ্ঞানের একটি প্রধান কাজ।

ইংরেজী 'right' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ '*rectus*' থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ হল সোজা (straight) বা বিধি অনুযায়ী (according to rule)। ইংরেজী 'wrong' শব্দটি '*wring*' শব্দটির সঙ্গে যুক্ত, যার অর্থ হল মোচড়ান (twisted), অর্থাৎ যা বিধি বা নিয়ম অনুযায়ী নয়। যখন বলি কোন মানুষের কাজ বা আচরণ যথোচিত বা ঠিক হয়েছে তখন বুঝি তার কাজ নিয়মমত হয়েছে এবং যখন বলি কোন মানুষের

কাজ বা আচরণ বেঠিক হয়েছে তখন বুঝি তার কাজ নিয়মমত হয়নি। সুতরাং, যথোচিত আচরণ বলতে বুঝায় সেই আচরণ, নৈতিক নিয়মের সঙ্গে যার সঙ্গতি আছে এবং অন্যায় আচরণ বলতে বুঝব সেই আচরণ, নৈতিক নিয়মের সঙ্গে যার সঙ্গতি নেই। অতএব দেখতে পাচ্ছি যে, যথোচিত এবং অনুচিত, ন্যায় এবং অন্যায়—এ জাতীয় ধারণার সঙ্গে নৈতিক নিয়মের বিশেষ সংযোগ আছে।

যথোচিত আচরণ হল নৈতিক নিয়মানুযায়ী আচরণ

নৈতিক জীবন যাপন করা অর্থে বুঝি নৈতিক নিয়ম মেনে চলা। এই কারণে *Lillie* বলেন, "কোন একটি নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার ওপর যথোচিত কাজের উপযুক্ততা অনেক সময় নির্ভর করে।[1] কোন একটি লোকের দয়ার কাজকে আমরা উপযুক্ত কাজ বলে মনে করি, কারণ অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার সাধারণ নিয়মটি যথোচিত। সুতরাং, নিয়মই ন্যায় এবং অন্যায় নির্ধারণ করার মাপকাঠি, অর্থাৎ নৈতিক নিয়মের সাহায্যেই আমরা কোন কাজ যথোচিত কি অনুচিত, ন্যায় কি অন্যায় বিচার করতে পারি। অবশ্য এ নৈতিক নিয়মটিকে যে সকল ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে এ নিয়মটি সুপরিব্যক্ত (explicit) থাকে না এবং অনেক সময় নৈতিক নিয়ম সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা না করেই আমরা মানুষের আচরণের নৈতিক বিচার করি।

নৈতিক জীবন যাপন মানে নৈতিক নিয়ম মেনে চলা

নৈতিক নিয়মটি সকল সময় সুপরিব্যক্ত থাকে না

যথোচিত বা ঠিক কাজ বলতে আমরা বুঝি যা নিয়মানুযায়ী করা হয়। কিন্তু আমরা নিয়ম মানি এজন্য যে, তার দ্বারা আমাদের কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধিত হবে বা কল্যণজনক কিছু লাভ করা যাবে। সুতরাং, নৈতিক নিয়ম মেনে চলার প্রধান উদ্দেশ্য হল জীবনের পরমকল্যাণ বা পরমার্থ (Tht Supreme or the Highest Good of life) লাভ করা। সুতরাং যথোচিত ন্যায় আচরণ বলতে বুঝব সেই আচরণ যা আমাদের পরমার্থলাভের সহায়ক এবং অনুচিত বা অন্যায় আচরণ বলতে বুঝব সেই আচরণ যা পরমার্থলাভের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ। সুতরাং 'যথোচিত' ধারণাটি 'কল্যাণ' বা মঙ্গল ধারণার অধীন (Right is subordinate to good)। সে কাজই যথোচিত কাজ যা কল্যাণলাভের উপায়স্বরূপ।

1. "The fittingness of a rigtion action often appears to consist in its conformity to some rule"
—**Lillie** : An Introduction to Ethics ; Page 7.

(খ) ভাল ও মন্দ (Good and Bad) : ইংরেজী good'[1] শব্দটি জার্মান শব্দ *'gut'* থেকে উদ্ভূত। কোন একটি জিনিসকে আমরা সাধারণতঃ তখনই ভাল বলি যখন তা আমাদের কোন উদ্দেশ্য সাধন করে। বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মুক্ত হতে সহায়তা করে বলেই বিভিন্ন রোগের পক্ষে বিভিন্ন ওষুধ ভাল। ম্যালেরিয়ার পক্ষে কুইনাইন ভাল নিমোনিয়ার পক্ষে পেনিসিলিন ভাল, স্বাস্থ্যের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য ভাল। তেমনি যখন বলি 'ভাল আচরণ' তখন বুঝতে হবে যে আমাদের যে নৈতিক আদর্শ আছে সেই আদর্শকে লাভ করার পক্ষে সে আচরণ অবশ্য কার্যকর।

নৈতিক আদর্শলাভের পক্ষে যে আচরণ কার্যকর তাকে ভাল আচরণ বলে

'ভাল' বা 'কল্যাণকর' বলতে আমরা কেবলমাত্র উদ্দেশ্য বা অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়কেই বুঝি না, উদ্দেশ্য বা অভীষ্টকেও বুঝে থাকি। এই অর্থে ভাল বা কল্যাণকর বলতে আমরা বুঝব কোন কাম্য বিষয় বা অর্থ, স্বাস্থ্য বা অন্য যে কোন বস্তু। তেম ন মন্দ বা অকল্যাণকর বলতে বুঝব যা কাম্য বস্তু নয়, নিন্দাত্মক এমন কিছু যাকে আমরা এড়িয়ে চলতে চাই, যেমন – দারিদ্র, রোগ, ভীরুতা ইত্যাদি।

নীতিবিজ্ঞান মানুষের আচরণ ভাল কি মন্দ বিচার করে, অর্থাৎ নৈতিক আদর্শ বা উদ্দেশ্যলাভ করার জন্য আমাদের আচরণ কার্যকর কিনা, নীতিবিজ্ঞান তাই বিচার করে। এখন এ উদ্দেশ্য বা আদর্শ বলতে কি বুঝি? আমাদের কোন কাজ করার পিছনে নানারকম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকতে পারে; যেমন—গ্রন্থ রচনা করা, অর্থ রোজগার করা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করা, খ্যাতি লাভ করা ইত্যাদি। নীতিবিজ্ঞান এ সকল বিশেষ বিশেষ ধরনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করে না। নীতিবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু হল মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বা পরম-কল্যান বা পরমার্থ (*Sumum bonum* or Supreme Good), যার দিকে দৃষ্টি রেখে মানুষের সমস্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার।

(গ) পরমার্থ বা পরমকল্যাণ (*Sumum bonum or* The Highest Good) : নীতিবিজ্ঞানে আমরা 'ভাল' বা 'কল্যাণকর' যা কিছু তাকে উপায় এবং উদ্দেশ্য দুভাবেই দেখে থাকি। সুখ যদি হয় লক্ষ্য তাহলে সুখলাভের জন্য ভাল স্বাস্থ্য হল উপায়: উভয়ই ভাল। আবার স্বাস্থ্যলাভ যদি হয় লক্ষ্য এবং কল্যাণকর তাহলে শারীরিক

---

1. "It should be carefully observed, however, that the term 'good' is used (perhaps even more frequently) to signify not something which is a means to an end but something which is itself taken as an end".

—*Mackenzie* : A manual of Ethics ; Page 2.

ব্যায়াম, পুষ্টিকর খাদ্য, ভাল ওষুধ ইত্যাদি স্বাস্থ্য লাভ করার উপায়স্বরূপ এবং সেজন্য কল্যাণকর। সুতরাং, কল্যাণ দুরকম—পরমকল্যাণ ও আপেক্ষিক কল্যাণ। 'পরমকল্যাণ' (Absolute Good) এবং 'আপেক্ষিক কল্যাণে'র (Relative Good) বা 'পরমার্থ' এবং 'বিশেষার্থের' মধ্যে যে প্রভেদ তা জানা দরকার। আপেক্ষিক কল্যাণ বলতে বুঝব এমন কিছু যার মাধ্যমে আমাদের কোন অভীষ্ট বা উদ্দেশ্য লাভ হয়, যাকে তার নিজের জন্যই কামনা করি না। অতএব আপেক্ষিক কল্যাণ অন্য কোন উচ্চতর কল্যাণলাভের উপায়স্বরূপ। অপর দিকে, মানুষের পরমার্থ বা পরমকল্যাণ বলতে বুঝি সেই কল্যাণ যাকে তার নিজের জন্যই কামনা করি। পরমকল্যাণ অন্য কোন কল্যাণের অধীনস্থ নয়, বা উচ্চতর কোন কল্যাণলাভের উপায়স্বরূপ একে ব্যবহার করা যায় না। পরমার্থ মানুষের চরম অভীষ্ট বা লক্ষ্য, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু।

পরমকল্যাণ ও আপেক্ষিক কল্যাণের পার্থক্য

প্রত্যেক ঐচ্ছিক ক্রিয়ার একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে এবং এই লক্ষ্যেরও ক্রম-বিন্যাস আছে। মানুষের পরমার্থ বা পরমকল্যাণ মানুষের জীবনের চরম কামনার বা বাসনার শেষ ধাপ, যাকে কামনা করার পর আর কামনা করার কিছুই থাকে না; সুতরাং মানুষের এই পরমকল্যাণ বা পরমার্থ হল নিজ সত্তায় কল্যাণকর (intrinsically good); যেহেতু এর নিজের জন্যেই একে কামনা করা হয়, অন্য কোন অভীষ্ট লাভের হেতু বা উপায় হিসেবে একে কামনা করা হয় না।

পরমকল্যাণ নিজ সত্তায় কল্যাণকর

পরিশেষে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, মানুষের জীবনে যথার্থ কোন পরমার্থ আছে কি না? মানুষ তো অনেক কিছু কামনা করে—অর্থ স্বাস্থ্য, শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, ভালবাসা ইত্যাদি। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, এসব মানুষের কাম্যবস্তু হলেও এগুলিকে মানুষের পরমার্থ মনে করা যেতে পারে না। এগুলির কোনটিই জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সে কেন অর্থ চায়, তাহলে সে বলবে যে, অর্থের সাহায্যে সে অন্য কোন বস্তু লাভ করতে চায়। সুতরাং, অর্থ যেহেতু অন্য কিছুকে পাবার উপায়স্বরূপ সেহেতু অর্থকে চরম অভিষ্ট মনে করা যেতে পারে না। এভাবে স্বাস্থ্য, শক্তি যাই বলি না কেন, সব কিছুই কামনা করা হয় অপর কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে লাভ করার জন্য। মানুষের জীবনে পরমার্থ কি—তার উত্তর এখন দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষের জীবনে পরম উদ্দেশ্য বা আদর্শ আছে—এটাই আমাদের প্রারম্ভে মেনে নিতে হবে এবং নীতিবিজ্ঞানের আলোচনায় অগ্রসর হয়ে যথাসময়ে আমরা এ আদর্শের স্বরূপটি নির্ধারণ করতে চেষ্টা করব।

মানুষের জীবনে পরম উদ্দেশ্য বর্তমান

(ঘ) কর্তব্য (Duty) ঃ কর্তব্য হল সেই কাজ নৈতিক নিয়মানুসারে যা করা উচিত, অর্থাৎ নৈতিক আদর্শানুযায়ী যেসব কাজ আমাদের করা প্রয়োজন সেগুলিই হল কর্তব্য। কর্তব্য কাজ শেষ পর্যন্ত পরম কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; সেহেতু এ কাজগুলি সম্পন্ন করার নৈতিক বাধ্যতাবোধ আমরা অনুভব করি।

নীতিবিজ্ঞান পরমকল্যাণের আদর্শ (Ideal of the Supreme God) এবং কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে। কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমেই আমরা পরমকল্যাণের আদর্শ উপলব্ধি করি। যখনই আমাদের মনে পরমকল্যাণলাভের ইচ্ছা জাগে তখনই আমাদের মধ্যে কর্তব্য সম্পাদেনর নৈতিক বাধ্যতাবোধ দেখা দেয়। নৈতিক জীবনের সঙ্গে এই কর্তব্যবোধ অত্যন্ত নিবিড় ভাবে যুক্ত। যেখানে নৈতিক দায়িত্ববোধ আছে সেখানে কর্তব্যবোধও আছে। আর যেখানে কর্তব্যবোধ আছে সেখানে কর্তব্য সম্পন্ন করার নৈতিক বাধ্যতাবোধও আছে।

(ঙ) সততা (Virtue) ঃ নৈতিক নিয়মানুযায়ী কর্তব্য করার যে মানসিক প্রবণতা বা বাসনা তকেই সততা বলা হয়। তাকেই আমরা সৎ লোক বলি যে ব্যক্তি অবিচলিত ভাবে তার কর্তব্য সমাপন করে। কর্তব্য ও সততার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। সততা হল চরিত্রের উৎকর্ষ (excellence)। কর্তব্য হল বহিরাচরণের মাধ্যমে সেই চরিত্রের প্রকাশ। সততা হল অন্তর্মুখী। কর্তব্য হল বর্হিমুখী। মাতা-পিতার সেবা করা, গুরুজনের আদেশ পালন করা মানুষের কর্তব্য। যেমন মাতাপিতার ও গুরুজনদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি হল মানুষের সদগুন বা সততা।

মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকলেই মানুষ মাতাপিতার সেবা করা কর্তব্য মনে করে অর্থাৎ কর্তব্যের মাধ্যমেই সততা আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং কর্তব্য ও সততা একই বস্তুর দুটি ভিন্ন দিক। যখন অন্তরের দিকে লক্ষ্য করি তখন যা সততা, যখন বাইরের আচরণের দিকে লক্ষ্য করি তখন তাই কর্তব্য। ম্যাকেঞ্জি বলেন, "সততা হল চরিত্রের সৎ অভ্যাস এবং তা' কর্তব্য থেকে পৃথক। কর্তব্য হল বিশেষ এক ধরনের কাজ যা আমাদের করা উচিত। মানুষ তার কর্তব্য করে কিন্তু সে সদ্গুণের অধিকারী বা সৎ হয়।"[1]

---

1. "The term virtue is employed to denote a good habit of character as distinguished from a duty which denotes rather some particular kind of action which we ought to perform. Thus a man does his duty but he possesses a virtue or is virtuous."

(চ) চরিত্র (Character) ঃ কোন ব্যক্তির চরিত্র হল তার বিশেষ মানসিক এবং নৈতিক গঠন, তার অভ্যাসসিদ্ধ ইচ্ছার প্রবণতা (habitual disposition of the will) যা তাকে অন্যান্য ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। ইচ্ছাকৃত কতকগুলি কাজ বার বার করার ফলেই এই ইচ্ছার অভ্যাস ও প্রবণতা অর্জিত হয়। নোভালিস (Novalis) চরিত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন। "চরিত্র হল সম্পূর্ণভাবে গঠিত ইচ্ছা (a completely fashioned will)। ম্যাকেঞ্জির মতে চরিত্র হল একটি নির্দিষ্ট 'কামনার জগতের' অবিরাম প্রাধান্য। অন্যত্র তিনি বলেছেন—"চরিত্র হল কোন এক ধরনের স্বেচ্ছামূলক কাজের দ্বারা গঠিত একটি সংহতি বা জগৎ।[1]

আচরণ (conduct) কাকে বলে? আচরণ হল মানুষের ঐচ্ছিক এবং অভ্যাস-সিদ্ধ ক্রিয়া। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া মানুষের আচরণের বহির্ভূত, যেহেতু উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ব থেকে সংকল্প করে এ কাজ করা হয় না। মানুষের আচরণের মধ্যেই তার চরিত্র প্রকাশিত হয়। আচরণ ও চরিত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। চরিত্র হল আচরণের আভ্যন্তরীণ দিক। আচরণ হল চরিত্রের বাহ্য দিক। একটিকে আর একটি থেকে আলাদা করা যায় না। মানুষের কাজ তার চরিত্রের ওপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় আর মানুষের চরিত্র তার আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যে ব্যক্তি সৎ তার আচরণ স্বভাবতঃই সৎ হয়। শৈশব থেকে যে ব্যক্তি অধর্ম ও অন্যায় আচরণে অভ্যস্ত তার চরিত্র মন্দভাবেই গঠিত হয়।

৫। নীতিবিজ্ঞানের পরিধি (The Province or Scope of Ethics) ঃ

ইংরেজীতে কোন বিজ্ঞানের *Province* বা *Scope* কথাটির অর্থ হল তার আলোচনার পরিসর বা ক্ষেত্র, অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়সমূহ। যে কোন বিজ্ঞান বিশ্বের এক বিশেষ বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং সেইটাই তার নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু। সেই নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সে সুশৃঙ্খল ও নির্ভুল জ্ঞানদান করার চেষ্টা করে। এই নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু এবং সংশ্লিষ্ট কতকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয় হল বিজ্ঞানের পরিসর বা ক্ষেত্র। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো নীতিবিজ্ঞানও একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নীতিবিজ্ঞানের আলোচনার পরিসরের অন্তর্ভুক্ত।

(১) নীতিবিজ্ঞান 'ভাল', 'মন্দ', 'উচিত', 'অনুচিত', 'পরমকল্যাণ', 'কর্তব্য', 'সততা' 'চরিত্র' প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করে।

---

1. "Character means the complete universe or system constituted by acts of will of a particular kind. —Mackenzie : A Manual of Ethics ; Page 67.

(২) মানুষের আচরণের নৈতিক মূল্য ও আদর্শ নির্ধারণ করাই নীতিবিজ্ঞানের কাজ। মানুষের আচরণ বলতে নীতিবিজ্ঞানে আমরা মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়াকেই বুঝি। সুতরাং ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ, ঐচ্ছিক ক্রিয়া (Voluntary Action) ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার (Non-voluntary Action) মধ্যে প্রভেদ এবং এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিষয়, যেমন—কামনা (Desire), ক্রিয়ার মূল উৎস (Spring of Action), উদ্দেশ্য (Motive), অভিপ্রায় (Intention) প্রভৃতি নীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) নৈতিক আদর্শের স্বরূপ নির্ধারণ করা নীতিবিজ্ঞানের একটি প্রধান কাজ। নীতিবিজ্ঞান মানুষের আচরণের নৈতিক মূল্য বা ভাল-মন্দ বিচার করে। কিন্তু মানুষের আচরণের নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয় একটি নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে। ঐ আদর্শের সঙ্গে যে কাজের সঙ্গতি থাকে তাকে সৎ বা ভাল কাজ এবং ঐ আদর্শ লঙ্ঘন করে যে কাজ করা হয় তাকে অসৎ বা খারাপ কাজ বলে আমরা অভিহিত করি।

(৪) নীতিবিজ্ঞান নৈতিক বিচারের মানদণ্ড সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করে। নৈতিক আদর্শের স্বরূপ নির্ধারণ করা নীতিবিজ্ঞানের একটি প্রধান সমস্যা। কেননা এ সম্পর্কে সকলে একমত নন, অর্থাৎ বিভিন্ন নীতিবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে এ আদর্শের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। কারও মতে নৈতিক আদর্শ হচ্ছে একটি নিয়ম বা বিধি (Law); কারও মতে এটা সুখ বা শান্তি (Pleasure or Happiness); কারও মতে কৃচ্ছ্রসাধন (Negation of Pleasure); আবার কারও কারও মতে এটা আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতা (Self-realisation or Perfection)। নীতিবিজ্ঞানের অন্যতম কাজ হল এসব বিভিন্ন মতবাদের ব্যাখ্যা করা এবং তাদের দোষ-গুণ নির্ণয় করে কোন্‌টি সর্বোৎকৃষ্ট বা গ্রহণযোগ্য মতবাদ সেটি নির্ধারণ করা।

নীতিবিজ্ঞান নৈতিক আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে

(৫) নীতিবিজ্ঞান নৈতিক বিচারের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে। যে মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা আমরা, আচরণের ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করি তাকে বলে নৈতিক বিচার (Moral Judgment)। নৈতিক বিচারের আলোচনা প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রশ্ন দেখা দেয়; যেমন—নৈতিক বিচার করার কর্তা (Subject of Moral Judgment) কে; নৈতিক বিচারের যথার্থ বিষয়বস্তু (Object of Moral Judgment) কি এবং আমাদের নৈতিক অবধারণ করার যে বৃত্তি (Faculty of moral Judgement) আছে, তারই বা স্বরূপ কি? নীতিবিজ্ঞান এ সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেবার চেষ্টা করে।

(৬) নীতিবিজ্ঞান নৈতিক বাধ্যতাবোধ নিয়ে আলাচনা করে; কারণ নৈতিক বিচার নৈতিক বাধ্যতাবোধর (moral obligation) সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। যখন আমরা একটি কাজকে ভাল বা মন্দ বলে ভাবি তখন মন্দ কাজটি না করে ভাল কাজটি করার জন্য আমাদের মনে এক তাগিদ দেখা দেয়; একেই বলে নৈতিক বাধ্যতাবোধ। এই নৈতিক বাধ্যতা-বোধকেই বলে কর্তব্যবোধ বা ঔচিত্যবোধ। *Kant* বলেন, "যা সঠিক (the right) তা যদি উচিত (ought) না হয় তবে সঠিকের কোন অর্থই হয় না।"[1] নীতিবিজ্ঞান নৈতিক বাধ্যতাবোধের স্বরূপ কি, বাধ্যতাবোধের উৎপত্তি কিভাবে হল, এ বাধ্যতাবোধের কারণ বা অধিকর্তা কে?—এ সকল প্রশ্ন আলোচনা করে।

নৈতিক বাধ্যতাবোধও নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

(৭) নীতিবিজ্ঞান নৈতিক গৌরব, অগৌরব নিয়ে আলোচনা করে। নৈতিক বাধ্যতাবোধ কাজের গৌরব বা নৈতিক উৎকর্ষ (Merit) এবং অগৌরব বা নৈতিক অপকর্ষের (Demerit) সঙ্গে সংযুক্ত। যে ব্যক্তি সৎ কাজ করে তার কাজ আমরা অনুমোদন করি, তাকে প্রশংসা করি এবং মনে করি কর্তব্য কাজ করার জন্য সে গৌরবের অধিকারী। অপর দিকে, যে ব্যক্তি অসৎ বা অন্যায় কাজ করে তাকে আমরা সমর্থন করি না এবং মনে করি যে, অসৎ কাজ করার জন্য সে নিন্দনীয়। সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যে গৌরব আছে। কাজকে যথোচিত বা কর্তব্য জেনেও না করার মধ্যে নিহিত আছে অগৌরব। নীতিবিজ্ঞান এই গৌরব ও অগৌরব বা নৈতিক উৎকর্ষ নিয়ে আলোচনা করে।

নীতিবিজ্ঞান কাজের গৌরব এবং অগৌরব নিয়ে আলোচনা করে

(৮) নীতিবিজ্ঞান কর্তব্য (Duties) ও নৈতিক অধিকার (Rights) এবং সততা (Virtue) ও অসদাচার (Vice) নিয়ে আলোচনা করে। নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী যে কাজ আমাদের করা উচিত তাই হল কর্তব্য। আবার কর্তব্য বা অধিকার অনেক সময় একত্র চলে। পিতার প্রতি পুত্রের যে কর্তব্য তাহল পুত্রের নিকট পিতার অধিকার। সুতরাং কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নীতিবিজ্ঞানকে অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। আবার কর্তব্য করলে আমরা সততা অর্জন করি এবং কর্তব্য অবহেলা করে আমরা সংগ্রহ করি অসততা। এই সততা ও অসদাচার নীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

নীতিবিজ্ঞান অধিকার ও কর্তব্য, সততা ও অসদাচার নিয়ে আলোচনা করে

1. "There is no meaning in the right unless it involves the ought."
—*Kant*: Critique of Practical Reason.

(৯) নীতিবিজ্ঞানকে কতকগুলি সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে তার মূল বিষয়বস্তুকে আলোচনা করতে হয়। প্রতিটি বিজ্ঞানের কতকগুলি স্বীকার্য সত্য (Postulates) আছে। নীতিবিজ্ঞানেরও কতকগুলি স্বীকার্য সত্য আছে: ব্যক্তির সত্তা (Personality), বুদ্ধি বা বিচারশক্তি (Reason) এবং ইচ্ছা-স্বাধীনতা (Freedom of Will) হচ্ছে নীতিবিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্য। নীতিবিজ্ঞান এসব স্বীকার্য সত্য নিয়ে আলোচনা করে। ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলেই আমাদের আচরণের নৈতিক দায়িত্ব আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়।

নীতিবিজ্ঞান কতকগুলি স্বীকার্য সত্য নিয়ে আলোচনা করে

(১০) নৈতিক দায়িত্ব (Moral Responsibility) সম্পর্কে আলোচনা করাও নীতিবিজ্ঞানের কাজ। কোন ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের বিপক্ষে নীতিবিরুদ্ধ কাজ করলে সে অপরাধী হয় এবং এজন্য তার শাস্তি পাওয়া উচিত। শাস্তির নৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতাবাদগুলি নীতিবিজ্ঞান আলেচনা করে।

(১১) নীতিবিজ্ঞান নৈতিক ভাবাবেগ (Moral Sentiment) নিয়েও আলোচনা করে। কোন ব্যক্তিকে সৎ কাজ করতে দেখলে আমাদের মনে যে প্রীতিকর ভাব জাগে এবং অসৎ কাজ করতে দেখলে মনে যে অপ্রীতিকর ভাব জাগে তাকেই নৈতিক ভাবাবেগ বলে। নৈতিক ভাবাবেগের স্বরূপ, উৎপত্তি এবং নৈতিক বিচারের সঙ্গে নৈতিক ভাবাবেগের সম্পর্ক নীতিবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

নীতিবিজ্ঞান নৈতিক ভাবাবেগ নিয়ে আলোচনা করে

(১২) নৈতিক বিচারশক্তিকে বা নৈতিক বিচারের বৃত্তিকেই ইংরেজীতে *Moral Faculty* বলে। এই Moral Faculty-র অপর নাম হল Conscience, বাংলায় আমরা যাকে বলে থাকি বিবেক। এই বিবেকের স্বরূপ কি এবং এ বিবেক সম্পর্কীয় যেসব বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, নীতিবিজ্ঞান সেগুলি আলোচনা করে।

(১৩) নীতিবিজ্ঞানও প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞান, দর্শন বা অধিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক আলোচ্য বিষয় নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, যেহেতু এসকল বিজ্ঞানের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। মনোবিজ্ঞানের যে বিষয়গুলি নীতিবিজ্ঞান বিশেষ করে আলোচনা করে সেগুলি হল ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্বরূপ, ইচ্ছার স্বাধীনতা, বাসনা এবং সুখের সঙ্গে সম্বন্ধ ইত্যাদি। নীতিবিজ্ঞানে আলোচিত দর্শনের বিষয়গুলি হল মানুষের সত্তা, এ বিশ্বে মানুষের স্থান, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরতা,

বিভিন্ন বিজ্ঞানের কিছু কিছু আলোচ্য বিষয়বস্তু নীতিবিজ্ঞানের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত

ঈশ্বরের স্বরূপ এবং অস্তিত্ব, বিশ্বের নৈতিক শাসন ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞানের যে-সব বিষয় নীতিবিজ্ঞানে আলোচিত হয় তাহল ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ, অপরাধ ও সেজন্য শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে-সব বিষয় নীতিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তাহল ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি ইত্যাদি।

৬। নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ (Nature of Ethics):

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, নীতিবিজ্ঞান সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কে একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। প্রকৃতির একটি বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে যথাযথ, সুনিশ্চিত, সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলে। নিজ নিজ বিভাগের বিষয়বস্তু ও ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা এবং ঐ সকল নিয়মের সাহায্যে বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। নীতিবিজ্ঞানকে আমরা বিজ্ঞান বলি, যেহেতু অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো নীতিবিজ্ঞানেরও একটা সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে এবং এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিশ্চিত, যথার্থ, সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানদান করা নীতিবিজ্ঞানের লক্ষ্য। নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু হল মানুষের আচরণ, অর্থাৎ ঐচ্ছিক ক্রিয়া, মানুষের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়। প্রধানতঃ পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে মানুষের আচরণকে একটি আদর্শ অনুযায়ী কতকগুলি নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করাই নীতি-বিজ্ঞানের কাজ।

নীতিবিজ্ঞান একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান

বিজ্ঞানকে এই হিসেবে দুভাগে ভাগ করা হয়; যথা—**বস্তুনিষ্ঠবিজ্ঞান** (Positive Science) এবং **আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান** (Normative Science)।

বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান: যে বিজ্ঞানে বস্তুর উৎপত্তি, বিকাশ ও যথাযথ প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া হয় তাকেই বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে; যেমন—মনোবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা—এই মানসিক প্রক্রিয়া-গুলিকে বিশ্লেষণ করে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্ণয় করা মনোবিজ্ঞানের কাজ। মানসিক প্রক্রিয়াগুলির প্রকৃতি কি, মনোবিজ্ঞান তা-ই বর্ণনা করে। মানসিক প্রক্রিয়াগুলি কি রকম হওয়া উচিত তা নিয়ে মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে না।

আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান: আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান একটি আদর্শের আলোকে বিষয়বস্তুর মূল্য বিচার করে। নীতিবিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। পরমকল্যাণের আদর্শের মাপকাঠিতে মানুষের আচরণের মূল্য নির্ধারণ করা নীতিবিজ্ঞানের কাজ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, সৌন্দর্যবিজ্ঞান এবং তর্কবিজ্ঞান উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

তর্কবিজ্ঞানের আদর্শ হল সত্যতা। কিভাবে আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করলে আমাদের চিন্তা যথার্থ হতে পারে তর্কবিজ্ঞানের কাজ হল তাই নির্ধারণ করা। অনুরূপ-ভাবে সৌন্দর্যবিজ্ঞানের (Aesthetics) আদর্শ হল সৌন্দর্য (Beauty) এবং বস্তুর সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যের অভাব নির্ণয় করার নিয়ম স্থির করা সৌন্দর্যবিজ্ঞানের কাজ।

বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানকে **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান** (Natural Science) এবং **বর্ণনামূলক বিজ্ঞান** (Descriptive Science) বলা হয়। বস্তুজগতে বিষয়টি যেভাবে বিদ্যমান আছে ঠিক সেইভাবে তাকে জানা এবং তার বর্ণনা দেওয়াই হল বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের কাজ। যেমন, প্রাণিবিদ্যায় ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রকৃতি নির্ণয় করা হয় এবং তাদের বর্ণনা দেওয়া হয়। বিশ্লেষণ, বর্ণনা এবং ব্যাখ্যাই এ জাতীয় বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, সদাসৎ, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানে উত্থাপন করা হয় না বা কোন আদর্শকে সামনে রেখে বিষয়বস্তুর মূল্য বিচার করা হয় না।

আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানকে **মূল্যাবধারণের বিজ্ঞান** বা **নিয়ামক বিজ্ঞান** বলা হয়। কোন আদর্শের মাপকাঠিতে বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করাই আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের কাজ। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে বিষয়টি বা ঘটনাটি কি, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে বিষয়টি কী হওয়া উচিত। নীতিবিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যেহেতু পরমকল্যাণের আদর্শের মাপকাঠিতে মানুষের আচরণ ভাল কি মন্দ বিচার করা বা মানুষের আচরণের মূল্য নির্ধারণ করাই নীতিবিজ্ঞানের কাজ। মানুষের আচরণের প্রকৃতি, উৎপত্তি এবং বিকাশ কিভাবে হয় তা নির্ণয় করার দায়িত্ব নীতিবিজ্ঞানের নয়, অর্থাৎ কতকগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ নিয়মের সাহায্যে মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা করা নীতিবিজ্ঞানের কাজ নয়। মানুষের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত, যার ফলে মানুষ তার জীবনের পরমার্থ লাভ করতে পারে, তা নির্ধারণ করাই নীতিবিজ্ঞানের কাজ। যে আদর্শের দ্বারা মানুষের চরিত্রের মূল্য নির্ণয় হয়, সেই আদর্শের স্বরূপ নির্ণয় করাই নীতিবিজ্ঞানের লক্ষ্য। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের সঙ্গে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের আরও একদিক থেকে পার্থক্য আছে। যে মানদণ্ডের সাহায্যে আমরা বিচার করি, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান শুধুমাত্র সেগুলিকে বর্ণনা করে না, সেগুলির যাথার্থ্য বা সত্যতা নিয়েও আলোচনা করে। হিব্রুরা দশটি আদেশের সাহায্যে মানুষের আচরণের বিচার করেছে। এই ধরনের নিয়মের, যার সাহায্যে মানুষ তার আচরণের বিচার করেছে, বর্ণনা করাই শুধুমাত্র নীতিবিজ্ঞানের কাজ নয়। নীতিবিজ্ঞানে আমরা আরও প্রশ্ন তুলি, কেন এই নিয়মগুলি যথার্থ বা কিসের ভিত্তিতে আমাদের এইগুলি মেনে চলা উচিত।

৭। নীতিবিদ্যা কি বিজ্ঞান, না দর্শনের অংশ (Is Ethics a Science or a part of Philosophy) :

নীতিবিদ্যা বিজ্ঞান, না দর্শনের অংশ, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নীতিবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন নীতিবিদ্ যেমন, ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) মনে করেন যে, নীতিবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে গণ্য না করে, দর্শনের অংশ রূপে গণ্য করাই যুক্তিসঙ্গত। নিজ অভিমত সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন, বিজ্ঞানের কাজ মানুষের অভিজ্ঞতার একটা সীমিত অংশ নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু নীতিবিদ্যা একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ক্রিয়া (activity)-র দিক থেকে, অর্থাৎ লক্ষ্য বা আদর্শ অনুসরণ করার দিক থেকে মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতা (whole of experience) নিয়ে আলোচনা করে।

ম্যাকেঞ্জি-র মতে নীতিবিদ্যা দর্শনের অংশ, বিজ্ঞান নয়

যেহেতু বিজ্ঞানের কাজ মানুষের অভিজ্ঞতার কোন সীমিত বিভাগের আলোচনা করা, সেহেতু নীতিবিদ্যাকে কোন মতেই বিজ্ঞানরূপে গণ্য করা সমীচীন নয়। নীতিবিদ্যা দর্শনের অংশ; যেহেতু নীতিবিদ্যা হল সমগ্র অভিজ্ঞতার আলোচনার অংশ বিশেষ (part of the study of experience as a whole)। নীতিবিদ্যা দর্শনের অংশস্বরূপ, কারণ ইচ্ছা বা ক্রিয়ার (will or activity) দিক থেকে জীবনের অভিজ্ঞতার আলোচনা করে নীতিবিদ্যা। চিন্তা করছে বা জানছে যে মানুষ তার আলোচনা নীতিবিদ্যা করলেও করে পরোক্ষভাবে; যে মানুষ ক্রিয়া করছে, অর্থাৎ কিনা কোন লক্ষ্য অনুসরণ করছে, সেই মানুষের আলোচনা করাই নীতিবিদ্যার কাজ। নীতিবিদ্যা, মানুষের সমগ্র ক্রিয়া (whole activity), যে কল্যাণ সে লাভ করতে চায় তার সমগ্র প্রকৃতি এবং সেই কল্যাণলাভে নিয়োজিত তার ক্রিয়ার সমগ্র তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে। ম্যাকেঞ্জি বলেন, এই কারণে নীতিবিদ্যাকে নীতিবিজ্ঞানরূপে গণ্য না করে নীতিদর্শন রূপে গণ্য করাই সমীচীন, কারণ বিজ্ঞানের নয়, দর্শনেরই কাজ সমগ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা।

কোন কোন নীতিবিদ্ মনে করেন নীতিবিদ্যাকে দর্শনের অংশরূপে গণ্য না করে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (normative science)-রূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। দর্শনের কাজ তত্ত্ব (reality)-র যথাযথ স্বরূপ নিরূপণ করা। জগৎ ও জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং তার মূল্যাবধারণই দর্শনের কাজ। নীতিবিদ্যা দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু নীতিবিদ্যাকে দর্শনের অংশরূপে গণ্য না করাই সমীচীন। তত্ত্বের স্বরূপ নিরূপণ করা নীতিবিদ্যার কাজ নয়। ঈশ্বর, জগৎ ও মানুষ যা দর্শনের আলোচ্য বিষয় তার মধ্যে মানুষের সঙ্গে, বিশেষ করে মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ বিচার নিয়েই নীতিবিদ্যার

আলোচনা। নীতিবিদ্যার আলোচনায় যেসব দার্শনিক সমস্যার আলোচনা এসে পড়ে নীতিবিদ্যার কাছে সেগুলি কেবলমাত্র কতকগুলি বিনা প্রমাণে গৃহীত অনুমান মাত্র। তাদের প্রকৃত স্বরূপ এবং যাথার্থ্য নিয়ে নীতিবিদ্যা আলোচনা করে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরতা, ইচ্ছা-স্বাধীনতা—এগুলি নীতিবিদ্যার স্বীকার্য সত্য। নীতিবিদ্যা এগুলির যাথার্থ্য প্রমাণে সচেষ্ট হয়নি। সে কারণে কোন কোন নীতিবিদ্ মনে করেন যে, নীতিবিদ্যাকে দর্শনের অংশরূপে গণ্য না করে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানরূপেই গণ্য করা উচিত।

কোন কোন নীতিবিজ্ঞানীর মতে নীতিবিদ্যা বিজ্ঞান, দর্শনের অংশ নয়

আমাদের মতে নীতিবিদ্যাকে দর্শনের অংশ মনে না করে বিজ্ঞানরূপেই গণ্য করা উচিত। অবশ্য নীতিবিদ্যা কোন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। নীতিবিদ্যা বিজ্ঞান, যেহেতু অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নির্ভুল, সুশৃঙ্খল এবং সুসংবদ্ধ জ্ঞান নীতিবিদ্যা দিতে চায়। নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যেহেতু যে আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করলে আমাদের আচরণ যথোচিত হবে, তা নির্ধারণ করাই নীতিবিদ্যার কাজ।

নীতিবিদ্যা দর্শনের অংশ নয়, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান

৮। নীতিবিজ্ঞান কি ব্যবহারিক বিজ্ঞান? (IS Ethics a Practical Science?) :

কোন কোন নীতিবিজ্ঞানী মনে করেন যে, নীতিবিজ্ঞান কেবলমাত্র আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়; আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান উভয়ই; আবার কেউ কেউ মনে করেন, নীতিবিজ্ঞান কেবলমাত্র আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান নয়। এই মতবিরোধ বিচার করার পূর্বে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য বুঝে নেওয়া দরকার :

আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান কোন একটি আদর্শের আলোকে বিষয়বস্তুর মূল্য বিচার করে; অপর দিকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান আমাদের কতকগুলি বিধি বা নিয়ম শিক্ষা দেয় যার সাহায্যে আমাদের জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আমাদের কোন উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। বিজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Theoretical science) শেখায় জানতে আর ব্যবহারিক বিজ্ঞান (Practical science) শেখায় কিভাবে কাজ করতে হবে। যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান হল একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান আদর্শের স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করে, সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারিকবিধি বা নিয়মকানুনের নির্দেশ দেয় না; যেমন সৌন্দর্যবিজ্ঞান। সৌন্দর্যবিজ্ঞান হল আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান নয়।

আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

সৌন্দর্যের আদর্শের স্বরূপ নির্ণয় করা সৌন্দর্যবিজ্ঞানের কাজ। কিভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করা সৌন্দর্যবিজ্ঞানের কাজ নয়। তর্কবিজ্ঞান কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান উভয়রূপেই গণ্য হয়।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি মনে করেন যে, নীতিবিজ্ঞান হল কেবলমাত্র আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। তাঁর মতে নীতিবিজ্ঞানকে আদর্শের স্বরূপ বুঝে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং কিভাবে সেই আদর্শটিকে লাভ করা যেতে পারে তার জন্য বিধি নির্ণয় করার আশা সে অবশ্যই করবে না। একথা বলা প্রয়োজন যে নীতিবিজ্ঞানকে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলার অর্থ এই নয় যে, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে এর কোন প্রত্যক্ষ সংস্রব বা সম্পর্ক আছে।"

ম্যাকেঞ্জি-র মতে নীতিবিজ্ঞান কেবলমাত্র আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান

নীতিবিজ্ঞান পাঠ করলেই যে মানুষ নীতিনিষ্ঠ বা সাধু হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। পরমকল্যাণ বা পরমার্থের আদর্শটি নিরূপণ করাই এর কাজ। পরমার্থলাভের উপায় নীতিবিজ্ঞান নির্ধারণ করে না। সুতরাং নীতিবিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান নয়। মুরহেড (*Muirhead*)-ও বলেন, "নীতিবিজ্ঞানকে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি থেকে এই অজুহাতে আলাদা করা হয় যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি তাত্ত্বিক বা তত্ত্বনিষ্ঠ, কিন্তু নীতিবিজ্ঞান ব্যবহারিক।

মুরহেড-এর মন্তব্য

অবশ্য পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যায়, এদের পার্থক্য খুব গভীর নয়। একথা সত্য যে, নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, জ্যোতির্বিদ্যা ও শারীরবৃত্তির সঙ্গে তত নয়; কিন্তু এ আমাদের বেশী দূর নিয়ে যেতে পারেনা। কারণ, অতি সহজেই দেখান যেতে পারে যে, বিজ্ঞান হিসেবে নীতিবিজ্ঞান যেমন জ্যোতির্বিদ্যা ও শারীরবৃত্তের ন্যায় তত্ত্বনিষ্ঠ বা তাত্ত্বিক, তেমনই এ সব বিজ্ঞান আবার নৌবিদ্যা ও আরোগ্যবিদ্যার ভিত্তি হিসেবে নীতিবিজ্ঞানের মতন ব্যবহারিক।"

আবার কোন কোন নীতিবিজ্ঞানী মনে করেন যে, যেহেতু নীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মানুষের আচরণ বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং যেহেতু নীতিবিজ্ঞান কিভাবে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান দেয়, সেহেতু নীতিবিজ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞান। সেথ্ (*Seth*) বলেন, যেহেতু তত্ত্বকে (theory) অনুশীলন (Practice) থেকে পৃথক করা চলে না, সেহেতু নীতিবিজ্ঞান তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়ই। নৈতিক অন্তঃদৃষ্টি (moral insight) নৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয় শর্ত এবং যে বিজ্ঞান এ অন্তঃদৃষ্টিকে গভীর করে সে বিজ্ঞান একাধারে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক।

সেথ-এর মন্তব্য

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, নীতিবিজ্ঞানকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য না করাই যুক্তিযুক্ত। নীতিবিজ্ঞান আমাদের নৈতিক আদর্শের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করে। আদর্শের তাত্ত্বিক আলোচনাই নীতিবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কি উপায় বা কোন্ নিয়ম অনুসরণ করে এ আদর্শকে আমাদের জীবনে লাভ করা যায় তা নির্দেশ করা নীতিবিজ্ঞানের কাজ নয়। কিভাবে সৎ জীবন যাপন করা যেতে পারে, নীতিবিজ্ঞান তা আমাদের শিক্ষা দেয় না। বস্তুতঃ, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের কাজ হল আদর্শের ব্যাখ্যা করা, আদর্শলাভের ব্যবহারিক উপায় নির্ধারণ করা নয়। কোন্ নীতির সহায়তায় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, নীতিবিজ্ঞান সে সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। কিভাবে এ নীতিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে নীতিবিজ্ঞান তা শিক্ষা দেয় না। অবশ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা আমরা অস্বীকার করি না। নীতিবিজ্ঞানের সমস্যার আলোচনা ও তার সমাধানের চেষ্টা আমাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করবেই ; কিন্তু এ প্রভাব বিস্তার নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা অপরিহার্য পরিণতি নয়। নীতিবিজ্ঞান পাঠ করেও কেউ নীতিভ্রষ্ট জীবন যাপন করতে পারে ; আবার নীতিবিজ্ঞান পাঠ না করেও লোকে সৎ জীবন যাপন করতে পারে। নীতিবিজ্ঞান আমাদের নৈতিক আদর্শের স্বরূপ নির্ণয় করে ; কিন্তু এ আদর্শকে অনুসরণ করার ইচ্ছা ও দায়িত্ব আমাদের নিজেদের। নীতিবিজ্ঞানকে এজন্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান না বলাই যুক্তিযুক্ত।

নীতিবিজ্ঞানকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য না করাই যুক্তিযুক্ত

৯। নীতিবিজ্ঞান কি কলাবিদ্যা ? (Is Ethics an Art ?) :

নীতিবিজ্ঞানকে যদি ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসেবে আমরা গণ্য করতে না পারি, তবে তাকে আমরা কলাবিদ্যা হিসেবেও গণ্য করতে পারি না। আমরা কোন আচরণের কলাবিদ্যার কথা বলতে পারি না। কেননা এমন কোন শাস্ত্র বা বিদ্যা নেই যা আমাদের নৈতিক আচরণের কলাকৌশল শিক্ষা দিতে পারে। যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, এমন কোন শাস্ত্র আছে যা আমাদের নৈতিক কর্মবিধি বা নৈতিক আচরণের নিয়মাবলী শিক্ষা দেয়, সেই শাস্ত্র কিভাবে সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে তা শিক্ষা দেয় না। এমন হতে পারে যে, নৈতিক কর্মবিধিগুলি কি আমরা তা জানি, কিন্তু চরিত্রের দুর্বলতা বা সঙ্কল্পের দৃঢ়তার অভাবের জন্য বাস্তবে সেগুলিকে প্রয়োগ করতে আমরা ব্যর্থ হতে পারি। নীতিবিজ্ঞান একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান। পরমকল্যাণের আলোকে আচরণের ঔচিত্য ও অনৌচিত্য নিরূপণ করা নীতিবিজ্ঞানের কাজ। নৈতিক জীবন যাপনের কলাকৌশল নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা দেয় না। নৈতিক কর্মবিধি রচনা করা নীতিবিজ্ঞানের কাজ নয়। কিভাবে

নীতিবিজ্ঞান নৈতিক কর্মবিধি রচনা করে না

আমাদের কামনাবাসনাকে সংযত করতে হয়, ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করতে হয় এবং সাধু জীবনের অনুশীলন করতে হয়, নীতিবিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দেয় না। কাজেই নীতিবিজ্ঞানকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বা কলাবিদ্যা হিসেবে গণ্য না করে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করাই যুক্তিসঙ্গত।

কোন আচরণের কলাবিদ্যা আছে কী? (Is there any art of Conduct ?) : এসম্পর্কে নীতিবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। নীতিবিজ্ঞানী লিলি (*Lillie*)-র[1] মতে সৎ জীবন যাপনের সঙ্গে কলাবিদ্যার সাদৃশ্য আছে এবং অসাদৃশ্যও আছে এবং এই পার্থক্যের কথা স্মরণ রেখেই সৎ জীবন যাপনের কলার কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু নীতিবিজ্ঞানী ম্যাকেঞ্জি (*Mackenzie*) কোন আচরণের কলাবিদ্যা স্বীকার করতে চান না। আমরা উভয় নীতিবিজ্ঞানীর যুক্তিগুলি আলোচনা করে দেখব :

লিলি ও ম্যাকেঞ্জির মধ্যে মতভেদ

লিলির মতে সৎ আচরণের (good conduct) সঙ্গে চিত্রকলা বা সঙ্গীতকলার মত চারুকলার (fine arts) **সাদৃশ্য** আছে, যার জন্য আচরণ-বিদ্যার (art of conduct) কথা মনে এসে যায়।

প্রথমতঃ, চিত্রকর যেমন দীর্ঘকালীন এবং যত্নশীল অনুশীলনের মাধ্যমে অঙ্কন শিক্ষা করে, তেমনি যা উচিত তা করতে আমরা শিক্ষা করি। আমরা স্বীকার করতে পারি সৌন্দর্যের প্রকৃতি সম্পর্কে উপলব্ধি যেমন চিত্রকরের অঙ্কনে সহায়তা করে তেমনি নৈতিক নীতিগুলির উপলব্ধি ভালত্বের অনুশীলনে সহায়ক হয়। কিন্তু সৎ আচরণ এবং চিত্রাঙ্কন, উভয় ক্ষেত্রেই, তাত্ত্বিক আলোচনার তুলনায় অনুশীলনই অধিকতর সাফল্য নিয়ে আসে।

সৎ আচরণ এবং চারুকলার মধ্যে সাদৃশ্য

দ্বিতীয়তঃ, সৎ আচরণ এবং চিত্রাঙ্কন উভয়ই ক্রিয়া যা প্রত্যক্ষভাবে বাহ্য জড় জগতে পরিবর্তন সূচনা করে। উভয়েরই লক্ষ্য হল ক্রিয়া, জ্ঞান নয়।

তৃতীয়তঃ, চারুকলার মত সুন্দর আচরণও এমন কিছু উৎপাদন করে যার নিজেরই সৌন্দর্য বা উৎকর্ষ আছে। একটি মহৎ কার্য, আমাদের মনে সেই প্রশংসা জাগরিত করে যা একটি সুন্দর চিত্র বা 'মহৎ কবিতা' আমাদের মনে জাগরিত করে। কিন্তু লিলির মতে সৎ আচরণ ও চারুকলার মধ্যে কয়েক বিষয়ে **অসাদৃশ্যও** বর্তমান।

---

1. "Our conclusion is that, whether we decide to call the living of a good life an art or not, it is certain that to love rightly has some resemblances to the arts some differences from them."

W. *Lillie* : An Introduction to Eihics ; Page 15

প্রথমতঃ, কলার সম্পর্ক ব্যক্তির বিশেষ এক ধরনের ক্রিয়ার সঙ্গে, কিন্তু সৎ আচরণের সম্পর্ক কোন ব্যক্তির সব কাজের সঙ্গে। চিত্রকরের কার্য শুধুমাত্র কলার মানদণ্ডে নয়, নৈতিক মানদণ্ডেও বিচার্য। কেননা তার অঙ্কিত চিত্র সুন্দর বলে স্বীকৃত হলেও, সেই চিত্রের মন্দ প্রভাব থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, চিত্রকর কোন সময় তার কলার অনুশীলন করতে পারে, অন্য সময় অনুশীলন থেকে বিরত হতে পারে। কিন্তু সৎ বক্তিকে সকল সময়ই সততার অনুশীলন করতে হবে। নৈতিক জীবনে কোন ছুটি থাকতে পারে না (There can be no holidays in the moral life)। অন্যান্য কলারও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। কোন গায়ক যদি অনুশীলন থেকে বিরত হয় তাহলে সেটা তার কলার পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জীবনে সব সময়ই তাকে অনুশীলনে রত থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু প্রকৃত সৎ ব্যক্তিকে সকল সময়ই সৎ আচরণে রত থাকতে হবে।

তৃতীয়তঃ, সৎ অভিপ্রায় কলার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। আমরা একজন চিত্রকর কি সৃষ্টি করল তা দিয়ে চিত্রকরের বিচার করি, কী সৃষ্টি করা তার অভিপ্রায় ছিল তাই দিয়ে বিচার করি না। কিন্তু নৈতিকতার ক্ষেত্রে আমরা কোন ব্যক্তিকে সৎ মনে করি, যদি আমরা দেখি যে বাহ্যতঃ ভাল ফল উৎপন্ন করতে না পারলেও কর্মকর্তার অভিপ্রায় ভাল ছিল। নীতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তার কাজের বিচার করতে গিয়ে তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের বিচারই করে থাকি, কলার ক্ষেত্রে তা করি না। চতুর্থতঃ, চিত্রকর হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ভাল চিত্র আঁকতে পারেন। কিন্তু সৎ ব্যক্তি হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি শুধু সৎ কাজ সম্পাদন করতে পারেন যে তা নয়, তিনি সৎ কাজ সম্পাদন করেন। চিত্রকর যদি তার কলার অনুশীলন না করেন, তাহলে তার যে দক্ষতা তাকে চিত্রকর নামের যোগ্য করে তোলে, সেই দক্ষতার হানি ঘটবে। কিন্তু সৎ ব্যক্তির সৎকার্য করার ক্ষমতা অপ্রকাশিত থেকে যাবে যদি তার প্রকাশের কোন উপযুক্ত সুযোগ না ঘটে। অবশ্য এক্ষেত্রে পার্থক্যটা যতটা মাত্রাগত, ততটা গুণগত নয়। চিত্রকর এবং সৎ ব্যক্তি, উভয়ের ক্ষেত্রেই, সুযোগ এলেই তাঁদের ক্ষমতার প্রকাশের প্রয়োজন আছে।

লিলির বক্তব্য হল, আমরা ছয়[1] ধরনের নীতিবিদ্যার কথা বলতে পারি, যার মধ্যে

---

1. (১) নীতির জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান (a positive science of morals), (২) আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিজ্ঞান (the normative science of ethics), (৩) নীতিদর্শন (moral philosophy), (৪) ধর্মাধর্ম বিচার বিজ্ঞান (Casuistry), (৫) ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান (practical ethics), এবং (৮) সৎ জীবন যাপনের কলাবিদ্যা।

সৎ জীবনযাপনের কলাবিদ্যাকে (the art or practice of living a good life) অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

ম্যাকেঞ্জির (*Mackenzie*)-র মতে নীতিবিজ্ঞান আমাদের আচরণকলা শেখায়, এরূপ চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সৌন্দর্যবিজ্ঞান এবং তর্কবিজ্ঞানের মিল আছে। সৌন্দর্যবিজ্ঞানের সম্পর্ক চারুকলা নিয়ে এবং তর্কবিজ্ঞান সঠিক চিন্তার কলাকৌশলের ভিত্তিটা যুগিয়ে দেয়। কাজেই ধারণা করা হয় যে, নীতিবিজ্ঞানও আমাদের আচরণকলার নীতিগুলি শিক্ষা দেয়। কিন্তু ম্যাকেঞ্জি বলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করার বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান যুক্তি হল, আচরণের সারবস্তু কোন বিশেষ ধরনের দক্ষতার অধিকারী হওয়া নয়, আচরণের সারবস্তু হল ইচ্ছার মনোভাব (attitude of will)।

আচরণের সারবস্তু হল ইচ্ছার মনোভাব

ম্যাকেঞ্জির মতে কেবলমাত্রই ক্রিয়াতেই সততার অস্তিত্ব (Virtue exists only in activity)। একজন ভাল চিত্রকর হলেন তিনি, যিনি সুন্দরভাবে চিত্র অঙ্কন করতে পারেন। কিন্তু সৎ ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি শুধু যে সঠিকভাবে কাজ করতে সক্ষম তা নয়, যিনি সঠিকভাবে কাজ করেন। ভালত্ব বা সততা কোন সামর্থ্য বা সম্ভাবনা (capacity or potentiality) নয়, বরং ক্রিয়া (activity)। সত্যবাদী ব্যক্তি তিনি নন, যিনি সত্য কথা বলতে পারেন, বরং যিনি সত্যকথা বলে থাকেন। সৎ ব্যক্তি হলেন তিনি যিনি কর্তব্য করার অভ্যাস অনুশীলন করেন। কাজেই সততা ক্রিয়ার ব্যাপার, ক্রিয়াতেই সততার অস্তিত্ব।

ক্রিয়াতেই সততার অস্তিত্ব

সততার সারবস্তু ইচ্ছাতেই নিহিত (The essence of virtue lies in the will)। দক্ষতার অধিকারী হওয়াই হল কলার মূল কথা। কিন্তু ইচ্ছার মনোভাবের দ্বারাই নৈতিকতা বিচার্য। যদিও কোন বাহ্য কাজ বাস্তবে সম্পন্ন হয়নি তবু সেই কাজের পিছনে ইচ্ছার মনোভাব থাকতে পারে—উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প, নির্বাচন ইত্যাদি। বাহ্য কাজ সম্পাদিত না হলেও নৈতিক আভ্যন্তরীণ মানসিক প্রক্রিয়াতে নিহিত থাকতে পারে। কাণ্ট (*Kant*)-এর মতে কি করা হল তার বিচারে নয়, কি ইচ্ছা করা হল তার বিচারেই ইচ্ছার ভালত্ব। কোন ক্রিয়ার নৈতিকতা কাজের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে না, আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করে। যেখানে বাহ্য ক্রিয়ার সুযোগ নেই সেখানে ইচ্ছার সঠিক বা যথোচিত মনোভাবই (right attitude of the will) নৈতকতা সূচনা করে। কলার উদ্দেশ্য কোন ফল উৎপাদন করা, কিন্তু নৈতিকতার সম্পর্ক উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের

সততার সারবস্তু ইচ্ছাতেই নিহিত

পবিত্রতা বা শুদ্ধতার সঙ্গে, ইচ্ছার সঠিক মনোভাবের সঙ্গে, বিশেষ করে যেখানে বাহ্য ক্রিয়া ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং ম্যাকেঞ্জির মতে কোন আচরণের কলাবিদ্যা (art of conduct) স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

১০। নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (End of Ethics):

নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল সমাজে বসবাসকারী মানুষের পরমকল্যাণ বা পরমার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা। মানবজীবনের পরমার্থ বলতে কি বুঝা যায়, নীতিবিজ্ঞান তাই নির্ধারন করে। এ-পরমার্থ বা পরমকল্যাণ একাধারে ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণ। এ পরমকল্যাণের আদর্শই সকল প্রকার নৈতিক বিচারের মূলস্বরূপ। মানুষের কোন্ আচরণ শেষ পর্যন্ত ভাল কি মন্দ এই আদর্শের সাহায্যেই তা নির্ধারন করা সম্ভব। তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে নীতিবিজ্ঞানের এই হল উদ্দেশ্য। যদিও আমরা নীতিবিজ্ঞানকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য করি না তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, পরমকল্যাণের আদর্শ থেকেই নৈতিক কর্তব্য (duty) ও সততার (virtue) ধারণা পাওয়া যায় এবং এ ধারণাকে আমরা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। নীতিবিজ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞান নয়, অর্থাৎ কিভাবে আমরা সৎ জীবন যাপন করতে পারি, নীতিবিজ্ঞান সে বিষয়ে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেয় না। কিন্তু পরমকল্যাণের আদর্শের প্রভাবে আমরা আমাদের কর্তব্য ও সততা সম্পর্কীয় যে ধারণাগুলিকে গঠন করি সেগুলির সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের একটা গভীর যোগাযোগ আছে। আমাদের আচরণকে আমরাই নিয়ন্ত্রিত করি, কিন্তু নীতিবিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে জীবনকে পরিচালিত করলে তা হয় সুষ্ঠু ও সুন্দর। অনুশীলনের মারফতই জ্ঞানের যথার্থ প্রকাশ ও প্রচার হয়।

নীতিবিজ্ঞানের লক্ষ্য পরমার্থের স্বরূপ নির্ধারণ

---

*দ্বিতীয় অধ্যায়

নীতি-সম্বন্ধীয় এবং নীতি-বহির্ভূত ক্রিয়া

(Moral and Non-moral Actions)

১। নীতি-সম্বন্ধীয় ও নীতি-বহির্ভূত ক্রিয়া (Meaning of Moral and Non-moral Actions) :

সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণই নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। নীতিবিজ্ঞান পশুদের আচরন নিয়ে আলোচনা করে না ; যেহেতু পশুদের আচরণ সম্বন্ধে নীতি-দুর্নীতির, অর্থাৎ ন্যায়অন্যায়ের কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না। যখন কোন কুকুর কাউকে কামড়ায় তখন কুকুরটির আচণের নৈতিক বিচার আমরা করি না। এমনকি মানুষের সকল রকম কাজের নৈতিক বিচার সম্ভব—একথাও আমরা বলতে পারি না। সুতরাং প্রশ্ন হল, নীতিবিজ্ঞান কিরূপ ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে? কোন্ কোন্ ক্রিয়া নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত এবং কোন্ কোন্ ক্রিয়া নীতিবিজ্ঞানের বিচার্য বিষয় নয়? অর্থাৎ, কোন্ ক্রিয়া নীতি সম্বন্ধীয় বা নৈতিক (moral) এবং কোন্ ক্রিয়া নীতি-বর্হিূত বা অনৈতিক (non-moral)?

(ক) **নীতি-সম্বন্ধীয় ক্রিয়া** (Moral Actions) : নীতি-সম্বন্ধীয় বা নৈতিক ক্রিয়া (moral action) বলতে এমন ধরনের ক্রিয়া বুঝি যার নৈতিক গুণ আছে অর্থাৎ যে ক্রিয়াকে ন্যায় বা অন্যায় অথবা ভাল বা মন্দ বলে অভিহিত করা যায়। এগুলিই নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত। নীতি-বহির্ভূত ক্রিয়া (non-moral actions) বলতে বুঝি এমন ক্রিয়া যার কোন নৈতিক গুণ নেই অর্থাৎ যাকে ন্যায় বা অন্যায়, ভাল বা মন্দ কোন কিছুই বলা যায় না। নীতি-সম্বন্ধীয় বা নৈতিক শব্দটিকে কখনও ব্যাপক অর্থে এবং কখনও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়।

নৈতিক এবং অ-নৈতিক ক্রিয়ার প্রভেদ

(i) ব্যাপক অর্থে নৈতিক শব্দটির অর্থ হল যার মধ্যে নৈতিক গুণ (ভাল ও মন্দ, যথোচিত ও অনুচিত) বর্তমান। এ অর্থে নৈতিক বা নীতি-সম্বন্ধীয় শব্দটি অ-নৈতিক বা নীতি-বহির্ভূত কথাটির বিরুদ্ধ শব্দ। অ-নৈতিক বা নীতি-বহির্ভূত বলতে বুঝি যার মধ্যে নৈতিক গুণ নেই, অর্থাৎ যে কাজের সম্বন্ধে ভাল কি মন্দ, যথোচিত কি অনুচিত শব্দ ব্যবহার করা যায় না।

নৈতিক শব্দের ব্যাপক অর্থ

---

*নৈতিক বিচারের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আলোচনার জন্য এই অধ্যায়টির আলোচনা প্রয়োজন।

(ii) সঙ্কীর্ণ অর্থে নৈতিক বা নীতি-সম্বন্ধীয় বলতে বুঝি যা যথোচিত, ভাল, ঠিক, যথার্থ বা সৎ। আর নীতি-বিগর্হিত বলতে বুঝি যা মন্দ, অসৎ বা বেঠিক। সুতরাং, যা নীতিবিরুদ্ধ তা সঙ্কীর্ণ অর্থে নীতি-সম্বন্ধীয় বা নৈতিক নয়। আমরা 'নৈতিক' পদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি ও করব এবং সে অর্থে যা নীতিসম্মত এবং যা নীতি বিগর্হিত দুই-ই নৈতিক। সুতরাং যা নীতি-বিগর্হিত তা নীতি-বহির্ভূত নয় (Immoral is not non-moral)।

নৈতিক শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থ

নীচের ছকটির সাহায্যে নীতিবিজ্ঞানের ক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগকে সহজে মনে রাখা যেতে পারে।
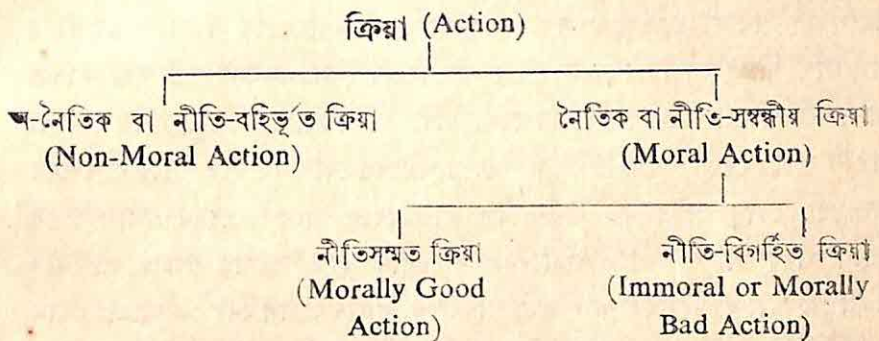
এখন ব্যাপক অর্থে কোন্ কোন্ ক্রিয়া নৈতিক বা নীতি-সম্বন্ধীয় (moral) এবং কোন্ কোন্ ক্রিয়া নীতি-বহির্ভূত (non-moral) তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

(খ) **নীতি-বহির্ভূত বা অ-নৈতিক ক্রিয়া** (Non-moral Action): যেসব ক্রিয়া মানুষ দেহস্থ বা বহিরাগত কোন প্রভাবে সম্পাদন করে তাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে। স্বতঃসঞ্জাত, পরাবর্তক, সাহজিক, ভাবজ, অনুকরণশীল প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া[1] (Non-voluntary action) এবং নীতি-বহির্ভূত অর্থাৎ এ ধরনের ক্রিয়া নীতিবিজ্ঞানের বিচার্য বিষয় নয়। এই ধরনের ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে—

(i) **স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া** (Spontaneous Action): বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়া দেহের আভ্যন্তরীণ শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশের ফলে যে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় তাকে স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া বলে। যেমন, ছোট শিশুর যখন তখন আপনা আপনি হাত-পা

1. জড়বস্তুর ক্রিয়া, যেমন—দাবানল, বন্যা, ঝড় প্রভৃতি এক হিসেবে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া—কিন্তু যেহেতু 'অনৈচ্ছিক' পদটি মনস্তত্ত্বমূলক পদ সেজন্য অচেতন পদার্থের ক্রিয়া সম্বন্ধে 'অনৈচ্ছিক' পদটি ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত।

ছুঁড়তে থাকা। এ জাতীয় ক্রিয়া, শিশুর দেহের স্নায়ু এবং পেশীগুলিকে উন্নত ও বর্ধিত করে। তবু এ ক্রিয়া অনৈচ্ছিক ক্রিয়া যেহেতু শিশুটি পূর্ব থেকে ভেবে-চিন্তে এ কাজ করছে না। কেন সে করছে, কিভাবে করলে বা এ জাতীয় ক্রিয়া যে তার দেহের বর্ধনের পক্ষে উপযোগী—এসব কিছুই তার জানা নেই।

(ii) **পরাবর্তক ক্রিয়া** (Reflex Action): বহির্জগতের কোন উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের দেহের ওপর ক্রিয়া করায় এবং তার ফলে আমাদের স্নায়ু শিরা উদ্দীপিত হওয়ার জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেহে সৃষ্টি হয় তাকেই পরাবর্তক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন, গরম পাত্রে হাত লাগা মাত্রই আমরা হাত সরিয়ে নেই, বা উজ্জ্বল আলো চোখের ওপর এসে পড়লেই আমরা তৎক্ষণাৎ চোখ বুজি। গরম পাত্রে হাত লাগা মাত্রই আমাদের দেহের শিরায় সংবেদনের (sensation) সৃষ্টি হয়, আমরা জ্বালা অনুভব করি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় আর আমরা হাতটা সরিয়ে নেই। এই উদ্দীপক বাইরের জগতের কোন বস্তু হতে পারে বা দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তনও উদ্দীপকের কাজ করতে পারে। যেমন, গলা খুস খুস করলে আমরা কাশি—এখানে আমাদের ইচ্ছা কোন কাজ করবার সুযোগ পায় না। এ জাতীয় কাজের সম্পর্কে সচেতনতা থাকলেও, সজ্ঞান প্রয়াস নেই। আবার কোন কোন পরাবর্তক ক্রিয়া সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। যেমন—শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া ইত্যাদি।

(iii) **সাহজিক ক্রিয়া** (Instinctive Action): কোনরূপ শিক্ষা বা পূর্ব সঙ্কল্প ছাড়া এবং কাজের ফলাফল সম্বন্ধে কোন ধারণা না নিয়ে কোন উদ্দেশ্যাভিমুখী (প্রধানতঃ আত্মরক্ষার বা স্বজাতিরক্ষার জন্য) যে একাধিক কাজ ধারাবাহিকভাবে করা হয় তাকেই সাহজিক ক্রিয়া বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সহজ প্রবৃত্তিবশে বিনা সঙ্কল্পে উপায় নির্ধারণ করা এ জাতীয় ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। প্রাণিজগতে এরূপ সহজাত ক্রিয়ার বহু উদাহরন আমরা দেখি। খাদ্য অন্বেষণ, বাসা নির্মাণ, আত্মরক্ষা, শাবক প্রতিপালন প্রভৃতি প্রাণিদের সাহজিক ক্রিয়ার উদাহরণ। বাসা নির্মাণ করার জন্য পাখী খড়কুটা সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ লক্ষ্য আছে, অর্থাৎ বাসা নির্মাণ, অথচ পূর্ব থেকে সঙ্কল্প করে পাখী একাজ করে না, সহজ প্রবৃত্তিবশে এ কাজ করে। সাহজিক ক্ষমতা এবং প্রবৃত্তি হল বংশগত, অর্জিত নয়। এ হল জন্মগত এবং স্বাভাবিক ; সজ্ঞান প্রচেষ্টার দ্বারা এ জাতীয় কাজ করা হয় না।

(iv) **ভাবজ ক্রিয়া** (Ideo-motor Actions): যখন কোন ভাব আমাদের অজ্ঞাতসারেই ক্রিয়ায় পরিণত হয় তখন তাকে বলি ভাবজ ক্রিয়া (an idea

automatically passing into action)। যেমন, ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে কোন দর্শক গোলের মুখে বল দেখে নিজের অজ্ঞাতসারেই পা ছোঁড়েন। এ ধরনের ক্রিয়া ইচ্ছার সহযোগিতা ব্যতিরেকে বা কোন কোন সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সম্পাদিত হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভাব এতই সতেজ, স্পষ্ট ও বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে, আমরা সেই ভাব অনুযায়ী কাজ না করে থাকতে পারি না। পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ার ধারণা অনেক সময় কোন মানুষের মনে এতই বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে শেষ পর্যন্ত সে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এ জাতীয় ধারণাকে **'বদ্ধমূল ধারণা'** (Fixed Idea) বলা যেতে পারে।

(v) **অনুকরণশীল ক্রিয়া** (Imitative Action): অনুকরণশীল ক্রিয়া দু'প্রকারের হতে পারে—ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক। যেসব অনুকরণশীল ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়া (automatic) ; যেমন, জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে বা শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেসব অনুকরণশীল ক্রিয়া অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। এছাড়া, অপর অনুকরণশীল ক্রিয়া ঐচ্ছিক পর্যায়ভুক্ত।

পূর্বোক্ত এই পাঁচ ধরনের ক্রিয়াকে আমরা অনৈচ্ছিক ক্রিয়ারূপে অভিহিত করি, যেহেতু এ ধরনের ক্রিয়ায় পূর্ব থেকে সঙ্কল্প করে কোন কাজ করা হয় না। এজন্য এগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া এবং সেহেতু নীতি-বহির্ভূত (non-moral) অর্থাৎ এসব কাজের কোন নৈতিক বিচারের প্রশ্ন ওঠে না।

(vi) **আকস্মিক ক্রিয়া** (Accidental actions): অকস্মিক ক্রিয়া ঐচ্ছিক ক্রিয়া বা নীতি-সম্পর্কিত ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল, যার বুদ্ধিবৃত্তি আছে সে-ই এ জাতীয় ক্রিয়া করতে পারে এবং সে স্বাধীনভাবে পূর্ব থেকে সঙ্কল্প করে উদ্দেশ্য ও উপায় নিরূপণ ক'রে ঐ কাজ করে। আকস্মিক ক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্য নেই। কোন ব্যক্তি যদি অনিচ্ছাপূর্বক বা আকস্মিকাবে একটি মূল্যবান জিনিস নষ্ট করে ফেলে তাহলে নৈতিক বিচারে সে দুষ্ট হবে না, অর্থাৎ তার কাজটি মন্দ বলে আমরা অভিহিত করব না।

আকস্মিক ক্রিয়া, উন্মাদ ব্যক্তির ক্রিয়া নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত নয়

(vii) **শিশু এবং অপ্রকৃতিস্থ বা উন্মাদ ব্যক্তির ক্রিয়াও** (Actions of children and insane persons) নৈতিক বিচারের বহির্ভূত। শিশুর পক্ষে পূর্ব থেকে সঙ্কল্প করে কাজ করা সম্ভব নয়। কোন উন্মাদ ব্যক্তি যদি কারও ঘরে আগুন দিতে চেষ্টা করে তাহলে তাকে আমরা আটক করে রাখি কিন্তু তার কাজের নৈতিক বিচার করি না।

(viii) **বাধ্যতামূলক কাজ** (Actions done under compulsion) নীতি-সম্বন্ধীয় ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়, তাহলে তার কাজকে নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অবশ্য আমরা যদি মনে করি যে অপরের বশ্যতা স্বীকার করা তার উচিত হয়নি এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতা করা তার উচিত ছিল, তবে তার বাধ্যতা স্বীকার করা নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হবে।

২। কোন্ কোন্ ক্রিয়া নৈতিক বা নীতি সম্বন্ধীয় (Which actions are moral ?) ঃ

ঐচ্ছিক ক্রিয়া (Voluntary Actions) এবং **স্বেচ্ছামূলক অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া** (Voluntary habitual actions) হল নৈতিক বা নীতি সম্বন্ধীয় ক্রিয়া। ঐচ্ছিক ক্রিয়া কাকে বলে ? কোন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন এবং আত্মসচেতন জীব পূর্ব থেকে সংকল্প করে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় অনুযায়ী উপায় নির্ধারণ করে, কারও দ্বারা বাধ্য না হয়ে যখন কোন কার্য সম্পাদন করে তখন তাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন—ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্ত দোকানে গিয়ে খাদ্য ক্রয় করে আহার করা।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ঃ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এই কর্ম করে, কারও দ্বারা বাধ্য হয়ে কর্ম করে না। কাজের উদ্দেশ্য ও উপায় সে নিজেই নির্বাচন করে। ঐচ্ছিক ক্রিয়া ব্যক্তির বিবেচনা ও বিচারশক্তিপ্রসূত। অবলম্বিত উপায় প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর হতে পারে কিন্তু উভয়ই কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত।

স্বেচ্ছায় অভ্যাসবশতঃ যে কার্য করা হয় তাকেই **স্বেচ্ছামূলক অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া** বলা হয়। যেমন—সাঁতার কাটা, বাদ্যযন্ত্র বাজান ইত্যাদি। স্বেচ্ছামূলক অভ্যাসসিদ্ধ কাজের দুটি বৈশিষ্ট্য—প্রথমতঃ, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি থেকেই স্বেচ্ছামূলক অভ্যাসের উৎপত্তি। দ্বিতীয়তঃ, স্বেচ্ছামূলক অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়ার বাহ্য রূপ অনৈচ্ছিক হলেও ব্যক্তির ইচ্ছা থেকেই তার শুরু। ধরা যাক, সাঁতার কাটা। এই ঐচ্ছিক ক্রিয়াটি বার বার সম্পাদনের ফলেই অভ্যাসে পরিণত হয় এবং প্রথমে চিন্তা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হলেও পরে যান্ত্রিকভাবেই সেটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়। চোখের পাতা বোজা হল **অস্বেচ্ছামূলক অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়ার** (Non-vountary habitual actions) উদাহরণ।

যদিও অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া শেষ পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় এবং অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার রূপ নেয় তবুও এ ক্রিয়া নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত, কারণ, অভ্যাস হচ্ছে বারংবার ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পাদনের ফল এবং ব্যক্তির ইচ্ছা ও সঙ্কল্প থেকেই এ জাতীয় কাজের শুরু। আবার

অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়াকে ত্যাগ করতে হলে দৃঢ় ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের দ্বারা বিপরীত অভ্যাস সৃষ্টি করে তাকে পরিবর্তিত করা যেতে পারে। যেমন—যিনি দীর্ঘকাল ধরে ধূমপানে অভ্যস্ত, তিনিও নিজের চেষ্টা এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা এ অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারেন। কাজেই ইচ্ছাকৃত অভ্যাস নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।

৩। নৈতিক বা নীতিসম্বন্ধীয় এবং অ-নৈতিক বা নীতি-বহির্ভূত—কোন্ প্রকার ক্রিয়া নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু? (Which of the actions—moral and non-moral are object of moral judgment ?) :

সকল ক্রিয়াই নীতিবিজ্ঞানের নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত নয়। একমাত্র **ঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং স্বেচ্ছামূলক অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়াই** (voluntary and voluntary habitual actions) **নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত।**

ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলতে বুঝি এমন ক্রিয়া যে ক্রিয়া কোন আত্ম সচেতন ও সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি কেবল আবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে বা অপর ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্পাদন করে। এছাড়া স্বেচ্ছামূলক অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া ঐচ্ছিক ক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত। অন্য যেসব ক্রিয়া মানুষ দেহস্থ বা বহিরাগত কোন প্রভাবে সম্পাদন করে তাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে। স্বতঃসঞ্জাত, পরাবর্তক, সাহজিক, ভাবজ ও অনুকরণশীল ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া[1] (non-voluntary action) এবং নীতি-বহির্ভূত অর্থাৎ এ ধরনের ক্রিয়া নৈতিক বিচারের বিষয় নয়।

৪। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ (Analysis of Voluntary Action) :

কোন নির্দিষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করার জন্য পূর্ব থেকে সঙ্কল্প করে যে ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় তাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে। ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এ প্রকার ক্রিয়া করে থাকে।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার তিনটি স্তর

ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব তার তিনটি স্তর আছে ; যথা—(ক) **মানসিক স্তর** (The Mental Stage), (খ) **শারিরীক স্তর** (The Bodily Stage) এবং (গ) **দেহাতিরিক্ত বা বাহ্যস্তর** (The External Stage)।

---

1. জড়বস্তুর ক্রিয়া যেমন—দাবানল, বন্যা, ঝড় প্রভৃতি এক হিসেবে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া—কিন্তু যেহেতু 'অনৈচ্ছিক' পদটি মনস্তত্ত্বমূলক পদ সেজন্য অচেতন পদার্থের ক্রিয়া সম্বন্ধে 'অনৈচ্ছিক' পদটি ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমি ক্ষুধার্ত হওয়ায় খাবার কিনতে দোকানে যাচ্ছি। এখানে মানসিক স্তর হল আমার মধ্যে খাদ্যের জন্য অভাববোধ এবং খাদ্য লাভ করার বাসনা বা সঙ্কল্প। দ্বিতীয়তঃ, দোকান থেকে খাবার কেনার জন্য আমাকে হেঁটে দোকানে যেতে হবে—এ স্তরটি হল শারীরিক স্তর। তৃতীয়তঃ, জাগতিক স্তর; অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার ফলে বহির্জগতে কিছু পরিবর্তন সাধিত হল। যে খাদ্য দোকানে ছিল, সে খাদ্য আমার অধিকারে এল এবং উদরে গিয়ে আমার ক্ষুধা তৃপ্ত করল।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার এ বিভিন্ন স্তরগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক :

(ক) মানসিক স্তর (The Mental Stage) : এই স্তরকে বিশ্লেষণ করলে এতে কয়েকটি উপস্তর পাওয়া যায়। যেমন—

(i) মূল উৎস (Spring of Action) : প্রতিটি ঐচ্ছিক ক্রিয়ার একটি মূল উৎস আছে এবং তা হল কোন বাস্তব বা কাল্পনিক অভাববোধ (Feeling of want)—কোন রকম ত্রুটি, অভাব বা অপূর্ণতা যা মনের মধ্যে একপ্রকার অস্বস্তিবোধের সৃষ্টি করে। এ অভাববোধ কেবলমাত্র বর্তমান কোন বিষয় সম্বন্ধে নাও হতে পারে ; ভবিষ্যতের কোন অভাব বা প্রয়োজনও এ অস্বস্তি বা বেদনার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, এখন আমি ক্ষুধার্ত এবং তার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ; এ অভাববোধ বর্তমানের। আবার এমনও হতে পারে যে, ভবিষ্যতে আমার অর্থের প্রয়োজন হবে। কিন্তু সেই অর্থের অভাববোধ বর্তমানে আমার মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করে আমাকে কাজে প্রযুক্ত করতে পারে। তাছাড়া, এ অভাববোধ সকল সময়ই যে নিজের প্রয়োজনে হবে এমন কোন কথা নেই, অপরের প্রয়োজনেও হতে পারে। কোন ব্যক্তি তার বন্ধুর স্বার্থ বা অভাবকে নিজের স্বার্থ বা অভাব বলে মনে করতে পারে এবং এ অভাববোধ তাকে কাজে প্রযুক্ত করতে পারে। অভাববোধ সকল সময়ই বেদনাদায়ক কিন্তু ভবিষ্যতে অভাব দূর হয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হতে পারে সেই আশায় একটা সুখের অনুভূতিও অভাবের বেদনার অনুভূতির সঙ্গে মিশে থাকতে পারে ; অবশ্য সুখের অনুভূতি থেকে বেদনার অনুভূতির তীব্রতাই বেশী।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উৎস হল কোন বাস্তব বা কাল্পনিক অভাববোধ

অভাববোধ নিজের বা অপরের প্রয়োজন হতে পারে

(ii) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (The End and Motive) : অভাববোধ থেকে আসে একটি বস্তুর কল্পনা যা সেই অভাবকে দূর করতে পারে; ব্যক্তি তার অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এমন একটি বস্তুর ধারণা করে যা তার অভাবকে দূর করতে পারবে। এই বস্তুটি হল ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কাম্য বস্তু বা

উদ্দেশ্য হল বস্তুর চিন্তা বা ধারণা

লক্ষ যাকে লাভ করার জন্য মানুষ কাজে প্রবৃত্ত হয়। এই বস্তুর চিন্তা বা ধারণাকে বলা হয় উদ্দেশ্য (motive)। উদ্দেশ্য হল চালিত করার শক্তি যা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

(iii) **কামনা** (Desire): অভাববোধ এবং অভাববোধ দূর করতে পারে যে কাম্যবস্তুটি তার ধারণা—উভয়ে মিলে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় কামনা। লক্ষ্যকে লাভ করার জন্য বা কাম্য বস্তুকে পাওয়ার জন্য যে আকুলতা তাকেই বলা হয় কামনা। কামনা যদি একাধিক না হয় এবং সহজেই যদি একে পূর্ণ করা যায় তাহলে কামনা অবিলম্বে সঙ্কল্পে পরিণত হয় এবং কাজ শুরু হয়ে যায়: একে বলে সরল ঐচ্ছিক ক্রিয়া। কিন্তু কামনার সংখ্যা অধিক হলে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং সঙ্কল্প গ্রহণ করতে দেরী হয়।

লক্ষ্যকে লাভ করার আকুলতাই কামনা

(iv) **কামনার দ্বন্দ্ব** (Conflict of Desires): জটিল অবস্থায় মনের মধ্যে বিভিন্ন কামনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একই সময়ে সব কামনাকে পূরণ করা সম্ভব নয়, একটিতে লাভ করতে হলে আর একটিকে বর্জন করতে হবে। যেমন, আমার পকেটে মাত্র কয়েকটি পয়সা আছে। ঐ পয়সা দিয়ে খাবার খাওয়া, বই কেনা, বেড়াতে যাওয়া সব কামনাকে একসঙ্গে পূরণ করা সম্ভব নয়। একই সময়ে হয়ত একটি উৎসবে যোগদান করতে হবে বা কোন একটি অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে যেতে হবে। তখন মনের মধ্যে কামনার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কোন্‌টা করি? সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কামনার বিরোধিতা দেখা দেয়।

কামনার প্রতিযোগিতা

(v) **বিবেচনা** (Deliberation): যখন মনের মধ্যে এভাবে কামনার বিরোধিতা দেখা দেয়, তখন মন বিবেচনা করতে থাকে, সে কি করবে? এ অবস্থায় মন বিরোধী কামনাগুলির আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করে ও বিভিন্ন কর্মপন্থার ভাল-মন্দ, খুঁটিনাটি বিচার করে দেখে—কোন্‌টিকে ত্যাগ করে কোন্‌টিকে গ্রহণ করবে। **বিবেচনা হল মানসিক প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন কর্মপন্থার ভাল-মন্দ বিচার করে। মানসিক স্তরের এ পর্যায়েই যথার্থ নৈতিক বিচারের কাজ শুরু হয়।** কারণ, মন বিভিন্ন কর্মপন্থার কোন্‌টি উচিত, কোন্‌টি অনুচিত, সুবিধাজনক কিংবা অসুবিধাজনক, ভাল কি মন্দ, গ্রহণযোগ্য না বর্জনীয় বিচার করে দেখে।

বিবেচনা হল মানসিক প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন কর্মপন্থার ভাল মন্দ বিচার করে

(vi) **মনোনয়ন, নিষ্পত্তি, সংকল্প বা অভিপ্রায়** (Decision, Resolution, Determination or Intention): বিবেচনা করার পর মন একটি বিষয়কে মনোনীত করে নেয় এবং সকল বিরোধিতার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। মন একটি কর্মপন্থাকে গ্রহণ

করে এবং অন্যগুলিকে বর্জন করে। যাকে মন গ্রহণ করে সে বস্তুই হল কামনার যথার্থ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (motive)। একটিকে গ্রহণ করে অন্যগুলিকে বর্জন করাই হল সঙ্কল্প।

অভিপ্রায় হল উদ্দেশ্য ও উপায়ের যুক্তরূপ

যখন এ অবস্থায় মন নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য অর্জন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করবে বলে স্থির করে তখন তার উদ্দেশ্য অভিপ্রায়ে পরিণত হয়। অভিপ্রায় (intention) হল উদ্দেশ্য ও উপায়ের যুক্ত রূপ। অভিপ্রায়ে মন একটি নির্দিষ্ট বস্তু ও সেই বস্তু লাভের নির্দিষ্ট উপায়গুলির কথা চিন্তা করে এবং বস্তু লাভ হলে যে ফলাফল উপস্থিত হবে তাও গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়।

(খ) **শারীরিক স্তর** (The Bodily stage): সঙ্কল্প করার মানসিক স্তর শেষ হল, এর পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করে কামনাকে কার্যে পরিণত করার প্রয়োজন। সঙ্কল্প করার পরই আমরা মোটামুটি উপলব্ধি করতে পারি কী ধরনের শারীরিক ক্রিয়া উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রয়োজন হবে।

(গ) **দেহাতিরিক্ত** বা **বাহ্যস্তর** (Extra-bodily or External Stage): শারীরিক ক্রিয়ার ফলে বহির্জগতে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। কতকগুলি ফলাফলের মাধ্যমে বহির্জগতের এ পরিবর্তনকে বুঝা যায়। এ ফলাফলগুলির অন্তর্ভুক্ত হল: (i) অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন। (ii) প্রত্যাশিত ফলাফল বা ফল-লাভে বিঘ্ন। (iii) অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক ফললাভ।

একটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরগুলিকে বুঝে নেওয়া যাক:

কোন একটি বেকার লোক অর্থাভাবহেতু মনে **অস্বস্তিবোধ** করছে (Spring of action)। সে অর্থ রোজগার **লক্ষ্য** (End) করে তার অভাব মেটাতে চায়। অর্থ রোজগারের জন্য কর্ম করার **কামনা** (Desire) তার মনে জেগে উঠল। কিন্তু সে চিন্তা করে দেখল যে, সদভাবে খুব বেশী অর্থ সে রোজগার করতে পারবে না। সে অসদুপায়ে

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের বাস্তব উদাহরণ

বেশী অর্থ রোজগারের কথা ভাবতে লাগল। তার মনে কামনার **দ্বন্দ্ব** দেখা দিল (Conflict of Desires)। সে কি করবে? সৎপথে অর্থ রোজগার করবে, না অসৎ পথে অর্থ রোজগার করবে? সে **বিবেচনা** (delibera-tion) করতে লাগল। তারপর সে সদভাবে অর্থ রোজগারের পন্থা মনোনয়ন করল (choice or determination)। সদভাবে অর্থ রোজগার করার কামনা মনোনীত হওয়াতে এটাই তার **উদ্দেশ্য** (Motive) হল। কিন্তু কি উপায়ে (means) সে তা করবে, চাকরি করে, না ব্যবসা করে? ব্যবসা করার মতো টাকা তার নেই। সে

স্থির করল চাকরি করবে। এরূপ সদভাবে অর্থ রোজগার করার উদ্দেশ্য ও চাকরি করা রূপ উপায় একত্র যুক্ত হয়ে তার **অভিপ্রায়** (Intention) সৃষ্টি হল এবং অভিপ্রায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্তর শেষ হল।

এবার শুরু হল দ্বিতীয় স্তর, **শারীরিক স্তর** (Bodily stage)। সে আবেদনপত্র নিয়ে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

এরপর তৃতীয় স্তর, অর্থাৎ **দেহাতিরিক্ত** বা **বাহ্যস্তর** (Extra-bodily or External Stage)। কোন এক পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ফলে তার আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ ঘটল। সে কাজে নিযুক্ত হল এবং সদভাবে অর্থ রোজগারের সুযোগ পেল। এ ছাড়া আরও কিছু অপ্রত্যাশিত ফললাভ ঘটল। কর্মজীবনে অপরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাওয়াতে তার নতুন বন্ধুলাভ ঘটল।

৫। কামনা (Desire)ঃ

কোন অভাববোধ দূর করার জন্য এক বা একাধিক বস্তু লাভ করার যে আগ্রহ বা বাসনা তাকেই কামনা বলা হয়; মানুষ তার অভাববোধ থেকে মুক্তি পাবার জন্য মনে মনে কাম্যবস্তুর ধারণা করে এবং মনে করে যে সেই বস্তুটি তার অভাব দূর করতে পারবে। কামনা হল একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া। একে বিশ্লেষণ করলে তিন জাতীয় উপাদান পাওয়া যায়। যথা—(ক) জ্ঞান-সম্পর্কীয় (intellectual) (খ) অনুভূতিমূলক (affective) এবং (গ) কর্মপ্রবৃত্তিমূলক (active)।

কামনার তিনটি উপাদান

(ক) জ্ঞান-সম্পর্কীয় উপাদানঃ জ্ঞান-সম্পর্কীয় উপাদানগুলি হল নিজের বা অপরের অভাব, ত্রুটি বা অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতনতা। এ হল অভাব দূর করতে পারে এমন কোন লক্ষ্য বা কাম্য বস্তু সম্বন্ধে ধারণা।

(খ) অনুভূতিমূলক উপাদানঃ এ হল অভাববোধের জন্য মনে বেদনাময় বা অপ্রীতিকর অনুভূতি এবং কাম্যবস্তু লাভ করার ফলে ভবিষ্যতে যে আনন্দ লাভ করা যাবে সেহেতু সুখকর বা প্রীতিকর অনুভূতি।

(গ) কর্মপ্রবৃত্তিমূলক উপাদানঃ এ হল লক্ষ্য বা কাম্যবস্তু লাভ করার জন্য কর্ম করার আকুলতা (impulse to action)। কাম্যবস্তু সম্পর্কে ধারণা করার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তু লাভের জন্য আমরা চঞ্চল হয়ে পড়ি এবং নিজেদের কর্মে নিযুক্ত করার জন্য উদ্‌গ্রীব হই। কর্ম করার জন্য এ চঞ্চলতা বা আকুলতাই কামনার কর্মপ্রবৃত্তিমূলক উপাদান।

পূর্বোক্ত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কর্মপ্রবৃত্তিমূলক উপাদানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনুভূতিমূলক উপাদানের মধ্যে যে অস্বস্তিকর বা বেদনাময় অনুভূতি তা সুখকর অনুভূতির তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ; যেহেতু এই বেদনামূলক অনুভূতিই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। সুখময় অনুভূতি ভবিষ্যতের ব্যাপার, বেদনাময় অনুভূতিই বর্তমানের বিষয় এবং সেহেতু বেশী স্পষ্ট ও সতেজ।

৬। অভাব, আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা (Want, Appetite and Desire):

অভাব, আকাঙ্ক্ষা এবং কামনার মধ্যে পার্থক্য আছে। ম্যাকেঞ্জি উদ্ভিদের অভাব, পশুদের আকাঙ্ক্ষা এবং মানুষের কামনার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। উদ্ভিদ হল অচেতন, পশু হল সচেতন এবং মানুষ হল স্ব-চেতন বা আত্মসচেতন। উদ্ভিদ বা গাছপালার অভাব আছে, কিন্তু সে অভাব সম্পর্কে তাদের কোন চেতনা নেই। উদ্ভিদ মাটির নীচে তার মূল প্রসারিত করে দিয়ে রস আহরণ করে বা সূর্যালোক পাবার জন্য তার শাখা-প্রশাখাকে আলোর দিকে প্রসারিত করে। এ কেবলমাত্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্যলাভের জন্য অন্ধ প্রবণতা (blind tendency)। কিন্তু পশুর যে আকাঙ্ক্ষা তা নিছক অন্ধ প্রবণতা নয়। তার আকাঙ্ক্ষার বিষয় সম্পর্কে সে সচেতন। পশু সুখ-দুঃখ অনুভব করে; সুতরাং সে তার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে পারে। ক্ষুধার্ত সিংহের ধারণা আছে কী ধরনের শিকার তার প্রয়োজন। কাজেই কাম্যবস্তুর একটা ধারণা তার আছে। মানুষ তার কাম্যবস্তু সম্পর্কে শুধু সচেতন নয়, বা তার যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে শুধু তাও নয়; উপরন্তু সে জানে যে, তার কাম্যবস্তু ভাল এবং তার অভাব মেটাবার পক্ষে উপযুক্ত। কাম্যবস্তুটি সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে। উদ্ভিদের পুষ্টির প্রয়োজন আছে, পশুর মধ্যে আছে আকাঙ্ক্ষা আর মানুষের মধ্যে আছে খাদ্যের জন্য কামনা। মানুষ খাদ্যকে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কাম্য বস্তুরূপে কল্পনা করে।

৭। কামনার জগৎ (Universe of Desire):

ম্যাকেঞ্জি বলেন, "প্রতিটি কামনা এক-একটি বিশেষ জগতের অন্তর্ভুক্ত এবং সেই জগৎ পরিত্যাগ করে যদি আমরা অন্য জগতে গমন করি তখন সে কামনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ যে জগৎ, কামনা যার অন্তর্ভুক্ত, সে জগৎ গঠিত হয় মানুষের চরিত্রের সমগ্রতা নিয়ে এবং যখন কামনাবোধ জাগে তখন ঐ চরিত্র নিজেকে প্রকাশ করে।"[1] আমাদের মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার কামনা জেগে ওঠে। তার কারণ আমরা এক কামনার জগৎ থেকে আর এক কামনার জগতে গমন করি। যৌবনে মানুষ যা

1. *Mackenzie* : A Manual of Ethics ; Sixth Edition, Page 34.

কামনা করে বার্ধক্যে তার প্রতি তার সে কামনা থাকে না। ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্য খাবার জন্য যখন মনে একান্ত কামনা জেগেছে তখনই যদি সংবাদ পাওয়া যায় যে কোন নিকট আত্মীয় গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত, তাহলে নিমেষের মধ্যে ক্ষুধা বিদায় নেয়, তখনই মনের মধ্যে কামনা জেগে ওঠে সেই প্রিয়জনের পাশে ছুটে যেতে। এভাবে এক কামনার জগৎ থেকে অন্য আর এক কামনার জগতে অহরহ মানুষ ছুটোছুটি করছে। মানুষের চরিত্রই স্বভাবতঃ নির্ধারণ করে কোন্ পরিস্থিতিতে সে কোন্ কামনার জগতে প্রবেশ করবে।"

৮। কামনা, ইচ্ছা এবং সঙ্কল্প (Desire, Wish and Will)ঃ

'কামনা' এবং 'ইচ্ছা'কে অনেক সময় সমার্থক শব্দ বলে ধরা হয়। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে এরা পৃথক। মনে যখন অনেক কামনা ভীড় করে আসে তখন সবগুলিই সমান প্রাধান্য লাভ করে না। যে কামনা কার্যকরভাবে মনে উপস্থিত থাকে তাকেই 'ইচ্ছা' বলা হয়। এজন্য ম্যাকেঞ্জি বলেন—'a wish is an effective desire', অর্থাৎ **ইচ্ছা হল কার্যকর কামনা**। যে কামনাকে মানুষ দমন করে বা ত্যাগ করে সে আর 'ইচ্ছা' থাকতে পারে না।

ইচ্ছা এবং সঙ্কল্পের মধ্যে পার্থক্য আছে। নানা কামনার মধ্যে যখন একটি কামনা প্রাধান্য লাভ করে তখন দেখা যায় কামনাটি হয়ত শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় না; যেহেতু কামনাটি কামনার জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু সঙ্কল্প হচ্ছে সেই কামনা যেটা কেবলমাত্র কামনার জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং যেটা, আমরা শুধু নির্বাচন করিনি, উপরন্তু যেটাকে আমরা নানা বাধাবিপত্তির মধ্যেও অর্জন করতে চাই। ইচ্ছা হচ্ছে একক, সঙ্কল্প হচ্ছে সমগ্র কামনাজগতের সমষ্টিগত ফল।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: কোন একজন দরিদ্র ব্যক্তি জুয়া খেলে অর্থ রোজগার করে। সে জুয়া খেলতে চায় না, কিন্তু তার দারিদ্র্য তাকে বাধ্য করে। জুয়া খেলার ইচ্ছা তার নেই কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য যে কামনার জগতের সে অধিবাসী, সেই কামনার জগতে তার এ কামনা এতই প্রবল যে, জুয়া খেলা তার সঙ্কল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯। উদ্দেশ্য (Motive)ঃ

উদ্দেশ্য হল 'চালিত করার একটা শক্তি' যা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে। 'উদ্দেশ্য' কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথমতঃ, উদ্দেশ্য অর্থে মনে করা হয়, **'অনুভূতি'** যা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে। এ অর্থে উদ্দেশ্য হল সুখ-দুঃখের অনুভূতি, কিংবা ঈর্ষা, ক্রোধ, ভয়, দয়া প্রভৃতি মানসিক

আবেগ। হিউম, বেন্থাম, মিল, বেইন (*Hume, Bentham, Mill, Bain*) প্রমুখ লেখকেরা মনে করেন, সুখ-দুঃখের অনুভূতিই হল উদ্দেশ্য যা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

দ্বিতীয়তঃ, 'উদ্দেশ্য' অর্থে মনে করা হয় **'কাম্যবস্তু' বা 'লক্ষ্য' যার ধারণা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।** গ্রীন (*Green*) উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'উদ্দেশ্য' হল কোন লক্ষ্য বা বস্তু সম্পর্কে ধারণা, যে লক্ষ্যটিকে বা বস্তুটিকে আত্মসচেতন ব্যক্তি নিজের সামনে তুলে ধরে এবং যাকে লাভ করবার জন্য সে সচেষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়।"[1] অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি-র মতেও নৈতিক আচরণ হল উদ্দেশ্যমূলক আচরণ এবং উদ্দেশ্যমূলক আচরণের মূলে কেবলমাত্র অনুভূতিই বর্তমান থাকে না, কোন একটি 'লক্ষ্যে'র ধারণাও কর্ম করে। যে কাম্য বস্তুটির চিন্তা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে তাহল উদ্দেশ্য।

তৃতীয়তঃ, উদ্দেশ্য বলতে মনে করা হয় **কোন কাম্যবস্তু বা লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা যা মন তার চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মনোনয়ন করে নিয়েছে।** যখন মনে কামনার দ্বন্দ্ব জাগে তখন একাধিক কাম্যবস্তুর কথা মানুষ ভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটিকে সে নির্বাচন করে ও অপরগুলিকে বর্জন করে। এই নির্বাচিত বস্তুটি হল উদ্দেশ্য, সুতরাং উদ্দেশ্য হল সেই লক্ষ্য বা কামবস্তু সম্পর্কে ধারণা যেটিকে ব্যক্তি বেছে নেয় (The idea of the end chosen by the self)। অধ্যাপক মুরহেড এই অর্থে 'উদ্দেশ্য' কথাটিকে ব্যবহার করেছেন। অধ্যাপক ডিউইও বলেন, 'যে কামনাটিকে বেছে নেওয়া হয় সেটিই হল উদ্দেশ্য'।[2]

অধ্যাপক হেনরি স্টিফেন বলেন যে, উদ্দেশ্য কথাটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য বলতে—(i) কোন কিছুর জন্য অভাববোধ বা অস্বস্তিবোধকে বোঝাতে পারে, (ii) কোন কাম্যবস্তুকে বোঝাতে পারে, অথবা (iii) উপরিউক্ত অভাববোধ ও কাম্যবস্তুর ধারণা মিলে যে জটিল মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে তাকেও বোঝাতে পারে। সুতরাং, উদ্দেশ্য হল অভাববোধ থেকে উদ্ভূত কাম্যবস্তুর ধারণা যা এ অভাববোধ দূর করতে পারে।

এখন উদ্দেশ্যকে কোন্ অর্থে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত হবে ? অধ্যাপক হেনরি স্টিফেন (*Henry Stephen*) যে জটিল মানসিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন তাকে উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এ অর্থে উদ্দেশ্য হল—(ক) অভাববোধ (feeling of

1. "Motive is an idea of an end which a self-conscious subject presents to itself and which it strives and tends to realise."

—Green : Prologomena to Ethics, Fourth Edition ; Page 104.

2. Dewey : Psychology, Page 366.

want), (খ) কাম্যবস্তুর ধারণা (idea of the object), এবং (গ) তাকে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা (yearning for the object)—এই তিনটির মিশ্রিত ফল। কিন্তু **যেহেতু এ সকল উপাদানের মধ্যে কাম্য বস্তুটির ধারণাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; সেজন্য আমরা তাকেই উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করতে পারি।** তাহলে **উদ্দেশ্য হল কোন কাম্যবস্তুর ধারণা বা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা—যাকে মন বেছে নিয়েছে ও নিজের বলে অনুভব করেছে এবং তার ফলে যা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করেছে।** সুতরাং অধ্যাপক মুরহেড-এর মত-ই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

১০। অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য (Intention and Motive):

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 'অভিপ্রায়' ও 'উদ্দেশ্য'—এ দুটি কথাকে অনেক সময় সমার্থক মনে করা সত্ত্বেও এরা সমার্থক শব্দ নয়; উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। নীতিবিজ্ঞানে এবং মনোবিজ্ঞানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত।

অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সমার্থক শব্দ নয়

(i) মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা মন নির্বাচন করে নিয়েছে এমন বস্তু (chosen object of desire), যার জন্য আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই।

(ii) উদ্দেশ্যসাধন করার উপায় (means): কাম্য বস্তুটিকে বা মূল লক্ষ্যটিকে পেতে হলে কোন-না কোন উপায় অবশ্যই অবলম্বন করতে হয়। এ উপায় সকল সময় যে সুখদায়ক হবে এমন কোন কথা নেই। কোন ব্যক্তির অভিপ্রায় দূরদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করা। এক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রম, অর্থ ব্যয়, ধৈর্য প্রভৃতি উদ্দেশ্যসাধনের উপায়।

(iii) উদ্দেশ্যসাধনের ফলে যে পরিণাম (consequences) হতে পারে, সে পরিণামের কথা আমরা পূর্ব থেকে অনুমান করেছি এবং মূল লক্ষ্যের কথা ভেবে সে পরিণাম অসুবিধাজনক হলেও গ্রহণ করেছি।

'অভিপ্রায়' শব্দটি 'উদ্দেশ্য' শব্দটির তুলনায় একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য বলতে বুঝি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা একটি কাম্যবস্তু যা আমরা লাভ করতে চাই এবং যাকে পাবার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু যখন অভিপ্রায়ের কথা বলি তখন আমরা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা কাম্যবস্তুর কথা চিন্তা করি না; **যে উপায়ে এই কাম্যবস্তু লাভ করা যায় এবং কাম্যবস্তু লাভ করার ফলে যে পরিণাম হতে পারে—তা যতই অবাঞ্ছনীয় হোক না কেন—সবগুলিকেই বুঝি।** অবাঞ্ছনীয় পরিণামের কথা চিন্তা করেও যখন আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই তখন বুঝে নিতে হবে যে, অবাঞ্ছনীয়

পরিণাম মূল লক্ষ্য নয় বা কাম্য বস্তুটিকে লাভ করার পথে সেটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বেন্থাম (*Bentham*) বলেন যে, **উদ্দেশ্য হল, যার জন্য** (for the sake of which) একটি কাজ করা হয় এবং **অভিপ্রায় হল, যার জন্য ও যার বাধা সত্ত্বেও** (for the sake of which and inspite of which) কাজটি করা হয়। অর্থাৎ, অভিপ্রায়ের মধ্যে প্ররোচক (অর্থাৎ, যা কাজে প্রবৃত্ত করে) এবং প্রতিরোধক (অর্থাৎ, যা কাজের পক্ষে বাধাস্বরূপ) উভয় উপাদানই বর্তমান।

অভিপ্রায়ের মধ্যে প্ররোচক এবং প্রতিরোধক উভয় উপাদান বর্তমান

একটি উদাহরণের সাহায্যে 'উদ্দেশ্য' ও 'অভিপ্রায়'-এর মধ্যে যে পার্থক্য তা বুঝে নেওয়া যাক। ব্রিটিশ আমলে ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন সন্ত্রাসবাদী দল দেশের স্বাধীনতার জন্য চুরি, ডাকাতি, নরহত্যাসাধন করেছিল। কিন্তু চুরি, ডাকাতি বা নরহত্যা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা ছিল তাদের অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। **সুতরাং উদ্দেশ্য হল কাম্যবস্তু; অভিপ্রায় হল উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় এবং উদ্দেশ্যসাধনের পরিণাম—সব কিছুর সমষ্টি।**

উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের পার্থক্য

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক বিচারের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু

(Nature and Objcet of Moral Judgment)

১। নৈতিক বিচারের স্বরূপ (Nature of Moral Judgment) :

নৈতিক বিচার বলতে আমরা বুঝি কোন কাজের নৈতিক গুণ-বিচার, অর্থাৎ কাজটা ভাল কি মন্দ তা বিচার করা। নৈতিক বিচার হল একটা মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটা কাজ ভাল কি মন্দ নির্ধারণ করা হয় এবং ভাষা মারফৎ তা প্রকাশ করা হয়। কোন আদর্শের মাপকাঠিতেই অবশ্য কোন কাজ ভাল কি মন্দ তা নির্ণয় করা হয়।

এখন নৈতিক বিচারের (Moral Judgment) সঙ্গে সাধারণ বিষয় সম্পর্কীয় অবধারণের (Judgment of Fact) পার্থক্য বুঝা দরকার। নৈতিক বিচার হল মূল্য বিচার এবং বিষয় সম্পর্কীয় অবধারণ হল মূল্যনিরপেক্ষ বিবরণ। প্রথমটি বলে, 'কি হওয়া উচিত বা অনুচিত'। দ্বিতীয়টি বলে, 'কি হয় বা হয় না'। একটি আদর্শজাত, অপরটি বিষয়জাত।

নৈতিক বিচার ও ঘটনার অবধারণ

ম্যাকেঞ্জি বলেন, "তর্কবিজ্ঞানে যাকে অবধারণ বলা হয় তার সঙ্গে নৈতিক বিচারের কোন মিল নেই।[1] নৈতিক বিচার কোন একটি কাজ সম্পর্কে নিছক অবধারণ করা নয় ; এ হল কোন নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে একটি কাজের মূল্য নিরূপণ। অর্থাৎ, কোন একটি কাজ নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা তাই নৈতিক বিচারে প্রকাশ করা হয়।"

নীতিবিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। মুরহেড-এর মতেও "বিষয়-সম্পর্কীয় অবধারণ এবং নৈতিক অবধারণ—এ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে, যেমন পার্থক্য আমরা দেখতে পাই তর্কবিজ্ঞানের বচনের এবং আইনের বচনের মধ্যে।"[2] নৈতিক বিচারের সঙ্গে আইনের বচনের সাদৃশ্য আছে।

এখন দেখা যাক, কোন কাজের নৈতিক গুণ আমরা কিভাবে নির্ধারণ করি। যে ঐচ্ছিক কাজকে আমরা বিচার করি, তাকে আমাদের মনে যে নৈতিক আদর্শ আছে

---

1. Mackenzie : A Manual of Ethics, Page 108.
2. Muirhead : The Elements of Ethics, Pages 19-20.

তার সঙ্গে তুলনা করি এবং কাজটি নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী হয়েছে, কি হয়নি নির্ণয় করে কাজটি ভাল না মন্দ স্থির করি। এভাবে বিশেষ বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শ প্রয়োগ করাই নৈতিক বিচারের কাজ। সুতরাং অনুমান ছাড়া নৈতিক বিচার সম্ভব নয়, অর্থাৎ **নৈতিক বিচার হল অনুমানমূলক** (inferential)। অবশ্য একথা মনে করা ভুল যে, নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে সকল সময়ই খোলাখুলি ভাবে অনুমান করা হয় বা এ অনুমানের ব্যাপারটি সকল ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট (explicit) থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৈতিক বিচারের ধারাবাহিক চিন্তার অবকাশ কম। আমাদের বিবেকই নিমেষের মধ্যে বলে দেয় কোন্ কাজটা যথোচিত কোন্‌টা অনুচিত। বিষয়টির নৈতিক গুণ যেন প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়। কেবল-মাত্র সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে যেখানে কাজের নৈতিক রূপটি অস্পষ্ট ও জটিল এবং যেসব ক্ষেত্রে নৈতিক বিচার নিয়ে মতভেদ দেখা যায়, সে ক্ষেত্রেই আমরা সমস্ত ঘটনাটি পর্যালোচনা করে নৈতিক আদর্শের সঙ্গে কাজটির তুলনা করি এবং কাজটি ভাল কি মন্দ বিচার করি। সুতরাং, জটিল ক্ষেত্রে নৈতিক বিচারের অনুমান-সম্পর্কীয় দিকটি বেশ স্পষ্টভাবেই আত্মপ্রকাশ করে।

নৈতিক বিচার অনুমানমূলক

অবশ্য একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, **'নৈতিক বিচার' হল বুদ্ধি সম্পর্কীয় ব্যাপার এবং 'নৈতিক বিচারের' নিজের কোন নৈতিক গুণ নেই**। তর্ক-বিজ্ঞানের দিক থেকে এরূপ নৈতিক বিচার ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এ প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু নৈতিক বিচারের ভাল মন্দ আর বিচার করা হয় না। অর্থাৎ, নৈতিক বিচার অপর কোন নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু নয়। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন নৈতিক বিচারকে বিকৃত করে তাহলে সে ব্যক্তির ঐ বিকৃত করার কাজটি নৈতিক বিচারে দুষ্ট হবে।

নৈতিক বিচারের ভাল-মন্দ বিচার করা হয় না

নৈতিক বিচার আদর্শনিষ্ঠ ; কেননা কোন আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক বিচার করা হয়। নৈতিক বিচার ব্যবহারিক, কেননা নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে ভালমন্দ বিচার করে তা ব্যক্ত করা হয় এবং নৈতিক বিচারে নিয়ামক (regulative), যেহেতু নৈতিক আদর্শ, যার ভিত্তিতে নৈতিক বিচার করা হয়, ব্যক্তির আদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করে।

নৈতিক বিচারের আলোচনায় চারটি প্রশ্ন দেখা দেয়। যেমন— (১) কে বিচার করছে বা বিচার করার কর্তা কে (২) কাকে বিচার করা হচ্ছে বা বিচারের বিষয়বস্তু কি (৩) কি নীতি অনুযায়ী বিচার করা হচ্ছে বা বিচারের মানদণ্ড কি এবং (৪) নৈতিকবিচারবৃত্তি কি? এগুলি আমরা পরে আলোচনা করবো।

২। নৈতিক বিচারের সঙ্গে তর্কবিজ্ঞানসম্মত বিচার এবং সৌন্দর্য-সম্পর্কীয় বিচারের প্রভেদ (Moral Judgment distinguished from Logical Judgment and Aesthetic Judgment) :

নীতিবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান এবং সৌন্দর্যবিজ্ঞান সকলই আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। নীতিবিজ্ঞানের আদর্শ হল পরমকল্যাণ বা পরমার্থ (The Highest Good), আর তর্কবিজ্ঞানের আদর্শ হল সত্যতা (Truth) ; এবং সৌন্দর্যবিজ্ঞানের আদর্শ হল সৌন্দর্য (Beauty)। আমাদের কোন চিন্তা বিশেষ করে অনুমান যথার্থ হয়েছে কিনা তা তর্কবিজ্ঞান বিচার করে সত্যতার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি লক্ষ্য করে। সৌন্দর্য-সম্পর্কীয় বিচার করা হয় সৌন্দর্যের আদর্শের মাপকাঠিতে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, নীতিবিজ্ঞানের বিচারের আদর্শ হল পরমার্থ বা পরমকল্যাণ। তিন প্রকার বিচারের কাজই হল বিষয়ের দোষগুণ বিচার করা, কোন কিছুর মূল্য নির্ধারণ করা। কিন্তু নীতিবিজ্ঞানের বিচারের সঙ্গে তর্কবিজ্ঞানের ও সৌন্দর্যবিজ্ঞানের বিচারের পার্থক্য আছে। নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে নৈতিক বাধ্যতাবোধের (moral obligation) এবং নৈতিক ভাবাবেগের (moral sentiment) প্রশ্ন দেখা দেয়, তর্কবিজ্ঞানসম্মত বিচার বা সৌন্দর্য-সম্পর্কীয় বিচারে এসব প্রশ্ন দেখা দেয় না। যখন আমরা কোন কাজকে যথোচিত বলে মনে করি তখন সে কাজ সম্পন্ন করার নৈতিক বাধ্যতাবোধ আমাদের মধ্যে দেখা দেয় এবং আমরা মনে করি কাজটি আমাদের করা কর্তব্য। কর্তব্যবোধ আমাদের মনে প্রীতিকর ভাব জাগিয়ে তোলে এবং কাজটি আমাদের অনুমোদন লাভ করে। অপরদিকে যখন আমরা কোন কাজ অনুচিত মনে করি তখন সে কাজটি করা যে আমাদের কর্তব্য নয় সে ভাব মনে জাগে। কাজটি সম্পর্কে একটি অপ্রীতিকর ভাব মনে উদিত হয় এবং কাজটি করা আমরা অনুমোদন করি না। এই প্রীতিকর এবং অপ্রীতিকর ভাবই হল মানসিক ভাবাবেগ। তর্কবিজ্ঞানসম্মত বিচার এবং সৌন্দর্য-সম্পর্কীয় বিচারের ক্ষেত্রে এরূপ বাধ্যতাবোধ বা মানসিক ভাবাবেগের প্রশ্ন দেখা দেয় না।

নৈতিক বিচার, তর্কবিজ্ঞানসম্মত বিচার ও সৌন্দর্য-সম্পর্কীয় বিচারের পার্থক্য

৩। নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু (The Object of Moral Judgment) :

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং স্বেচ্ছায় অভ্যাসলব্ধ ক্রিয়াই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু। পূর্ব থেকে সঙ্কল্প করে, উদ্দেশ্য ও উপায় নির্ধারণ করে যে কাজ করা হয় তাই হল ঐচ্ছিক ক্রিয়া। অভ্যাসলব্ধ ক্রিয়াও নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু, যেহেতু ঐচ্ছিক ক্রিয়া বারবার সম্পন্ন হলেই তা অভ্যাসলব্ধ ক্রিয়ায় পরিণত হয়।

নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু ঐচ্ছিক ক্রিয়া ও স্বেচ্ছায় অভ্যাসলব্ধ ক্রিয়া

আমরা ইতিপূর্বে আরও দেখেছি, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার তিনটি স্তর বা তিনটি ধাপ আছে ; যথা—(ক) মানসিক স্তর : অভাববোধ, কামনা, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প, (খ) শারীরিক স্তর : কাম্যবস্তু লাভ করার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করা, (গ) দেহাতিরিক্ত বা বাহ্যস্তর : কার্যের প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত ফলাফল। এখন সকল নীতি-বিজ্ঞানীই একমত যে, শারীরিক স্তর অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনার ব্যাপার নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু নয়। সুতরাং প্রশ্ন হল, মানসিক স্তর ও জাগতিক স্তরের মধ্যে কোন্‌টি নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু ? ভিন্ন-ভাষায়, কাকে বিচার করি কাজের উদ্দেশ্যকে, না তার পরিণামকে ?

(১) কোন কাজের জাগতিক ফলাফল দেখে কি আমরা তার নৈতিক মূল্য নির্ণয় করি ?

এ বিষয়ে সুখবাদী (Hedonists) এবং বিচারবাদীদের (Rationalists) মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। সুখবাদীদের মতে একটি কাজ ভাল কি মন্দ তা নির্ভর করে কাজের ফলাফলের ওপর ; আর বিচারবাদীরা মনে করেন যে, উদ্দেশ্য বিচার করেই বলা যেতে পারে, কাজটি ভাল কি মন্দ। তাহলে প্রশ্ন হল, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য—না ফলাফল, কোন্‌টি নৈতিক বিচারের বিচার্য বিষয় ? অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাহ্য ফলাফলের কোন অসঙ্গতি থাকে না সেখানে এ প্রশ্নই ওঠে না। যেমন, কোন ডাক্তার একজন রোগীকে সুস্থ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তার শরীরে অস্ত্রোপচার করল এবং ফলে রোগীটি সুস্থ হয়ে উঠল। এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার কাজের বাহ্য ফলাফলের সঙ্গতি রয়েছে এবং উভয়ই ভাল বলে নৈতিক বিচারে কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে না। বস্তুতঃ, কাজের উদ্দেশ্য ও কাজের ফলাফলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কারও উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে হলে তার কাজের ফলাফল লক্ষ্য করতে হয়। এ হিসেবে মনজাত উদ্দেশ্যেরই বাহ্যিক পরিণতি হল কাজের ফলাফল। কিন্তু অসুবিধা হল, সকল সময় উদ্দেশ্যের সঙ্গে কাজের ফলাফলের সঙ্গতি থাকে না। দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়ই দেখি যে উদ্দেশ্যের সঙ্গে কাজের ফলাফলের কোন সঙ্গতি নেই, বরং সময় সময় কাজের ফলাফল কাজের উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন অস্ত্রচিকিৎসক কোন একটি রোগীকে নীরোগ করার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার ওপর অস্ত্রোপচার করলেন, অথচ তাঁর সমস্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও রোগীটি মারা গেল। 'এক্ষেত্রে অস্ত্রচিকিৎসকের কাজটা

সুখবাদী এবং বিচারবাদীদের মত

দৈনন্দিন জীবনে সকল সময় উদ্দেশ্যের সঙ্গে কাজের সঙ্গতি থাকে না

কোন মতেই মন্দ বলা যায় না; যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভাল, যদিও ফল হল বিপরীত।

ডক্টর জনসন (*Dr. Johnson*) বলেন, 'একটা কাজ নীতিসঙ্গত হয়েছে কিনা তা নির্ভর করে উদ্দেশ্যের ওপর। একটা ভিক্ষুকের মাথা ফাটিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে যদি আমি তার দিকে একটা আধ-ক্রাউন ছুঁড়ে দিই এবং যদি সে সেটি কুড়িয়ে নিয়ে খাবার কিনে খায় তাহলে বাহ্য ফল ভাল হওয়া সত্ত্বেও আমার কাজটা খুবই মন্দ হল।' এখানে কাজটি নিঃসন্দেহে খারাপ; যেহেতু উদ্দেশ্য হল মন্দ।

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কাজের ফলাফল দেখে কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা সকল সময় সম্ভব হয় না। সুতরাং, কাজের নৈতিক বিচারের জন্য ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরে আসা প্রয়োজন। কিন্তু মানসিক স্তর সম্বন্ধে যে প্রশ্ন দেখা দেয় সেটা হল—কোন্‌টি নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু—উদ্দেশ্য (Motive), না অভিপ্রায় (Intention)?

উদ্দেশ্য হল কাম্যবস্তুর ধারণা যেটিকে মন নির্বাচন করে নেয় (the idea of a chosen end)। অভিপ্রায় হল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ কাম্যবস্তুর ধারণা এবং উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উপযুক্ত উপায়। এখন প্রশ্ন হল, কোন্‌টি নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু—**উদ্দেশ্য, না অভিপ্রায়?** অথবা যদি কোন কাজের অভিপ্রায় ভাল হয় তাহলেই কি কাজটি যথোচিত? উদ্দেশ্য মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, সুতরাং নৈতিক মূল্যের বিচারে উদ্দেশ্যকে অবশ্যই ধরতে হবে। কিন্তু কেবলমাত্র উদ্দেশ্যর দিকে লক্ষ্য রেখে ভাল-মন্দ বিচার করা উচিত নয়। যেহেতু উদ্দেশ্য ভাল হলেও উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মন্দ হতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি অপরের দ্রব্য অপহরণ করে দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য করতে পারে। এক্ষেত্রে লোকটির উদ্দেশ্য ভাল কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের যে উপায় তা খুবই মন্দ। সুতরাং লোকটির কাজকে কোনমতেই ভাল বলা চলে না। একজন অসাধু ব্যবসায়ী এবং একজন সাধু ব্যবসায়ী দুজনেরই উদ্দেশ্য হয়ত এক—অর্থ উপার্জন করে পরিবার প্রতিপালন করা। কিন্তু একজন ভাল উপায় অবলম্বন করছে এবং আর একজন মন্দ উপায় অবলম্বন করছে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, শুধু উদ্দেশ্য নয়, অভিপ্রায়ই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু। অভিপ্রায় হল: উদ্দেশ্য+উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। **যদি কোন লোকের অভিপ্রায় ভাল হয়, অর্থাৎ কাম্যবস্তুর ধারণা ও কাম্যবস্তুকে লাভ করার উপায়—উভয়ই যদি ভাল হয় তাহলেই কাজটি ভাল বা যথোচিত; এবং যদি অভিপ্রায় মন্দ হয় তবে কাজটি যথোচিত নয়।**

কেবলমাত্র উদ্দেশ্য নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু

'সব ভাল যার শেষ ভাল'—এ নীতি কি নীতিবিজ্ঞানে স্বীকার করে নেওয়া যায় ?

যদি আমরা কেবলমাত্র উদ্দেশ্যকেই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু মনে করি তাহলে আমরা 'সদুদ্দেশ্য অসদুপায়কেই খাঁটি করে' (the end justifies the means) কিংবা 'সব ভাল যার শেষ ভাল' (all's well that ends well)—এ নীতি মেনে নেই ; অর্থাৎ কার্যসিদ্ধির উপায় মন্দ হলেও উদ্দেশ্য যদি ভাল হয় তবে কাজটি ভাল বলে ধরে নেই।

অভিপ্রায়ই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু

নীতিবিজ্ঞানে এ মতকে সমর্থন করা যায় না। এ মত যদি আমরা মেনে নেই তাহলে অনেক মন্দ কাজকে ভাল কাজ বলে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হব। কোন ব্যক্তি যদি সংসার পালনের জন্য অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে, কোন কর্মচারী যদি বন্ধুর চিকিৎসার জন্য তহবিল তছরূপ করে, কোন দয়ালু ব্যক্তি যদি গরীবের জন্য জুতো তৈরি করার উদ্দেশ্যে চামড়া চুরি করে তাহলে এদের কাজকে পূর্বোক্ত মত অনুযায়ী সমর্থন করতে হবে ; যদিও স্পষ্টই আমরা জানি যে, এসব কাজ মন্দ। আসল কথা, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। যদি উদ্দেশ্য মহৎ হয় এবং অবলম্বিত উপায় মন্দ হয় তাহলে মন্দ উপায় উদ্দেশ্যর মহৎ নৈতিক গুণকে নষ্ট করে দেয়। যেমন, উপমার সাহায্যে বলা যায়, একটি তার যদি বেসুরো বাজে তাহলে সমস্ত বাজনাটাই নষ্ট হয়ে যায়।

'সব ভাল যার শেষ ভাল'—নীতিবিজ্ঞানে এ মতকে সমর্থন করা যায় না।

সুতরাং, নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হল অভিপ্রায়, শুধু উদ্দেশ্য নয়। নিজেদের অভিপ্রায় আমাদের জানাই থাকে। অপরের কাজের নৈতিক বিচারের সময় আমাদের নিজেদের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে তাদের অভিপ্রায় বুঝি বা অনুমান করে নিয়ে থাকি।

কোন কোন নীতিবিজ্ঞানী মনে করেন যে, **কর্মকর্তার অভিপ্রায় নয়, তার চরিত্রই (Character) নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।** কিন্তু অভিপ্রায় চরিত্র থেকে কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। মানুষের অভিপ্রায় মানুষের চরিত্রকে প্রকাশ করে। কোন মানুষের অভিপ্রায় হল চুরি করা, একথা বললে বুঝতে হবে যে, সে লোকটি চোর। কোন কারণে সে চুরি করতে বিফল হলেও চরিত্র বিচারে সে চোরই থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ তার অভিপ্রায় তার চরিত্রকে প্রকাশ করছে। বস্তুতঃ, চরিত্র হল মানুষের মনের স্থায়ী প্রবণতা যেটা সে বারংবার ঐচ্ছিক ক্রিয়াসাধন করে অর্জন করে। মানুষ নিজের চরিত্র নিজেই সৃষ্টি করে। সুতরাং, অভিপ্রায় যে মানুষের চরিত্রের প্রকাশ—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভাল

অভিপ্রায় মানুষের চরিত্রের প্রকাশক

লোকের অভিপ্রায় স্বভা তঃই ভাল হয়। সে কারণে কোন লোকের চরিত্র জানা থাকলে তার অভিপ্রায় জানা সহজ হয়। এ কারণে ম্যাকেঞ্জির মতে নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কর্মকর্তার চরিত্রকেই নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁর মতে, "যে কাজটি করা হয়েছে শুধু সেটা নয়, যে কাজ করছে তাকেই সর্বদা নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু করা হয়।"[1]

মোটামুটিভাবে এই মতবাদ মেনে নিলেও সময়ে সময়ে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ মানুষের চরিত্রের সঙ্গে তার অভিপ্রায়ের সকল ক্ষেত্রে সঙ্গতি বা সমঞ্জস্য নাও থাকতে পারে। সাধারণতঃ সচ্চরিত্র ব্যক্তি সৎ কাজ করে থাকে। কিন্তু সচ্চরিত্র ব্যক্তি অসদাচরণ করছে—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আবার হীন চরিত্রের লোক সৎ অভিপ্রায় নিয়ে কাজ করেছে, দৈনন্দিন জীবনে এমন দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়।

সুতরাং, আমাদের সিদ্ধান্ত হল সাধরণতঃ কর্মকর্তার অভিপ্রায়ই হল নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু, তার চরিত্র নয়। অবশ্য একথা ভুললেও চলবে না যে, সময় সময় আমরা ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র বিচার করে থাকি এবং এটা বলা বাহুল্য যে, সেরকম ক্ষেত্রে চরিত্রই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।

৪। নৈতিক বিচার করে কে বা নৈতিক বিচারের কর্তা কে (Subject of Moral Judgment) :

কে নৈতিক বিচার করে? নৈতিক বিচার করে আমাদের নিজেদের মন, আমাদের নিজেদের বিবেক। আমরা আমাদের অভিপ্রায়ের কথা জানি, কাজেই আমরা আমাদের বিচার করি।

ম্যাকেঞ্জি বলেন, নৈতিক বিচারের কর্তা বলতে আমরা বুঝব, যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয় সেইটি। একটা আদর্শের মান (Ideal Standard) অনুসারে আমরা নৈতিক বিচার করি। শ্যাফ্টস্‌বারি (*Shaftesbury*)-র মতে, কোন শিল্প কলার বিচারের জন্য যেমন সমঝদার আছে তেমনি নৈতিক কাজের বিচার করে নৈতিক সমঝদার (Moral Connoisseur)'। অ্যাডাম স্মিথ (*Adam Smith*) বলেন, 'আমরা নিজেদের ও অপরের কাজের বিচার করি নিরপেক্ষ দর্শকের (Impartial Spectator) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।' বিষয়টি একটু ভাল করে বুঝে নেওয়া যাক : আমরা যখন আমাদের কাজের বিচার করি তখন আমরাই আমাদের কাজের দর্শক। কিন্তু তা কিভাবে

1. ......It is never simply on a thing done, but always on a person doing that we pass moral judgment.'

—Mackenzie—A Manual of Ethics ; Sixth Edition, Page 111.

সম্ভব? অ্যাডাম স্মিথ-এর মতে, আমরা যখন আমাদের কাজের বিচার করি, তখন আমরা নিজেদের দুটি ব্যক্তিতে ভাগ করে ফেলি, একদিকে থাকে সেই 'আমি'—যে বিচার করে, অর্থাৎ যে বিচারক এবং আর এক দিকে থাকে সেই 'আমি' যাকে বিচার করা হচ্ছে—এরা দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রথম জন দর্শক, অপর জন কর্মকর্তা; প্রথম জন বিচারক, অপর জন অভিযুক্ত। সুতরাং আমি যখন আমার কাজের বিচার করছি তখন আমি এক নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করছি এবং নিজেকে আসামী মনে করে আমিই আমার কাজের বিচার করছি।

নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নৈতিক বিচার করা হয়

অ্যাডাম স্মিথ-এর উপরিউক্ত অভিমতের যথেষ্ট সত্যতা আছে। আমরা যখন আমাদের কাজের বিচার করি তখন আমাদের নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। যিনি নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তিনি হলেন এক 'আদর্শ আমি' (Ideal Self) এবং যাকে বিচার করছেন তিনি হলেন 'বাস্তব আমি' (Actual Self); অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই দুটি 'আমি'র সমষ্টি। 'আদর্শ আমি' নিরপেক্ষভাবে ও শান্ত মনে কোন নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী কাজের বিচার করে। 'বাস্তব আমি' তারই সামনে কাঠগড়ার আসামীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে এবং 'আদর্শ আমি' তার কাজের যে বিচার করে সেই বিচার মাথা পেতে গ্রহণ করে। যদি 'বাস্তব আমি' অপরাধী সাব্যস্ত হয় এবং 'আদর্শ আমি' তার কাজকে অপরাধজনক বলে মনে করে তাকে শাস্তি দেয়, তবে 'বাস্তব আমি' মাথা পেতে সেই শাস্তি গ্রহণ করে।

'আদর্শ আমি' ও 'বাস্তব আমি'

৫। কাকে আমরা প্রথম বিচার করি? (Whom do we judge first?) :

নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে আর একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। কাকে আমরা প্রথম বিচার করি? নিজেকে, না অপরকে? এ বিষয়ে দুটি বিপরীত মতবাদ দেখা যায়। কোন কোন নীতিবিজ্ঞানী মনে করেন, আমরা প্রথমে অপরের কাজের বিচার করি এবং পরে তদনুসারে নিজেদের কাজের বিচার করি। আবার কেউ কেউ মনে করেন, আমরা প্রথমে নিজেদের কাজের বিচার করি; এবং পরে সেই অনুসারে অপরের কাজের বিচার করি; বিবর্তনবাদী (Evolutionists) এবং উপযোগবাদীরা (Utilitarians) মনে করেন যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বিধিব্যবস্থা আমাদের মনে নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে। আমরা প্রথমে লক্ষ্য করি অপরের কাজ আমাদের ওপর কি প্রতিক্রিয়া ঘটায়। যদি অপরের কাজ

বিবর্তনবাদী ও উপযোগবাদীদের মতবাদ

আমাদের ভাল করে, আমরা কাজগুলিকে 'যথোচিত' বলি এবং অপরের কাজ যদি আমাদের স্বার্থে ঘা দেয়, আমরা সেগুলিকে 'অনুচিত' কাজ বলি। এভাবে অপরের কাজের নৈতিক বিচার করে আমরা 'ভাল', 'মন্দ' সম্পর্কে যে ধারণা করি সেসব ধারণার সাহায্যে নিজেদের কাজকে বিচার করি। মিল এবং বেন্থাম-এর মতে আমরা প্রথমতঃ অপরের কাজের ওপর 'ভাল', 'মন্দ', 'উচিত', 'অনুচিত' নৈতিক শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকি এবং পরে সেগুলি আমাদের কাজের ওপর প্রয়োগ করি এই ভেবে যে, এ ধরনের কাজ আমরাও করতে পারি। অ্যাডাম স্মিথ-এর মতেও আমরা প্রথমে অপরের কাজের বিচার করি, তারপর নিজেদের কাজের বিচার করি। হার্বার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*)-এর মতে 'নৈতিক চেতনা' সমাজ ব্যবস্থা থেকেই উদ্ভূত। বাইরের ক্রিয়াকলাপ দেখেই আমাদের মধ্যে নৈতিক চেতনা উদ্ভূত হয়। লেসলি স্টিফেন (*Leslie Stephen*)-ও স্পেন্সার-এর অভিমত অনুসরণ করে বলেন যে, নৈতিক ধারণা সামাজিক চেতনারই ফল। বিবেক হল ব্যক্তির কণ্ঠে উচ্চারিত সমাজের বাণী। ঐ বিবেক আমাদের সেরূপ নীতি ও নিয়ম অনুসরণ করতে আদেশ দেয় যাতে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়।[1]

Mill এবং Bentham-এর মত

Herbert Spencer ও Stephen-এর মত

পূর্বোক্ত মতবাদটি গ্রহণযোগ্য নয়। মার্টিনিয় (*Martineau*) বলেন যে, এই মতবাদকে মেনে নিলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, কেবলমাত্র কাজের জাগতিক ফলাফলই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু। একমাত্র ফলাফল দেখে যদি কাজের বিচার সম্ভব হত তাহলে যে কোন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও যথাযথ নৈতিক বিচার করা খুব সহজ হত। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার নৈতিক বিচার করতে হলে আমাদের মানুষের কামনা, উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়টিকে জানতে হবে এবং এগুলি হল মনের খবর, যেগুলি, বাইরের ফলাফল দেখে সকল সময় জানা যায় না। অন্তঃপ্রত্যক্ষ (internal perception), অন্তঃদৃষ্টি (introspection) বা আত্ম-সচেতনতার (self-consciousness) দ্বারা অর্থাৎ আত্মবিচারের মধ্য দিয়ে মনের অভিপ্রায় জানা যায়। কাজেই আমরা আমাদের কাজকেই সর্ব প্রথমে নৈতিক বিচারের বিষবস্তু করি এবং তারপর অপরের কাজের সঙ্গে তার তুলনা করি এই বিশ্বাসে

সমালোচনা

1. "Moral sense is a product of social factor. Conscience is the utterance of the public spirit of the race, ordering us to obey the primary condition of its welfare." —Dr. Martineau : Types of Ethical theory ; Vol. II. Pages 27-28.

যে, আমরা যে কাজ যে উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অনুযায়ী করি; অন্য যে কেউ সেই কাজ একই উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় নিয়ে করে থাকে। এজন্য দৈনন্দিন জীবনে আমাদের এমন অভিজ্ঞতা অনেক সময়েই হয় যার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ঠিকমত জানতে না পারার জন্য অপরের অনুরূপ কাজের ঠিকমত নৈতিক বিচার আমরা করতে পারি না।

সুতরাং, নৈতিক বিচার হল মুখ্যতঃ আত্মবিচার। আত্মচিন্তার মাধ্যমেই যথার্থ নৈতিক বিচারের উৎপত্তি। আমরা প্রথমতঃ আমাদের কাজের নৈতিক বিচার করি এবং পরে আমাদের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অপরের কাজের নৈতিক বিচার করি।

৬। নৈতিক বিচারের পদ্ধতি (Method of Judgment):

নৈতিক বিচারের আলোচনায় আরও দুটি প্রশ্ন যুক্ত আছে, যথা—(i) কি পদ্ধতিতে নৈতিক বিচার করা হয়? (Method of Moral Judgment) এবং (ii) নৈতিক বিচারবৃত্তির (Moral Faculty) স্বরূপ কি?

আমরা নৈতিক আদর্শ (Moral Standard) অনুযায়ী কাজের বিচার করি। নৈতিক আদর্শের সঙ্গে যদি কোন কাজের সঙ্গতি থাকে, অর্থাৎ কাজটি নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী হয়, তাহলে কাজটি ভাল; আর যদি কাজটি নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী করা না হয়, তাহলে কাজটি মন্দ। কিন্তু এই আদর্শটি কী? এই সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আছে এবং সেজন্য যথার্থ নৈতিক বিচার-পদ্ধতি কি, সে সম্বন্ধেও মতবাদ আছে। যথাস্থানে আমরা সেগুলির আলোচনা করব।

নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী কাজের বিচার করা হয়

৭। নৈতিক বিচারের বৃত্তি (Moral Faculty):

এখানে *Faculty* শব্দটির অর্থ হল মনোবৃত্তি বা মানসিক ক্ষমতা। Moral Faculty হল নৈতিক বিচারে বৃত্তি বা বিচারশক্তি, যার সাহায্যে আমরা কাজের ভাল-মন্দ বিচার করি। দৃষ্টিশক্তির সহায়তায় যেমন প্রত্যক্ষ করি কোন্ ফুল লাল রঙের, বা নীল রঙের, ঠিক তেমনি ভাবে নৈতিক বৃত্তি বা বিচারশক্তির দ্বারা আমরা কাজের নৈতিক মূল্য বিচার করি, অর্থাৎ কাজটি ভাল কি মন্দ, যথোচিত কি অনুচিত তা নির্ণয় করি। এই নৈতিক বিচারশক্তিই হল আমাদের বিবেক (conscience)। নৈতিক বৃত্তি বা বিবেকের স্বরূপ সম্বন্ধেও লেখকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

নৈতিক বৃত্তি কাজের নৈতিক মূল্য বিচার করার ক্ষমতা দেয়

চতুর্থ অধ্যায়

নৈতিক আদর্শ—সুখবাদ, কৃচ্ছ্রতাবাদ ও পূর্ণতাবাদ
(Moral Standards—Hedonism, Rigorism and Perfectionism)

১। ভূমিকা (Introduction) ঃ

নৈতিক বিচার যে নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় এ আমরা দেখেছি। এই নৈতিক বিচার-প্রসঙ্গে যে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় তার অন্যতম প্রশ্ন হল, নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী কি নৈতিক বিচার হয়? বস্তুতঃ, এটি এক হিসেবে নীতিবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এই নৈতিক আদর্শের স্বরূপ সম্বন্ধে নীতিবিজ্ঞানীরা একমত হতে পারেন নি; ফলে নীতিবিজ্ঞানে আমরা একাধিক নৈতিক আদর্শের আলোচনা দেখতে পাই। কেউ কেউ মনে করেন সমাজের, রাষ্ট্রের বা ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ীই কাজের নৈতিক মূল্য নির্ণয় করা হয়। নীতিবিজ্ঞানে এ মতবাদ বিধিবাদ (Law as the moral Standard) নামে পরিচিত। এ ছাড়াও নীতিবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান মতবাদগুলি হল সুখবাদ (Hedonism), কৃচ্ছ্রতাবাদ (Rigorism or Rationalism), স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism) এবং পূর্ণতাবাদ (Perfectionism)। আমরা শুধুমাত্র সুখবাদ, কৃচ্ছ্রতাবোধ এবং পূর্ণতাবাদ আলোচনা করব।

নীতিবিজ্ঞান একাধিক নৈতিক আদর্শের আলোচনা করে

২। নৈতিক আদর্শ সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of the Moral Standard) ঃ

আমাদের নৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের পথে তিনটি স্তরের কথা মুরহেড উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্তরে সমাজ, রাষ্ট্র বা ঈশ্বরের বিধি অনুযায়ী মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে যখন মানুষের চিন্তাশক্তি এবং বিচারশক্তি আরও উন্নত হয় তখন বাইরের বিধির স্থান দখল করে অন্তরের বিধি বা বিবেক। অর্থাৎ, প্রথম স্তরে মানুষ বাইরের বিধির নির্দেশ মেনে চলে, পরবর্তীকালে বাইরের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ মেনে চলে অন্তরের বা বিবেকের নির্দেশ। তৃতীয় স্তরে মানুষ কোনরূপ নির্দিষ্ট বিধি না মেনে একটি নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করে এবং এ আদর্শ হল কল্যাণের আদর্শ।

নৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের পথে তিনটি স্তর

এর থেকে নীতিবিজ্ঞান সম্পর্কীয় মতবাদগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—**নিয়মমূলক নীতিবিজ্ঞান** (Leogal Ethics) এবং **পরিণতিমূলক নীতিবিজ্ঞান** (Telelogical Ethics)। প্রথমোক্ত মতগুলি 'নৈতিক নিয়ম', 'ন্যায়,' 'অন্যায়', 'উচিত', 'অনুচিত'-এর ধারণার ওপর জোর দেয় এবং অপর মতগুলি 'ভাল', 'কল্যাণ', 'মঙ্গল' বা মানুষের 'পরম লক্ষ্যে'র বা 'পরমার্থে'র ওপর জোর দেয়। আমরা আগেই জেনেছি, যা নিয়মানুযায়ী করা হয় তাই হল যথোচিত, আর যে বস্তু আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করে তাই হল 'ভাল' বা 'কল্যাণকর'।

নিয়মমূলক নীতিবিজ্ঞান ও পরিণতিমূলক নীতিবিজ্ঞান

নীতিবিজ্ঞানে আমরা বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের আলোচনা দেখি। এই আলোচনা করা হয়েছে নিয়মমূলক নীতিবিজ্ঞান এবং পরিণতিমূলক নীতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বিধিসম্পর্কীয় বা নিয়মমূলক নীতিবিজ্ঞান বিধি বা নিয়মকেই নৈতিক বিচারের মাপকাঠি বলে নির্দেশ করে। বিধিবাদ (Legal theory) অনুযায়ী বিধি বা নিয়ম—সে নিয়ম বাইরে থেকেই আসুক বা মনের ভেতর থেকেই আসুক, এ হল নৈতিক আদর্শ। পরিণতিমূলক নীতিবিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের কল্যাণই হল নৈতিক বিচারের মাপকাঠি। কিন্তু মানুষের যথার্থ কল্যাণ কি—এ নিয়ে আবার মতভেদ আছে। সুখবাদ (Hedonism) মনে করে, সুখই (Pleasure) মানুষের কল্যাণ, সুতরাং সুখভোগই হল নৈতিক আদর্শ। কৃচ্ছ্রতাবাদ (Rigorism) মনে করে যে, ইন্দ্রিয়জনিত সুখভোগ থেকে বিরত হয়ে বুদ্ধির আলোকে জীবন যাপন ও কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন বা ত্যাগই মানুষের জীবনের পরমলক্ষ্য এবং সেহেতু তাই হল নৈতিক আদর্শ। পূর্ণতাবাদ (Prefectionism) মনে করে, আত্মোপলব্ধি (Self-realisation) বা পূর্ণতা (Prefection) লাভই মানব জীবনের পরমকল্যাণ, সেহেতু তাই হল নৈতিক আদর্শ। আমরা অন্য মতবাদগুলি আলোচনা করার পূর্বে বহির্বিধিবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব :

নৈতিক বিচারের মাপকাঠি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

৩। বহির্বিধিবাদ (External Law as the Moral Standard) :

এ মতবাদ অনুযায়ী বহিরাগত বিধিই হল নৈতিক আদর্শ। এই বিধি বা নিয়মকানুন অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য। যে কাজ বিধি বা নিয়মানুসারে করা হয় সে কাজ যথোচিত; যে কাজ বিধি বা নিয়ম অনুযায়ী করা হয় না সে কাজ অনুচিত। কোন কাজই নিজে নিজেই যথোচিত বা অনুচিত হয় না। কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে এ বিধি বা নিয়ম মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়। কিন্তু সে কর্তৃপক্ষ কে? সে কর্তৃপক্ষ সমাজ, রাষ্ট্র বা ঈশ্বর হতে পারে।

বহিরাগত বিধিই নৈতিক আদর্শ

এই উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে আমাদের ওপর যে বিধান চাপিয়ে দেয়, শাস্তির ভয়ে ও পুরস্কারের লোভে আমরা যে বিধান মেনে নিই বা ঐ বিধান লঙ্ঘন করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাজা পাই।

সমালোচনা: (ক) আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের নীতি বলে কিছু থাকে না। নৈতিক অনুশাসন হল অন্তরের নির্দেশ—বিবেকের বাণী। এ শাসন বাইরে থেকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বহিরাগত বিধি বা নিয়ম শারীরিক বাধ্যতা সৃষ্টি করতে পারে, নৈতিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা উচিত মনে করে স্বেচ্ছায় আমাদের নৈতিক কর্তব্য সম্পন্ন করি। কারও দ্বারা বাধ্য হয়ে কিছু করাকে কর্তব্যপালন বলে না।

নিয়ম নৈতিক বাধ্যতাবোধ সৃষ্টি করতে পারে না

(খ) বিধিবাদ স্বার্থকেই নৈতিকতা এবং বুদ্ধিমত্তা বা বিজ্ঞতাকেই সততা বলে ভুল করে। পুরস্কারের লোভে বা শাস্তির ভয়ে কাজ করলে তাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় থাকতে পারে কিন্তু সে কাজের কোন নৈতিক উৎকর্ষ থাকে না। স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কাজ করলে সে কাজের কোন নৈতিক সদগুণ তো থাকেই না; বরং নৈতিক বিচারে সে কাজ হয় অসৎ।

স্বার্থের জন্য কাজের কোন নৈতিক উৎকর্ষ নেই

(গ) যেহেতু বিধি বা নিয়ম কোন বাইরের কর্তৃপক্ষের দ্বারা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সেহেতু তা শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের খেয়াল-খুশীর ব্যাপার (arbitrary) হয়ে পড়ে। যা খেয়াল-খুশীর ব্যাপার তা নৈতিক আদর্শ হতে পারে না। নৈতিক আদর্শ যুক্তিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

যা খেয়াল-খুশীর ব্যাপার তা নৈতিক আদর্শ হতে পারে না

(ঘ) বিধিবাদ অনুসারে মানুষের কাজের ফলাফলই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু। এর দ্বারাই কাজ যথোচিত কি অনুচিত বিচার্য হবে। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, মানুষের কাজের ফলাফল নয়, মানুষের অভিপ্রায়ই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু। বাইরের কর্তৃপক্ষের পক্ষে মানুষের সব কাজের খবর রাখা বা কি উদ্দেশ্যে মানুষ কাজ করছে তা জানা সব সময় সম্ভব নয়।

(ঙ) বিধি বা নিয়ম হল কল্যাণলাভের উপায়স্বরূপ। আমরা নিয়ম মেনে চলি যেহেতু জানি যে নিয়ম মেনে চললে আমাদের মঙ্গল বা কল্যাণ সাধিত হবে। সুতরাং, যেহেতু নিয়ম কল্যাণলাভের উপায়স্বরূপ সেহেতু কল্যাণকেই নৈতিক আদর্শ-রূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।

বহির্বিধিবাদের বিভিন্ন রূপ আছে। আমরা এবার এই বিভিন্ন রূপগুলি বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করছি:

৪। **বিধিবাদের বিভিন্ন রূপ (Different forms of the Legal Theory) ঃ**

(ক) **সমাজের বিধিই হল নৈতিক আদর্শ** (Social law as Standard) ঃ কোন কোন নীতিবিদের মতে সমাজের বিধিই হল নৈতিক আদর্শ। যদি সমাজের বিধির সঙ্গে কোন কাজের সঙ্গতি থাকে তাহলে কাজটি যথোচিত, আর সমাজের বিধিকে লঙ্ঘন করে যদি কোন কাজ সম্পন্ন করা হয় তাহলে কাজটি অনুচিত। যা সমাজের অনুশাসন তাই যথোচিত, যা সমাজের দ্বারা নিষিদ্ধ, তা অনুচিত। সমাজস্থ ব্যক্তিদের সমষ্টিগত অভিমতের ওপরই নৈতিকতা নির্ভর করে। সমাজের ইচ্ছাই নৈতিক আদর্শ। অর্থাৎ সামাজিক প্রথা এবং আইন-কানুনই নৈতিক আদর্শ। প্রশ্ন হল, সমাজের নিয়মগুলি কিভাবে সাধারণের ওপর প্রযুক্ত হয়? সমাজের বিধিগুলি অনুমোদন, সম্মতি, সম্মান প্রদর্শন বা নিন্দা প্রভৃতি জনসাধারণের ভাবাবেগের মাধ্যমে প্রযুক্ত হয়। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সমাজের বিধি বা নিয়মগুলি লঙ্ঘন করলে তাকে সমাজচ্যুত করা যেতে পারে।

সামাজিক বিধি-নিষেধই নৈতিক আদর্শ

সমালোচনা ঃ (১) সামাজিক বিধি বা নিয়মগুলি পরিবর্তনশীল—এগুলি যুগে যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে। সামাজিক প্রথা এবং রীতিনীতি যেগুলি একটি বিশেষ সময়ে সকলের অনুমোদন লাভ করেছে, সেগুলিই পরে ভ্রান্ত বিবেচিত হওয়ার জন্য পরিবর্তিত হয়েছে। সে কারণে এগুলিকে নৈতিক আদর্শরূপে গণ্য করা যেতে পারে। নৈতিক আদর্শ অপরিবর্তনশীল ও সকল অবস্থায়ই তার প্রকৃতি একরূপ।

সামাজিক বিধি পরিবর্তনশীল

(২) বিভিন্ন সমাজের আইন-কানুন বিভিন্ন। আবার অনেক সময় সামাজিক বিধিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কোন সমাজ বহু বিবাহ সমর্থন করে। আবার কোন সমাজে বহু বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। সে কারণে এগুলিকে নৈতিক আদর্শরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। নৈতিক আদর্শ সর্বপ্রকার বিরোধমুক্ত।

সামাজিক বিধি পরস্পরবিরোধী

(৩) সামাজিক বিধিগুলিকেই নৈতিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন সামাজিক বিধিকে আমরা নৈতিকতার দিক থেকে দোষদুষ্ট মনে করি। সুতরাং স্পষ্টই উপলব্ধি করা যাচ্ছে, অন্য কোন নৈতিক আদর্শের সহায়তায় সামাজিক বিধিগুলির নৈতিক গুণাগুণ বিচার করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সামাজিক বিধিগুলিকে নৈতিক আদর্শরূপে গণ্য করা যেতে পারে না।

সামাজিক বিধিকে নৈতিক সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়

(৪) সামাজিক বিধি-নিষেধ কেবলমাত্র আমাদের বাহ্য আচরণই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আমাদের মনের অভিপ্রায় সামাজিক বিধিনিষেধের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। ব্যক্তির অভিপ্রায়ই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু, তার বাহ্য আচরণ নয়। এমন কি ব্যক্তির সব প্রকাশ্য আচরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়াও সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়।

মনের অভিপ্রায় সামাজিক বিধি-নিষেধের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়

(৫) সামাজিক বিধি-নিষেধের ভয়ে যদি কোন কাজ করা হয়, সে কাজের নৈতিক গুণাগুণ বিচারের কোন প্রশ্ন আসে না। পুরস্কারের লোভে বা শাস্তির ভয়ে যে কাজ করা হয় তাতে বুদ্ধিমত্তার বা বিজ্ঞতার পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু সে কাজের কোন নৈতিক উৎকর্ষ থাকে না।

বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক উৎকর্ষ এক ও অভিন্ন নয়

(খ) রাষ্ট্রের বিধিই হল নৈতিক আদর্শ (Political Law as Standard) : হবস্, বেইন প্রমুখ ব্যক্তিদের মতে রাষ্ট্রের বিধিই হল নৈতিক আদর্শ। রাষ্ট্রের বিধিই ন্যায়-অন্যায় বিচারের মাপকাঠি। রাষ্ট্রের বিধি মেনে চলাই নৈতিকতা। রাষ্ট্র কতকগুলি আইন প্রবর্তন করে সেগুলিকে জনসাধারণের ওপর প্রয়োগ করে এবং শাস্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে সেগুলি মেনে চলার জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করে। সুতরাং কোন কাজ যথোচিত কি অনুচিত; নীতিসঙ্গত কি নীতিবিরুদ্ধ তা বিচার করতে হলে রাষ্ট্র-প্রবর্তিত আইনের সঙ্গে তুলনা করে তার সঙ্গতি আছে কিনা বিচার করা প্রয়োজন। হবস্-এর ভাষায়, "সব রকম ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের জন্য অসামরিক আইনই আবেদনের সর্বোচ্চ বিচারালয়" ("The Civil law alone is the supreme court of appeal in all cases of right and wrong.")।

রাষ্ট্রের বিধিই নৈতিক নিয়ম

সমালোচনা : (১) এই মতবাদ স্বার্থকেই নৈতিকতা এবং বুদ্ধিমত্তা বা বিজ্ঞতাকে সততা বলে ভুল করে। পুরস্কারের লোভে বা শাস্তির ভয়ে যদি কোন কাজ করা হয়, তাহলে সে কাজের নৈতিক উৎকর্ষ থাকে না।

(২) রাষ্ট্রের বিধি হল কোন উদ্দেশ্যলাভের উপায় স্বরূপ—সে উদ্দেশ্য হল জনকল্যাণ। সুতরাং রাষ্ট্রীয় বিধিকে পরম নৈতিক আদর্শরূপে গণ্য করা যেতে পারে না।

(৩) যেহেতু রাষ্ট্রের আইন-কানুনকে নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেহেতু রাষ্ট্রের বিধিকে পরম নৈতিক আদর্শরূপে গণ্য করা যেতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-প্রবর্তিত কোন কোন আইনকে নীতিবিরুদ্ধ মনে করে তার সমালোচনা করা হয়।

রাষ্ট্রের বিধিকেও নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়

(৪) আমাদের বাহ্য আচরণ রাষ্ট্রীয় বিধির শাসনাধীন, রাষ্ট্রের পক্ষে আমাদের মনের অভিপ্রায় জানা সম্ভব নয় এবং অভিপ্রায়ই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু, মানুষের বাহ্য আচরণ নয়। তাছাড়া রাষ্ট্রের পক্ষেও আমাদের সব রকম বাহ্য আচরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রের পক্ষে আমাদের মনের অভিপ্রায় জানা সম্ভব নয়

(৫) রাষ্ট্রের আইন-কানুন পরিবর্তনশীল। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তিত হয় এবং একই দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রবর্তিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় বিধি কখনও নৈতিক বিধির স্থান অধিকার করতে পারে না, যেহেতু নৈতিক বিধি শর্তহীন, অপরিবর্তনীয় এবং সঙ্গতিপূর্ণ।

রাষ্ট্রীয় আইন কানুন পরিবর্তনশীল

(৬) বাইরের কর্তৃপক্ষ যদি কোন নিয়ম আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয় এবং সেই নিয়মের দ্বারা যদি আমরা পরিচালিত হই তাহলে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং স্বয়ংক্রিয়তাকে অস্বীকার করা হয়। রাজনৈতিক নিয়ম তখনই নৈতিক নিয়মের স্থান অধিকার করতে পারে যদি সে নিয়ম আমাদের বিবেকের সমর্থন লাভ করে।

রাষ্ট্রীয় বিধিবাদ আমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও কার্যের স্বতঃস্ফূর্ততাকে স্বীকার করে না

(গ) ভগবৎ-বিধিই নৈতিক আদর্শ (Divine Law as Standard) : ডেকার্টস, লক এবং প্যালে (*Paley*) প্রমুখ দার্শনিকগণ মনে করেন যে, ঈশ্বরের বিধান বা ভগবৎ-বিধিই নৈতিক বিধি। ঈশ্বর মানুষের জন্য কতকগুলি বিধিনিষেধ প্রবর্তন করেছেন, এগুলিই নৈতিক নিয়ম। এই সব বিধি-নিষেধ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষদের কাছে এইসব ঈশ্বরের বাণী প্রকাশিত হয় এবং তাঁরা এগুলি ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সাধারণ মানুষ ধর্মশাস্ত্রের মারফত এই সব বিধি-নিষেধগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। সাধারণ মানুষ পুণ্যের লোভে এবং পাপের ভয়ে এই সব বিধি-নিষেধ মেনে চলে। এই মতবাদ অনুসারে কোন কাজ যথোচিত, যেহেতু সে কাজ ঈশ্বরের বিধান। উচিত ও অনুচিত বলেই যে সেটি ঈশ্বরের বিধান তা নয়, ঈশ্বরের বিধান বলেই কাজটি যথোচিত। ঈশ্বর প্রয়োজন অনুযায়ী উচিতকে অনুচিত এবং অনুচিতকে যথোচিতে পরিবর্তিত করতে পারেন।

ভগবৎ-বিধিই নৈতিক বিধি

সমালোচনা : (১) এই মতবাদও স্বার্থকেই নৈতিকতা এবং বুদ্ধিমত্তা বা বিজ্ঞতাকে সততা বলে ভুল করে। পুরস্কারের লোভে বা শাস্তির ভয়ে যদি কাজ করা হয় তাহলে সে কাজের কোন নৈতিক উৎকর্ষ থাকে না। মানুষ যদি পুণ্যের লোভে বা শাস্তির ভয়ে ঈশ্বরের বিধান মেনে চলে তাহলে সেক্ষেত্রে সততার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

স্বার্থকেই নৈতিকতা এবং বিজ্ঞতাকে সততা মনে করা উচিত নয়

(২) এই মতবাদ অনুযায়ী নৈতিকতা ঈশ্বরের খেয়াল-খুশীর ওপর নির্ভর। কেননা, ঈশ্বর খেয়াল-খুশীমত ভালকে মন্দ বা মন্দকে ভাল করতে পারেন না। এই মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বরের কোন নৈতিক চরিত্র আছে বলে স্বীকার করা যেতে পারে না, ঈশ্বর যেন সব নৈতিকতার উর্ধ্বে। কিন্তু এ মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা, আমরা ধারণা করি ঈশ্বরের মধ্যে নৈতিকতা পূর্ণ রূপলাভ করেছে। যা যথোচিত তা ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা অনুচিত তা ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হলেও তিনি ন্যায়কে অন্যায় বা অন্যায়কে ন্যায় করতে পারেন না। ঈশ্বর এমন কিছু করতে পারেন না যা তাঁর স্বভাবের বা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ঈশ্বরের বিধান বলে যে কোন কাজ যথোচিত তা নয়, যা যথোচিত তা ঈশ্বরের বিধান। ন্যায়-অন্যায়ের যে তারতম্য তা ঈশ্বরের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু অপরিবর্তনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী।

নৈতিকতা ঈশ্বরের খেয়াল-খুশীর ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না

(৩) ঈশ্বরের বিধি-নিষেধের সততা যাচাই করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোন্‌টি ঈশ্বরের বিধান এবং কোন্‌টি ঈশ্বরের বিধান নয় কিভাবে জানা সম্ভব? বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রে ঈশ্বরের যে বিধি-নিষেধের উল্লেখ আছে সে সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধিতাও লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু ঈশ্বরের বিধি-নিষেধ সুস্পষ্টভাবে জানা সম্ভব নয়, সেহেতু সেগুলি কিভাবে পালন করা সম্ভব?

ঈশ্বরের বিধি-নিষেধ জানা সম্ভব নয়

(৪) বহির্বিধিবাদের বিরুদ্ধে যেসব সমালোচনা করা হয়েছে, সেগুলি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

সুখবাদ

(Hedonism)

১। ভূমিকা (Introduction) :

বিধিবাদ অনুযায়ী বিধি বা নিয়মই পরম নৈতিক আদর্শ। কিন্তু বিধিবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু বিধি বা নিয়মকে জীবনের পরম আদর্শরূপে গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য জীবনে চলার পথে নিয়ম এবং নিয়মানুবর্তিতাকেও বাদ দেওয়া যায় না। সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপনের জন্য এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিধি বা নিয়মের একান্ত প্রয়োজন। সমাজের, রাষ্ট্রের বা ঈশ্বরের বিধান ইত্যাদি সকল বিধানই জীবনকে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন। সাধারণতঃ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিধি বা নিয়ম আমাদের আচরণের আদর্শ এবং সভ্য সমাজে আমাদের কাজ নিয়মানুযায়ী হল কিনা তাই স্থির করে আমাদের আচরণ যথোচিত কি অনুচিত তা বিচার করা হয়। কিন্তু বিধি বা নিয়মকে পরম আদর্শ (Ultimate Standard) রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না। বিধিবাদ আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করে কিন্তু এ সব কর্তব্যকর্মের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কিছু বলে না।

বিধিকে জীবনের পরম আদর্শরূপে গ্রহণ করা যায় না

তাছাড়া, যে-কোন বিধি বা নিয়মকেও অনেক সময় নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নৈতিক প্রয়োজনে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিধির প্রতিরোধ করা আমাদের কর্তব্য হয়। কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়া নিয়ম হয় অর্থহীন এবং খেয়াল-খুশীর ব্যাপার। প্রতিটি ঐচ্ছিক ক্রিয়া আমাদের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধন করে। এ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের স্তরভেদ আছে। শেষ স্তরে বা ধাপে আছে পরম উদ্দেশ্য বা সর্বোচ্চ লক্ষ্য। যখন কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াকেই তার লক্ষ্য বলে মনে করে, তখন দেখা যায় যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যদিও তার লক্ষ্য, আসলে তা উচ্চতর কোন লক্ষ্য লাভ করার উপায়মাত্র; কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করাই হয়ত সেই উচ্চতর লক্ষ্য। আবার এই দ্বিতীয় লক্ষ্যও অন্য কোন উচ্চতর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়মাত্র ; হয়ত সেই উচ্চতর লক্ষ্য হল অর্থ, স্বাস্থ্য, খ্যাতি। আবার অর্থ, স্বাস্থ্য ও খ্যাতি হল অন্য কোন লক্ষ্যের উপায়মাত্র। এভাবে আমরা সর্বোচ্চ লক্ষ্যে আসি, যেটা হল জীবনের পূর্ণতা। সুতরাং, এ জীবনের পূর্ণতাই (Perfection) হল সর্বোচ্চ লক্ষ্য—জীবনের পরমার্থ বা পরম কল্যাণ

জীবনের পূর্ণতাই হল সর্বোচ্চ লক্ষ্য

(Supreme Good)। অন্যান্য সব কিছুই এই পরম লক্ষ্যের উপায়মাত্র। যে কাজ জীবনের এই পরম লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, অর্থাৎ জীবনের এই পরম কল্যাণের আদর্শ অনুযায়ী যে কাজ সম্পন্ন করা হয়, সেকাজ যথোচিত এবং যে কাজ এই পরম লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন, অর্থাৎ পরম কল্যাণের আদর্শানুযায়ী যে কাজ করা হয় না সে কাজ অনুচিত। জীবনের এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য বা পরম কল্যাণের আদর্শটির স্বরূপ নির্ণয় করা নীতিবিজ্ঞানের একটি প্রধান কাজ।

আমরা এখন মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মতবাদ আছে একে একে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করব:

২। সুখবাদ (Hedonism):

সুখবাদীদের মতে সুখই (hedone or pleasure) জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু, জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। সুখই জীবনের পরম কল্যাণ বা পরমার্থ (Summum Bonum of the Highest Good)। যে কাজ সুখ দেয় বা দুঃখ দূর করে সে কাজ যথোচিত বা ভাল; যে কাজ সুখে বাধা দেয় বা দুঃখ সৃষ্টি করে সে কাজ অনুচিত বা মন্দ। মানুষের একমাত্র কর্তব্য সুখ অনুসরণ করা বা দুঃখ পরিহার করা। দুটি ধারণা এ সুখবাদের ভিত্তি—প্রথমতঃ, মানুষের মন স্বভাবতঃ এবং প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়াসক্ত—ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি এর প্রধান কামনা। আমরা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব, কিন্তু বিচারশক্তি আমাদের প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়। মানুষের বুদ্ধি বা বিচারশক্তি ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস মাত্র এবং কিভাবে ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করা যায়, বুদ্ধি বা বিচারশক্তি কেবলমাত্র তার উপায় নির্দেশ করে। আমাদের মধ্যে যে দুটি 'আমি' আছে: একটি হল 'ইন্দ্রিয়প্রধান আমি' আর একটি হল 'বুদ্ধিপ্রধান আমি'। 'ইন্দ্রিয়প্রধান আমি'কে পরিতৃপ্ত করাই সুখবাদীদের মতে জীবনের পরমকল্যাণ বা সর্বোচ্চ লক্ষ্য। আমাদের আবেগকে পরিতৃপ্ত করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। একমাত্র সুখই নিজ গুণে ভাল এবং সুখ লাভের আশায়ই আমরা কাজ করি।

মানুষ স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়াসক্ত

সুখবাদীর মতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল সংবেদন ও অনুভূতির পারম্পর্যই হল মন এবং বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পেছনে কোন অপরিবর্তিত আত্মা বা ঐক্যসূত্র (principle of unity) নেই। এই পরিবর্তনশীল আবেগ ও অনুভূতির পরিতৃপ্তিসাধন করাই মানুষের জীবনের সাক্ষাৎ ও শেষ লক্ষ্য।

মানুষ স্বভাবতঃ সুখ কামনা করে

সুখবাদের দ্বিতীয় ধারণা (যার ওপরে সুখবাদের ভিত্তি) হল মানুষ স্বভাবতঃ সুখ কামনা করে এবং দুঃখকে পরিহার করতে চায়। কাজটির ফলাফল সুখজনক কি দুঃখজনক তার দ্বারাই কাজের নৈতিক মূল্য নির্ধারিত হয়। সুখই মানুষের স্বাভাবিক কামনার বস্তু।

৩। সুখবাদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Hedonistic Theories) ঃ

প্রথমতঃ, সুখবাদকে দুশ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে ; যথা—(১) মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ (Psychological Hedonism) এবং (২) নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ (Ethical Hedonism)। মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী সুখই সকল মানুষের স্বাভাবিক এবং সাধারণ কাম্যবস্তু। আমরা সকল সময়ই সুখ চাই এবং দুঃখকে পরিহার করি। নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী সুখই কামনার বস্তু হওয়া উচিত। আমাদের সকল সময় সুখ কামনা করা উচিত।

সুখবাদ মনস্তত্ত্ব-সম্মত ও নীতি-বিজ্ঞানসম্মত

সুতরাং, প্রথম মতবাদ অনুসারে আমরা স্বভাবতঃ সুখ কামনা করি, দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে আমাদের সকল সময় সুখ কামনা করা উচিত। প্রথমটি কেবলমাত্র যা বাস্তবে ঘটে তারই কথা বলে। দ্বিতীয়টি আমাদের কাম্যবস্তু বা আদর্শের কথা বলে। যদিও নীতিবিজ্ঞানে নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদই আমাদের আলোচ্য বিষয় তবু আমাদের মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদও আলোচনা করতে হবে ; যেহেতু কোন কোন সুখবাদীর মতে মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ হচ্ছে নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের ভিত্তি।

নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদকে আবার দুশ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ যথা, (ক) আত্ম-সুখবাদ বা ব্যক্তিসুখবাদ (Egoistic or Individualistic Hedonism) এবং (খ) পরসুখবাদ বা সর্বসুখবাদ (Altruistic or Universalistic Hedonism)।

আত্মসুখবাদ অনুসারে মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বা একমাত্র কাম্যবস্তু তার নিজের সুখ। পরসুখবাদ অনুযায়ী পরের সুখ বা সকলের সুখ অর্থাৎ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই (The greatest happiness of the greatest number of people) মানুষের কাম্য বা সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। এই আত্মসুখবাদকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয় ; যথা—(i) স্থূল বা অসংযত (Gross or Sensualistic) এবং (ii) সূক্ষ্ম বা সংযত (Refined or Rational)। যদি সুখ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নামান্তর হয় তাহলে তা হবে স্থূল বা অসংযত সুখ এবং সুখভোগ যদি বুদ্ধির বা চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে তা হবে সূক্ষ্ম বা সংযত সুখ।

স্থূল বা অসংযত ও সূক্ষ্ম বা সংযত সুখবাদ

পরসুখবাদ বা সর্বসুখবাদকে আবার দুশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ; যথা—(i) বিবর্তনবাদসম্মত (Evolutional) এবং (ii) বিবর্তনবাদ-নিরপেক্ষ (Non-evolutional)। পরসুখবাদের ভিত্তি যদি হয় বিবর্তনবাদ তবে তা হবে বিবর্তনবাদসম্মত এবং যদি তা না হয় তবে তাকে বলা হবে বিবর্তনবাদ-নিরপেক্ষ। পর পৃষ্ঠায় এই শ্রেণীবিভাগকে ছকের সাহায্যে দেখান হলো ঃ

বিবর্তনবাদসম্মত ও বিবর্তনবাদ-নিরপেক্ষ সুখবাদ
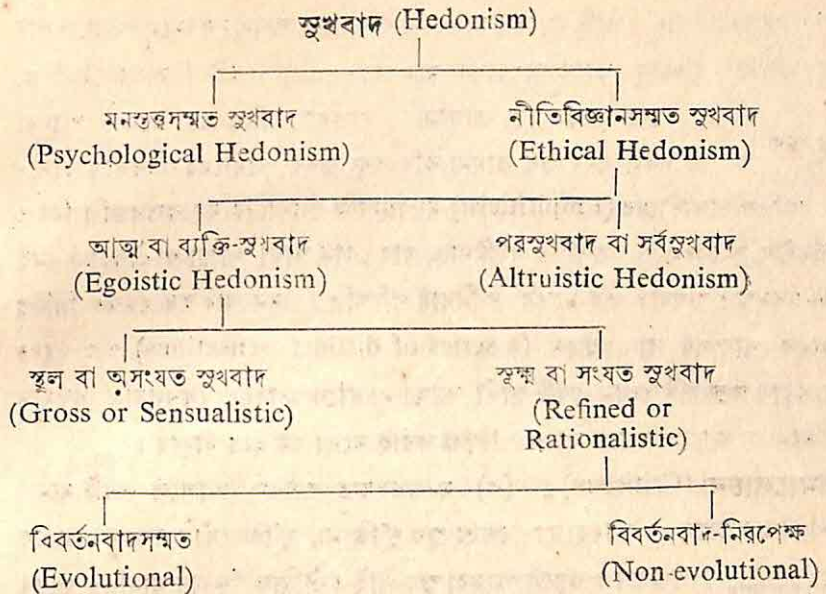
৪। মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ (Psychological Hedonism):

মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী সুখই হল মানুষের একমাত্র স্বাভাবিক কাম্যবস্তু। সুখের কামনাই মানুষের কাজের একমাত্র প্রেরণা। প্রতিটি ব্যক্তি সুখদায়ক বস্তু কামনা করে। কোন বস্তুকে তার নিজের জন্য কামনা করা হয় না; অর্থাৎ বস্তু থেকে যে সুখ পাওয়া যায় সেই সুখের জন্যই বস্তুকে কামনা করা হয়। যেমন, আমরা পুস্তকের জন্য পুস্তক কামনা করি না, কোন পুস্তক পাঠ করে যে সুখ আমরা তা থেকে পেতে পারি, সেই সুখের জন্য পুস্তক কামনা করি। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। এই হিসেবে জীবন আর কিছুই নয়, অবিরত সুখ অনুসরণ করে চলা। সুখের এবং দুঃখের অনুভূতিই আমাদের সকল কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। প্রাচীনকালে গ্রীসদেশের *Cyrenaics* এবং বর্তমান যুগে হব্‌স, বেন্থাম, মিল প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ এ মতবাদ সমর্থন করেন। বেন্থাম-এর মতে প্রকৃতি মানুষকে সুখ এবং দুঃখ—এই দুই সম্রাটের অধীনস্থ করে রেখেছে এবং মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য সুখ খোঁজা এবং দুঃখকে এড়িয়ে যাওয়া। তিনি আরও বলেন যে, প্রকৃতি মানুষকে যে দুই প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছে—তারা হল সুখ এবং দুঃখ। আমাদের কি করা উচিত এবং আমরা কি করব একমাত্র তারাই নির্ণয় করে দেয়। কাজেই বেন্থাম-এর মতে সুখ এবং দুঃখ হল একমাত্র বস্তু যাদের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা কাজ করি।

মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী মানুষ স্বভাবতঃ সুখ কামনা করে

মিল বলেন, কোন একটি বস্তুকে চাওয়া এবং তাকে সুখদায়ক মনে করা, কোন বস্তুকে অপছন্দ করা এবং তাকে দুঃখদায়ক মনে করা—এরা একই বিষয়ের দুটি দিক, এদের পৃথক করা যায় না। সুতরাং, মিল-এর মতেও আমরা সকল সময় সুখ কামনা করি এবং সুখই আমাদের একমাত্র কাম্য-বস্তু। অভিজ্ঞতাবাদীদের (Empiriticist) মতানুসারে আমাদের মন কতকগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল সংবেদন ও অনুভূতির সমষ্টিমাত্র, যার কোন স্থায়ী আত্মা বা ঐক্যসূত্র নেই এবং মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ এই মতের অনিবার্য পরিণতি। মন যদি হয় কেবল বিভিন্ন সংবেদনের পারম্পর্য বা অনুক্রম (a series of distinct sensations) এবং এদের সংযুক্ত করার জন্য যদি কোন একটি স্থায়ী আত্মা না থাকে তাহলে কেবলমাত্র বর্তমান মুহূর্তে মনে যে আবেগ জাগে তাকে পরিতৃপ্ত করাই মনের ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

মিল-এর মন্তব্য

সমালোচনা (Criticism) : (ক) মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ আসলে একটি মনোবিজ্ঞান-বিরুদ্ধ মতবাদ। আমরা সাধারণতঃ সুখ খুঁজি না, খুঁজি কোন বস্তুকে এবং সে বস্তু লাভ করলে আমরা সুখ পাই। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক স্তরের বিভিন্ন ধাপগুলি হল—প্রথমে অভাববোধ, তারপর বস্তুর জন্য কামনা, তারপর বস্তুটি লাভ এবং তারপর মনে সন্তোষের ভাব বা সুখের অনুভূতি। ক্ষুধা পেলে আমরা সুখ চাই না, চাই খাবার, খাবার খেলে তবে ক্ষুধা মেটে এবং তখন আপনা থেকেই মনে সুখ আসে। সুতরাং মনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হল কাম্যবস্তুটি, সুখ নয়। অবশ্য সুখ কোন কোন ক্ষেত্রে কাম্যবস্তু হতে পারে; অর্থাৎ সুখের জন্যই সুখকে মাঝে মাঝে কামনা করা হয়। যেমন, মাতাল সুখলাভের জন্য তিক্ত মদ পান করে।

মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ মনোবিজ্ঞানবিরুদ্ধ মতবাদ

সুখ কোন কোন ক্ষেত্রে কাম্যবস্তু হয়, সর্বত্র নয়

(খ) ডক্টর সিজউইক সুখবাদের একটা প্রধান ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, সুখের প্রতি আকর্ষণ খুব বেশী প্রবল হলে সুখ পাওয়া যায় না। সুখের দিকে আমরা যত বেশী মনোযোগ দেই ততই সুখ আমরা হারাই। যেমন, আমি ভাল ফুটবল খেলা দেখলে সুখ পাই। এখন কোন খেলা দেখতে দেখতে যদি খেলার দিক থেকে আমার মন আমার সুখভোগের দিকে চলে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখ চলে যায়; এজন্য বলা হয়েছে যে, 'সুখ পাবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সুখকে ভুলে যাওয়া' (The best way to get pleasure is to forget it.)। একেই বলা হয় 'সুখবাদের বিরোধাভাস বা হেঁয়ালি' (Paradox of Hedonism)।

সুখের বিরোধাভাস বা হেঁয়ালি

র‍্যাশডল[1] এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সুখবাদের এই যে বিরোধাভাস তার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে বটে, তবে অভিযোগটি অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। তাঁর মতে সব সময় আগের থেকে সুখের হিসেব করলে সুখকে হারাতে হবে বা সুখ কমে যাবে তা ঠিক নয়, সময় সময় এতে সুখ বেড়ে যায়। আগে থেকে নানাভাবে যদি চিন্তা করা যায় কিভাবে আমি একটা ছুটির দিন উপভোগ করব, তাহলে এই আগের থেকে ভাবার জন্যই ছুটির দিনটিকে উপভোগ করা যাবে না, একথা ঠিক নয়।

র‍্যাশডল-এর মন্তব্য

(গ) 'সুখ' কথটি দ্ব্যর্থবোধক ; সুখ বলতে আমরা মনের আনন্দানুভূতিকে বুঝতে পারি বা যে বস্তু হতে সে আনন্দানুভূতি পাই সে বস্তুটিকে বুঝতে পারি। এই শেষোক্ত অর্থেই আমরা 'একটি সুখ' বা 'সুখগুলি'—এ জাতীয় কথা ব্যবহার করে থাকি। যখন বলি—'মানুষ সুখের পেছনে দৌড়ায়,' তখন সুখ বলতে বুঝি বস্তু, যা সুখ দেয় (the object that gives pleasure)। আবার যখন বলি, 'সুন্দর দৃশ্যটি দেখে আমার মনে সুখ হয়েছিল,' তখন সুখ বলতে বুঝি সুখের অনুভূতি (feeling of pleasure)। কাজেই যখন একথা বলা হয় যে, আমরা সুখ কামনা করি তখন যদি সুখদায়ক বস্তুকে বুঝি তবে আপত্তিকর কিছু নেই ; কিন্তু যদি আনন্দানুভূতিকে বুঝি তবে কদাচিৎ আমরা ঐ সুখ খুঁজি।

'সুখ' কথাটি দ্ব্যর্থবোধক

(ঘ) ইংরেজীতে একটি কথা আছে, 'গাড়ীকে ঘোড়ার সামনে জুড়ে দেওয়া' ; মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ তা-ই করে।[2] 'র‍্যাশডল' বলেন, কোন বস্তু কামনা করার অর্থ ঐ কামনার পরিতৃপ্তি হলে সুখ অনিবার্যভাবে আসবে। যে কোন কামনা তৃপ্ত হলেই সুখ আসে। কিন্তু কোন বস্তু সুখদায় বলেই সেটাকে চাই, একথা বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

সুখবাদ গাড়ীকে ঘোড়ার সামনে জুড়ে দেয়

(ঙ) আগে অভাববোধ, তবে পরিতৃপ্তি। বাটলার (*Butler*) বলেছেন, পূর্ব থেকে মনে বস্তুর কামনা না জাগলে অনেক ধরনের সুখের কোন অস্তিত্বই থাকত না। পরের উপকার করার ইচ্ছা যদি মনে না জাগে ; তাহলে পরোপকারের মধ্যে যে সুখজনক অনুভূতি আছে তাকে লাভ করা যায় না। পরোপকারীকে প্রথমে সুখের কথা না ভেবে সুখ ভিন্ন অন্য কিছু অর্থাৎ পরের উপকারের কথা ভাবতে হবে। সুতরাং, সব কামনাই যে সুখের কামনা নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বস্তুর কামনা ছাড়া অনেক সুখের কোন অস্তিত্বই থাকে না

1. Rashdall : Theory of Good and Evil. Vol. 1. Pages 37-38.
2. Rashall : Theory of Good and Evil, Vol,.Page 15.

(চ) মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদকে মেনে নেওয়ার আর একটি অসুবিধা হল এই যে, মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ সত্য হলে নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকে না। যদি আমরা স্বাভাবিকভাবেই সুখ কামনা করি তাহলে আমাদের সুখ কামনা করা উচিত একথা বলা অর্থহীন। ম্যাকেঞ্জির মতেও নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের সঙ্গে মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদের কোন সঙ্গতি নেই। তিনি বলেন, "যদি আমরা সকল সময় আমাদের সুখ অনুসন্ধান করেই থাকি, তাহলে 'আমাদের সুখ অনুসন্ধান করা উচিত' একথা বলার কোন অর্থ হয় না।"[1] মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ এবং নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদকে অবশ্য এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, মনোবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী আমরা সাধারণতঃ আমাদের সুখ অনুসন্ধান করি এবং নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী আমাদের নিজের বা অপরের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সুখ অনুসন্ধান করা উচিত।

নীতিবিজ্ঞনসম্মত সুখবাদের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব-সম্মত সুখবাদের কোন সঙ্গতি নেই

(ছ) মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ এবং নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের মধ্যে কোন অনিবার্য যোগাযোগ নেই। তবু এ দুই মতবাদকে কেন্দ্র করে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ '*desirable*'—এই কথাটির অর্থের মধ্যে নিহিত। মিল 'desirable' শব্দটির অর্থ করেছেন যা সাধারণতঃ কামনা করা হয়, কিন্তু 'desirable' কথাটির প্রকৃত অর্থ যা কামনার যোগ্য, যা কামনা করা উচিত।

'Desirable' কথাটির অর্থ নিয়ে মিল-এর ভ্রান্তি

৫। নীতিবিজ্ঞান-সম্মত সুখবাদ (Ethical Hedonism):

নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী সুখই প্রতিটি মানুষের কাম্যবস্তু হওয়া উচিত —প্রতিটি মানুষের সুখ অন্বেষণ করা উচিত। মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী মানুষ সাধারণতঃ সুখ চায়, নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী মানুষের সুখ চাওয়া উচিত। নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদকে দুশ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা—(১) আত্মসুখবাদ (Egoistic Hedonism) এবং (২) পরসুখবাদ (Altruistic Hedonism)। আত্মসুখবাদ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের নিজের জন্য সর্বাধিক সুখ অন্বেষণ করা উচিত। ব্যক্তির সুখই নৈতিক আদর্শ বা নৈতিক বিচারের মাপকাঠি। পরসুখবাদ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের কাম্য হওয়া উচিত সর্বসাধারণের সুখ, অর্থাৎ সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ বা জগতের সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক ব্যক্তির মঙ্গল।

নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের শ্রেণীবিভাগ

1. Mackenzie : A Manual of Ethics ; Page 42.

সিজউইক আত্মসুখবাদকে দু-শ্রেণীতে ভাগ করেছেন; যথা—স্থূল বা অসংযত আত্মসুখবাদ (Gross Egoistic Hedonism) এবং সূক্ষ্ম বা সংযত আত্মসুখবাদ (Refined Egoistic Hedonism)।

আত্মসুখবাদ (Egoistic Hedonism)ঃ আত্মসুখবাদ অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির নিজের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুখ খোঁজা উচিত। ব্যক্তির সর্বাধিক সুখলাভের পক্ষে যে কাজ সহায়ক সে কাজ ভাল এবং যে কাজ তার অন্তরায়স্বরূপ সে কাজ মন্দ। সুখের পরিমাণ নির্ধারিত হয় দুটি বিষয়ের দ্বারা—যথা, (১) সুখের তীব্রতা (Intensity) এবং (২) স্থিতিকাল (Duration)। একটি সুখ আর একটি সুখের তুলনায় অধিকতর তীব্র হতে পারে। যেমন, *Cyrenaics*-দের মতানুযায়ী দৈহিক সুখ মানসিক সুখের তুলনায় অধিকতর তীব্র। কোন সুখ অল্পকাল স্থায়ী হতে পারে, কোন সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে। যেমন, এক মিনিটে একটি সন্দেশ খাওয়া এবং এক ঘণ্টা ধরে একটি বড় ভোজ খাওয়া।

সুখের তীব্রতা এবং স্থিতিকাল

সময় সময় আত্মসুখবাদকে মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদের সঙ্গে এক করে দেখা হয়। আত্মসুখবাদ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের নিজের সর্বাধিক সুখ অন্বেষণ করা উচিত এবং মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ স্বভাবতঃ নিজের সুখ চায়। অর্থাৎ দুটো মতবাদেই একটা বিষয় প্রধান হয়ে দেখা যায়, তাহল 'যা কিছু নিজের জন্য'।

আত্মসুখবাদ এবং মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ

কিন্তু একথা যদি সত্য হয় যে, প্রতিটি ব্যক্তি স্বভাবতঃই নিজের সুখ কামনা করে তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্র কিভাবে গড়ে উঠল? সামাজিক অনুভূতি, পরের হিতেচ্ছা এগুলিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? মানুষ শুধু যদি নিজের কথা ভাবে, সে স্বভাবতঃ যদি হয় আত্মকেন্দ্রিক তাহলে সমাজ বা রাষ্ট্রে মানুষ নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে, নিজের ইচ্ছাকে অপরের ইচ্ছার অধীনস্থ করে অপরের সঙ্গে কাজে সহযোগিতা করে কেন? মানুষ পরের মঙ্গলের কথা ভাবে কেন, বা পরের মঙ্গলসাধন করার জন্য সে উৎসুক হয় কেন? হব্‌স্ এবং তাঁর সমর্থক এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন।

হব্‌স্-এর মতবাদ আধুনিক আত্মসুখবাদের দৃষ্টান্ত। তাঁর মতে প্রতিটি ব্যক্তি দুঃখ পরিহার করে নিজের সুখ কামনা করে। প্রতিটি ব্যক্তি চায় নিজেকে রক্ষা করতে ও নিরাপদ জীবন যাপন করতে। হবস্ এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ সমাজ এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ আদিমকালে 'প্রকৃতির রাজ্যে'-র অধিবাসী ছিল, যখন সমাজ বলে কিছু ছিল না। তখন মানুষের মধ্যে প্রায়ই খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, খুনোখুনী লেগেই থাকত। তখন মানুষ ছিল

আত্ম-কেন্দ্রিক, নিজের স্বার্থ এবং নিজের বেঁচে থাকাটাকেই সে বড় করে দেখত। মানুষের পরস্পরের মধ্যে কোন সহযোগিতা ছিল না। প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করত, তার নিজের কামনা মেটান ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। সে মনে করত যে কোন বস্তুতেই, এমনকি অপর ব্যক্তির ওপর তার অধিকার আছে। প্রকৃতির রাজ্যে এজন্য বিবাদ-বিসংবাদ অহরহ লেগেই থাকত। ধীরে ধীরে মানুষ উপলব্ধি করল যে, তার নিজের সুখ, নিরাপত্তা, আত্মরক্ষা প্রভৃতি সব কিছুই অপরের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করছে। তখন প্রতিটি ব্যক্তি কিছু কিছু স্বার্থ এবং অধিকার ত্যাগ করে অধিকতর মঙ্গললাভের আশায় সমাজ গঠনের জন্য একটি সামাজিক চুক্তিতে (Social Contract) অঙ্গীকারবদ্ধ হল এবং স্থির করল যে, কোন শাসনকর্তার হাতে তারা নিজেদের কিছু স্বাভাবিক অধিকার ছেড়ে দেবে এবং শাসনকর্তা সমাজ রক্ষার জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন করবেন সেগুলিকে মেনে নেবে। এভাবে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে এবং অপরের সহযোগিতায় নিজের কল্যাণ অধিকতরভাবে লাভ করতে পারবে, এই আশায় মানুষ নিজের ব্যক্তিগত অধিকার বিসর্জন দিয়ে সমাজ গঠন করল।

হব্‌স এর মতে সমাজের ভিত্তি হল আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব এবং আত্মানুরাগই সকল অনুভূতি ও ক্রিয়াকর্মের মূল উৎস। তাঁর মতে মানুষ পরের মঙ্গল করে, যেহেতু তার বিনিময়ে সে নিজের জন্য অধিকতর মঙ্গল প্রত্যাশা করে। হব্‌স-এর মতে দয়া হল নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে আনন্দজনক সচেতনতা, কৃতজ্ঞতাবোধ হল ভবিষ্যৎ উপকার লাভ করার চেতনা এবং বন্ধুত্ব হল সমাজের কাছ থেকে আমরা যে আনন্দ এবং উপকার লাভ করি সে সম্পর্কে চেতনা।

আত্মসুখবাদ দুরকমের; যথা—স্থূল বা অসংযত সুখবাদ (Gross Egoistic Hedonism) এবং সূক্ষ্ম সংযত সুখবাদ (Refined Egoistic Hedonism)।

(ক) স্থূল বা অসংযত আত্মসুখবাদ (Gross Egoistic Hedonism): Cyrene-র অধিবাসী গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টিপাস (*Aristippus*) এই মতবাদ প্রচার করে। Cyrene-র নামানুসারে এ মতবাদ *Cyrenaicism* নামে পরিচিত। অ্যারিস্টিপাস-এর মতানুসারে মানুষের নিজের সুখই তার জীবনের একমাত্র কাম্য। যে কোন উপায়ে সুখভোগ করাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর মতে বিভিন্ন ধরনের সুখের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই; তবে পরিমাণগত প্রভেদ আছে। সব সুখই সুখ—দৈহিক সুখও সুখ, মানসিক সুখও সুখ। তবে সুখের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য

অ্যারিস্টিপাস প্রচারিত মতবাদ Cyrenaicism নামে পরিচিত

বর্তমান, সে পার্থক্য হল **তীব্রতার** (Intensity) এবং **স্থিতিকালের** (Duration)। দেহের সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখ মানসিক সুখের তুলনায় অধিকতর কাম্য। কেননা, ইন্দ্রিয়-সুখের তুলনায় মানসিক সুখ নিতান্তই ক্ষীণ ও দুর্বল। ইন্দ্রিয়সুখের তীব্রতা এবং প্রখরতা মানসিক সুখের তুলনায় অধিক। সুখাদ্য ভোজনের যে আনন্দ তা হল দৈহিক সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখ; সৎগ্রন্থ বা সুসাহিত্য পাঠের যে আনন্দ তা হল মানসিক সুখ।

সাধারণতঃ আমরা মানসিক সুখকে উচ্চস্তরের সুখ বলে মনে করি। অ্যারিস্টিপাস তা স্বীকার করেন না। গুণগত বিচারে সব সুখই এক জাতীয়। অ্যারিস্টিপাস সুখ অর্থে বোঝেন প্রত্যক্ষভাবে আনন্দ উপভোগ; কেবলমাত্র দুঃখকে পরিহার করা নয়। তিনি ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকেই বেশী মূল্য দেন। ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে বর্তমানকে পরিত্যাগ করা মূর্খতার লক্ষণ, যেহেতু ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আবৃত এবং অনিশ্চিত। বর্তমানকে চূড়ান্তভাবে উপভোগ করা দরকার। উপভোগের জন্য বর্তমানে আমরা যে সব সুখ-সুবিধা পাই সেগুলির সদ্ব্যবহার করা উচিত। অতীত বিদায় নিয়েছে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কেবল বর্তমানই আমাদের হাতের মুঠোয়। সেই বর্তমানকে যতদূর পারা যায় কাজে লাগান যাক। "চল আমরা খাই-দাই, মজা করি; কারণ কালই হয়ত আমরা মারা যেতে পারি। তীব্র সুখ দিয়ে প্রতিটি মুহূর্তকে যেন আমরা ভরে তুলি, একটি মুহূর্তও যেন বৃথা কেটে না যায়"—এহল এই মতবাদের প্রধান কথা।

'ভারতের চার্বাক দর্শন' স্থূল বা অসংযত আত্ম-সুখবাদের প্রচারক। চার্বাকরা সুখবাদী; কেননা সুখই মানবজীবনের চরম কাম্যবস্তু। সুখ এবং অর্থই জীবনের চরম লক্ষ্য—একমাত্র কাম্যবস্তু। অবশ্য সুখ হল উদ্দেশ্য, অর্থ সুখলাভের উপায় মাত্র। তথাকথিত ধর্ম এবং মোক্ষ জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। চার্বাক মতে যে কাজে দুঃখের তুলনায় সুখ বেশী, সেকাজ ভাল, যে কাজে সুখের তুলনায় দুঃখ অধিক সে কাজ মন্দ। চার্বাক মতে এ জগতে অবিমিশ্র সুখভোগ করা সম্ভব নয় সত্য, কিন্তু জাগতিক সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশে আছে বলে সুখ অন্বেষণ থেকে বিরত হওয়া মূর্খতারই সামিল। চার্বাকরা বলেন, ধান ছাড়িয়ে চাল করতে হয় বলে কি ভাত না খেয়ে পারা যায়? কাঁটা ছাড়াতে হবে বলে কি মানুষ মাছ খাবে না? জাগতিক সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত থাকলেও সেই সুখ বর্জন করা মানুষের উচিত হবে না। প্রতিটি সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশে আছে বটে; কিন্তু সে কারণে সুখ অন্বেষণ থেকে বিরত হওয়া মূর্খতার সামিল। তাছাড়া চার্বাকরা বলেন যে, দুঃখ আছে বলেই সুখের এত মাধুর্য।

চার্বাক মতে ব্যক্তির নিজের সুখই তার জীবনের পরম কাম্য বস্তু। চার্বাকরা

বলেন, "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" অর্থাৎ যতদিন বাঁচ সুখেই বাঁচ ; ঋণ করেও ঘি খাও। মানুষের উচিত ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বর্তমান জীবনকে উপভোগ করা। চার্বাকরা স্থূল বা অসংযত আত্মসুখবাদের প্রচারক। চার্বাকরা মানসিক সুখের তুলনায় ইন্দ্রিয় সুখের ওপর অত্যধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। যথাসম্ভব দুঃখ পরিহার করে সর্বাধিক পরিমাণ ইন্দ্রিয় সুখ লাভ করাই মানব জীবনের লক্ষ্য। চার্বাক মতে ইন্দ্রিয় সুখই মানুষের পরম পুরুষার্থ। চরম ইন্দ্রিয় সুখই মানুষের জীবনে পরম কল্যাণ ; স্থায়ী আত্মা বলে কিছু নেই। পাপ পুণ্য নেই, স্বর্গ-মর্ত নেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যে কোন ভাবেই হোক না কেন ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিতৃপ্ত করা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সুখভোগ করা।

ভারতীয় স্থূল আত্ম-সুখবাদ

তবে এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সব চার্বাকই স্থূল ইন্দ্রিয় সুখভোগ সমর্থন করেননি। ধূর্ত চার্বাকরাই স্থূল বা অসংযত আত্ম-সুখবাদের সমর্থক কিন্তু সুশিক্ষিত চার্বাকরা স্থূল ইন্দ্রিয় সুখের তুলনায় উচ্চস্তরের সুখের কথা বলেছেন।

বর্তমান যুগে ম্যাণ্ডেভিল (*Mandeville*) এবং হেলভেটিয়াস্ (*Helvetius*) এই স্থূল বা অসংযত আত্ম-সুখবাদ সমর্থন করেছেন। ম্যাণ্ডেভিল-এর মতে মানুষের সবকিছু নিজেকে কেন্দ্র করে এবং নিজের জন্যই মানুষ অপরকে ভালবাসে বা ঘৃণা করে। আত্ম-অনুরাগই জীবনের একমাত্র ধর্ম এবং সে কারণেই স্বার্থপরতা, বিলাসিতা, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়ভোগ, সবকিছুই সমর্থনযোগ্য। হেল-ভেটিয়াস্-ও বলেন যে, নিজেকে কেন্দ্র করেই সবকিছু, নিজের স্বার্থকে ঘিরেই ভালবাসা, বন্ধুত্ব, তা না হলে এ সবের কোন মূল্য নেই। দৈহিক বা ইন্দ্রিয় সুখই সুখ, অন্য কোন প্রকার সুখের সঙ্গে মানুষের পরিচয় নেই। সুতরাং ইন্দ্রিয় সুখই মানুষের একমাত্র কাম্যবস্তু।

ম্যাণ্ডেভিল এবং হেলভেটিয়াস-এর মতবাদ

(খ) সূক্ষ্ম বা সংযত আত্মসুখবাদ (Refined Egoism): এপিকিউরাস্ (*Epicurus*) এই মতবাদ প্রচার করেছেন এবং তাঁর নামানুসারে এই মতবাদ *Epicureanism* নামে পরিচিত। এপিকিউরাস্-এর মতে নৈতিক জীবনে বুদ্ধিবৃত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। জীবনকে পরিচালিত করার জন্য বুদ্ধি অপরিহার্য। বুদ্ধিই প্রকৃত সুখলাভের পথ নির্দেশ করে দেয়। মানুষের লক্ষ্য হল সুখ। কিন্তু বুদ্ধির সহায়তা ছাড়া এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অন্ধ আবেগ বা অনুভূতি এই পথ প্রদর্শকের কাজ করতে পারে না। বুদ্ধির সাহায্যেই জীবনে পরম সুখলাভ করা সম্ভব।

এপিকিউরস্ সুখকে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছেন। সুখ বলতে তিনি বোঝেন দৈহিক দুঃখ ও মানসিক অশান্তির অভাব। তাঁর মতে সুখ হল এমন একটা

মানসিক অবস্থা যা আনন্দ ও দুঃখ উভয়ের প্রতি সমানভাবে উদাসীন, এমন একটা স্থিরতা যা ধনদৌলত, ঐশ্বর্য নষ্ট করতে পারে না। জীবনের লক্ষ্য হল ঐ উদাসীন মনোভাব, ভোগের জন্য তীব্র অনুভূতি নয়, বরং অনুভূতির বিরতি। সুতরাং ভোগের বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মধ্যে সুখ নেই। সুখ হল দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ এবং নির্লিপ্ত মানসিক মনোভাব।

মিল-এর মত এপিকিউরাস সুখের গুণগত পার্থক্য স্পষ্ট স্বীকার করেননি, তবে সুখের স্তরভেদ মেনে নিয়েছেন। শারীরিক সুখ এবং মানসিক সুখ এক স্তরের সুখ নয়। শারীরিক সুখ নিম্নস্তরের, মানসিক সুখ উচ্চস্তরের। শারীরিক সুখের তুলনায় মানসিক সুখই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। কারণ মানসিক সুখ হল স্থির, স্থায়ী এবং বিশুদ্ধ।

এপিকিউরাস্ সুখের গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন

শারীরিক সুখ মানসিক সুখের তুলনায় তীব্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখজনক। এপিকিউরাস্ Cyrenaic-দের মতবাদের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে জীবনের কাম্য সুখ হলেও সে সুখ অমিতাচারী বা কামুকের সুখ নয়। শুধু ক্রমাগত আহার-বিহার, পান-ভোজন ও বিলাসিতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াই সুখ নয়, বরং বুদ্ধি বা বিচারশক্তির সাহায্যে মনকে স্থির ও শান্ত করাতেই যথার্থ সুখ। এপিকিউরাস্ সাময়িক সুখের ওপর জোর দেননি; সমগ্র জীবনের কথা বলেছেন। ম্যাকেঞ্জি বলেন, "*Epicurean*-রা জীবনের সামগ্রিক সুখ অর্জনের প্রচেষ্টার ওপর বেশী জোর দিতেন।"[1]

এপিকিউরাস্ কেবলমাত্র বর্তমানের সুখের ওপরেই জোর দেননি; ভবিষ্যতে যদি বেশী সুখলাভ করা যায় তাহলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানের সুখকে পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। আমাদের কাজের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় প্রকার ফলাফলের কথা চিন্তা করে কোন্ কর্মপন্থা আমাদের গ্রহণ করা উচিত তা বিচার করতে হবে। লিলি বলেন, "গ্রীক Cyrenaic-রা ধারণা করতেন যে, ভবিষ্যতের ফলাফলের কথা চিন্তা না করে মানুষের উচিত প্রতিটি মুহূর্তে সুখ অন্বেষণ করা, কিন্তু

এপিকিউরাস্-এর মতবাদের চারটি সূত্র

Epicurian-রা ভাবতেন যে, বুদ্ধিমানের উচিত ফলাফলের কথা চিন্তা করে দেখা যাতে কর্মকর্তা তার সমগ্র জীবনে সর্বাধিক পরিমাণ সুখ লাভ করতে পারে।"[2] কামনা-বাসনাকে বাড়িয়ে সুখ পাওয়া যাবে না। অভাবকে কমিয়ে কামনা-বাসনা কমালে এবং অল্পেতে সন্তুষ্ট হলেই সুখ লাভ করা যাবে। এপিকিউরাস্-এর মতবাদের চারটি সূত্র আছে; যথা—(১) যে সুখ কোন

1. Mackenzie : A Manual of Ethics ; Page 171.
2. William Lillie : An Introduction to Ethics ; Page 181.

দুঃখ উৎপন্ন করে না তাকে পেতে হবে, (২) যে দুঃখ কোন সুখ উৎপন্ন করে না তাকে পরিহার করতে হবে, (৩) যে আনন্দ অধিকতর আনন্দলাভের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ বা দুঃখ উৎপন্ন করে তাকে পরিহার করতে হবে এবং (৪) যে দুঃখ পরে আনন্দ আনে বা অধিকতর দুঃখ পরিহার করতে সাহায্য করে সে দুঃখকে মেনে নিতে হবে।

এপিকিউরাস্-এর নৈতিক মতবাদ আত্মসুখবাদের সংযত বা মার্জিত রূপ। কিন্তু যেহেতু এ সুখবাদে পরের মঙ্গল বা কল্যাণ করার কোন কথা নেই, সেহেতু পরসুখবাদের তুলনায় এ মতবাদ নিম্নতর। এপিকিউরাস্ তাঁর নৈতিক মতবাদটিকে ডেমোক্রাইটাস্ (*Democritus*)-এর জড়বাদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যাঁর মতে পদার্থ, মন ও এই পৃথিবীর সকল বস্তুরই মূল উপাদান কতকগুলো পরমাণু এবং ঈশ্বর, ধর্ম, ভবিষ্যৎ-জীবন, মৃত্যুর পরে স্বর্গ ও নরকের কল্পনা বা মৃত্যুর পরে পুণ্যের জন্য পুরস্কার লাভ ও পাপের জন্য শাস্তিলাভ—এ সবই অলীক এবং কল্পনার বিষয়বস্তু। এসব নিয়ে মাথা ঘামানো কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত নয়, তাতে জীবনের শান্তিই শুধু ব্যাহত হয়।

সমালোচনা (Criticism) : (ক) আত্মসুখবাদের সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, তাঁদের আত্মসুখবাদ মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে দেখেছি যে, মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ ভ্রান্ত মতবাদ। ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে দেখলে জানা যাবে, আমরা প্রত্যক্ষভাবে সুখ চাই না, প্রত্যক্ষভাবে কামনা করি বস্তু, যে বস্তু পেলে মনে সুখের উদয় হয়। মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ যে সকল দোষে দুষ্ট তা সমস্তই আত্মসুখবাদেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন, সুখবাদের বিরোধাভাস (Paradox of Hedonism); এ দোষ যেমন মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদকে খণ্ডন করে তেমনি আত্মসুখবাদকে খণ্ডন করে।

মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদের দোষ আত্মসুখবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

(খ) আত্মসুখবাদীরা সমাজ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের ধারণা সমাজ কেবল বহু ব্যক্তির যান্ত্রিক সমষ্টিমাত্র; মানুষ সমাজে থেকেও একটা স্বাধীন সত্তা, যে কেবল নিজের সুখই খোঁজে এবং প্রয়োজন না হলে অপরের সুখের কথা চিন্তা করে না। আমরা জানি, ব্যক্তি সমাজ-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। সুতরাং, সমাজের মঙ্গল বাদ দিয়ে ব্যক্তির নিজের মঙ্গল বা কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। আত্মসুখবাদীরা মনে করেন যে, মানুষ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর। আসলে মানুষ একাধারে স্বার্থপর ও পরার্থপর দুই-ই। নিজের অপেক্ষা অপরের ওপর নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকি। মানুষের মধ্যে জন্ম থেকেই স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা—এই দুই বৃত্তি কম-বেশী পাশাপাশি বর্তমান।

মানুষ স্বার্থপর এবং পরার্থপর উভয়ই

মানুষ যেমন নিজের কথা ভাবে, তেমনি পরের কথাও ভাবে। 'আত্মত্যাগ আত্মরক্ষা থেকে কম প্রাচীন নয়' (Self-sacrifice is no less primordial than self-preservation। স্বার্থপরতার মতো পরার্থপরতাও মানুষের সহজাত বৃত্তি, নতুবা মানুষের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হত না। সুতরাং স্বার্থসাধন-বৃত্তি ও পরোপকার-বৃত্তি দুটি ভিন্ন বৃত্তি, দুটিই জন্মগত এবং একটিকে আর একটি থেকে সৃষ্টি করা যায় না।

(গ) আত্মসুখবাদ এমন কোন নৈতিক আদর্শ দিতে পারে না যা সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য (Uniform Standard of Morality)। সুখ-দুঃখের অনুভূতি ব্যক্তিসাপেক্ষ (relative) বিষয়, একের কাছে যা সুখজনক তা অপরের কাছে অনেক সময় দুঃখদায়ক। কোন ব্যক্তি পশুপাখী শিকার করে আনন্দ পান, আবার কোন ব্যক্তি নির্দোষ পশুপাখীকে হত্যা করার কল্পনাতেই দুঃখবোধ করেন। যা সুখ দেয় তাই যদি যথোচিত কাজ হয় এবং যা দুঃখ দেয় তাই যদি অনুচিত কাজ হয়,তাহলে সকলের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য এমন নৈতিক আদর্শ পাওয়া কি সম্ভব? অথচ সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযুক্ত এরূপ একটি নৈতিক আদর্শ ছাড়া কোন কাজের নৈতিক বিচার সম্ভব নয়।

আত্মসুখবাদ নৈতিক আদর্শ দিতে পারে না

(ঘ) আত্মসুখবাদ সুখের যে মান নির্ণয় করেছে সেটা ব্যক্তিগত ও আপেক্ষিক। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতির (subjective feeling) পরিমাণ নির্ধারণ করাখুবই কঠিন। আমাদের অনুভূতি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, যা বর্তমানে সুখজনক বলে মনে হয়, ভবিষ্যতে তা হয়ত সুখজনক মনে হয় না। কাজেই এরূপ অবস্থায় সুখের আপেক্ষিক মূল্য গণনা করা কিভাবে সম্ভব?

সুখের আপেক্ষিক মূল্য গণনা করা কঠিন

(ঙ) বস্তুতঃ, অসংযত আত্মসুখবাদকে যথার্থ নৈতিক মতবাদরূপে স্বীকার করা যায় না। এ মতবাদ অনুযায়ী আমাদের জীবন বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় না; ফলে ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খলতাই জীবনের ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। এতে কেবলমাত্র ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লালসা ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই মানুষের পরমকল্যাণরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিসম্পন্ন, তার বিচারশক্তি আছে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে নয়, আত্মসংযমে, আত্মশাসনেই মানুষের সুখ বা পরমকল্যাণ। বিলাসিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, কামুকতা—এক কথায় পশুর জীবন বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষের কাম্যবস্তু বা চরম লক্ষ্য হতে পারে না।

অসংযত আত্মসুখবাদ ভ্রান্ত মতবাদ

(চ) এপিকিউরাস্-এর সংযত আত্ম-সুখবাদ অ্যারিস্টিপাস (*Aristippus*)-এর অসংযত আত্ম-সুখবাদের তুলনায় অবশ্য অনেক বেশী যুক্তিসঙ্গত। কেননা, এপিকিউরাস্ নৈতিক জীবনে বুদ্ধি বা বিচারশক্তির অবদানকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর মতে

সাময়িক সুখ বা অসংযত ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি জীবনের পরকল্যাণ নয়। শান্তিপূর্ণ জীবনই মানুষের পরমকল্যাণ। কিন্তু এ মতবাদ-অনুযায়ী সুখকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করা সম্ভব নয় এবং সেজন্য দুঃখকে পরিহার করাই জীবনের লক্ষ্য। তাই এ দৃষ্টিভঙ্গি সদর্থক নয়, নঞর্থক। সুখ হল দুঃখের অনুপস্থিতি (absence of pain) ; কাজেই এপিকিউরাস্-এর মতবাদ কর্মময় জীবনের জন্য অনুপ্রেরণা দান করে না, নিষ্ক্রিয় এবং অলস জীবনকেই সমর্থন করে। কিন্তু নৈতিক জীবন হল কর্মময় জীবন, দুঃখহীন নিষ্ক্রিয় জীবন নয়। কর্মহীন বিশুদ্ধ চিন্তার জীবন (a life of pure contemplation) নৈতিক দিক দিয়ে শূন্যগর্ভ। কর্মের মাধ্যমেই নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়।

এপিকিউরাস্-মতবাদ অ্যারিস্টিপাস-এর মতবাদের তুলনায় অনেক বেশী যুক্তিসঙ্গত

(ছ) নৈতিক জীবনে অনুভূতির যে কোন স্থান নেই তা নয়। সৎ কাজ করলে মনে যে সুখের অনুভূতি জাগে তা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সুখের জন্যই সৎ কাজ করা হয়, এ কথাও স্বীকার করা চলে না। এ কারণে সুখ ও শান্তির মধ্যে প্রভেদ করা দরকার। আমরা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির ফলে যে আনন্দ পাই তাহল সুখ, আর সৎ কাজ করলে যে মানসিক আনন্দ পাই তাহল শান্তি (happiness)। শান্তি লাভ করা যায় তখন যখন আমরা আমাদের কামনাবাসনাকে বুদ্ধি বা বিচারশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করি। শান্তি ক্ষণিক সুখলাভ নয়, মুহূর্তের তৃপ্তি নয়, সুখের যান্ত্রিক সমষ্টি নয়—এ হল বহু সুখের সমন্বয় (synthesis of pleasures) ; অর্থাৎ, কামনা-বাসনার মধ্যে এমন এক সঙ্গতি আনয়ন করা যায় যার ফলে মন প্রশান্তি লাভ করে। শান্তি আসবে তখনই যখন ক্ষণিক অন্ধ আবেগকে বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে মনের অশান্ত অবস্থাকে শান্ত করা যায়।

সুখ ও শান্তির মধ্যে প্রভেদ

৬। নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ—পরসুখবাদ বা সার্বিক সুখবাদ (Ethical Hedonism—Altruistic or Universalistic Hedonism or Utilitarianism) :

পরসুখবাদ বা সার্বিক সুখবাদ অনুসারে সকলের সুখ হয়ত আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ; কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। সে কারণে পরসুখবাদ 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখকে' (the greatest happiness of the greatest number) আমাদের জীবনের নৈতিক আদর্শ বলে নির্ণয় করেছে। বিশ্বের যত অধিক লোকের মঙ্গল সাধিত হয় ততই শুভ। এ মতবাদকে সুখবাদ বা Hedonism নামে অভিহিত না করে অনেকে '*Utilitarianism*' বা উপযোগবাদ নামে অভিহিত করেছে। একে বহু

পরসুখবাদ অনুসারে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখেই মানুষের নৈতিক আদর্শ

সুখবাদও বলা যেতে পারে। সর্বসাধারণের কল্যাণসাধনই নৈতিক আদর্শ বা নৈতিক বিচারের মাপকাঠি। যে কাজ সর্বসাধারণের বা বহু লোকের সুখ উৎপাদনে উপযোগী সে কাজ যথোচিত বা ভাল, আর যে কাজ সেই সুখ উৎপাদনে উপযোগী নয়, তা অনুচিত বা মন্দ কাজ। সুতরাং উপযোগিতা বা কার্যকারিতাই (utility) নৈতিক বিচারের মাপকাঠি। আমাদের কর্তব্য কেবলমাত্র নিজের সুখ উৎপাদন করা নয়, আমাদের সাধ্যানুযায়ী অপরের এবং সকলের সুখ উৎপাদন করা। এই মতানুসারে মানুষের মধ্যে সহানুভূতি বা সমবেদনা আছে যা মানুষকে অপরের মঙ্গলসাধন করতে প্রেরণা দেয় এবং অন্যায় আচরণ থেকে তাকে বিরত রাখে।

উপযোগিতাই নৈতিক বিচারের মাপকাঠি

বেন্থাম এবং মিল-কে এ মতবাদের প্রধান প্রচারক বলা যায়। বেইন এবং অন্যান্য লেখকেরাও এ মতবাদ প্রচার করেছেন। মিল এবং বেন্থাম উভয়ের মতে সর্বসাধারণের সুখই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে উভয়ের মতবাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। যেমন, বেন্থাম সুখের কেবলমাত্র পরিমাণগত (quantitative) প্রভেদ স্বীকার করেন, কিন্তু মিল সুখের পরিমাণগত এবং গুণগত (qualitative) উভয় প্রকার প্রভেদকেই স্বীকার করেন। এজন্য এদের পরসুখবাদকে দুশ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা—স্থূল বা অসংযত (Gross) এবং সূক্ষ্ম বা সংযত (Refined)। বেন্থাম-এর মতবাদ স্থূল বা অসংযত পরসুখবাদের দৃষ্টান্ত এবং মিল-এর মতবাদ সূক্ষ্ম বা সংযত পরসুখবাদের দৃষ্টান্ত। নিম্নে এ উভয় প্রকার মতবাদ একে একে আলোচনা করা হচ্ছে:

বেন্থাম এবং মিল-এর মতবাদের পার্থক্য

পরসুখবাদ অসংযত এবং সংযত

(i) **বেন্থাম-এর স্থূল বা অসংযত উপযোগবাদ** (Bentham's Gross or Unrefined Utilitarianism): বেন্থাম-এর মতে সুখের মূল্য বিচার একমাত্র সুখের পরিমাণের দ্বারা স্থির করা যায়; অর্থাৎ কী পরিমান সুখ পাওয়া যায় তা দিয়েই সুখের মূল্য বিচার করতে হবে। তাঁর মতে দৈহিক সুখ আর মানসিক সুখ—এদের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। যদি পার্থক্য থাকে সে হল পরিমাণ-সম্পর্কীয় পার্থক্য। বেন্থাম-এর মতে যদি সুখের পরিমাণ ঠিক থাকে তবে 'pushpin is as good as poetry' অর্থাৎ খেলার জিনিস আর কবিতা সুখের দিক থেকে উভয়ই সমতুল্য। কিন্তু ঐ পরিমাণের বিভিন্ন মান বা রূপ আছে (Dimensions) এবং বেন্থাম-এর মতে সুখের এই মান হল মোট সাতটি; যথা—(১) তীব্রতা (Intensity), (২) স্থিতিকাল (Duration),

বেন্থাম নির্ণীত সুখের পরিমাণের বিভিন্ন মান

(৩) নৈকট্য (Proximity), (৪) নিশ্চয়তা (Certainty), (৫) বিশুদ্ধি (Purity), (৬) উর্বরতা (Fecundity) এবং (৭) বিস্তৃতি (Extent)।

(১) তীব্রতা (Intensity)ঃ সাধারণ প্রদীপের আলোকের তুলনায় বৈদ্যুতিক আলোক যেমন অধিকতর তীব্র, সেরকম কোন একটি সুখ অন্য একটি সুখের তুলনায় বেশী তীব্র হতে পারে। পরীক্ষায় আমার ভাই ও বন্ধু দুজনেই কৃতকার্যতা লাভ করেছে; কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে আমার যে সুখের অনুভূতি তা দ্বিতীয় ক্ষেত্রের তুলনায় অধিকতর তীব্র হতে পারে। বেন্থাম-এর মতে মানসিক সুখের তুলনায় দৈহিক সুখ অধিকতর তীব্র এবং তিনি বলেন, একাধিক সুখের মধ্যে যে সুখের তীব্রতা বেশী সে সুখই আমাদের সবার কাম্য হওয়া উচিত।

(২) স্থিতিকাল (Duration)ঃ সকল দুঃখের স্থিতিকাল সমান নয়। কোন সুখ ক্ষণকাল বা অল্পকাল স্থায়ী, কোন সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী। যেমন, এক মিনিটে একটি সন্দেশ খাওয়া, আর এক ঘণ্টা ধরে একটা ভোজ খাওয়া। দুমিনিট ধরে একটি ছবি দেখা, আর এক ঘণ্টা ধরে একটি ভাল অভিনয় উপভোগ করা। প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় সুখটি প্রথমটির তুলনায় অধিকতর দীর্ঘকাল স্থায়ী। দুটি সুখের মধ্যে যদি অন্য কোন রকম পার্থক্য না থাকে তবে বেন্থাম-এর মতে দীর্ঘকাল স্থায়ী সুখই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

(৩) নৈকট্য (Proximity)ঃ বেন্থাম-এর মতে কাছের সুখ ফেলে রেখে দূরের সুখের জন্য লালায়িত হওয়া উচিত নয়। দুটি সুখ অন্য দিক দিয়ে সমতুল্য হলেও, যদি একটিকে ভবিষ্যতে পেতে হয় আর একটিকে বর্তমানে পাওয়া যায়, তাহলে বর্তমানের সুখটিকে লাভ করার চেষ্টা করা উচিত।

(৪) নিশ্চয়তা (Certainty)ঃ অন্য সব রকম বিচারে দুটি সুখ যদি সমতুল্য হয় তাহলে আমাদের উচিত অনিশ্চিত সুখের পিছনে না ছুটে নিশ্চিত সুখকেই গ্রহণ করা।

(৫) বিশুদ্ধি (Purity)ঃ 'বিশুদ্ধি' কথাটিকে এখানে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বিশুদ্ধ সুখ বলতে বোঝাচ্ছে এমন সুখ যার সঙ্গে দুঃখের মিশ্রণ নেই, শুধু সুখই আছে। দুঃখের সঙ্গে মিশ্রিত হলে সুখকে বিশুদ্ধ সুখ বলা যাবে না। অন্যভাবে সমতুল্য দুটি সুখের মধ্যে যেটি বিশুদ্ধ বা অধিকতর সুখ, সেটিই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

(৬) উর্বরতা (Fecundity)ঃ সে সুখেরই উর্বরতা আছে যে সুখ একা আসে না, কোন এক বা একাধিক সুখ সঙ্গে করে আনে। যে সুখ অন্য কোন সুখ উৎপন্ন

করে না তাকে বলা হয় অনুর্বর সুখ। অন্যান্য বিষয়ে সমতুল্য হলে অনুর্বর সুখের তুলনায় উর্বর সুখই শ্রেয় বা বাঞ্ছনীয়।

(৭) **বিস্তৃতি** (Extent) : সুখভোগকারী লোকের সংখ্যা দ্বারা সুখের বিস্তৃতি নির্ণীত হয়। যে সুখ যত অধিক লোক ভোগ করে সে সুখ তত বিস্তৃত। যেমন, আমি একা সুখাদ্য খেলাম, এখানে খাওয়ার যে সুখ বা আনন্দ তা আমাতেই সীমাবদ্ধ। আমি একটি ভোজের আয়োজন করলুম, যে ভোজ আমিও খেলাম এবং আরও অনেক লোক খেল ও সুখ পেল। এক্ষেত্রে সুখের বিস্তৃতি অনেক বেশী।

এই সপ্তমানের সাহায্যে সুখের যে পরিমাণ নির্ণয় করা হয় সেই পদ্ধতিকে বলা হয়েছে **সুখবাদের গণনা প্রণালী** (Hedonistic Calculus)।

বেন্থাম-এর মতে আমাদের কাজের ফলাফল অপরের ওপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায় তা খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করে এবং হিসেব করে আমাদের কাজ করা উচিত। কোন্ কাজটি আমরা করব বা করব না তা নির্ধারিত হবে পূর্বোক্ত সুখের মানগুলির দ্বারা।

বেন্থাম-এর মতবাদে মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ (Psychological Hedonism)-ও জড়িত। যদিও বেন্থাম পরসুখবাদের সমর্থক তবুও তিনি স্পষ্টই বলেন যে, মানুষ স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ নিজের সুখ কামনা করে। তিনি বলেন, "প্রকৃতি মানুষকে দুটি প্রবল প্রতাপান্বিত প্রভুর শাসনে রেখেছে, তাহল সুখ এবং দুঃখ। একমাত্র তারাই নির্দেশ করে দিতে পারে কী আমাদের করা উচিত এবং কী আমরা করব"। তাঁর মতে প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির লক্ষ্য হল নিজের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখলাভ করা। মানুষের সবচেয়ে নিকটে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ নিজে এবং অন্য কেউই তার হয়ে তার সুখ-দুঃখ মেপে দিতে পারে না। মানুষ কেবল নিজের সুখ কামনা করে এবং সে স্বভাবত আত্মকেন্দ্রিক।

বেন্থাম-এর মতবাদের ভিত্তি মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ

বেন্থাম বলেন, "স্বপ্নেও মনে করো না যে, তোমার সেবা করবার জন্য কোন মানুষ কখনও তার অঙ্গুলি হেলন করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা করাতে তার নিজের কি সুবিধা হবে সেটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।"[1] এজন্য তাঁর মতে যেহেতু মানুষ স্বভাবতঃ সুখ কামনা করে সেহেতু মানুষের সুখ কামনা করা উচিত; অর্থাৎ মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদের ভিত্তির ওপরই তাঁর নীতিবিজ্ঞান সম্মত সুখবাদ দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, বেন্থাম সুখ-সম্পর্কীয় গণনা প্রণালীর (Hedonistic Calculus) সাহায্যে সুখের পরিমাণ নির্ণয়ের কথা বলেছেন। কোন বস্তু যেমন

1. Bentham : Deontology II. Page 108.

দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা যায়, তাঁর বিশ্বাস সুখকেও সেভাবে ওজন করা চলে। তিনি বলেন, "সুখকে ওজন কর, দুঃখকে ওজন কর এবং পাল্লা কিভাবে দাঁড়ায় দেখ, আর তা দেখে উচিত আর অনুচিত বিচার করা হবে।" একটি কাজ যথোচিত, যদি তাতে দুঃখের তুলনায় সুখ বেশী হয় এবং কাজটি অনুচিত যদি তাতে সুখের তুলনায় দুঃখ বেশী হয়।

বেন্থাম-এর পরসুখবাদ বা উপযোগবাদকে স্থূল ও অসংযত সুখবাদ বলা হয় এ কারণে যে, তিনি সুখের গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁর মতে দৈহিক সুখ ও মানসিক সুখের মধ্যে কোন গুণগত প্রভেদ নেই; উভয়েই এক রকমের সুখ। পরিমাণ যদি এক হয় তবে খেলাধূলার সুখ আর কবিতা পড়ার সুখ একই পর্যায়ের সুখ। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বেন্থাম সুখের বিশুদ্ধি বলতে কোন 'পবিত্র' 'শুদ্ধ' বা উচ্চস্তরের সুখকে বোঝেননি। যে সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত নয় সে সুখকেই বিশুদ্ধ সুখ বলেছেন তিনি।

বেন্থাম-এর পরসুখবাদ স্থূল বা অসংযত সুখবাদ কেন?

প্রশ্ন করা যেতে পারে, বেন্থাম-এর মতবাদকে পরসুখবাদ বলে অভিহিত করার কারণ কি? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তিনি সুখের বিস্তৃতিকে (Extensity) স্বীকৃতি দিয়েছেন; অর্থাৎ যে সুখ অধিক লোক ভোগ করতে পারে সেই সুখ, কম লোক ভোগ করতে পারে এমন সুখের তুলনায় অধিকতর কাম্য। সুতরাং তাঁর মতবাদে নিজের সুখ ছাড়াও অপরেরং সুখের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এজন্য তাঁর প্রচারিত সুখবাদ নিছক আত্ম-সুখবাদ না হয়ে পরসুখবাদে রূপান্তরিত হয়েছে।

বেন্থাম-এর মতবাদ পরসুখবাদ কেন?

বেন্থাম যদিও পরসুখবাদের সমর্থক তবু আমরা দেখেছি তিনি স্পষ্ট ভাষায় মানুষের আত্ম-সুখের প্রতি আকর্ষণের কথা বলেছেন। তাহলে প্রশ্ন হল, আত্ম-সুখবাদ থেকে পরসুখবাদে তিনি কিভাবে গেলেন? প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে যাবার পথ কোথায়? মানুষ যদি স্বভাবতঃই নিজের সুখ অন্বেষণ করে তবে সে সকলের সুখ চাইবে কেন? অপরের সুখের জন্য নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ সে কেন বিসর্জন দেবে? এই নৈতিক বাধ্যতাবোধের (moral obligation) উৎস কি? এ প্রশ্নটি সমাধানের চেষ্টা বেন্থাম করেছেন নৈতিক নিয়ন্ত্রণের (Moral Sanctions) সহায়তায়। নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা বুঝি, যা কোন কর্মপন্থাকে বাধ্যতামূলক করে তোলে।

নৈতিক বাধ্যতা-বোধের উৎস হল নৈতিক নিয়ন্ত্রণ

বেন্থাম চার প্রকারের নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেছেন; যথা—(১) সামাজিক

নিয়ন্ত্রণ (Social Sanctions), (২) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ (Political Sanctions) (৩) ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ (Religious Sanctions) এবং (৪) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ (Physical or Natural Sanctions)। অন্যায় আচরণের জন্য সমাজ প্রদত্ত শাস্তি (যেমন—সমাজচ্যুতি) যখন কাউকে পেতে হয় তখন সেই ব্যক্তির মনে যে দুঃখ জাগে তাহল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বা শাসন, তা মানুষকে অপরের মঙ্গলের কথা চিন্তা করায়। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝি রাষ্ট্রের আইনভঙ্গ করার জন্য শাস্তিবিধানের দ্বারা ব্যক্তির মনে দুঃখ উৎপাদন। এই দুঃখের ধারণাই ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের আইনভঙ্গ করা থেকে বিরত করে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কারের আশায় ব্যক্তিকে অপরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত করে। ধর্মের নিয়ন্ত্রণ হল পাপ-পুণ্যের ভয়। যেমন, সৎ কাজের জন্য স্বর্গবাসের আশা এবং অসৎ কাজের জন্য নরকবাসের ভয়। প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ হল প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ করার জন্য ব্যক্তিকে যে দুঃখ পেতে হয়। যেমন স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নিয়ম হল প্রকৃতির নিয়ম। আমাদের আহার-বিহারে মিতাচারী হওয়া উচিত, নতুবা অমিতাচারী হওয়ার জন্য আমাদের দেহ ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে এবং আমাদের দুঃখ পেতে হবে।

নৈতিক নিয়ন্ত্রণ চার প্রকার

এ সব বাইরের নিয়ন্ত্রণ (External Sanction) বা শাসনই ব্যক্তিকে বাধ্য করে তার নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমাজের সর্বসাধারণের মঙ্গল চিন্তা করতে। সুতরাং বেন্থাম-এর মতে এসব বাইরের নিয়ন্ত্রণ বা শাসনই নৈতিক বাধ্যতাবোধ সৃষ্টি করে এবং মানুষ আত্মসুখের কথা চিন্তা না করে পরের সুখের কথা চিন্তা করে।

সমালোচনা (Criticism)ঃ বেন্থাম-এর স্থূল বা অসংযত পরসুখবাদ ত্রুটিপূর্ণ। এ মতবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগগুলি এখন একে একে আলোচনা করা হচ্ছে:

(ক) বেন্থাম-এর পরসুখবাদের ভিত্তি হল মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ। মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদের সব ত্রুটি বেন্থাম-এর মতবাদের ক্ষেত্রেও বর্তমান। আমরা প্রত্যক্ষভাবে সুখ চাই না, আমরা চাই আমাদের কাম্যবস্তু। কাম্যবস্তু লাভ করলে সুখ পাওয়া যায়। বস্তু লব্ধ হলে সুখ পাই, তা বলে সুখই আমাদের কাম্যবস্তু—এ কথা বলে চলে না। তাছাড়া, সুখবাদের বিরোধাভাস বা হেঁয়ালির (Paradox of Hedonism) কথাও বিস্মৃত হলে চলবে না। প্রত্যক্ষ-ভাবে সুখ কামনা করতে গেলেই সুখ চলে যায় আমাদের নাগালের বাইরে। আমরা স্বভাবতঃই সুখ চাই বলে, আমাদের সুখ চাওয়া উচিত এমন কথাও বলা চলে না। সুখ যদি আমাদের স্বাভাবিক কাম্যবস্তু হয়, তাহলে সুখ আমাদের কাম্যবস্তু হওয়া

সুখবাদের হেঁয়ালী

উচিত, একথা বলার কোন অর্থই হয় না। সুতরাং মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের কোন যুক্তিযুক্ত যোগাযোগ নেই।

(খ) বেন্থাম সুখের কেবলমাত্র পরিমাণগত প্রভেদ স্বীকার করেন, সুখের কোন গুণগত প্রভেদ স্বীকার করেন না। তিনি অবশ্য সুখের 'বিশুদ্ধি'র (Purity) কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর বিশুদ্ধ সুখ কোন উচ্চস্তরের সুখকে বোঝায় না। কিন্তু সুখের স্তরভেদ অর্থাৎ কোন সুখ যে উচ্চস্তরের এবং কোন সুখ যে নিম্নস্তরের তা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্য পাঠের সুখ, শিল্প রসানুভূতির সুখ; আধ্যাত্মিক সুখ প্রভৃতি নিঃসন্দেহে উচ্চস্তরের সুখ এবং আহার, বিহার, পান, ভোজন বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সুখের সঙ্গে তাকে একাসনে বসান কোন মতে সঙ্গত হবে না।

(গ) বেন্থাম-এর 'সুখবাদের গণনা-প্রণালী' (Hedonistic Calculus) অবাস্তব। সুখ-দুঃখ জড় পদার্থ নয় যে তাদের আমরা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দেখতে পারি। সুখ-দুঃখ হল মানসিক প্রক্রিয়া যা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। কাজেই তাদের যোগ-বিয়োগ করা বা তাদের পরিমাণ নির্ধারণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

(ঘ) বেন্থাম-এর মতে মানুষ স্বভাবতঃ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। মানুষ নিজের সুখ চায় এবং যদি সে কখনও পরের মঙ্গল কামনা করে তবে তা কেবল নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করার জন্য। অথচ বেন্থাম পরসুখবাদ প্রচার করেছেন। মানুষ স্বার্থপর হয়েও কেন পরের মঙ্গলসাধন করবে, সে সম্পর্কে তিনি কোন সুযুক্তি দেননি। অবশ্য তিনি সুখের 'বিস্তৃতির' কথা বলেছেন, অর্থাৎ এমন সুখ আমাদের কামনা করা উচিত যা অপর ব্যক্তিরও সুখ উৎপাদন করে। কিন্তু আমরা দেখি, যে সব সুখের বিস্তৃতি আছে সে সব সুখ সাধারণতঃ উচ্চস্তরের সুখ, নিম্নস্তরের সুখ নয়। যেমন—কোন ব্যক্তি যখন ভোজনে রত তখন তার সুখের বিশেষ কোন বিস্তৃতি নেই, অর্থাৎ তার সুখে অপরের সুখ হচ্ছে না। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি একটি ভাল ছবি এঁকে বা ভাল বই লিখে সুখ পায় তখন তার সেই সুখের বিস্তৃতি আছে, অর্থাৎ আরও অনেক লোক তার সুখের অংশীদার হতে পারে। পান, ভোজন, দৈহিক সুখ—নিম্নস্তরের সুখ: ভাল গ্রন্থ রচনা করা বা ভাল চিত্র অঙ্কন করা উচ্চস্তরের সুখ। সুতরাং আমরা দেখি যে, উচ্চস্তরের সুখেরই বিস্তৃতি অধিক, নিম্নস্তরের সুখের তত বিস্তৃতি নেই। কাজেই 'বিস্তৃতির' সম্পর্ক সুখের গুণের সঙ্গে, পরিমাণের সঙ্গে নয়, কিন্তু বেন্থাম সুখের গুণগত প্রভেদ স্বীকার করেন না।

আত্মসুখবাদ থেকে বেন্থাম-এর পরসুখবাদকে পাওয়া যায় না

(ঙ) বেন্থাম-এর নৈতিক নিয়ন্ত্রণ নৈতিক বাধ্যতাবোধ সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, ঐ সকল নিয়ন্ত্রণ হল বাইরের নিয়ন্ত্রণ এবং বাইরে থেকে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যথার্থ নৈতিক শাসন হল মানুষের অন্তরের বা বিবেকের শাসন। বাইরের নিয়ন্ত্রণ বা শাসন আমরা মেনে চলি শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে, আমাদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা চিন্তা করে। এতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে, কিন্তু নৈতিকতার কোন প্রশ্ন নেই। এসব নিয়ন্ত্রণ শারীরিক বাধ্যতা সৃষ্টি করতে পারে, নৈতিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে পারে না।

বেন্থাম-এর নৈতিক নিয়ন্ত্রণ নৈতিক বাধ্যতাবোধ সৃষ্টি করতে পারে না

(চ) বেন্থাম-এর সুখবাদের গণনা-প্রণালী শুধু কঠিন কাজ নয়, অত্যন্ত অবাস্তব। সুখ-দুঃখ আমরা কিভাবে ওজন করতে পারি? সুখ-দুঃখ টাকা পয়সা নয় যে তাদের যোগ-বিয়োগ করা যায়। তাছাড়া, নিজের সুখের কথা না ভেবে অপরের সুখের কথা চিন্তা করি এবং তাকেই যদি বেশী মূল্য দিই তাহলে তা নিছক সুখবাদ হল কিভাবে? আমাদের নিজের সুখের কথা না ভেবে অপরের সুখের কথা চিন্তা করা মানেই, ভিন্ন নৈতিক আদর্শকে মেনে নেওয়া, নইলে নিজের সুখ থেকে অপরের সুখকে অধিক কাম্য বলে মনে করব কেন?

(ii) **সংযত পরসুখবাদ** বা **মিল-এর উপযোগবাদ** (Refined Altruistic Hedonism or Mill's Utilitarianism) : মিলও একজন সুখবাদী। তাঁর মতে যে কাজ শান্তি উৎপাদন করে সে কাজ যথোচিত, যে কাজ শান্তির বিপরীত (the reverse of happiness) উৎপাদন করে সে কাজ অনুচিত। তিনি বলেন, শান্তিই জীবনের পরম কাম্যবস্তু অর্থাৎ সুখ কামনা করা এবং দুঃখকে পরিহার করা মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সুখ ও শান্তি—এ দুটি কথাকে মিল একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। "শান্তি বলতে সুখকে এবং দুঃখের অনুপস্থিতিকেই বোঝায়। দুঃখ বলতে বোঝায় বেদনা এবং সুখের অভাব।"[1] শান্তিই হল কাম্যবস্তু ও একমাত্র পরম কাম্যবস্তু এবং অন্যান্য বস্তু কামনা করা হয় এই কারণে যে, সেগুলি শান্তিলাভের উপায়স্বরূপ; তিনি ভাল স্বাস্থ্য, খ্যাতি, ধর্ম প্রতিটি বস্তুকেই সুখের উপায়স্বরূপ মনে করেছেন। নিজ বৈশিষ্ট্যে বা এরা নিজেরাই সুখ বলেই এগুলি কাম্য—একথা তিনি মনে করেন না।

মিল সুখ ও শান্তিকে এক অর্থে ব্যবহার করেছেন

মিল নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের সমর্থনে যে যুক্তিটি দিয়েছেন তাহল এই : আমরা

1. 'By happiness is intended pleasures and the absence of pain, by unhappiness pain and the privation of pleasure.' —J. S. Mill ; Utilitarianism : Page 10.

বস্তুসমূহকে দেখি, তাতেই প্রমান হচ্ছে বস্তুগুলি দৃশ্যযোগ্য (visible), আমরা শব্দ শুনি তাতেই প্রমাণ হচ্ছে শব্দ-শ্রবণযোগ্য (audible), তেমনি আমরা সুখ কামনা করি এবং তাতেই প্রমান হচ্ছে সুখ কামনার যোগ্য (desirable)।

সুখবাদী হিসেবে মিল পরসুখবাদের সমর্থক। তাঁর মতে নিজের সুখ মানুষের নৈতিক আদর্শ নয়, তার নৈতিক আদর্শ হল সর্বসাধারণের সুখ। উপযোগিতা (utility), অর্থাৎ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই (the greatest happiness of the greatest number) হল নৈতিক আদর্শ। উপযোগিতার আদর্শ যখন মানুষ স্বীকার করে নেয় তখন মানুষ অপরের কাছ থেকে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করে ঠিক সেরূপ ব্যবহার অপরের সঙ্গে করে এবং অপরের স্বার্থে বা অনুভূতিকে আঘাত দেয় এমন আচরণ থেকে সে অবশ্যই বিরত থাকে। সর্বসাধারণের জন্য স্বার্থ ত্যাগই হল উপযোগবাদের মূল কথা।

মিল-এর মতে 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই' নৈতিক আদর্শ

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়ঃ সর্বসাধারণের সুখ যে আমাদের কাম্য, তার প্রমান কি? আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজের সুখ কামনা করি, তাহলে পরসুখবাদ কি করে সম্ভব হয়? মিল একাধিক যুক্তির অবতারণা করে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সুখ তার কাছে ভাল এবং সেহেতু সর্বসাধারণের সুখ সমষ্টিগতভাবে সকলের ভাল।"[1] উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, রাম নিজের সুখ কামনা করে, যদু নিজের সুখ কামনা করে ইত্যাদি। সুতরাং সকল লোকই সকলের সুখ বা সমষ্টিগত সুখ কামনা করে।

সর্বসাধারণের সুখই যে আমাদের কাম্য তার প্রমাণ কি?

মিল নৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন। তাঁর মতে বাইরের নিয়ন্ত্রণ (external sanctions) যথেষ্ট নয়, ভেতরের বা অন্তরের নিয়ন্ত্রণেরও (internal sanctions) প্রয়োজন আছে। এই উভয় প্রকার নিয়ন্ত্রণ আমাদের আত্মসুখ পরিহার করে সর্বসাধারণের সুখ কামনা করায়। আমরা দেখেছি, বেন্থাম এর মতে বাইরের নিয়ন্ত্রণ হল চারপ্রকার; যথা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ। বেন্থাম-এর মতো মিলও এই চারপ্রকার নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিয়েছেন। এই নিয়ন্ত্রণগুলি বাইরের শাসন, যেহেতু বাইরের কোন কর্তৃপক্ষ আমাদের ওপর এগুলিকে চাপিয়ে দিয়ে আমাদের ন্যায়পথে চলার জন্য বাধ্য করে। এক্ষেত্রে নৈতিক বাধ্যতা আসছে বাইরে

মিল বাইরের নিয়ন্ত্রণ ও অন্তরের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন

1. J. S. Mill : Utilitarianism.

থেকে, অন্তর থেকে নয়। কিন্তু শুধু বাইরের নিয়ন্ত্রণের জন্য যদি আমরা ন্যায়পথে চলতে বাধ্য হই তবে আমাদের সে আচরণের নৈতিক মূল্য হল শূন্য এবং সেক্ষেত্রে আমাদের নৈতিকতা হল কৌশল বা চাতুর্যের বিষয় ও ধর্ম হল স্বার্থসিদ্ধির উপায়। এজন্য ঐ চারপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও মিল আরও একটি নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেছেন। এই

অন্তরের নিয়ন্ত্রণ হল বিবেকের শাসন এবং এ হল দুঃখের অনুভূতি

নিয়ন্ত্রণ হল অন্তরের নিয়ন্ত্রণ (internal sanction), বিবেকের শাসন; সে কারণে এ আসে ভেতর থেকে, অন্তর থেকে—বাইরে থেকে নয়। মিল এই নিয়মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এ হল দুঃখের অনুভূতি, যা কর্তব্য পালন না করার জন্য আমাদের মনে দেখা দেয় (a feeling of pain attendant on the violation of duty)। "এই অন্তরের নিয়ন্ত্রণ হল মানুষের সুখের জন্য অনুভূতি, এ হল অপরের অনুভূতি ও বেদনার জন্য শ্রদ্ধাবোধ—এ হল মানুষের সামাজিক অনুভূতি, আমাদের স্বজাতীয় জীবনের সঙ্গে একাত্মবোধের বাসনা, যা সহজাত না হলেও স্বভাবসিদ্ধ।"[1] মিল-এর মতে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অপরের জন্য সহানুভূতি বা সমবেদনা (sympathy or fellow-feeling) আছে যার জন্য আমরা আত্ম-চিন্তায় মগ্ন না হয়ে বা নিজের স্বার্থের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে, পরের সুখ-দুঃখের কথাও চিন্তা করি। অপরের সুখ-দুঃখকে

অপরের সঙ্গে একাত্মবোধই মানুষের বৈশিষ্ট্য

নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করা এবং অপরের সঙ্গে একাত্মবোধই সহানুভূতির বৈশিষ্ট্য। সেই কারণে নিজের সুখই আমাদের একমাত্র কাম্যবস্তু নয়; অপরের সুখও আমাদের কাম্যবস্তু। কিন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, মানুষ স্বভাবতঃই যদি নিজের সুখ কামনা করে এবং আত্মসুখ যদি মানুষের সকল কাজের মূল উৎস হয় তাহলে মানুষের জীবনে এই সহানুভূতি বা সমবেদনার উদ্ভব কিভাবে হয়? সুখবাদ যদি মানুষের জীবনের আদর্শ হয় এবং সুখ যেহেতু মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি, সে ক্ষেত্রে মানুষের মনে পরার্থবোধের সৃষ্টি হয় কিরূপে?

এই পরার্থবোধ কিভাবে মানুষের জীবনে উদ্ভূত হয়, মিল তার মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা

বিধি স্বার্থের স্থানান্তর-করণ অনুযায়ী স্বার্থবোধ থেকে পরার্থবোধের উদ্ভব হয়

দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, বিশেষ এক বিধি অনুযায়ী আত্মসুখবাদ থেকে পরসুখবাদের, আত্ম-অনুরাগ থেকে সমবেদনা বা সহানুভূতির, স্বার্থবোধ থেকে পরার্থবোধের উদ্ভব হয়। এই বিধিটির নাম হল 'স্বার্থের স্থানান্তরকরণ' (transference of interest)। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: মানুষ অর্থ চায় জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

1. J S. Mill : Utilitarianism.

লাভ করার জন্য, জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করার জন্য। কিন্তু অর্থ সংগ্রহ করতে করতে কোন মানুষের অর্থের তৃষ্ণা এমন বেড়ে যায় যে, অর্থ সংগ্রহই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থ যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রয়োজনীয় বস্তুলাভের উপায় মাত্র, সেকথা সে বিস্মৃত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে উপায়ই জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। একেই বলে 'স্বার্থের স্থানান্তরকরণ' বা 'Transferenc of Interst.' কৃপণ ব্যক্তিদের এরকম স্বভাব প্রায়ই আমরা লক্ষ্য করি। কৃপণ ব্যক্তি অর্থের জন্যই অর্থ-সংগ্রহ করে, অন্য কোন কিছুর জন্য নয়। সামাজিক জীব হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সুখ পেতে হলে অপরের সুখের সঙ্গে তাকে পেতে হয়। এজন্য আমরা নিজের সুখের জন্য অপরের সুখ খুঁজি। নিজের সুখ উদ্দেশ্য, অপরের সুখ উপায় মাত্র। কিন্তু ক্রমে ক্রমে 'স্বার্থের স্থানান্তরকরণ'-এর জন্য নিজের সুখ ভুলে গিয়ে অপরের সুখ খোঁজই আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

মিল-এর সঙ্গে বেন্থাম-এর পার্থক্য

মিল-এর সঙ্গে বেন্থাম-এর প্রধান পার্থক্য এই যে, মিল (১) সুখের গুণগত বিভাগ মেনে নিয়েছেন; (২) অন্তরের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন; এবং (৩) যুক্তির সাহায্যে দেখাতে চেয়েছেন যে, সর্বসাধারণের সুখ উপায় হিসেবে নয়, লক্ষ্য হিসেবেই মানুষের কাম্য।

সুখবাদীদের মধ্যে মিল-ই সর্বপ্রথম সুখের গুণগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন। এপিকিউরাস্ দৈহিক সুখ এবং মানসিক সুখের কথা বলেছেন। তিনি এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, মানসিক সুখের স্থিতিকাল বেশী এবং মানসিক সুখের পরিমাণ কম দুঃখজনক, সে কারণে মানসিক সুখ দৈহিক সুখের তুলনায় অধিকতর কাম্য। কিন্তু মানসিক সুখের গুণগত শ্রেষ্ঠতা এপিকিউরাস স্বীকার করেন নি। কিন্তু মিল খুব স্পষ্ট

মিল দু'প্রকার সুখের কথা বলেছেন—উচ্চস্তরের এবং নিম্নস্তরের

করেই বলেছেন যে, 'সুখের প্রকারভেদ আছে এবং কোন কোন জাতীয় সুখ অন্য সুখের তুলনায় অধিকতর **কাম্য** এবং বেশী মূল্যবান' (Some kinds of happiness are **most** desirable and valuable than others)। সুখের মূল্য বিচারে কেবলমাত্র তার পরিণামের ওপর নির্ভর করা চলে না। মিল উচ্চস্তরের এবং নিম্নস্তরের দুপ্রকার সুখের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন; দৈহিক সুখ জাগতিক সুখ—নিম্নস্তরের সুখ। মানসিক সুখ, আধ্যাত্মিক সুখ—উচ্চস্তরের সুখ। কোন একটি সুখের পরিমাণ কম হলেও অর্থাৎ তার স্থিতিকাল এবং তীব্রতা কম হলেও সেটি উচ্চস্তরের হতে পারে।

মিল মনে করে যে, মানুষের পরমকল্যাণ তীব্র এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী সুখভোগের মধ্যে নিহিত নেই, বরং পবিত্র, উন্নত এবং উচ্চস্তরের সুখভোগের মধ্যেই নিহিত, তার

তীব্রতা এবং স্থিতিকাল যতই কম হোক না কেন। বেন্থাম সুখের পরিমাণের ওপর জোর দিয়েছেন। মিল জোর দিয়েছেন তার পরিমাণ এবং গুণ উভয়ের ওপর। মিল-এর মতে নিম্নস্তরের সুখের তুলনায় উচ্চস্তরের সুখই অধিকতর কাম্য। এ কারণেই তাঁর পরসুখবাদ বা উপযোগবাদ স্থূল বা অসংযত না হয়ে সূক্ষ্ম বা সংযত হয়েছে। সাধারণতঃ অনেকে সুখবাদকে ইন্দ্রিয়-ভোগবাদ বলে মনে করেন এবং তাঁদের মতে এ মতবাদ মানুষের নৈতিক অধঃপতনের কারণ। মিল-এর সুখবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু এ অভিযোগ আনা যায় না।

মিল-এর পরসুখবাদ অসংযত নয়, সংযত

কিন্তু সুখের এই গুণগত পার্থক্য নির্ণয় করার মাপকাঠি কি? এ বিষয়ে মিল উপযুক্ত বিচারকের রায়-এর (The verdict of the competent judges) ওপর নির্ভর করতে বলেছেন। যদি অভিজ্ঞতালব্ধ দুটি সুখের মধ্যে একটিকে উপযুক্ত বিচারকেরা কোনরকম নৈতিক বাধ্যতাবোধ ছাড়া প্রাধান্য দেন তবে সে সুখই গুণগতভাবে অধিকতর কাম্য সুখ। উপযুক্ত বিচারকদের বিচারে সন্তুষ্ট হতে না পারলে উচ্চতর কোন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা চলবে না। উপযুক্ত বিচারকদের মধ্যে যদি মতের কোন বিরোধিতা দেখা দেয়, তাহলে অধিকসংখ্যক বিচারকের যে মত তাকেই গ্রহণ করতে হবে।

উপযুক্ত বিচারক সুখের গুণগত পার্থক্য নির্ণয় করেন

এ প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন দেখা দেয়—উপযুক্ত বিচারকবৃন্দের দ্বারা নির্ধারিত সুখকে প্রাধান্য দেওয়া হবে কেন? মিল-এর মতে মানুষ মনুষ্যোচিত স্বাভাবিক মর্যাদার জন্য উচ্চস্তরের সুখকে নিম্নস্তরের সুখ থেকে প্রাধান্য দেয়। তিনি বলেন, "একটি সুখী শূকর হওয়ার চেয়ে অসুখী মানুষ হওয়া অনেক ভাল, একটি সুখী মূর্খ হওয়ার চেয়ে অ-সুখী সক্রেটিস হওয়া অনেক ভাল।"[1] এ কথার অর্থ হল শত দুঃখী হলেও মানুষের জীবনের যে মর্যাদা তা সুখময় শূকরের জীবনের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ এবং এই মর্যাদাবোধ থেকে মানুষ যে সুখ পায় তার গুণগত শ্রেষ্ঠতার জন্যই মানুষ নিম্নস্তরের সুখকে ত্যাগ করে একেই গ্রহণ করে।

মানুষ স্বাভাবিক মর্যাদাবোধে উচ্চস্তরের সুখ খোঁজে

মিল-এর নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের ভিত্তি হল, মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ। মনস্তত্ত্বমূলক সুখবাদের সমর্থক হিসেবে তিনি বলেন—"কোন জিনিস কামনা করা এবং তাকে সুখদায়ক মনে করা একই বিষয়ের দুটি দিক; কোন বিষয়কে সুখদায়ক মনে করি না অথচ তাকে কামনা করি—এরকম ব্যাপার পার্থিব, কি অপার্থিব, কোন ভাবেই

1. J, S, Mill—Utilitarianism.

সম্ভব নয়।" তাঁর মতে যেহেতু আমরা স্বাভাবিকভাবে সুখ কামনা করি সেহেতু সুখই কাম্যবস্তু।

সুতরাং মিল আত্মসুখের জায়গায় পরসুখ কামনার কথা বলেন। সুখের গুণগত বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়ে, সর্বসাধারণের সুখকেই নৈতিক মানদণ্ডরূপে স্বীকৃতি দিয়ে, নৈতিক বাধ্যতাবোধের মূলে যে বাইরের নিয়ন্ত্রণ নয়, অন্তরের নিয়ন্ত্রণ বর্তমান, সে কথা বলে এবং সর্বশেষে উচ্চস্তরের সুখ ও মানুষের মর্যাদাবোধকে বিশেষ মূল্য দিয়ে তিনি বেন্থাম-এর অসংযত পরসুখবাদকে সংশোধিত করে তাকে সংযত পরসুখবাদে উন্নীত করেছেন.

মিল-এর মতের সমালোচনা (Criticism of Mill's Utilitarianism): মিল পরসুখবাদের সমর্থক এবং তাঁর মতে সকল লোকের সুখই মানুষের যথার্থ কাম্যবস্তু।

আত্মসুখ থেকে বহু সুখে যাবার পথ নেই

কিন্তু কেন মানুষ নিজের সুখ বর্জন করে সর্বসাধারণের সুখ কামনা করবে তা তিনি ত্রুটিবিহীন যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারেন নি। মার্টিনিয়ু বলেন, আত্মসুখ থেকে সর্বসুখে যাবার কোন পথ নেই (From each for himself to each for all, there is no road)। সুখবাদের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হচ্ছে আত্মসুখবাদ পর বা সর্বসুখবাদ নয়। মিল-এর যুক্তিগুলি একে একে আলোচনা করা যাক:

(ক) সর্বসাধারণের সুখ যে আমাদের কাম্যবস্তু তা প্রমাণ করতে গিয়ে মিল বলেছেন, 'প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ সুখ কামনা করে ; সেহেতু সকল লোক সকলের সমষ্টিগত সুখ কামনা করে।' আবার তিনি বলেন, 'সকল লোক সকলের সমষ্টিগত সুখ কামনা করে, সুতরাং যে কোন লোক সকলের সুখ কামনা করে।' এভাবে তিনি সকলের সুখকে কাম্যবস্তু বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। মিল-এর যুক্তি দুটি ভ্রমাত্মক।

মিল-এর সর্বসাধারণের সুখ প্রমাণ করার যুক্তি হেত্বাভাস দোষে দুষ্ট

যুক্তি দুটি যথাক্রমে 'সমষ্টি হেত্বাভাস' (Fallacy of Composition) এবং ব্যষ্টি হেত্বাভাস (Fallacy of Division)-এই দুই প্রকার অনুমান সম্পর্কীয় দোষে দুষ্ট।[1] মিল-এর মত একজন খ্যাতনামা তর্কবিজ্ঞানী যে কি প্রকারে এ জাতীয় ভুল করতে পারেন তাই আশ্চর্যের বিষয়। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই মিল-এর যুক্তির অসারত্ব স্পষ্ট হয়ে পড়বে। লিলি-র ভাষায়, "এ যেন এই রকম যুক্তি যে, যেহেতু একটি শহরে

1, একই অনুমানে কোন পদ প্রথমে ব্যষ্টিগত (distributive) এবং পরে সমষ্টিগত (collective) অর্থে ব্যবহৃত হলে 'সমষ্টি হেত্বাভাস' (Fallacy of Composition) ঘটে থাকে। আবার একই অনুমানে কোন পদ প্রথমে সমষ্টিগত কিন্তু পরে ব্যষ্টিগত অর্থে ব্যবহৃত হলে 'ব্যষ্টি হেত্বাভাস' (Fallacy of Division) ঘটে থাকে।

প্রতিটি লোকের নিজের বাড়ির দরজা খোলার অধিকার আছে, সেহেতু শহরের সকলেরই তাদের খুশীমত যে কোন বাড়ির দরজা খোলার অধিকার আছে।[1] এমন কথা বলা যেতে পারে কি যে, প্রত্যেকটি সৈনিক যখন ছয় ফুট উঁচু, তখন একশ জন সৈন্য নিয়ে দলটি ছয়শ ফুট উঁচু? অবশ্য সৈন্যদলটি ছয়শ ফুট উঁচু হতে পারে যদি সৈন্যরা সকলে একজনের মাথার ওপর আর একজন দাঁড়ায়।

(খ) মিল নৈতিক বাধ্যতাবোধের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে সামঞ্জস্যের অভাব আছে। মিল বাইরের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে অন্তরের নিয়ন্ত্রণ যুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ সুখবাদের সঙ্গে অন্তরের নিয়ন্ত্রণের মিল সম্ভব নয়। সুখের কামনা হচ্ছে ব্যক্তিগত অনুভূতি আর অন্তরের নিয়ন্ত্রণ মিল-এর মতে পরসুখান্বেষী—এর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? আত্মসুখ বা স্বার্থবোধ থেকে পরসুখ যা পরার্থবোধের উদ্ভব কখনও হতে পারে না। যে প্রকৃত আত্মসুখবাদী তার পক্ষে কখনও স্বদেশ বা বিশ্বপ্রেমিক বা শহীদ হওয়া সম্ভব নয়।

মিল নৈতিক বাধ্যতাবোধের উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি

(গ) মিল সুখের গুণগত প্রভেদ স্বীকার করেছেন। কিন্তু সুখের গুণগত তারতম্য করতে গিয়ে মিল যে মাপকাঠি গ্রহণ করেছেন তাকে বলা হয়েছে সুখবাদ-বহির্ভূত মাপকাঠি (Extra-Hedonistic Criterion)। বিষয়টি ভাল করে বুঝে নেওয়া যাক: যদিও দুটি সুখ পরিমাণের দিক দিয়ে এক, তবু একটিকে বর্জন করে আর একটিকে গ্রহণ করব, যেহেতু একটি আর একটির তুলনায় গুণানুসারে উচ্চস্তরের। কিন্তু এ রহস্যময় গুণটি কি? এ রহস্যময় গুণটি নিশ্চয়ই সুখানুভূতি নয়। তা যদি না হয় তবে সেটা নিশ্চয়ই সুখ-বহির্ভূত কোন বিষয়। তাহলে কি তিনি স্বীকার করছেন না যে, মানুষ সুখ ছাড়াও অন্য কোন বস্তু কামনা করে? সুতরাং পরিমাণ ছাড়াও যদি গুণের জন্য কোন সুখ কাম্য হয় তাহলে সুখবাদকে পরোক্ষভাবে বর্জন কর হয়।

মিল সুখবাদ-বহির্ভূত মাপকাঠি গ্রহণ করেছেন

উচ্চস্তরের এবং নিম্নস্তরের সুখের প্রভেদ প্রসঙ্গে লিলি বলেন, "একজন একনিষ্ঠ সুখবাদীর পক্ষে এ প্রভেদ করা চলে না।" মিল বলেন, 'মানুষ উচ্চস্তরের সুখ খোঁজে, যেহেতু তার মর্যাদাবোধ আছে। গ্রীন বলেন, এ মর্যাদাবোধকে কোনমতেই সুখের অনুভূতি বলে মনে করতে পারা যায় না। একমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই আমরা বুঝতে পারি যে, কোন কাজটি আমাদের পক্ষে মর্যাদাকর বা অমর্যাদাকর। এ মর্যাদাবোধ

1, Lillie : An Introduction to Ethic ; Page, 189,

আসলে মানুষের বুদ্ধিকে বা বিচারশক্তিকে মর্যাদা দেওয়া। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মিল বিচারবাদকে সমর্থন করে সুখবাদকে বর্জন করেছেন।

(ঘ) মিল সুখবাদের গণনা-প্রণালী (Hedonistic Calculus) স্বীকার করে নিয়েছেন। সুখের পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজের নৈতিক মূল্য বিচার করা অসম্ভব ব্যাপার। বস্তুতঃ সুখ-দুঃখের পরিমাণের মাপ আদৌ যদি সম্ভব হয় তবে অনেকটা এরকম ব্যাপার দাঁড়াবে যে, আমার কাছে দু সের চাল, তিন গজ কাপড়, আর পাঁচ টাকা আছে; তাদের যোগ করে মোট দশটা জিনিস আমার আছে : সুখ-দুঃখের অনুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং খুবই পরিবর্তনশীল। সুতরাং সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখের পরিমাণগত গণনা যে আরও অসম্ভব হবে তাতে আর সন্দেহ কি? উপরন্তু মিল-এর সুখের গুণগত তারতম্য স্বীকার এবং সুখের পরিমাণ গণনা এক সঙ্গে চলতে পারে না, কারণ সুখের গুণকে পরিমাণে রূপান্তরিত করা যায় না।

সুখের পরিমাণ অনুসারে কাজের নৈতিক মূল্য বিচার করা অসম্ভব ব্যাপার

(ঙ) উপযোগবাদ নৈতিক আচরণের বিচারের উপযুক্ত মানদণ্ড বা নৈতিক আদর্শ নির্দেশ দিতে পারে না। উপযোগবাদীদের মতে যে কাজ অপরের সুখ উৎপাদন করে সে কাজ মন্দ। কিন্তু এ নিয়মানুসারে কাজের ভাল-মন্দ সব সময় বিচার করা যায় না। অনেক সময় একজনকে আঘাত দিয়ে কোন লোকের মনে সুখের অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ জাতীয় কাজের নৈতিক বিচার কিভাবে সম্ভব। মিল এবং বেন্থাম যদি সে রকম কাজকে 'অনুচিত' বলে মনে করেন তাহলে বুঝতে হবে উপযোগবাদকে বর্জন করে অন্য কোন আদর্শের মাপকাঠির সাহায্যে তাঁরা একাজের বিচার করেছেন।

উপযোগবাদ নৈতিক আদর্শের নির্দেশ দিতে পারে না

(চ) মিল 'সুখ' এবং 'শান্তি'র মধ্যে কোন প্রভেদ করেননি এবং উভয় শব্দকে একার্থক বলে মনে করেন। 'সুখ' এবং 'শান্তি' একার্থক নয়। ক্ষণিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি এবং মুহূর্তের আবেগের তৃপ্তিসাধনই হল সুখ, শান্তি হল বিভিন্ন সুখের সামঞ্জস্য। আমাদের কামনা-বাসনার মধ্যে সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি স্থাপিত হওয়ার ফলে যে আনন্দের অনুভূতি জাগে তাই হল শান্তি। শান্তি হল স্থায়ী; সুখ হল ক্ষণিক, শান্তি আমাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে তৃপ্ত করে, সুখ তৃপ্ত করে কোন একটি বিশেষ আবেগকে।

মিল সুখ এবং শান্তির মধ্যে প্রভেদ করেননি

(ছ) মিল সুখবাদের সমর্থক। সুখবাদ অনুযায়ী মানুষ সচেতনভাবে কেবল সুখই আকাজ্ক্ষা করে। কিন্তু মানুষ যে বুদ্ধিসম্পন্ন জীব, সে যে তার বিচারশক্তি দ্বারা জীবনকে

নিয়ন্ত্রিত করতে চায়—সে দিকটা তিনি লক্ষ্য করেননি। মানুষের মধ্যে অনুভূতি যেমন আছে, তেমনি বিচারশক্তিও আছে। আমাদের সমগ্র মনের (total self) সুখই আমাদের কাম্য, তার কোন খণ্ড অংশের নয়। এ ছাড়া, মিল মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং, মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলি তাঁর মতবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সুখকে সোজাসুজি পেতে চাইলে, সুখ চলে যাবে নাগালের বাইরে। এ প্রসঙ্গে লিলি বলেন, "মানুষ ক্ষুধার্ত হলে স্বাভাবিকভাবে খাদ্য কামনা করে। ক্ষিধে মেটাবার জন্য না খেয়ে সুখের জন্য খাওয়ার প্রবৃত্তি মানুষ পরে লাভ করেছে।"[1]

(জ) এ ছাড়া মিল কামনার যোগ্য (desirable) কথাটির অর্থ বুঝতে ভুল করেছেন। শ্রবণযোগ্য (audible) মানে যা শোনা যায়, দৃশ্যমান (visible) মানে যা দেখা যায়, কিন্তু কামনার যোগ্য (desirable) মানে এটা নয় যা কামনা করা হয়। এর যথার্থ অর্থ হচ্ছে যা কামনা করা উচিত। লিলি বলেন, "ইংরেজী ভাষায় *desirable* কথাটি visible বা audible জাতীয় কথার মতো নয়, বরং detestable জাতীয় কথার মতো, যার অর্থ এই নয় যে, যাকে ঘৃণা করা হয়' বরং 'যাকে ঘৃণা করা উচিত।"[2]

মিল 'Desirable' কথাটির অর্থ বুঝতে ভুল করেছেন

(ঝ) মিল-এর মতে আমাদের সহানুভূতি বা সমবেদনাবোধের উদ্ভব হয় 'স্বার্থের স্থানান্তরকরণ'(transference of interest) নিয়মানুসারে, কিন্তু স্বার্থবোধ থেকে কখনই পরার্থবোধের উদ্ভব সম্ভব নয়। পরের উপকার করার প্রেরণা ভিন্ন জাতীয় এবং এ প্রকার প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হলে মানুষ কখনও নিজের সুখের কথা বিস্মৃত হয়ে অপরের উপকার করতে প্রবৃত্ত হতে পারে না। বস্তুতঃ, স্বার্থবোধের সঙ্গে পরার্থবোধের এক চিরন্তন বিরোধ আমরা দেখতে পাই। মানুষের স্বার্থবোধ সময় সময় এত প্রবল হয়ে দেখা দিতে পারে যে, পরোপকার প্রবৃত্তিকে মানুষ অলীক বস্তু বলে মনে করতে পারে।

(ঞ) এ ছাড়া, উপযোগবাদ যদিও দশের সুখের কথা বলে তবু উপযোগবাদীরা দৈহিক এবং পার্থিব সুখের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চিন্তা সম্পর্কীয় এবং ধর্মসম্পর্কীয় মূল্যগুলির (values) ওপর যতখানি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ততখানি গুরুত্ব তাঁরা দেননি।

1, Lillie : An Introduction to Ethics ; Page 187,

2, Ibid, Page 186,

৭। মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ ও নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Psychological Hedonism and Ethical Hedonism) :

মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ (Psychological Hedonism) অনুযায়ী সুখই হল মানুষের একমাত্র স্বাভাবিক কাম্যবস্তু। সুখের কামনাই মানুষের কাজের একমাত্র প্রেরণা। কোন বস্তুকে তার নিজের জন্য কামনা করা হয় না। বস্তু থেকে যে সুখলাভ হবে তার জন্যই বস্তুকে কামনা করা হয়। আমরা খাদ্যের জন্য খাদ্য কামনা করি না, খাদ্য গ্রহণ করলে আমরা যে সুখ পাব তার জন্য খাদ্য কামনা করি। প্রাচীনকালে গ্রীসদেশের *Cyrenaics* এবং বর্তমান যুগে হব্‌স্‌, বেন্থাম, মিল প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ এ মতবাদের সমর্থক।

নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ (Ethical Hedonism) অনুযায়ী সুখই কাম্যবস্তু হওয়া উচিত এবং প্রতিটি মানুষের সুখ অন্বেষণ করা উচিত।

মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী মানুষ সাধারণতঃ সুখ চায়, নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী মানুষের সুখ চাওয়া উচিত। মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী সুখই সকল মানুষের স্বাভাবিক এবং সাধারণ কাম্যবস্তু। আমরা সকল সময় সুখ চাই এবং দুঃখকে পরিহার করি। নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ অনুযায়ী সুখই কামনার বস্তু হওয়া উচিত। আমাদের সকল সময় সুখ কামনা করা উচিত। সুতরাং প্রথম মতবাদ অনুসারে আমরা স্বভাবতঃ সুখ কামনা করি। দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে আমাদের সকল সময় সুখ কামনা করা উচিত। মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ আমাদের মনোজগতে স্বাভাবিকভাবে যা ঘটে তারই কথা বলে। এ হল একটি ঘটনার বিবৃতি ('is statement')। আর নীতিবিজ্ঞান-সম্মত সুখবাদ আমাদের আদর্শের কথা বলে, মূল্য বিচারের কথা বলে। এ হল যা হওয়া উচিত তার বিবৃতি ('ought statement')। বেন্থাম, মিল প্রমুখ নীতিবিদ্‌গণ মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদের ভিত্তিতে নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ প্রচার করেছেন।

মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ মনোবিজ্ঞানবিরুদ্ধ মতবাদ। আমরা সাধারণতঃ সুখ খুঁজি না, খুঁজি বস্তুকে, যে বস্তু লাভ করলে আমরা সুখ পাই। দ্বিতীয়তঃ, সুখের প্রতি আবেগ যদি খুব বেশী প্রবল হয় তাহলে তার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়। একেই বলা হয় সুখের বিরোধাভাস বা হেঁয়ালী। কোন একটি বস্তু কামনা করার অর্থ হল যে, কামনায় পরিতৃপ্তি হলে অনিবার্যভাবে সুখ আসবে। যে কোন কামনার পরিতৃপ্তিতেই নিঃসন্দেহে সুখ বর্তমান। কিন্তু কোন 'বস্তুকে চাই যেহেতু সেটা সুখদায়ক' বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আবার বস্তুর কামনা ছাড়া অনেক সুখের কোন অস্তিত্বই থাকে না। যেমন, পরোপকার বৃত্তির সুখ।

মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ এবং নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের মধ্যে কোন অনিবার্য যোগাযোগ নেই। মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ সত্য হলে নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকে না। যদি আমরা স্বাভাবিকভাবে সুখ কামনা করি তাহলে আমাদের সুখ কামনা কথা উচিত, এই কথা বলা অর্থহীন। কাজেই উভয় মতবাদের বিচার স্বতন্ত্রভাবে করাই যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু বেন্থাম, মিল প্রমুখ নীতিবিদ্‌গণ মনে করেন যে, মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের সংযোগ আছে এবং প্রথম মতবাদের সত্যতা দ্বিতীয় মতবাদের সত্যতা নির্দেশ করে। বস্তুত তাঁরা 'বাস্তব' এবং 'আদর্শ', বা 'যা হয়' এবং 'যা হওয়া উচিত' এই দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ডেভিড হিউম স্পষ্ট দেখালেন যে, 'ঘটনামূলক বিবৃতি' ('is statement') থেকে 'ঔচিত্যমূলক বিবৃতিকে ('ought statement') কখনও নিঃসৃত করা যায় না। 'মানুষ স্বভাবতঃ সুখ কামনা করে' (মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ)—এই ঘটনা থেকে তার পরিণাম হিসেবে 'মানুষের সুখ কামনা করা উচিত' (নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ)—এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যেতে পারে না। এক্ষেত্রে আশ্রয়বাক্যের (premisc) সত্যতা স্বীকার করে নিলেও, আমরা সিদ্ধান্তের সত্যতা স্বীকার করতে পারি না, যেহেতু যুক্তিটি ভ্রান্ত। আসল কথা হল, ঘটনামূলক বিবৃতি থেকে আর একটি ঘটনামূলক বিবৃতিকে অবরোহের সাহায্যে নিঃসৃত করা যেতে পারে, কিন্তু কোন ঔচিত্যমূলক বিবৃতিকে নিঃসৃত করা যেতে পারে না। 'যা হয়' আর 'যা হওয়া উচিত'—এই দুটির মধ্যে যোগাযোগ করার কোন পথ নেই। নীতিবিদ্‌ মূর (*Moore*) বলেন যে, ঘটনা (a fact) এবং 'মূল্যকে' (a value) যদি এক করে দেখা হয় তাহলে মূল্য বা আদর্শকে বাস্তব ঘটনা বলে গণ্য করা হয়, যা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয় এবং এ ক্ষেত্রে 'naturalistic fallacy' ঘটবে। বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের মৌলিক পার্থক্য আছে।

মিল যখন মনস্তত্ত্বমূলক সুখবাদের সত্যতা থেকে নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের সত্যতাকে পেতে চান তখন তাঁর যুক্তির মধ্যে পূর্বোক্ত ভ্রান্তিই ঘটে থাকে এবং এই ভ্রান্তি ঘটার কারণ হল 'desirable' কথাটির অর্থ নিয়ে। মিল নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের সমর্থনে যে যুক্তিটি দিয়েছেন তাহল এই—আমরা বস্তু দেখি, তাতেই প্রমাণ হয় বস্তু দৃশ্যযোগ্য (visible), আমরা শব্দ শুনি তাতেই প্রমাণ হয় শব্দ শ্রবণযোগ্য (audible), তেমনি আমরা সুখ কামনা করি এবং তাতেই প্রমাণ হচ্ছে সুখ কামনার যোগ্য (desirable)। এক্ষেত্রে মিল কামনার যোগ্য (desirable) কথাটির অর্থ বুঝতে ভুল করেছেন। শ্রবণযোগ্য (audible) মানে যা শোনা যায়, দৃশ্যযোগ্য (visible)

মানে যা দেখা যায়। কিন্তু কামনার যোগ্য (desirable) মানে এটা নয় যা কামনা করা হয়, এর যথার্থ অর্থ হচ্ছে, যা কামনা করা উচিত। সাধারণতঃ মানুষ কোন বস্তু কামনা করলেও তা কামনার যোগ্য, এটা প্রমাণিত হল না। স্বাভাবিকভাবে মানুষ সুখ কামনা করে (মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ), তার থেকে এই সিদ্ধান্তে যুক্তিযুক্তভাবে আসা যায় না যে সুখ মানুষের জীবনে কামনার যোগ্য বা একমাত্র কাম্যবস্তু হওয়া উচিত (নীতিবিজ্ঞান-সম্মত সুখবাদ)।

মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদের চরম রূপও নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি বলি আমরা সাধারণতঃ নিজেদের সর্বাধিক পরিমাণ সুখ কামনা করি, তাহলে আমাদের নিজেদের সর্বাধিক পরিমাণ সুখ কামনা করা উচিত, বলা অর্থহীন। অবশ্য যদি মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদের চরম রূপকে স্বীকার করে না নিয়ে আমরা বলি এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষ স্বাভাবিক-ভাবে সুখ কামনা করে, তাহলে নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের নিজের বা অপরের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সুখ অনুসন্ধান করা উচিত। যাই হোক না কেন, যেমন ভাবেই আমরা উভয় মতবাদকে বর্ণনা করি না কেন, উভয়ের মধ্যে কোন অনিবার্য যোগাযোগ নেই।

৮। উপযোগবাদের গুণ (Merits of Utilitarianism):

উপযোগবাদ যদিও দোষমুক্ত নয়, তবু তার গুণকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। মিল, বেস্থাম প্রমুখ উপযোগবাদীরা আত্মসুখ ছাড়াও দশের সুখের কথা বলে মতবাদ হিসেবে সুখবাদের মর্যাদা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া, সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখের কথা বলে তাঁরা আইন সম্পর্কীয় এবং রাষ্ট্রীয় সংস্কারসাধনে অনেকখানি সহায়তা করেছেন।

উপযোগবাদীরা সুখবাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন

কেবলমাত্র নিজের সুখের কথা ভাবলেই চলবে না, অপরের সুখের কথাও চিন্তা করতে হবে—এ মতবাদ প্রচার করে তৎকালীন সামাজিক দুর্নীতির সংস্কারসাধনেও তাঁরা যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। এ ছাড়া, যে কোন লোক সাধারণতঃ যেমন আত্মসুখবাদকে নিছক স্বার্থবাদ থেকে পৃথক করে না, তেমনি স্বাভাবিকভাবে পরসুখবাদকে যথার্থ মতবাদ বলে মনে করে। উপযোগবাদকে কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও শ্রেয় বলে মনে করেন। একজন কবির ভাষায় উপযোগবাদের মূল কথা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবর্তনসম্মত সুখবাদ
(Evolutionary Hedonism)

১। নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের প্রয়োগ
(Application of Theory of Evolution in the field of Morality) :

বিবর্তনবাদ অনুসারে বর্তমানে পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখতে পাই সৃষ্টির প্রারম্ভে তা ঠিক এ রকম ছিল না বা দূর ভবিষ্যতে ঠিক এরূপ থাকবে না। বিবর্তনবাদ অনুসারে জগৎ ও জগতের প্রতিটি বস্তুই সহজ ও সাধারণ অবস্থা থেকে শুরু করে ক্রম-পরিবর্তনের মারফত জটিল থেকে জটিলতর হতে হতে বর্তমান অবস্থায় পৌচেছে। এ জগতের কো· বস্তুকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসটুকু জানা প্রয়োজন।

বিবর্তনবাদ বলতে কি বুঝি

বর্তমান সময়ে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন যে, নীতিবোধ বা নৈতিকতারও বিবর্তন ঘটেছে এবং তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসটুকু না জানলে নৈতিকতার স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। নৈতিকতাও অনেক পূর্বে শুরু হয়েছে, ধাপে ধাপে তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং বর্তমান সভ্য মানুষের মধ্যে তাকে অনেকটা উন্নতরূপে দেখতে পাচ্ছি। হেগেল (*Hegel*) এবং কোঁৎ (*Comte*)-ই সর্বপ্রথম বিবর্তনবাদের ধারণাটিকে সকলের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছেন। সৌরজগতের উৎপত্তির ক্ষেত্রে ল্যাপলেস (*Laplace*) এই বিবর্তনবাদকে প্রয়োগ করেছেন। ডারউইন (*Darwin*)-এর জৈবিক বিবর্তনবাদ (Biological evolution) অনুসারে যে কোন শ্রেণীর প্রাণী তার পূর্ববর্তী কোন শ্রেণী থেকে বিকাশলাভ করেছে এবং যে নিয়মের ভিত্তিতে এই ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন ঘটেছে তাহল প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the Fittest)।

নীতিবোধেরও বিবর্তন ঘটেছে

স্পেন্সার জগতের প্রতিটি বিভাগে এই বিবর্তনবাদের প্রয়োগ করেছেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদকে কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তাই আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এ মতবাদ অনুযায়ী মানুষের আচরণ এবং যে আদর্শ বা মানদণ্ড অনুযায়ী মানুষের আচরণ বিচার করা হয়—উভয়েরই বিবর্তনের ফলে ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

হার্বার্ট স্পেন্সার, লেসলি স্টিফেন এবং আলেকজাণ্ডার (*Alexander*) প্রচারিত যে সুখবাদ তাকেই বলা হচ্ছে বিবর্তনসম্মত সুখবাদ (Evolutionary Hedonism)। হার্বার্ট স্পেন্সার সর্বপ্রথম এই বিবর্তনবাদকে নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে পশুদের নীতি-বহির্ভূত (Non-moral) আচরণ থেকেই ক্রমশঃ নীতির উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ। বিবর্তন বা ক্রমাভিব্যক্তির আদি এবং অনাগত অন্তিম স্তর আমাদের জানা নেই। আমরা কেবল নৈতিক উন্নতির বর্তমান রূপটুকুই দেখতে পাচ্ছি। এমন নৈতিক জীবনের বিবর্তনমূলক ব্যাখ্যা করতে হলে দুভাবে এ ব্যাখ্যা সম্ভব—ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসারে অথবা পরিণতিমূলক প্রণালী অনুসারে। আমরা হয় নীতির প্রারম্ভ অবস্থা কল্পনা করে সেই অনুসারে তার পরবর্তী অবস্থার ব্যাখ্যা করতে পারি, অথবা নীতির শেষ বা লক্ষ্য কি তা নির্ণয় করে সেই অনুসারে তার ব্যাখ্যা করতে পারি। হার্বার্ট স্পেন্সার এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ নৈতিকতার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রণালী (Historical Method) প্রয়োগ করেছেন। হেগেল, গ্রীন এবং অন্যান্য ভাববাদীরা নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা আদর্শকে সামনে রেখে নীতি ব্যাখ্যা করেছেন; অর্থাৎ তাঁরা পরিণতিমূলক প্রণালী (Teleological Method) ব্যবহার করেছন।

নৈতিক জীবনের বিবর্তনসম্মত ব্যাখ্যা দু ভাবে সম্ভব

হার্বার্ট স্পেন্সার বিবর্তনবাদকে নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন

২। হার্বার্ট স্পেন্সার-এর মতবাদ:

নৈতিক জীবন কিভাবে শুরু হল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পেন্সার নিম্নস্তরের জীবনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। এজন্য তিনি নৈতিক নিয়মের উৎসরূপে জীববিদ্যার নিয়মকে (Biological Laws) নির্দেশ করেছেন। তার মতে নীতিবিজ্ঞানের কাজ হল কোন্ কোন্ জৈবিক নিয়ম (Laws of Life) অনুসারে কী ধরনের কাজ সুখ উৎপন্ন করে এবং কী ধরনের কাজ দুঃখ উৎপন্ন করে তা নির্ণয় করা এবং তাই হবে আমাদের আচরণের নিয়ম যার দ্বারা কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা হবে। স্পেন্সার-এর মতে জীবের আচরণ হল সে-সব কার্যকলাপ যার দ্বারা সে নিজের দেহ-যন্ত্রটিকে (organism) পরিবেশের (environment) সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। তাঁর মতে 'জীবন হল বাইরের সম্বন্ধের সঙ্গে অন্তরের সম্বন্ধের অবিরত সামঞ্জস্য' (Life is the continuous adjustment of internal relations to external relations)। আচরণের ভাল-মন্দ কিভাবে বুঝব? মানুষ যখন নিজের কাজকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তখন তার আচরণ হয় ভাল, না পারলে মন্দ। সে আচরণ আপেক্ষিকভাবে

পরিবেশের সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্য আচরণের ভাল-মন্দ নির্ণয় করে

ভাল যে আচরণ মোটের ওপর দুঃখের তুলনায় সুখই বেশী উৎপাদন করে; অর্থাৎ এ জাতীয় আচরণ পরিবেশের সঙ্গে দেহের অধিকতর 'সামঞ্জস্য' আনতে সমর্থ হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ভাল বলতে বুঝব 'সুসামঞ্জস্য', মন্দ বলতে বুঝব 'অ-সামঞ্জস্য'।

হার্বার্ট স্পেন্সার সুখ-দুঃখের জৈবিক মূল্য এভাবে নির্ণয় করেছেন—সুখ জীবনীশক্তিকে বর্ধিত করে, দুঃখ জীবনশক্তিকে হ্রাস করে। কাজেই যে সব কাজে সুখ হয় সেগুলি জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে ও বাড়িয়ে দেয়, দুঃখজনক কাজ জীবনকে কমিয়ে দেয় বা ধ্বংস করে। এজন্য তাঁর মতে যে কাজে জীবনীশক্তি বাড়ে তাই করা আমাদের কর্তব্য, অর্থাৎ জীবনের দৈর্ঘ্য ও বৈচিত্র্য বাড়ানই আমাদের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর মতে জীবনের চরম লক্ষ্য হল সুখ, কিন্তু জীবনের আসন্ন লক্ষ্য হল জীবনের দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার (length and breadth of life)।

সুখ জীবনীশক্তিকে বর্ধিত করে, দুঃখ জীবনশক্তিকে হ্রাস করে

স্পেন্সার-এর মতে নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে সকল অনুশাসন আছে তারা হল রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুশাসন। এগুলি বেন্থাম-এর বাইরের নিয়ন্ত্রণের অনুরূপ। এছাড়া আছে এক জাতীয় শাসন তাকে বলা হয় নৈতিক অনুশাসন (moral control)। কর্তব্যবোধ বা নৈতিক বাধ্যতাবোধই আমাদের নীতির ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রতিরোধক, যা অন্যায় আচরণ থেকে আমাদের বিরত করে। নৈতিক বাধ্যতাবোধের দুটি উপাদান পাই—একটি প্রভুত্বব্যঞ্জক (authoritative) এবং অপরটি বাধ্যতামূলক (coercive)। নৈতিক বাধ্যতাবোধ হল মধ্যবর্তী ব্যাপার, এটা পূর্বে ছিল না, পরেও থাকবে না। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অসম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের ফলেই এর উদ্ভব। যখন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে, তখন কর্তব্যবোধ বা নৈতিক বাধ্যতাবোধের কিছুই থাকবে না। মানুষ তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সদাচরণ করবে।

নৈতিক বাধ্যতাবোধের দুটি উপাদান

স্পেন্সার-এর মতে আত্মসুখ এবং পরসুখবাদের মধ্যে যথার্থ কোন বিরোধিতা নেই। সহানুভূতি ও সমবেদনার পূর্ণ বিকাশের ফলে আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদের যে বিরোধিতা, তা দূরীভূত হবে। আত্মসুখবাদ এবং পরসুখবাদ উভয়ই সত্য। আত্মরক্ষা এবং আত্মত্যাগ উভয়ই মানুষের জন্মগত বা স্বভাবগত প্রবৃত্তি। 'নিজের জন্য জীবন'—এ নীতি যেমন ভ্রান্ত; 'পরের জন্য জীবন'—এ নীতিও তেমনিই ভ্রান্ত। যে মানুষ একেবারেই স্বার্থপর সে খুব বেশী সুখ পেতে পারে না। যে ব্যক্তি খুব বেশী

স্পেন্সারের মতে আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদের মধ্যে বিরোধিতা নেই

স্বার্থশূন্য সে আবার অপরকে সুখী করতে পারে না। ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষ যখন আদর্শ অবস্থায় উপনীত হবে তখন কর্তব্যকর্মের সুখ নিজের ও অপরের উভয় ক্ষেত্রে সুখদায়ক হবে।

হার্বার্ট স্পেন্সার দু ধরনের নীতিবিজ্ঞানের কথা বলেছেন ; যথা—(১) নিরপেক্ষ নীতিবিজ্ঞান (Absolute Ethics) এবং (২) সাপেক্ষ নীতিবিজ্ঞান (Relative Ethics)। নিরপেক্ষ নীতিবিজ্ঞান এমন কতকগুলি কর্তব্যের নির্দেশ দেয় যেগুলি সর্বত্রুটিমুক্ত আদর্শ-সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যে আদর্শ সমাজে ব্যক্তি এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি স্থাপিত হবে। অপর দিকে সাপেক্ষ নীতিবিজ্ঞান এমন কর্তব্যের কথা বলে যেগুলি ত্রুটিপূর্ণ সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয়। ত্রুটিপূর্ণ সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটে না। হার্বার্ট স্পেন্সার বিশ্বাস করেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে এবং ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ দুটি মিশে এক হয়ে যাবে। কল্পনার স্বর্গরাজ্য তখন বাস্তবতা লাভ করবে, নৈতিক বাধ্যতাবোধ বলে কিছুই থাকবে না, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদাচরণ করবে। লিলির মতে স্পেন্সার-এর মতবাদের ওপর তিনটি বিষয়ের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় ; যথা—(১) তার সময়কার উপযোগবাদ যা তার মতবাদে সুখবাদকে টেনে এনেছে, (২) জৈবিক বিবর্তনবাদ, (৩) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ।[1]

সমালোচনা (Criticism) : হার্বার্ট স্পেন্সার-এর বিবর্তনসম্মত সুখবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি আনা যায়। যথা—

(ক) বিবর্তনবাদ নৈতিক নিয়মের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা গ্রহণ করা যায় না। বাস্তব থেকে আদর্শকে কখনও পাওয়া সম্ভব নয়। নীতিনিরপেক্ষ বিষয় থেকে নৈতিক নিয়ম পাওয়া সম্ভব নয়। জৈবিক নিয়ম থেকে নৈতিক নিয়মকে নিঃসৃত করা যায় না।

নৈতিক নিয়মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়

(খ) ম্যাকেঞ্জি বলেন, স্পেন্সার-এর মতবাদ যেন ঘোড়ার সামনে গাড়িকে জুড়ে দেওয়া। স্পেন্সার মনে করেন, নৈতিক উন্নতি হল ব্যক্তির কাজের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের সামঞ্জস্যসাধন। কিন্তু কোন দুটি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি নেই, তা কিভাবে নির্ণীত হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, অবশ্য কোন আদর্শের সাহায্যে। এজন্যই স্পেন্সার আদর্শকে সামঞ্জস্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আসল অবস্থাকে উল্‌টিয়ে দিয়েছেন।

সামঞ্জস্য দ্বারা আদর্শের ব্যাখ্যা হয় না

1, William Lillie : An Introduction to Ethics ; Pages 204-205,

(গ) হার্বার্ট স্পেন্সার সুখ ও দুঃখের যে স্বরূপ নির্ণয় করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুখানুভূতি সকল সময় জীবনীশক্তিকে বাড়ায় না, অনেক সময় জীবনীশক্তির ক্ষয় করে। আবার দুঃখানুভূতি সকল সময় জীবনীশক্তিকে ক্ষয় না করে বর্দিতও করতে পারে। এছাড়া, আমরা পূর্বেই দেখেছি, কাজের মূল উৎস সুখ-দুঃখের অনুভূতি নয়; কাম্যবস্তু লাভ করতে সফল বা বিফল হলেই সুখ-দুঃখের অনুভূতি মনে জাগে।

(ঘ) জীবনের আসন্ন লক্ষ্য (Proximate end of life) জীবনের দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার নয়। দীর্ঘ আয়ুই নৈতিক জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। জীবনের বিস্তার বা বৈচিত্র্যও নিজগুণে কাম্য নয়। জীবনের দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার জৈবিক আদর্শ হতে পারে, কিন্তু নৈতিক আদর্শ নয়।

জীবনের আসন্ন লক্ষ্য জীবনের দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার নয়

(ঙ) নৈতিক ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন জৈবিক ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের অংশরূপে গণ্য হতে পারে না। জৈবিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতার স্থান নগণ্য। পরিবেশের প্রভাব এবং বংশগতি (heredity) এখানে প্রধান কার্যকর শক্তি। কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতা নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য। নৈতিক উন্নতি যতটা সামাজিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে তার থেকে বেশি নির্ভর করে ঐচ্ছিক ক্রিয়া, আর নৈতিক অন্তর্দৃষ্টির ওপর।

নৈতিক ক্রমবিকাশ জৈবিক ক্রমবিকাশের অংশরূপে গণ্য হতে পারে না

(চ) নৈতিক চেতনার উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পেন্সার সমাজের, রাষ্ট্রের এবং ধর্মের অনুশাসনের কথা বলেছেন। বাইরের অনুশাসন কখনও নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারে না। এগুলি শারীরিক বাধ্যতাবোধ সৃষ্টি করতে পারে।

বাইরের অনুশাসন নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারে না

(ছ) হার্বার্ট স্পেন্সার নৈতিক বাধ্যতাবোধ যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তিনি মনে করেন, নৈতিক বাধ্যতাবোধ মধ্যবর্তী ব্যাপার এবং আদর্শ সমাজে নৈতিক বাধ্যতাবোধ বলে কিছু থাকবে না। কিন্তু নৈতিক বাধ্যতাবোধ না থাকলে নৈতিকতাও থাকতে পারে না। নৈতিক উন্নতি যতই বাড়বে, নৈতিক বাধ্যতাবোধ ততই গভীর হবে। নৈতিক আদর্শ অনন্ত। ব্যক্তির এক জীবনে তাকে পূর্ণভাবে লাভ করা যেতে পারে না। সুতরাং, নৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে নৈতিক বাধ্যতাবোধ চিরকাল বর্তমান থাকবে।

হার্বার্ট স্পেন্সার নৈতিক বাধ্যতাবোধ ব্যাখ্যা করতে পারেননি

(জ) হার্বার্ট স্পেন্সার-এর নিরপেক্ষ নীতিবিজ্ঞানের (Absolute Ethics) ধারণা ভ্রান্ত। তিনি মনে করেন এমন এক সময় আসবে যখন সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির পূর্ণ

সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে বা মানুষেরই বাইরের সঙ্গে তার ভেতর অংশের এমন পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে যে, বিরোধ, দুঃখ, ত্রুটি বা অভাব সকল কিছুই লোপ পাবে এবং পূর্ণ সামঞ্জস্য, সুখ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এরকম পূর্ণ সামঞ্জস্য কি কখনও সম্ভব? মুরহেড-এর মতে এ জাতীয় পূর্ণ সামঞ্জস্যের কথা বিবর্তন কিছুই জানে না। তিনি বলেন, "যেখানে জীবন সেখানেই বিকাশ। একমাত্র মৃত্যুতেই (ব্যক্তিগত বা জাতিগত) পূর্ণ সামঞ্জস্য আসতে পারে।"[1]

৩। লেসলি স্টিফেন-এর মতবাদ:

যদিও লেসলি স্টিফেন বিবর্তনমূলক সুখবাদের সমর্থক তবুও স্পেন্সার-এর সঙ্গে তাঁর মতবাদের পার্থক্য আছে। স্টিফেন-ই সমাজের আঙ্গিক স্বরূপের (Organic nature) কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কী? লেসলি স্টিফেন আঙ্গিক মতবাদ (Organic Theory) সমর্থন করে বললেন যে, সমাজ হল একটি অবয়বী এবং জীবদেহের বিভিন্ন অবয়বের সঙ্গে জীবের যেরূপ সম্পর্ক সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজেরও সেরূপ অবয়ব-অবয়বী সম্পর্ক। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ যেরূপ একে অপরের ওপর এবং প্রত্যেকে সমগ্র জীবদেহের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পরের ওপর এবং সমাজের ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির পৃথক সত্তা বলে কিছুই নেই। জীবদেহের যেরূপ বৃদ্ধি ও বিকাশ আছে, সমাজ-অবয়বীরও সেরূপ বৃদ্ধি ও বিকাশ আছে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অন্তঃস্থ সম্পর্ক, (internal relation) বাহ্যিক সম্পর্ক নয়।

স্টিফেন সমাজের আঙ্গিক স্বরূপের ওপর জোর দেন

লেসলি-স্টিফেন উপযোগবাদকে অর্থাৎ বেন্থাম এবং মিল-এর মতবাদকে সমর্থন করেননি। জীবনের চরম লক্ষ্য সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ (the greatest happiness of the greatest number) নয়, কারণ ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর মতে নৈতিক আদর্শ হল সমাজের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, অর্থাৎ যে কাজ সমাজের স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার উপযোগী, সে কাজ ভাল, আর যে কাজ সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তা মন্দ। নৈতিক নিয়ম হল সমাজদেহের জীবনীশক্তি বজায় রাখার এবং বাড়াবার জন্য অপরিহার্য উপকরণ। বিবেক কোন অদৃশ্য শক্তি নয়, এ হল সমাজের বাণী—সমাজ কল্যাণকে সম্ভব করার জন্য সমাজের প্রাথমিক প্রয়োজনকে পূরণ করার দাবি।

যে কাজ সমাজের স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখে সে কাজই ভাল

1. "Where there is life there is progress. In death alone (individual or national) there is final equilibrium." —Muirhead : Elements of Ethics.

সহানুভূতি হল মানুষের জন্মগত সামাজিক প্রবৃত্তি। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও এই সহানুভূতিরূপ সামাজিক প্রবৃত্তির বিবর্তন ঘটতে থাকে।

হার্বার্ট স্পেন্সার-এর নিরপেক্ষ নীতিবিজ্ঞানকে (Absolute Ethics) লেসলি স্টিফেন মেনে নেননি। হার্বার্ট স্পেন্সার-এর মতো তিনি কোন আদর্শ সমাজের প্রতিরূপে বিশ্বাস করেন না যার অভিমুখে সমাজ অগ্রসর হচ্ছে। সমাজের স্বাস্থ্যকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখা এবং তার সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করাই মানুষের পরম লক্ষ্য। সামাজিক সমতা রক্ষা করার দক্ষতাই হল ব্যক্তির লক্ষ্য।

সমালোচনা (Criticism): লেসলি স্টিফেন-এর বিবর্তনসম্মত সুখবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি উত্থাপন করা যেতে পারে। যথা—

(ক) স্টিফেন সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে এবং ব্যক্তিকে জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে যে হুবহু তুলনা করেছেন তা সঙ্গত হয়নি। তুলনামূলক সামঞ্জস্যের একটা সীমা আছে, তাঁকে বেশী দূর টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিজস্ব কোন সত্তা নেই, কিন্তু সমাজস্থ ব্যক্তিদের নিজস্ব সত্তা আছে, চেতনা আছে।

(খ) সমাজদেহের স্বাস্থ্যের কথা বলাও রূপক মাত্র। আমরা যখন সুখের কথা বলি তখন সমাজদেহের সুখের কথা বললেও আসলে বুঝি সমাজ যে সকল ব্যক্তি নিয়ে গঠিত তাদের সুখ। ব্যক্তির মনকে ছাড়িয়ে সমাজের আলাদা কোন মন নেই। সমাজদেহের স্বাস্থ্য বলতে বুঝি সমাজের কতকগুলি নিয়ম-পদ্ধতি যে গুলিকে মেনে চললে সমাজস্থ ব্যক্তিরা সুখে থাকে। কিন্তু স্টিফেন সমাজদেহ কথাটি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে।

সমাজদেহ কথাটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে

(গ) যখন লেস্‌লি স্টিফেন সমাজ-স্বাস্থ্যকেই নৈতিক আদর্শ বলে মনে করেন, তখন তিনি সুখবাদকে বর্জন করেন। সমাজ-স্বাস্থ্য বললে ব্যক্তির সুখকেই বুঝতে হবে এমন কথা নেই, বরং পূর্ণতাবাদেই (Perfectionism) আমরা এর সমাধান খুঁজে পাই। পূর্ণতাবাদে বলা হয়েছে, সমাজের মাধ্যমেই ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতা লাভ সম্ভব।

৪। আলেকজাণ্ডার-এর মতবাদঃ

আলেকজাণ্ডার-এর মতে সমাজের সাম্যাবস্থাই (Equilibrium of the Society) মানুষের পরমকল্যাণ এবং নৈতিক আদর্শ। ব্যক্তির আচরণের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া এবং সকল প্রকার বিরোধিতা দূরীভূত হওয়াই মানুষের পরমকল্যাণ।

নৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেন তার সরল অর্থ হল এই যে, নৈতিক আদর্শ হল একটা মাপকাঠি বা মানদণ্ড যার সাহায্যে আমরা মানুষ বা তার কাজকে বিচার করি। এ মানদণ্ডের সহায়তায় বিভিন্ন কামনা-বাসনার মধ্যে সমতা এনেই নৈতিক আদর্শকে লাভ করা যেতে পারে। এই সুসমাঞ্জস্যপূর্ণ আচরণই পরমকল্যাণ।[1]

সমাজের সাম্যাবস্থাই মানুষের পরম কল্যাণ এবং নৈতিক আদর্শ

জীবজগতে বিবর্তনবাদের প্রয়োগ করতে গিয়ে বিবর্তনবাদীরা প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) বা যোগ্যতমের উদবর্তনকে (Survival of the Fittest) স্বীকার করেছেন। আলেকজাণ্ডার এই প্রাকৃতিক নির্বাচনকে নীতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। নীতির ক্ষেত্রে এর অর্থ হল দোষযুক্ত আদর্শ দোষমুক্ত আদর্শের স্থান দখল করে। মানুষের নৈতিক জীবনে এই 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও সমতাযুক্ত আচরণই রক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন মানে এই নয় যে, শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে ধ্বংস করে। নৈতিক প্ররোচনার ফলে দোষযুক্ত ও সঙ্গতিশূন্য আচরণের স্থান দখল করে দোষমুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ। যে আচরণ সমাজকল্যাণের উপযোগী সে আচরণই টিকে থাকে। আলেকজাণ্ডার এইভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে নৈতিক আদর্শের উৎপত্তির কথা বলেন।

সমালোচনা (Criticism) : (ক) আলেকজাণ্ডারও লেসলি স্টিফেনের মত মেনে নিয়েছেন, সামাজিক সাম্যাবস্থাই হল পরমকল্যাণ। কিন্তু কেন আমরা সামাজিক সাম্যাবস্থাকে পরমকল্যাণ বলে মনে করব—এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর আলেকজাণ্ডার দেননি।

(খ) আলেকজাণ্ডার প্রাকৃতিক নির্বাচনকে (Natural Selection) নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু এ প্রয়োগ যথাযথ হয়নি। তাঁর মতে নীতির ক্ষেত্রে যখন প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলি তখন আমরা 'যাঁরা যোগ্যতম তাঁরাই বেঁচে থাকবে'—এ অর্থে তাকে প্রয়োগ করি না। নিম্নতর আদর্শের তুলনায় উচ্চতর আদর্শই জয়লাভ করবে বা টিকে থাকবে, এ হল নীতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল কথা। কিন্তু একে কোন মতেই প্রাকৃতিক নির্বাচন বলা চলে না। একমাত্র চেতনাযুক্ত মানুষই নৈতিক জগতে নির্বাচন করতে পারেন। নীতির ক্ষেত্রে জীববিদ্যা-সম্পর্কীয় ধারণাগুলি প্রয়োগ করা সুসঙ্গত নয়।

প্রাকৃতিক নির্বাচনকে নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না

1. Alexander : Moral Order and Progress; Page 999.

(গ) নীতির ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের প্রয়োগও সুপ্রযুক্ত নয়। ক্রমবিকাশ বলতে আমরা নিছক পরিবর্তন বুঝি না, পরন্তু বুঝি নিম্নাবস্থা থেকে উচ্চাবস্থায় পরিবর্তন। তাই যদি হয় তবে একটা আদর্শের আলোকেই ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, ক্রমবিকাশ আদর্শকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, বরং আদর্শই সমাজের ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করে। তাই শুরু দিয়ে নয়, বরং পরিণতি অনুসারে যে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করা দরকার, আলেকজাণ্ডার সেটা লক্ষ্য করেননি।

নীতির ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের প্রয়োগ সুপ্রযুক্ত নয়

৫। বিবর্তনসম্মত সুখবাদের সাধারণ ব্যাখ্যা (General Explanation of Evolutional Hedonism) ঃ

বিবর্তনবাদ অনুসারে এ জগৎ এবং জগতের প্রতিটি বস্তু বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। নৈতিক চেতনাও বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে এবং নৈতিক চেতনার বিবর্তন প্রাকৃতিক বিবর্তনেরই অংশস্বরূপ। স্পেন্সার, লেসলি, স্টিফেন, এবং আলেকজাণ্ডার এই বিবর্তনবাদের সমর্থক।

নৈতিক চেতনা বিবর্তনেরই ফল

অধিকাংশ বিবর্তনবাদী মনুষ্য সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেন এবং মনে করেন দেহের যেরূপ বিকাশ ঘটে সমাজেরও সেরূপ বিকাশ ঘটেছে। তাঁদের মতে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক এবং ব্যক্তি ছাড়া সমাজের কোন অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তি সমাজদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ ও সমাজের কল্যাণসাধন করেই ব্যক্তি তার নিজ কল্যাণ বা পূর্ণতালাভ করতে পারে। সুখই হল ব্যক্তির চরম লক্ষ্য কিন্তু সমাজ দেহের স্বাস্থ্য অটুট ও অক্ষুণ্ণ রেখে এবং এর বিকাশসাধন করেই ব্যক্তি তার সুখ পেতে পারে।

সমাজ দেহের স্বাস্থ্য নৈতিক আদর্শ

সহানুভূতি, সমবেদনা পরোপকার বৃত্তি এসব গুণগুলি মানুষ নিজের জীবনে নিজের অভিজ্ঞতায় অর্জন করেনি। এ গুণগুলি অর্জন করতে প্রচুর সময় লেগেছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এগুলি অভিজ্ঞতার সাহায্যে অর্জন করেছেন। আমরা এগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। বংশপরম্পরায় এগুলি আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়ে বর্তমানে এগুলি আমাদের জন্মগত প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে।

বিবর্তনবাদের বৈশিষ্ট্য হল যে, এটা দুটি বিরোধী মতবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করেছে। কোন কোন লেখকের মতে জীবনের শুরুতে আমরা আত্মসুখের কথাই চিন্তা করি এবং পরে জীবনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরের সুখের কথা

চিন্তা করি ও পরের মঙ্গলসাধন করা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। এই মতবাদের বিরোধিতা করে অপর লেখকেরা বলেন যে, পরোপকার প্রবৃত্তি আমাদের সহজাত (innate) প্রবৃত্তি, অভিজ্ঞতার পরে নয়, অভিজ্ঞতার পূর্বেই আমরা এর অধিকারী হই। সুতরাং প্রশ্ন হল, এই পরোপকার প্রবৃত্তি আসে অভিজ্ঞতার পরে (*a posteriori*) না অভিজ্ঞতার পূর্বে (*a priori*)? বিবর্তনবাদীরা এই দুই বিরোধী মতের সমন্বয় সাধন করে বলেন, উভয় মতই আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাঁরা বলেন; পরোপকার প্রবৃত্তি আমাদের পূর্বপুরুষগণ অভিজ্ঞতার সাহায্যে লাভ করেছেন এবং বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে এগুলি আমরা লাভ করেছি। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে এগুলি সহজাত প্রবৃত্তি। এই পরোপকার প্রবৃত্তি আমাদের পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালব্ধ (*a posteriori*) এবং বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ফলে বংশপরম্পরায় এগুলি আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়েছে। আমাদের কাছে এগুলি জন্মগত, সহজাত বা অভিজ্ঞতা-পূর্ব (*a priori*) প্রবৃত্তি।

বিবর্তনবাদ দুটি বিরোধী মতবাদের সমন্বয় সাধন করেছে

পরোপকার প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতার পরে আসে, না পূর্বে আসে

বিবর্তনবাদীরা আত্মসুখ ও পরসুখবাদের মধ্যেও সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন। বিবর্তনবাদীদের মতে মানুষ প্রথমে নিজের সুখ, স্বার্থ, কামনা, বাসনার তৃপ্তির কথাই চিন্তা করত। কিন্তু বহু অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ উপলব্ধি করল যে কিছুটা স্বার্থত্যাগ করেই তবে নিজের সুখ লাভ করা যায়। সুতরাং, ব্যক্তি নিজে সুখ পাবে বলে অপর দশের সুখের কথাও ভাবতে শুরু করল। এই উদ্দেশ্যেই সে সমাজকে সুগঠিত করল, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করল এবং সকলের সুখের জন্যই সমাজপতি এবং রাষ্ট্রের শাসকবর্গের হাতে নিজের অধিকার সমর্পণ করল। এভাবে আত্মত্যাগের মধ্যেই সে নিজের আত্মসুখ প্রসারের পথ খুঁজে পেল। সুতরাং ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষ হয়েছে পরসুখকামী।

আত্মসুখবাদের ও পরসুখবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন

বিবর্তনবাদীদের মতে নীতিবিজ্ঞানের কাজ হল সামাজিক এবং জৈবিক নিয়মগুলি থেকে নৈতিক নিয়মগুলিকে নিঃসৃত করা। জীবনের এবং সমাজের বিকাশের জন্য যে সব নীতি এবং প্রথা মানা দরকার সেগুলি থেকেই নৈতিক নিয়মগুলিকে পাওয়া যাবে।

বিবর্তনবাদীরা সুখবাদীদের সুখ-গণনা-প্রণালীকে (Hedonistic Calculus) গ্রহণ করেননি। উপযোগবাদীদের (Utilitarians) মতে একটি সুখের পরিমাণকে আর একটি সুখের পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের কর্মধারাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত

করতে হবে যাতে সর্বাধিক পরিমাণ সুখলাভ হয়। কিন্তু বিবর্তনমূলক সুখবাদীরা মনে করেন যে, সুখের এ রকম গণনা বা হিসেবের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, মানুষ সহজাত বা জন্মগত প্রবৃত্তির বশেই সমাজ-দেহের স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য সচেষ্ট হয়। সমাজদেহের স্বাস্থ্যরক্ষা করা মানে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের কথা চিন্তা করা, কারণ সামাজিক কল্যাণের মাধ্যমেই ব্যক্তির কল্যাণকে লাভ করা যায়।

বিবর্তনবাদীরা সুখ-গণনা-প্রণালীকে গ্রহণ করেননি

সমালোচনা (Criticism): (ক) বিবর্তনবাদ নৈতিক আদর্শকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। মানুষের নৈতিক আদর্শের স্বরূপ নির্দেশ করাই নীতিবিজ্ঞানের কাজ। মানুষের নৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের কথা নীতিবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। নৈতিক জীবনের বিকাশ সম্পর্কে বিবর্তনবাদ আলোকপাত করে কিন্তু নৈতিক আদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং 'ভাল-মন্দ', 'যথোচিত' ও 'অনুচিত' প্রভৃতি নৈতিক ধারণার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে এ মতবাদ অসমর্থ।

(খ) বিবর্তনবাদের মতে স্বার্থবোধ থেকেই পরার্থবোধ উদ্ভূত হয়, এ ধারণা ভ্রান্ত। যে পরার্থবোধ স্বার্থবোধ থেকে উদ্ভূত হয় তা আসলে ছদ্মবেশী স্বার্থবোধ। মানুষ যদি নিজের সুখলাভের জন্যই পরহিতসাধনে ব্রতী হয় তবে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা যথোচিত আচরণ হবে না।

স্বার্থবোধ থেকে পদার্থবোধের উদ্ভব হতে পারে না

(গ) বিবর্তনসম্মত সুখবাদ যখন সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং বিকাশসাধনকেই সর্বাধিক পরিমাণ সুখ লাভের উপায় বলে মনে করে তখন প্রকৃতপক্ষে তা সুখবাদকে বর্জন করে; অর্থাৎ বিবর্তনবাদের সঙ্গে সুখবাদের কোন সঙ্গতি নেই। সুখবাদ অনুযায়ী সুখই একমাত্র কাম্যবস্তু। অথচ সমাজের স্বাস্থ্য বা স্থায়িত্ব মারফত ব্যক্তি নিজের সুখলাভ নাও করতে পারে।

(ঘ) প্রাণিজগতে বিবর্তনবাদকে প্রয়োগ করা গেলেও নৈতিক জগতে তাকে সুসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা চলে না। নীতিনিরপেক্ষ বিষয় থেকে নীতির উদ্ভব সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, বিবর্তনের ফলে নতুন কিছুর উদ্ভবও সম্ভব নয়। বিবর্তনের ফলে যা সুপ্ত (implicit) থাকে তাই স্পষ্টরূপে প্রকটিত (explicit) হয়।

নৈতিক জগতে বিবর্তনবাদের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়

(ঙ) এছাড়া, জৈবিক বিবর্তন এবং নৈতিক বিবর্তন দুই-ই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। জৈবিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকাই বড় কথা; কিন্তু নীতির জগতে আদর্শসাধনই বড় কথা, তাতে মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন বড় নয়। নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

জৈবিক বিবর্তন ও নৈতিক বিবর্তন ভিন্ন জিনিস

৬। নীতির ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের প্রয়োজনীয়তা (Importance of the Theory of Evolution in the field of Ethics) :

মুরহেড নীতির ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের গুণাগুণ আলোচনা প্রসঙ্গে এ মতবাদের নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।[1]

(ক) বিবর্তনবাদ সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। সুখবাদ এবং বিচারবাদ উভয়েই সমাজের আঙ্গিক ঐক্যের (organic unity) দিকটার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। আত্মসুখবাদে ও পরসুখবাদে ব্যক্তিকে সকল সময়ই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়েছে এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যে আঙ্গিক সম্পর্ক তার ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। Cyrenaics-রা আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপনের ওপর জোর দিয়েছেন। Epicurean-রা মনে করেন, বন্ধুত্ব হল সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে আকস্মিক সম্পর্ক। Cynics এবং Stoics-রা স্পষ্টই সমাজকে উপেক্ষা করেছেন। Cynics-রা তো ছিলেন পুরোপুরি অসামাজিক। কাণ্ট-এর মতে সমাজ হল সেসব স্বার্থের রাজত্ব যা প্রকৃত আত্মোপলব্ধির পথে অন্তরায়স্বরূপ (Society is the field of the reign of interest hostile to true self-determination)। কিন্তু বিবর্তনবাদীরা যথার্থই বলেছেন যে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ককে আকস্মিক সম্পর্ক ধরে নিলে কোন মতবাদই নৈতিকতার যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

বিবর্তনবাদে সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে

(খ) বিবর্তনবাদ নীতির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historic Method) প্রয়োগ করেছে এবং বিবেকের নির্দেশ যে জন্মগত বৃত্তি তা স্বীকার করেননি। সমাজের বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তির এই বিবেকের বিশেষ সংযোগ আছে। নৈতিক ধারণা বা চেতনারও যে একটা ইতিহাস আছে, বিবর্তনবাদীরাই তা নির্দেশ করেছে।

বিবর্তনবাদীরা নৈতিক ধারণার যে ইতিহাস আছে, তা নির্দেশ করেছেন

(গ) নৈতিক জীবনে সুখের প্রকৃত স্থান কোথায়, একটি নতুন দিক থেকে বিবর্তনবাদ তা দেখিয়েছে। সুখ জীবনের প্রাণশক্তিকে বর্ধিত করে এবং সঞ্জীবিত করে। সুতরাং জীবনের ক্ষেত্রে সুখের এই অবদান একটা নতুন জিনিস।

বিবর্তনবাদীরা নৈতিক জীবনে সুখের নতুন স্থান নির্দেশ করেছেন

---

1. The elements of Ethics : Page 151.

সপ্তম অধ্যায়

কৃচ্ছ্রতাবাদ

(Rigorism)

১। কৃচ্ছ্রতাবাদ (Rigorism) ঃ

(ক) কৃচ্ছ্রতাবাদ কাকে বলে (What is Rigorism) ?[1] : কৃচ্ছ্রতাবাদ হল নৈতিক বিচারের মানদণ্ড সম্পর্কীয় একটি মতবাদ যে মতবাদ অনুসারে আত্ম-জয় বা আত্ম-অবদমনকে আচরণের আদর্শরূপে গণ্য করা হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই কাজের ঔচিত্য ও অনৌচিত্য বিচার করা হয়। অনুভূতির দাবী অগ্রাহ্য করে শুদ্ধ বিচার বুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য করা, নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ কর্তব্য করা, কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা এই মতবাদের নির্দেশ। অনুভূতির অবদমন খুবই ক্লেশ সাধ্য। তাই এই নৈতিক সাধনা খুবই কঠোর। তাই এই মতবাদ কৃচ্ছ্রতাবাদ নামে অভিহিত।

(খ) কৃচ্ছ্রতাবাদ বা বিচারবাদ এবং সুখবাদ (Rigorism or Rationalism and Hedonism) ঃ কৃচ্ছ্রতাবাদ বা বিচারবাদের বিভিন্ন রূপগুলি আলোচনা করার পূর্বে সুখবাদের সঙ্গে তার পার্থক্য নিরূপণ করা দরকার।

বিচারবাদীদের মতে অনুভূতি ও আবেগকে লুপ্ত করে দিয়ে বিশুদ্ধ চিন্তার জগতে বিচার করাই মানুষের কর্তব্য

আমরা দেখেছি যে, সুখবাদীদের মতে সুখই হল মানুষের পরমার্থ বা একমাত্র কাম্যবস্তু। সুখবাদীরা বিচারবুদ্ধির তুলনায় অনুভূতিকেই নৈতিক জীবনে প্রাধান্য দিয়েছেন ; অপরদিকে বিচারবাদীরা বিচারশক্তি বা বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দান করেছেন এবং বিচারশক্তিসম্মত সৎকর্ম সম্পাদনকেই জীবনের পরমকল্যাণ বলে মনে করেন। বিচারবাদীদের মতে অনুভূতি ও আবেগকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করে বিশুদ্ধ চিন্তা বা বুদ্ধির জগতে বিহার করাই মানুষের কর্তব্য। একমাত্র বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত জীবনই হল যথার্থ সততা।

সুখবাদীদের মতে সুখভোগই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ; বিচারবাদীদের মতে আত্ম-জয়ই জীবনের পরমকল্যাণ। সুখবাদীরা কামনা-বাসনার দাবীকে গুরুত্ব দেন ; বিচারবাদীরা কামনা-বাসনাকে নাশ করতেই উৎসুক। সুখবাদীরা মনে করেন,

---

1. "Rigorism (Latin rigor, inflexibility, severity, from rigere, to be stiff, to stand firm is "the view of moral life which sees in self-conquest or self-suppression the ideal of conduct. —P. B. Chatterjee, Principles of Ethics, P. 207

বিচারশক্তি হল অনুভূতির পরিচারিকা ; সুখলাভের উপায় নির্ধারণ করাই এর একমাত্র কাজ। বিচারবাদীরা মনে করেন, অনুভূতি নানা প্রলোভনের সঙ্গে মানুষকে জড়িয়ে তাকে কামনা-বাসনার ক্রীতদাস করে তোলে, অতএব অনুভূতির নিধনই নীতিনিষ্ঠ মানুষের একমাত্র কর্তব্য। বিচারবাদীদের মতে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব ; বিচারশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিই তার প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিচারবুদ্ধি-রহিত হয়ে কেবলমাত্র অনুভূতির দ্বারা চালিত পশু-জীবনযাপন করা মানুষের লক্ষ্য নয়। অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করে দিয়ে বিশুদ্ধ বুদ্ধির (Pure Reason) জীবন পরিচালিত করাই মানুষের কর্তব্য।

বিচারবাদী ও সুখবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

(গ) কৃচ্ছ্রতাবাদের বা বিচারবাদের বিভিন্ন রূপ (Different forms of Rigorism or Rationalism) : বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এ মতবাদ প্রসারলাভ করেছে। প্রাচীন গ্রীসে *Cynics* এবং *Stoics*-দের মতবাদের মাধ্যমে, মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক অনুশাসনে এবং বর্তমান যুগে কাণ্ট-এর কৃচ্ছ্রতাবাদ বা বিচারবাদের মধ্যে এ মতবাদ রূপায়িত হয়েছে। আমরা এখন এক একটি করে এদের আলোচনা করছি :

(ক) Cynics-দের মতবাদ (Cynicism) : প্রাচীন গ্রীসে এ মতবাদ প্রসারলাভ করেছিল। অ্যান্টিস্থেনিস (*Antisthenes*), ডায়োজেনিস (*Diagenes*) প্রমুখ ব্যক্তিরা নামকরা *Cynics* ছিলেন। এ মতবাদ অনুসারে নৈতিক আদর্শ হল সর্বপ্রকারে সুখ পরিহার করা। সততাই হল জীবনের পরম লক্ষ্য। সুখ-দুঃখের প্রতি পূর্ণ নির্বিকার ভাব ও কঠোর উদাসীনতা এবং কোন প্রবৃত্তির পরাধীন না হওয়াই নৈতিক জীবনের কাম্য বা লক্ষ্য। যতটুকু পার্থিব প্রয়োজন জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য তার বেশী কিছুর ওপর নির্ভর করা চলবে না ; তা না হলে আমাদের স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীন হতে হবে। পরনির্ভরতা মানেই পরাধীনতা। যেমন, যে ব্যক্তি অর্থের বাসনায় বা কামনায় উন্মত্ত, যে ব্যক্তি অর্থের অধীনতা স্বীকার করেছে, সে স্বাধীন নয়। পূর্ণ স্বাধীনতাতেই আত্মার কল্যাণ বা মঙ্গল।

Cynics-দের মতে নৈতিক আদর্শ হল সর্বপ্রকার সুখ পরিহার করা

কামনা-বাসনা হতে পূর্ণ স্বাধীনতাতেই আত্মার কল্যাণ

অতএব আত্মনির্ভরতাই একমাত্র কাম্য—আত্মনির্ভরতা হচ্ছে কোনরকম ঘটনা-চক্রের দাস না হওয়া বা পার্থিব প্রয়োজনের দ্বারা প্রবুদ্ধ না হওয়া। এজন্য আমাদের অভাবকে সীমিত করতে হবে; আমাদের কৃত্রিম প্রয়োজনকে একেবারে বর্জন করতে হবে, প্রকৃতির মুক্ত উদার অঙ্গনে আমাদের বিহার করতে হবে। মহাত্মা গান্ধীও প্রকৃতি-নির্ভর সহজ ও সরল জীবনযাত্রার কথা বলেছেন। *Cynic*-বাদ অনুসারে অনুভূতির দাবিকে অগ্রাহ্য করে

আত্মনির্ভরতার অর্থ কোনরকম ঘটনাচক্রের দাস না হওয়া

শুদ্ধ বিচারবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য করতে হবে। ঐশ্বর্যের লালসা থেকে বিরত হতে হবে এবং সমাজের প্রশংসা বা নিন্দাকে তুচ্ছ করতে হবে। এভাবে আত্মা অনুভূতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে পার্থিব প্রয়োজনের সংখ্যাকে যথাসম্ভব কমিয়ে চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভ করবে এবং সততা অর্জন করে যথার্থ শান্তি ও কল্যাণ লাভ করবে। এ হল *Cynics*-দের বক্তব্য। *Cyincs*-রা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, দুঃখবাদী, কৃচ্ছ্রতাবাদী, স্বাধীন এবং ভয়শূন্য। সুখ-দুঃখে নির্বিকার চিত্তলাভ করাই এ মতবাদের উদ্দেশ্য।

Cynics-রা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, দুঃখবাদী এবং কৃচ্ছ্রতাবাদী

(খ) Stoics-দের মতবাদ (Stoicism) : এ মতবাদটিও গ্রীসে প্রসারলাভ করে। জেনো (*Zeno*) একজন খ্যাতনামা *Stoic* ছিলেন। *Stoics*-রাও *Cynics* দের মতো সুখকে পরিহার করার কথা বলেছেন। মানুষ ইন্দ্রিয় সুখে তৃপ্ত হতে পারে না, বরং ইন্দ্রিয় সুখ নিম্নস্তরের সুখ বলে সর্বতোভাবে তা বর্জন করা প্রয়োজন। মানুষের বিচারশক্তি আছে, চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। সুতরাং, মানুষের কর্তব্য বিশুদ্ধ চিন্তার জগতে বিহার করা এবং তাই হল উচ্চস্তরের জীবন। *Cynics* এবং *Stoics* উভয়েই জীবনে বিচারবুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বিচারবুদ্ধির দ্বারা জীবন অতিবাহিত করাকেই জীবনের পরমকল্যাণ বলে মনে করে উভয়েই কৃচ্ছ্রতাবাদ প্রচার করেছেন; তবু এ দুটি মতবাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।

বিশুদ্ধ চিন্তার জীবনই উচ্চস্তরের জীবন

Cynics-রা আত্মনির্ভরতাকে এত বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন যে, মানুষের সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে একরকম অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁদের মতে মানুষের লক্ষ্য হল স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার অর্থ কোন কিছুর ওপর নির্ভর না করা। যে মানুষ স্বাধীন, যার কোন অভাব নেই, কামনা-বাসনা নেই, সে মানুষের সমাজ-জীবনের প্রয়োজন কি? Stoics-রা কিন্তু *Cynics*-দের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থন করেননি। যদিও তাঁরা আত্মনির্ভরশীলতাকে সমর্থন করেন, তবু তাঁদের মতে সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে জীবন যাপন করাই যুক্তিসঙ্গত। আদর্শ জীবন আত্মকেন্দ্রিক জীবন নয়; সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে, বিবেকবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে জীবন-যাপনই আদর্শ জীবন। মানুষের মধ্যে এবং বিশ্বজগতের মধ্যে যে বুদ্ধির প্রকাশ সেই বুদ্ধিই প্রকাশিত হয়েছে সমাজের নিয়ম-কানুন ও রীতির মধ্যে। সুতরাং সমাজের নিয়ম মেনে চলা মানুষের কর্তব্য। *Stoics*-দের মতে 'Back to nature' বা Life according to nature'-এর অর্থ

Cynic-বাদ ও Stoics-বাদের মধ্যে পার্থক্য

Cynics-রা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী আর Stoics-রা সমাজবাদী

'Life according to Reason'; এসব বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ হল সমাজের মধ্যে থেকেই বিচার-বুদ্ধির সহায়তায় জীবন যাপন; সমাজ পরিত্যাগ করে বনে চলে যাওয়া নয়।

দ্বিতীয়তঃ, *Cynics*-রা হল দুঃখবাদী বা নিরাশবাদী; *Stoics*-রা হল আশাবাদী। *Cynics*-রা জগৎ ও জীবনে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দেখেননি। তাঁদের মতে কষ্ট, অনিষ্ট, ব্যাধি, মৃত্যু—এ নিয়েই সংসার; সুতরাং এ সংসার থেকে যত তাড়াতাড়ি সরে পড়া যায় ততই ভাল। *Cynics*-রা হল পলাতকদের দল; সংসার থেকে সরে এসে, নিজেদের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেতে চায়। সংসারে শুধু অশান্তি, শুধুই দুঃখ, সব কিছুই মন্দ। কিন্তু *Stoics*-রা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগতের দিকে তাকাননি। দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, জরা, মৃত্যু, পাপ, ব্যাধি—এসব থাকলেও এ জগতে সব কিছুই খারাপ নয়। সংসারের মধ্যে মন্দের সঙ্গে ভালও আছে। মানুষের কর্তব্য সমাজে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করা। *Stoics*-দের জীবনের আদর্শ শান্ত, সংযত ও সঙ্গতিপূর্ণ। তাই তাঁদের জীবনে আছে আশার আলোক। *Cynics*-দের জীবন-আদর্শ রূঢ়, কঠোর, তাই তাদের জীবনে আছে শুধু নিরাশার অন্ধকার।

Cynics-রা দুঃখবাদী Stoics-রা হল আশাবাদী

(গ) মধ্যযুগের খ্রীস্টধর্ম (Mediaeval Christianity): মধ্যযুগের খ্রীস্টানদের মধ্যে এই কৃচ্ছ্রতাবাদ প্রসার লাভ করেছিল। খ্রীস্টানরা যীশুখ্রীস্টের জীবনকেই আদর্শ জীবন বলে মনে করেন। যীশুখ্রীস্টই ভগবানের প্রতিনিধি, প্রতিটি মানুষের উচিত যীশুর উপদেশ অনুসরণ করা বা তাঁর মতানুসারে পূর্ণতা লাভ করা।

যীশুখ্রীস্টের জীবনই আদর্শ জীবন

খ্রীস্টানরা কাজের বাহ্যিক ফলাফলের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে মনের পবিত্রতা এবং ইচ্ছার শুচিতার ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। অন্তরের মালিন্য দূরীভূত না হলে বাইরের যান্ত্রিক সদাচরণের কোন মূল্য নেই। খ্রীস্টানরা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন এবং পাপ মনে করেন। আত্মদমন ও সংযত জীবনযাপনই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। যদিও যীশুখ্রীস্ট জীবনে স্বাভাবিক সুখ উপভোগ থেকে মানুষকে বিরত হতে বলেননি, তবুও যীশুখ্রীস্টের পবিত্র, সরল, উদার ও মহৎ জীবন এবং তাঁর আত্মনির্যাতন বরণ আর আত্মোৎসর্গ প্রতিটি ভক্ত খ্রীস্টানের মনে এক গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছে। এর ফলেই অনেক খ্রীস্টান নিম্নস্তরের কামনা থেকে মুক্ত হয়ে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত হয়ে ঈশ্বর চিন্তাকেই জীবনের আদর্শ বলে মনে করেন। তাঁদের মতে 'দেহ'

আত্মদমন ও সংযত জীবন যাপনই খ্রীস্টধর্মের লক্ষ্য

এবং 'আত্মা'র মধ্যে চিরবিরোধ বর্তমান। দেহের ওপর আত্মার প্রভুত্ব স্থাপিত না হলে মানুষ প্রকৃত মনুষ্য জীবন যাপন করতে পারে না। অনুভূতি যে খুব মন্দ তা নয়, কিন্তু বিচারশক্তি দিয়ে এ অনুভূতিকে সম্পূর্ণ বশে আনতে হবে। খ্রীস্টানদের বক্তব্য হল, 'Die to live' 'মরে অমর হও'। এ কথার তাৎপর্য কি? দেহের মৃত্যুতেই আত্মার পুনরুজ্জীবন। অর্থাৎ দৈহিক কামনা, বাসনা, ভোগ এবং ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিকে একেবারে ধ্বংস করতে পারলেই মানুষের আত্মা জেগে উঠবে, বেঁচে থাকবে—সেটাই হবে সত্যিকারের বাঁচা।

প্রকৃত মনুষ্য জীবন হল দেহের ওপর আত্মার প্রভুত্ব স্থাপন

Die to live—মরে অমর হও

২। Kant-এর বিচারবাদ বা কৃচ্ছ্রতাবাদ (Kant's Rationalism or Rigorism):

মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি এক হিসেবে তার মধ্যে দুপ্রকার বৃত্তি আছে—জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। সুখ, দুঃখ, আবেগ ও অনুভূতির মধ্যে মানুষের জীববৃত্তি প্রকাশিত হয়। মানুষের বিচারশক্তি প্রকাশ পায় তার জ্ঞান, বিবেচনা যুক্তিনির্ণয় প্রভৃতির মাধ্যমে। কাণ্ট মানুষের প্রকৃতিতে এই বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচারশক্তির স্থান সর্বোচ্চ বলে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, মানুষের জীববৃত্তি হল তার নিম্নবৃত্তি, আর বুদ্ধি বা বিচারশক্তি হল তার উচ্চবৃত্তি। মানুষ যে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ সে হল তার এই উচ্চবৃত্তি বা বিচারশক্তির জন্য। কাণ্ট-এর মতে মানুষের উচিত তার আবেগ, অনুভূতি, ভোগলিপ্সা প্রভৃতিকে অবদমিত করে বিশুদ্ধ চিন্তায় জীবন (life of pure reason) যাপন করা। তাঁর মতে একমাত্র চিন্তা বা বুদ্ধিই আমাদের কর্তব্য নির্ণয় করে দিতে পারে এবং মানুষের জীবন বিচারশক্তির দ্বারাই সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। মানুষের উচিত অনুভূতিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দেওয়া এবং বিশুদ্ধ চিন্তার অনুশীলন করা। তাঁর ভাষায় আমাদের নৈতিক জীবন হচ্ছে জীববৃত্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির চির-সংগ্রাম ক্ষেত্র।

কাণ্ট-এর মতে মানুষের প্রকৃতিতে বিচারবুদ্ধির স্থান সর্বোচ্চ

কাণ্টের মতে কোন কার্যকে যথোচিত হতে হলে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে, প্রথমতঃ, বিচারবুদ্ধি যে নৈতিক নিয়মকে প্রকাশ করবে তার সঙ্গে যথোচিত কার্যের সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, কর্মকর্তা নৈতিক নিয়মের প্রতি বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা বশতঃই কার্যটি সম্পাদন করবে।

জীবনের সর্বোচ্চ নৈতিক নিয়ম কিভাবে আমরা জানতে পারি? কাণ্ট বলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমরা এই নৈতিক নিয়ম জানতে পারি। তিনি বুদ্ধি বা বিচারশক্তিকে

দুভাবে ভাগ করেছেন ; যথা—(১) বিশুদ্ধ বিচারশক্তি বা চিন্তা (pure reason) এবং (২) ব্যবহারিক বিচারশক্তি বা চিন্তা (practical reason)।[1] তাঁর মতে বিবেক (conscience) হল ব্যবহারিক বুদ্ধি বা বিচারশক্তি। বিবেক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বোচ্চ নৈতিক নিয়ম সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। আমরা সোজাসুজি প্রত্যক্ষবোধের দ্বারা এই নৈতিক নিয়ম জানতে পারি। ঐ নৈতিক নিয়ম অভিজ্ঞতালব্ধ (*a posteriori*) নয়, অভিজ্ঞতা-পূর্ব (*a priori*) এবং স্বতঃসিদ্ধ (self-evident)। এ নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি বা অসঙ্গতি নির্ণয় করেই কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়। মনের অভিপ্রায় নির্ধারণ করেই কাজের ভাল-মন্দ বিচার করতে হবে, কাজের বাহ্যিক ফলাফল দেখে নয়।

কাণ্ট-এর মতে বিবেক হল ব্যবহারিক বুদ্ধি বা বিচারশক্তি

বিবেক যে নৈতিক নিয়মকে আমাদের কাছে ব্যক্ত করে তাকে কাণ্ট বলেছেন, 'শর্তহীন আদেশ' (Categorical Imperative)।[2] প্রথমতঃ, নৈতিক নিয়ম হল আদেশ বা imperative, সাধারণ বক্তব্য বা উক্তি নয়। 'তুমি সেখানে যেতে পার' আর 'তোমার সেখানে যেতেই হবে'—এ দুটির মধ্যে প্রভেদ আছে, প্রথমটি বক্তার বক্তব্য বা সাধারণ 'উক্তি', দ্বিতীয়টি বক্তার 'আদেশ'। দ্বিতীয়টিতে কাজ করার সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা প্রকাশ পাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক নিয়ম হল শর্তহীন আদেশ। লিলি বলেন, "কাণ্ট-এর শর্তহীন কথাটির অর্থ হল এই যে, নৈতিক নিয়ম হল কারুর আদেশ।"[3] কোন রকম শর্তের ওপর এ আদেশ পালন করা নির্ভর করে না। যে আদেশে শর্ত থাকে

নৈতিক নিয়ম হল শর্তহীন আদেশ

---

1. তাত্ত্বিক বিচারশক্তি (Theoretical reason) তথ্য সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে ব্যবহারিক বিচারশক্তি আমাদের নির্বাচন করতে এবং কোন ইচ্ছাকৃত কার্য করতে সহায়তা করে। বিকল্প কর্মপন্থার মধ্যে কোনটি নির্বাচন করা যেতে পারে সে সম্পর্কে চিন্তা, তার লক্ষ্য ও উপায় নির্ধারণে, সিদ্ধান্ত গঠনে ব্যবহারিক বিচারশক্তির প্রকাশ ঘটে।

2. কাণ্ট তিন রকমের আদেশের কথা বলেছেন : (১) শর্তাধীন আদেশ (Hypothetical Imperative) : যে আদেশ কোন উদ্দেশ্য পূরণের আশায় মানতে হয় ; যেমন—স্বাস্থ্যের নিয়ম। (২) দৃঢ় উক্তিমূলক আদেশ (Assertorial Imperative) : কতকগুলি উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, এগুলি সকলেই চায় এবং যেহেতু এগুলিকে পাবার আদেশ বা নিয়মগুলি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবু এগুলি শর্তাধীন, যেহেতু বিশেষ কোন উদ্দেশ্য কামনা করে মানুষ এসব আদেশ পালন করে। (৩) শর্তহীন আদেশ (Categorical Imperative) : বিনাশর্তে এ আদেশ পালন করতে হবে ; যেমন—নৈতিক নিয়ম।

3. Kant's Term "Categorical imperative implies that the moral law is a command made by somebody."

—W. Lillie : An Introduction to Ethics, Page 158.

তাকে বলা হয় শর্তাধীন আদেশ (Hypothetical Imperative)। 'যদি তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাও, তবে তোমাকে কঠিন পরিশ্রম করতেই হবে।'—এ আদেশ শর্তাধীন। স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী শর্তাধীন আদেশ, কারণ যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য রক্ষা করতে চায় সে ব্যক্তিই এ নিয়মগুলি মানতে বাধ্য। নৈতিক নিয়ম হল শর্তহীন আদেশ যা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে আমরা পালন করব না।

কিন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। যে নৈতিক নিয়ম বা নৈতিক কর্তব্য শর্তহীন আদেশ এবং যে নিয়মকে পালন করার জন্য আমরা বাধ্য, সে নিয়ম পালন করতে যদি আমরা সক্ষম না হই, তবে কি হবে? এর উত্তরে কাণ্ট বললেন, 'তোমার করা উচিত', মানেই 'তুমি করতে পার'। 'Thou oughtest means thou canst'—এ হল কাণ্ট-এর এক সুবিখ্যাত উক্তি।

উচিত মানেই 'তোমার করার সামর্থ্য আছে'

নিছক কর্তব্যবোধের প্রেরণায় আমরা নৈতিক নিয়ম পালন করব। কিন্তু কাণ্ট-এর মতে যে ইচ্ছা আমাদের ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কর্তব্যবোধ উদ্বুদ্ধ করে তাই সদিচ্ছা (Good Will); জগতে একমাত্র সদিচ্ছাই নিরপেক্ষ সৎ বস্তু। অপর যে সকল বস্তু বা বিষয়কে আমরা সৎ বা ভাল মনে করি, যেমন—অর্থ, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি—সেগুলি সাপেক্ষভাবে ভাল, অর্থাৎ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য মেটাবার জন্য সেগুলিকে উপায় হিসেবে প্রয়োজন। এ সকল কাম্যবস্তু লাভ করার ক্ষেত্রে যে নীতি প্রযুক্ত হবে তাহল 'যদি আমি এটি পেতে চাই' তবে 'এভাবে আমায় কাজ করতে হবে।' কিন্তু নৈতিক কর্তব্যের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শর্তহীন আদেশ 'তোমার এরূপ আচরণ করা উচিত।' স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রে আমার ইচ্ছাকে পরিচালিত করতে হবে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী, যে নিয়মের মধ্যে কোন ব্যতিক্রমের স্থান নেই।[1]

জগতে সদিচ্ছাই নিরপেক্ষ সৎ বস্তু

কাণ্ট বলেন, সৎ ইচ্ছাই একমাত্র কল্যাণকর। সৎ ইচ্ছা (Good Will) বিনা শর্তেই সৎ। বাইরের কোন কিছুর মাপকাঠির বিচারে একে সৎ বলে বিচার করা যায় না। ধীশক্তি, জাগতিক বিচক্ষণতা, জ্ঞান—এগুলি তখনই সৎ যখন এদের পেছনে থাকে সৎ ইচ্ছা। এদের পেছনে যদি মন্দ ইচ্ছা থাকে তাহলে এগুলি মন্দ। এই সৎ ইচ্ছাই নৈতিক নিয়মগুলিকে নিজের ওপর প্রয়োগ করে। কাণ্ট ইচ্ছার স্বাধীনতা (Autonomy of

সৎ ইচ্ছাই নৈতিক নিয়মগুলিকে নিজের ওপর প্রয়োগ করে

1. ম্যাকেঞ্জি বলেন, "সর্বোচ্চ নৈতিক নিয়ম, তা যাই হোক না কেন, তার আদেশ নিরপেক্ষভাবেই আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয় এবং তা কোন প্রশ্নকে আমল দেয় না। যা আমাদের করা উচিত তাই আমাদের করা উচিত। এমন কোন উচ্চতর নৈতিক নিয়ম নেই যা এই নৈতিক আদেশকে সরিয়ে দিতে পারে।"
—Mackenzie: A Manual of Ethics; Page 138.

will) এবং ইচ্ছার পরাধীনতা (Heteronomy of will)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। মানুষের ইচ্ছা যখন বিচার-বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন (autonomous)। অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা না করে কেবলমাত্র কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সম্পাদন করাই স্বাধীন ইচ্ছার ধর্ম। আবেগের বশে, অন্ধ কামনা-বাসনায় উন্মত্ত হয়ে, সুখ-দুঃখ ও অন্যান্য অনুভূতির দ্বারা অভিভূত হয়ে যখন কাজ করা হয় তখন ইচ্ছা পরাধীন (heteronomus)। সৎ ইচ্ছা সকল সময়ই স্বাধীন ; বিনা শর্তে এবং নিজগুণেই এই ইচ্ছা কল্যাণকর। এমন কি, যদি আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সৎ ইচ্ছা ভাল ফল উৎপন্ন করতে না পারে তাহলেও এ সৎ ইচ্ছা (Good Will), উজ্জ্বল রত্নের মতো নিজ দীপ্তিতেই দেদীপ্যমান।

ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ইচ্ছার পরাধীনতা

ইচ্ছা তখনই সৎ হয়, যখন বিচার বুদ্ধির নিয়মানুযায়ী ইচ্ছা করা হয়, কাজেই কাণ্ট-এর মতে নৈতিক মানদণ্ড হল বিচার-বুদ্ধির নিয়ম। বিচার-বুদ্ধির নিয়ম হল কর্তব্যের নিয়ম (The law of reason is the law of duty)। সেহেতু কাণ্টের নীতিতত্ত্বের একটি সুবিখ্যাত বাণী হল 'Duty for Duty's sake'.—কেবলমাত্র 'কর্তব্যের জন্যই কর্তব করতে হবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। মানুষ যখন বিচার ও বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করে তখন সে প্রকৃত মানুষ। অনুভূতির বশীভূত হয়ে যখন সে কাজ করে তখন সে পশুতুল্য। কাণ্ট-এর মতে ফলাফলের কথা চিন্তা না করে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা না ভেবে, অনুভূতির বশবর্তী না হয়ে, কেবলমাত্র নৈতিক কর্তব্যের কথা স্মরণ করে যদি কাজ করা হয় তবেই 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য, করা হয়। কর্তব্যের ক্ষেত্রে স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা কোন কিছুর স্থান নেই। যে ব্যক্তি অনুরাগ বা অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে যখন কোন পীড়িত ব্যক্তির সেবা করে সে ব্যক্তির কাজের কোন নৈতিক মর্যাদা নেই। এরূপ ব্যক্তির কার্যকে কাণ্ট বিকারগ্রস্ত (Pathological) কাজ বলে অভিহিত করেছেন। কর্তব্যের মধ্যে যদি কোনপ্রকার অনুভূতিকে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে স্থান দেওয়া হয় তাহলে ইচ্ছার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই ইচ্ছাকে সদিচ্ছা কোন মতেই বলা চলে না। নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী নয়, নৈতিক নিয়মের জন্যই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে, তবেই কাজটি নৈতিক বিচারে হবে 'যথোচিত' কাজ।

কেবলমাত্র নৈতিক কর্তব্যের কথা স্মরণ করে কাজ করাই হল কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা

সকল প্রকার অনুভূতিমুক্ত হয়ে কেবলমাত্র কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা বাস্তব জীবনে অত্যন্ত কঠিন কাজ। সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন উদ্দেশ্যর কথা চিন্তা না করে কাজ করা একান্তই দুরূহ কর্ম। কিন্তু এ ব্যাপারে কাণ্ট অত্যন্ত কঠোর। তিনি 'কর্তব্যের

জন্য কর্তব্য'—এ নীতিই প্রচার করেছেন, সাধারণ মানুষের জন্যও কোন বিকল্প ব্যবস্থা করেননি। মানুষকে সর্বোতভাবে সমস্ত অনুভূতি মন থেকে বিসর্জন দিতে হবে।

কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করতে হবে—কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই

যে কোন অনুভূতি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বা সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসা যাই হোক না কেন, মন থেকে তা বিদূরিত করে বিবেকের নির্দেশ অনুসরণ করাই মানুষের কর্তব্য। অবশ্য কাণ্ট প্রধান কল্যাণ (Supreme Good) ও পূর্ণ কল্যাণ (Complete Good)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কর্তব্য পালন করে আমরা সততা অর্জন করি এবং তাই আমাদের প্রধান কল্যাণ। কিন্তু পূর্ণ কল্যান হল সততা ও সুখের সমন্বয়। নৈতিক জীব হিসেবে অবশ্য আমরা সুখের আশায় সৎ কাজ করবো না, কিন্তু কাণ্ট বলেন, সৎ কাজ করলে ঈশ্বর, যিনি জগতের নৈতিক নিয়ামক, তিনি আমাদের সুখ দেবেন ও ফলে আমরা পূর্ণ কল্যাণলাভে সমর্থ হব।

বিচার-বুদ্ধি আমাদের কর্তব্য করতে আদেশ করে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কী, দৈনন্দিন জীবনে সার্বভৌম বিচার-বুদ্ধির নিয়মকে (Universal law of reason) প্রয়োগ করেই তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই সার্বভৌম বস্তুনিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধির নিয়ম (The Uuiversal final law of reason) বা 'শর্তহীন আদেশ' নীতিবাক্যকে কাণ্ট এভাবে রূপ দিয়েছেন—"Act only on that maxim which thou canst at the same time will to become a universal law." অর্থাৎ 'এমন নিয়মানুসারে কাজ কর যে নিয়মকে একটি সার্বজনীন নিয়মে পরিণত করতে তুমি ইচ্ছা করতে পার। তিনি আবার বলেছেন, "Act only in such a way as you could will that everyone should act under the same general condition." অর্থাৎ তুমি এমন ভাবে কাজ কর যাতে তুমি ইচ্ছা করতে পার যে, এই একই সাধারণ অবস্থায় অন্য সকলেরও সেরূপ কাজ করা উচিত।" এর সহজ অর্থ হচ্ছে, যে কাজ সকলের করা উচিত, একমাত্র সে কাজকরা আমাদের কর্তব্য। কর্তব্য সকলেরই এক এবং এর কোন ব্যতিক্রম নেই। বিচার-বুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে যে কাজ করা হবে তার মধ্যে অবশ্যই আত্মসঙ্গতি থাকা চাই।[1]

কাণ্ট-এর নীতিবাক্য এমনভাবে কাজ কর যাতে সকলে সেভাবে কাজ করতে পারে

1. উপরিউক্ত নীতিবাক্যটি ছাড়াও কাণ্ট আরও দুটি নীতিবাক্যের কথা বলেছেন। যথা—(i) প্রথমটি হল "So act as to treat humanity whether in thine own person or in that of any other, always as an end and never as a means'—এর সহজ অর্থ হল —'এমনভাবে কাজ কর যাতে তুমি নিজেকে বা অন্য কোন মানুষকে কোন সময় উপায় হিসেবে গ্রহণ না করে, সকল সময়ে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করবে।'

কাণ্ট উদাহরণ দিয়ে তার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা অনুচিত কাজ, যেহেতু সকলে যে কোন সময় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারে, এ রকম অবস্থা আমরা মেনে নিতে পারি না। বস্তুতঃ সেরকম হলে প্রতিজ্ঞা করা বলে আর কিছুই থাকবে না। অনুরূপভাবে, চুরি করাও যথোচিত কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না, কারণ বিশ্বের সকল লোকই চুরি করুক—এ রকম অবস্থাও আমরা স্বীকার করে নিতে পারি না। এ জাতীয় কাজকে সার্বজনীন করা চলে না, কারণ তাহলে এই জাতীয় কাজ অসঙ্গতিপূর্ণ হবে। আমাদের কর্তব্য হল এমন নিয়মানুসারে কাজ করা যে নিয়মকে সার্বজনীন নিয়মে পরিণত করা যেতে পারে ; অথচ যার মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখা দেবে না।

কাণ্ট-এর মতে জীববৃত্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধ নৈতিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য এবং নৈতিক জীবন যতদিন চলতে থাকবে ততদিন এদের বিরোধও চলতে থাকবে। কামনা প্রলোভনকে যত দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করা যাবে, কাজের নৈতিক উৎকর্ষ তত অধিক হবে।

মানুষ নিজেই উদ্দেশ্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধনের উপায়রূপে মানুষকে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং যে কাজ মানুষকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে সে কাজ যথোচিত কাজ নয়। মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব, সেহেতু তার বিচার-বুদ্ধিকে সব সময়ই মর্যাদা দিতে হবে। ক্রীতদাস প্রথা সমর্থন করা যায় না, যেহেতু মানুষ ক্রীতদাসকে তার সুখের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। আত্মহত্যাও সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ আত্মহত্যার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে অমর্যাদা করে।

এই নীতিবাক্যেরই আর একটি অনুসিদ্ধান্ত (Corollary) হল : "Try always to perfetc thyself and try to conduce to the happiness of others, by bringing about favourable circumstances as you cannot make others perfect." এর অর্থ হল—'নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে সব সময়ই চেষ্টা কর এবং যেহেতু অপরকে তুমি পূর্ণ করে তুলতে পার না সেহেতু অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে অপরের সুখ উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হও'।

মানুষ নিজের ইচ্ছায় নিজেকে পূর্ণ বা ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। কিন্তু অপরের ইচ্ছার ওপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই। সে কারণে অপরের জন্য সে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে যাতে অপরের সুখ হয়। পূর্ণতা মানুষ নিজের চেষ্টাতেই অর্জন করতে পারে, অপরের চেষ্টায় নয়।

(ii) অপর নীতিবাক্যটি হল : 'Act as a member of the kingdom of ends'—এর সরল অর্থ হল—'আদর্শ সমাজের সভ্য হিসেবে কাজ কর।'

কাণ্ট-এর মতে প্রতিটি মানুষের একটা নিজস্ব মূল্য বা স্বতঃ মূল্য আছে। কারণ, মানুষ নিজেই মূর্তিমান উদ্দেশ্য, উপায় নয়। সে কারণে মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতেই হবে। Kingdom of ends' বলতে কাণ্ট মনে করেন, এক আদর্শ সমাজ যেখানে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। বিচার-বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে কাজ করে, নৈতিক নিয়মানুযায়ী কর্তব্যসাধন করে এবং অপরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে সেখানে কোন ব্যক্তিই নৈতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করবে না, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নৈতিক নিয়ম পালন করবে।

সমালোচনা (Criticism) ঃ

(ক) কাণ্ট মনে করেন যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার জীববৃত্তির বিরোধী এবং উভয়ের মধ্যে এক চির-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্তমান। কিন্তু মনস্তত্ত্ব অনুসারে মনের বিভিন্ন বৃত্তি থাকা সত্বেও তার এক স্বগত ঐক্য আছে। বুদ্ধিবৃত্তি ও জীববৃত্তি উভয়ই মনের প্রয়োজনীয় উপাদান এবং উভয়ই মনের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কিন্তু তারা মনের অখণ্ডতা ও অবিচ্ছিন্নতাকে নষ্ট করতে পারে না। যদি মনকে পৃথক পৃথক কতকগুলি কুঠুরিতে বিভক্ত করা যায় তাহলে তা মনের বিজ্ঞানসম্মত চিত্র হবে না। বিভিন্ন বৃত্তিসম্পন্ন হয়েও মন স্বরূপে এক ও অখণ্ড।

বুদ্ধিবৃত্তি ও জীববৃত্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই

(খ) কাণ্ট বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় জীববৃত্তিকে হেয় বলে মনে করেন। তাঁর মতে জীববৃত্তি বা অনুভূতিকে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দিয়ে বিশুদ্ধ চিন্তা অনুযায়ী জীবনযাপনই মানুষের নৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। নৈতিক জীবনে অনুভূতি বা জীববৃত্তির একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে, এ হল নৈতিক জীবনের উপাদান। এ উপাদান সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দিলে বিচারবুদ্ধিকে কার ওপর প্রয়োগ করা হবে? অনুভূতির জন্যই কামনা বা বাসনার উৎপত্তি। কামনার বা বাসনার পরিতৃপ্তির জন্যই মানুষ ক্রিয়া করে। কাজেই অনুভূতি ছাড়া ক্রিয়া সম্ভব নয়, নৈতিক জীবন কর্মময় জীবন। জীববৃত্তিহীন বা অনুভূতিহীন মন হচ্ছে একটি শূন্য কাঠামো যার কোন অস্তিত্ব নেই। বিচারবুদ্ধির দ্বারা অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করে আত্মার বশীভূত করাই মানুষের লক্ষ্য।

অনুভূতি ছাড়া নৈতিক জীবন শূন্য

(গ) কাণ্ট-এর নৈতিক মতবাদকে বলা হয় '*Formalistic*' বা 'আকারমূলক মতবাদ'; যেহেতু তিনি কেবলমাত্র নৈতিক জীবনের আকারের কথা বলেছেন কিন্তু বিষয়বস্তুর কথা বলেননি। কথাটা ভাল করে বুঝে নেওয়া যাক ঃ বাস্তব জীবনে আমরা দেখি, উপাদান ও আকার উভয়ে একত্র বর্তমান থাকে; যেমন, কোন টেবিলের উপাদান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট আকার আছে। ইচ্ছা, আবেগ, কামনা, বাসনা প্রভৃতিকে বলা হয়েছে নৈতিক জীবনের উপাদান এবং যে নিয়ম অনুসারে এদের নিয়ন্ত্রিত করা হয় তাদের বলা হয় নৈতিক জীবনের আকার। এখন কাণ্ট-এর মতানুসারে মানুষ যদি তার কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দেয় তবে বিচার-বুদ্ধি কাকে নিয়ন্ত্রিত করবে বা কোন্ উপাদানের ওপর নিজেকে প্রয়োগ করবে? জ্যাকোবি (*Jacobi*) সে কারণে কাণ্ট-এর বিশুদ্ধ ইচ্ছাকে (Pure Will)

কাণ্ট-এর মতবাদ Formalistic বা আকারমূলক মতবাদ

কাণ্ট-এর বিশুদ্ধ ইচ্ছা শূন্যগর্ভ

শূন্যগর্ভ-বা বিষয়বস্তুশূন্য বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, এই ইচ্ছা কোন কিছুই ইচ্ছা করে না (A will that wills nothing)।

(ঘ) কাণ্ট-এর কৃচ্ছ্রতাবাদ অত্যন্ত কঠোর। অনুভূতির বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করা হলে তাঁর মতে সে কাজের কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা দেখি, করুণা ও ভালবাসার বশবর্তী হয়ে অনেকে অনেক কাজ করে যার নৈতিক মর্যাদা শুধু কম নয়, বরং সেগুলি যথার্থই প্রশংসার যোগ্য। যেমন, সমবেদনাবশতঃ অনেকে অসহায়কে সাহায্য করে বা পীড়িতকে সেবা করে। বস্তুতঃ নৈতিক জীবনে যদি অনুভূতির কোন স্থান না থাকে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে কর্তব্যসাধন কৃত্রিম ও বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে এবং অন্তরের স্পর্শে সজীব হয় না। কিন্তু কাণ্ট-এর মতকে স্বীকার করলে বলতে হয় যে, দৈনন্দিন জীবনে বহু মহৎ ও সৎ কাজ আছে যার কোন নৈতিক উৎকর্ষ নেই।

কাণ্ট-এর কৃচ্ছ্রতাবাদ অত্যন্ত কঠোর

(ঙ) কাণ্ট নৈতিক আদেশের কোন ব্যতিক্রম স্বীকার করেন না। অথচ নিয়ম থাকলে তার ব্যতিক্রম থাকবেই, নৈতিক নিয়মেরও থাকবে। এমন কি অনেক কাজকে আমরা যথোচিত বলে মনে করি, যেহেতু সেগুলি সাধারণ নিয়মানুসারে ব্যতিক্রম। যেমন, মানুষ সাধারণতঃ আত্মরক্ষা করতে চায়, সেজন্য যে ব্যক্তি কোন মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করে, তার কাজের নৈতিক মূল্য অনেক বেশী। এক্ষেত্রে এসব কাজ ব্যতিক্রম বলেই নৈতিক দিক থেকে বরণীয়।

কাণ্ট নৈতিক আদেশের কোন ব্যতিক্রম স্বীকার করেন না

(চ) কাণ্ট-এর মতে সর্বোচ্চ নৈতিক নিয়ম হল ব্যাখ্যাতীত (inexplicable)। মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব; কোন নিয়মকে অন্ধের মতো অনুসরণ করা তার ধর্ম নয়। ম্যাকেঞ্জি বলেন, নৈতিক নিয়মকে শর্তহীন আদেশরূপে ব্যাখ্যা করার অর্থ হল একে বাধ্যতামূলক রূপে উপস্থিত করা এবং এর ঔচিত্যের ভাবটি অস্পষ্ট রাখা। নৈতিক নিয়মকে এমনভাবে বর্ণনা করা উচিত যাতে বোঝা যায় এটি একটি আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[1] লিলি-র মতে নৈতিক নিয়মকে শর্তহীন আদেশ বলা যায় কিনা সন্দেহজনক। নৈতিক নিয়ম তারাই পালন করতে বাধ্য যাদের বুদ্ধিবৃত্তি আছে। সুতরাং এ নিয়ম একটা শর্তের অধীন, সেটি হল এটি বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়া দরকার।

কাণ্ট-এর মতে সর্বোচ্চ নৈতিক নিয়ম হল ব্যাখ্যাতীত

কাণ্ট তাঁর মতবাদে 'যথোচিতে'র ওপরই গুরুত্ব দিয়েছেন; 'ভাল'র ওপর নয়। কিন্তু 'যথোচিত' এবং 'ভাল'—এ দুটি নৈতিক ধারণার মধ্যে 'ভাল'—এই নৈতিক

1. Mackenzie : A Manual of Ethics ; Page 190.

ধারণাই প্রাথমিক ধারণা। কোন কাজকে 'যথোচিত' বলার অর্থই হল কাজটির দ্বারা কোন কিছু ভাল লাভ করা যায়। কাজেই ভালর ধারণা থাকলেই যথোচিতের ধারণা আসে।

(ছ) কাণ্ট-এর মতবাদ অনুযায়ী জীববৃত্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধ নৈতিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য এবং নৈতিক জীবন যতদিন চলতে থাকবে ততদিন এদের এ বিরোধও চলতে থাকবে। তাই যদি হয় তবে কাণ্ট-এর মতানুসারে যখন বিরোধ শেষ হবে তখন নৈতিক উৎকর্ষ বলেও আর কিছু থাকবে না। জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির যে বিরোধ তা বস্তুতঃ নৈতিক জীবনের প্রাথমিক স্তরে বর্তমান। আমরা যতই নৈতিক জীবনে উন্নীত হই ততই এ বিরোধের হ্রাস হয় এবং একেই বলে 'কৃচ্ছ্রতাবাদের হেঁয়ালি' (Paradox of Asceticism)। নৈতিক জীবনের উচ্চস্তরে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাল কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়।

কৃচ্ছ্রতাবাদের হেঁয়ালি (Paradox of Asceticism)

(জ) কাণ্ট-এর প্রথম নীতিবাক্যটি নঞর্থক এবং শূন্যগর্ভ। এতে তিনি কি করা উচিত তা স্পষ্ট করে বলছেন না, কি করা উচিত নয়—তাই বলেছেন। সেজন্য তাঁর এই নীতিবাক্যের কোন সদর্থক (Positive) মূল্য নেই। এ নীতিবাক্য থেকে আমরা শুধু জানতে পারি কী আমাদের করণীয় নয়। কাজ করার সময় আমাদের কেবলমাত্র দেখতে হবে যে, কাজের নিয়মটিকে সার্বজনীন করা যেতে পারে কিনা এবং তার ফলে এর মধ্যে আত্মসঙ্গতি থাকছে কি না। বস্তুতঃ কাণ্টের নীতিবাক্যটি নিছক আত্ম-সঙ্গতির নীতিবাক্য (a maxim of self-consistency) অর্থাৎ কিনা এই নীতিবাক্য অনুসারে আমাদের কাজে আত্মসংগতি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এর দ্বারা জানা যাচ্ছে না আমাদের কর্তব্য কি। তর্কবিদ্যায় যেমন কোন ন্যায় অনুমানের আকারগত সত্যতা থাকলেই সেটা যথার্থ হয় না, তেমনি সঙ্গতি বজায় রেখে কোন কাজের নিয়মকে সার্বজনীন নিয়মে পরিণত করতে পারলেই তাকে কর্তব্য বলা যেতে পারে না। ম্যাকেঞ্জি বলেন, কাণ্ট যে নীতিটি প্রকাশ করেছেন সেটি-অনেক ক্ষেত্রে আচরণের নিরাপদ নেতিবাচক পথ প্রদর্শক।[1] তাছাড়া, কাণ্ট-এর এ নীতিবাক্যটি কাজের নৈতিক বিচারের যথার্থ মাপকাঠি নয়। কাণ্ট-এর মতে বাস্তব পরিস্থিতির কথা চিন্তা না করেই নৈতিক নিয়মানুযায়ী কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কাণ্ট-এর প্রথম নীতিবাক্যটি নঞর্থক এবং শূন্যগর্ভ

1. Mackenzie; A Manual of Ethics; Sixth Edition, Page 155.

যেমন, ধরা যাক, 'সদা সত্য কথা বলা' একটি নৈতিক নিয়ম। কিন্তু সকল পরিস্থিতিতে সত্য কথা বলা নীতিসঙ্গত নাও হতে পারে। যেমন, অনেক সময় আমরা গুরুতরভাবে পীড়িত রোগীকে সত্য কথা বলি না এবং তাতে নীতির দিক থেকে আমরা দুষ্ট হই না।

(ঝ) কাণ্ট-এর মতে সততা যদিও মানুষের প্রধান কল্যাণ (Supreme Good), মানুষের পূর্ণ কল্যাণ (Complete Good) হল সততা এবং সুখের সমন্বয়। কিন্তু পূর্ণ কল্যাণে প্রত্যেকটি মূল্যেরই (Values) স্থান আছে; যেমন—চিন্তার মূল্য, ধর্ম সম্পর্কীয় মূল্য ইত্যাদি। এসবগুলির উপযুক্ত সামঞ্জস্য সা নেই মানুষের পূর্ণতা বা আত্মোপলব্ধি লাভ। কাণ্ট যদিও বলেছেন যে, নৈতিক জীবন থেকে অনুভূতিকে বা সুখকে লুপ্ত করে দিতে হবে, কিন্তু মানুষের পূর্ণ কল্যাণে তিনি সুখের নৈতিক প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এখানে তাঁর মতবাদ বিরোধী উক্তি দোষে দুষ্ট।[1]

৩। বিচারবাদের গুণ (Merits of Rationalism) ঃ

বিচারবাদের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। নিম্নে সংক্ষেপে সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

বিচার-বুদ্ধির স্থান অনুভূতির উচ্চে

বিচারবাদের প্রধান গুণ হল এই যে, মানুষের স্বভাবের মধ্যে বিচার-বুদ্ধির স্থান যে অনুভূতির তুলনায় অনেক উচ্চে, তা এই মতবাদ নির্দেশ করেছে। বস্তুতঃ, মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব এবং মানুষের বিচার-বুদ্ধিই তার কামনা, বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিচারবাদ মানুষের স্বাধীনতা এবং

---

1. কাণ্ট-এর দ্বিতীয় নীতিবাক্য অনুযায়ী প্রতিটি মানুষকেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যরূপে গণ্য করতে হবে, কোন মানুষকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। এ নিয়মের বৈধতা অবশ্য আমরা 'মানুষ' বলতে কি বুঝি তার ওপর নির্ভর করছে। যদি মানুষ বলতে যে-কোন মানুষ বুঝি তবে নিয়মটির ব্যতিক্রম আছে। যেমন, অপরাধীকে বন্দী করে রাখা, উন্মাদ ব্যক্তিকে আটক করে রাখা—এসব কাজ অনুচিত কাজ নয়। কাণ্ট বলেন, মানুষকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (End)-রূপে বিচার করবে। কিন্তু 'মানুষ' বলতে যদি বুঝি মনুষ্যত্ব বা মানবোচিত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ, তবে দেখতে পাই, কাণ্ট পরোক্ষভাবে পূর্ণতাবাদকেই সমর্থন করেছেন। দ্বিতীয় নীতিবাক্যের যে অনুসিদ্ধান্ত, অর্থাৎ নিজের পূর্ণতার জন্য চেষ্টা কর এবং অপরকে পূর্ণ করে তুলতে না পারলে তাদের সুখের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা কর', তাও স্পষ্টই পূর্ণতাবাদকে এবং পরসুখবাদকে সমর্থন জানায়।

কাণ্ট-এর তৃতীয় বাক্যটির বৈধতা অনুরূপভাবে কয়েকটি শব্দের তাৎপর্যের ওপর নির্ভর করছে। এ নীতিবাক্য অনুযায়ী একটি আদর্শ সমাজের সভ্যরূপে আমাদের পরস্পরের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হওয়া উচিত। এই বাক্যকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে, কাণ্ট পরোক্ষভাবে পূর্ণতাবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

তার মর্যাদাবোধের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ আছে। পশু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই সুখী। মানুষের মর্যাদাবোধ আছে, তাই বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার করে না। অনুভূতি, আবেগকে বিচার-বুদ্ধির বশীভূত করাই মানুষের ধর্ম।

বিচারবাদ মানুষের মর্যাদাবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে

বিচারবাদ নৈতিক কর্তব্য পালনের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। নৈতিক কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধা—এসবের কোন প্রশ্ন নেই, নৈতিক কর্তব্য কোন রকম শর্তের অধীন নয়। নৈতিক বাধ্যতাবোধের উৎস হল বিবেক বা বিচার-বুদ্ধি; কোন বাইরের কর্তৃপক্ষ নয়। সুখবাদ মানুষের বিচার-বুদ্ধি আর চাতুর্য দুটোকে এক করে দেখে, কিন্তু বিচারবাদ উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্কের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। মুরহেড এই মতবাদের মূল্য নির্দেশ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, যা উচিত তা নিছক সুবিধা থেকে সব সময়ই পৃথক (Right is distinct from expendiency)। সে কারণে তিনি বলেছেন "সব রকম চালাকির কলঙ্ক থেকে স্পষ্টই দূরে সরে থাকা উচিত।"[1] সুখবাদীদের যেহেতু সুখই কাম্যবস্তু, সেহেতু নৈতিক নিয়মকে শর্তহীন আদেশ মনে করা তাঁদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু বিচার-বুদ্ধি সকলের মধ্যেই বর্তমান; সুতরাং তার আদেশ মেনে না নেওয়া নিজের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করারই সামিল।

বিচারবাদ নৈতিক কর্তব্যপালনের ওপর গুরুত্ব দেয়

বিচারবাদ যে কৃচ্ছ্রতাবাদ প্রচার করে তা কঠোর হলেও অর্থহীন নয়। আত্মত্যাগের মাধ্যমেই আত্মোপলব্ধি আসে। নৈতিক উন্নতির নিম্নস্তরে আত্ম-সংযম, আত্মজয়ের একান্ত প্রয়োজন। নৈতিক উন্নতির উচ্চস্তরেই মানুষের অনুভূতি, আবেগ, কামনা, বাসনা ও বিচার-বুদ্ধির সামঞ্জস্য সাধিত হতে পারে।

কৃচ্ছ্রতাবাদ কঠোর হলেও অর্থহীন নয়

---

1. Muirhead : The Element of Ethics.

অষ্টম অধ্যায়

(Perfectionism)

পূর্ণতাবাদ

১। ভূমিকা ঃ (Introduction) ঃ

ইতিপূর্বে নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি, সে আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের পরমকল্যাণ বা পরমার্থের আদর্শের আলোকেই কাজের নৈতিক বিচার করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের পরমকল্যাণের স্বরূপ আমরা নির্ধারণ করি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নৈতিক সমস্যার যথার্থ সমাধান সম্ভব নয়। পরম-কল্যাণের স্বরূপ সম্বন্ধে অবশ্য 'নানা মুনির নানা মত'।

পরমকল্যাণের আদর্শে নৈতিক বিচার করতে হয়

সুখবাদীরা মনে করেন যে, সুখই হল পরমকল্যাণ। কিন্তু এ মতবাদ যে ভ্রান্ত তা আমরা আলোচনা করেছি। কৃচ্ছ্রতাবাদও পরমকল্যাণের স্বরূপটি নির্দেশ করতে পারে না। সমস্ত কামনা-বাসনাকে মুছে ফেলে কেবলমাত্র বিচার-বুদ্ধির জীবন যাপনের মধ্যে মানুষের পরমকল্যাণ নিহিত থাকতে পারে না; এ হল নেতিবাচক আদর্শ। লেস্‌লি স্টিফেন, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ ব্যক্তিরা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ (Mechanical Theory of Evolution) সমর্থন করেন এবং নৈতিক প্রক্রিয়াকে তাঁরা আদর্শ বা লক্ষ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন নি। হেগেল, গ্রীন প্রমুখ পূর্ণতাবাদীরা পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ (Teleological Theory of Evolution) সমর্থন করেন, সেহেতু তাঁরা মনে করেন, নৈতিক প্রক্রিয়াকে লক্ষ্য বা আদর্শের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

সুখবাদ ও কৃচ্ছ্রতাবাদ উভয়ই চরমপন্থী মতবাদ। সুখবাদীরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন ইন্দ্রিয়পরতার ওপর। ইন্দ্রিয়ভোগ, কামনা-বাসনার তৃপ্তি অর্থাৎ সুখভোগই তাঁদের জীবনের আদর্শ। কৃচ্ছ্রতাবাদীরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন বুদ্ধিপরতার ওপর। সমস্ত কামনা, বাসনা, আবেগ মন থেকে মুছে ফেলে বিশুদ্ধ চিন্তার জগতে বিহার করাই তাদের লক্ষ্য। দুই-ই চরমপন্থী মতবাদ। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। কিন্তু মানুষের মধ্যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি আছে, তেমনি আছে জীববৃত্তি। মানুষের জীবনে উভয়েরই প্রয়োজন আছে। জীবনে ইন্দ্রিয়ভোগের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি বিচার-বুদ্ধির দ্বারা

সুখবাদ ও কৃচ্ছ্রতাবাদ চরমপন্থী মতবাদ

জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করারও প্রয়োজন আছে। মানুষের জীবনে ভোগেরও প্রয়োজন, ত্যাগেরও প্রয়োজন। কাজেই এই দুই চরমপন্থাকে এড়িয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বনই শ্রেয় এবং যুক্তিযুক্ত। নিছক আত্মপরিতৃপ্তি বা আত্মঅস্বীকৃতি, অর্থাৎ শুধু মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগ বা শুধু মাত্র কৃচ্ছ্রতা কখনও মানুষের জীবনের আদর্শ হতে পারে না।

মানুষের জীবন যেমন নিছক দেবতার জীবন নয়, তেমনি নিছক পশুর জীবনও নয়। তার মধ্যে পশুত্ব ও দেবত্ব উভয়ই বর্তমান। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের জীবপ্রবৃত্তির বা পশুত্বের প্রকাশ ঘটে; মূল্য ও আদর্শের উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের দেবত্বের বা ঐশ্বরিক দিকটির প্রকাশ ঘটে। মানুষ যেমন একদিকে তার স্বাভাবিক কামনা-বাসনাগুলিকে পরিতৃপ্ত করতে চায়, তেমনি মানুষের বিচার-বুদ্ধি তার জৈব প্রবৃত্তির ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার করতে তাকে সমর্থ করে। কোন মানুষ যদি বিচার-বুদ্ধির নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত না করে, ইন্দ্রিয় ভোগকেই জীবনের আদর্শ করে, তাহলে সে জীবনে শান্তি লাভ করতে পারে না। ভীতি, উদ্বেগ এবং শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ এই জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আবার সমস্ত কামনা-বাসনাকে দূর করে দিয়ে বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধির জীবন যাপনও অর্থহীন, এ জীবনের মধ্যেও রয়েছে নিছক শূন্যতার ভীতি ও উদ্বেগ। সুতরাং প্রবৃত্তি এবং বিচার-বুদ্ধি—এই দুই বিরোধী দাবীর সমন্বয়-সাধনের প্রয়োজন আছে, কারন এরই ওপর মানুষের নৈতিক জীবনের ভিত্তি।

নৈতিক জীবনের লক্ষ্য এই বিরোধকে ক্রমশ দূর করা এবং ইন্দ্রিয় ও বিচার-বুদ্ধি উভয়ের দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া এবং উভয়ের সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে এমন একটি পূর্ণ সুসংবদ্ধ জীবন প্রতিষ্ঠা করা যা একটি মাত্র মূল নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্ণতাবাদীদের মতবাদে এই প্রচেষ্টার কথাই বলা হয়েছে।

প্রবৃত্তি এবং বিচার-বুদ্ধি মানুষের প্রকৃতির দুটি ভিন্ন দিক। দুটো মিলেই মানুষের পূর্ণরূপ। সুতরাং মানুষের পরমকল্যাণ নিহিত আছে আত্মোপলব্ধিতে (Self-realisation), নিজেকে পূর্ণ করে তোলাতে (Self-perfection)। এর জন্য প্রয়োজন বিচার-বুদ্ধির সহায়তায় আমাদের কামনা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা, যার ফলে শান্তি লাভ করা যাবে। মানুষের ভোগ-প্রবৃত্তি এবং ত্যাগাকাঙ্ক্ষা—এই দুই বিপরীত প্রকৃতির সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ—এই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এরই নাম পূর্ণতাবাদ বা Perfectionism. এই মতবাদ আত্মোপলব্ধিবাদ বা পূর্ণব্যক্তিত্ববাদ নামেও পরিচিত। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং বর্তমান যুগে হেগেল, গ্রীন, কেয়ার্ড, ডিউই, ম্যাকেঞ্জি, মুরহেড, শেথ্, পলসেন এবং আরও অনেকে এ মতবাদ

পূর্ণতাবাদ অনুসারে আত্মোপলব্ধিই নৈতিক আদর্শ

সমর্থন করেছেন। এ মতবাদকে বিভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয়; যথা—(১) পূর্ণতাবাদ (Perfectionism), (২) কল্যাণবাদ (Eudaemonism), এবং (৩) শক্তিবাদ (Energism)।

২। পূর্ণতাবাদের বিবরণ (General Account of Perfectionism) :

পূর্ণতাবাদ অনুসারে আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতালাভেই মানুষের জীবনের পরমকল্যাণ। পূর্ণতা অর্থে চরিত্রের পূর্ণতা, মানুষের স্বভাবের বা প্রকৃতির পূর্ণতা। মানুষকে নিজের চেষ্টায় নিজের কামনা-বাসনা, আবেগকে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে এ পূর্ণতা বা আত্মোপলব্ধি লাভ করতে হবে। আত্মোপলব্ধি হল মানুষের ব্যক্তিত্ববোধের (Personality) পূর্ণ বিকাশ। প্রতি মানুষের মধ্যে আছে অসংখ্য শক্তি, অনন্ত সম্ভাবনা, যা সকল সময় বাস্তবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। এর জন্য যেমন পরিবেশ দায়ী, তেমনি দায়ী মানুষের কর্মবিমুখতা, আলস্য বা উদ্যমহীনতা। মানুষের মধ্যে সুপ্ত হয়ে থাকতে পারে শারীরিক শক্তি, বিচার শক্তি, সৌন্দর্য-উপলব্ধির শক্তি এবং নৈতিক শক্তি। এ সব বিভিন্ন শক্তিকে বিকশিত করে তাদের মধ্যে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য আনতে পারলেই মানুষের ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। মানুষের সর্বশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশই তার শ্রেষ্ঠ আদর্শ—এই আদর্শকেই বলা হয়েছে পূর্ণতাবাদ। হেগেল, গ্রীন, পলসেন, সকলেই নৈতিক বিবর্তনকে সমর্থন করেন। বিবর্তনের অর্থ হল, যা অপ্রকাশিত থাকে তা প্রকাশিত হয়, পরিস্ফুট হয়। মানুষের মধ্যে নীতিবোধ আছে এবং নৈতিক বিবর্তনের অর্থহল নৈতিক ক্ষমতার ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করা। আমাদের জীবনের নৈতিক আদর্শ আমাদের সত্তার মধ্যেই নিহিত আছে। আমাদের সত্তার মধ্যে অনুভূতি ও বিচার-বুদ্ধির যে বিরোধ চলছে আত্মোপলব্ধির সাহায্যে তা থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তাতেই হবে আমাদের নৈতিক সত্তার প্রকৃত প্রকাশ।

আত্মোপলব্ধিই বা পূর্ণতালাভেই জীবনের পরম কল্যাণ

মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা

নিজের সকল শক্তিকেই পূর্ণভাবে বিকশিত করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ মানুষের কর্মশক্তি সীমাবদ্ধ। একজন মানুষের পক্ষে একই সঙ্গে সাহিত্যিক, চিত্রকর, খেলোয়ার, কবি, রাজনীতিজ্ঞ এবং সমাজ-সংস্কারক হওয়া সম্ভব নয়। আসল কথা মানুষের উচিত সমাজে নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী কর্তব্য করে যাওয়া। ব্রাডলে (*Bradley*) তাঁর 'Ethical Studies' গ্রন্থে এই আত্মশক্তির বিকাশ বা আত্মোপলব্ধির বিষয়টিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। প্রত্যেক মানুষ একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশে

যার যেদিকে মানসিক প্রবণতা তাকে সেভাবে বিকশিত হতে হবে

এক বিশেষ ধরনের মানসিক প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং এর ওপরই তার কর্তব্যের রূপ ও প্রকৃতি নির্ভর করছে। এই কর্তব্য সম্পাদন করে মানুষ ক্রমশঃ জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, ধর্ম প্রভৃতি অর্জন করে অর্থাৎ সে আত্মোপলব্ধির আদর্শটি লাভ করে। ঐ আদর্শই তার জন্মগত মানসিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আদর্শটির মাধ্যমেই সে তার ব্যক্তিসত্তাকে চরমভাবে বিকশিত করে তুলতে পারে, সুপ্ত শক্তিকে পরিস্ফুট করে তুলতে পারে এবং মনুষ্যজাতির উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে।

আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতারূপ নৈতিক আদর্শের দ্বারাই কাজের নৈতিক বিচার করা হয়। যে কাজ ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পক্ষে সহায়ক সে কাজ ভাল, যে কাজ ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পক্ষে বাধাস্বরূপ সে কাজ মন্দ। পূর্ণতাবাদীদের মতে বিচার-বুদ্ধিও মানুষের জীববৃত্তি অর্থাৎ কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি দুই-ই মানুষের আত্মার পূর্ণ বিকাশসাধনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাঁদের মতে মন থেকে যদি সব রকম অনুভূতিকে মুছে ফেলা হয় তাহলে মানুষের নৈতিক জীবনেরও সমাপ্তি ঘটবে। সুতরাং বিচারবাদীরা যখন সকল রকম কামনা, বাসনাকে বর্জন করার কথা বলেন বা সুখবাদীরা যখন কেবলমাত্র ভোগের ওপর জোর দেন তখন তাঁরা হয়ে ওঠেন চরমপন্থী। পূর্ণতাবাদ এ দুই মতবাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে। আত্মোপলব্ধির অর্থ কামনা-বাসনাকে বর্জন করা নয়, কামনা-বাসনার মধ্যে সঙ্গতি আনয়ন করে মানুষের আত্মার পূর্ণ বিকাশসাধন করা। স্বভাবের বৈপরীত্য সত্বেও মানুষ এই পরিপূর্ণ সুসংবদ্ধ ঐক্য; সুতরাং পূর্ণতাবাদ, সুখবাদ এবং বিচারবাদ বা কৃচ্ছ্রতাবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে।

পূর্ণতাবাদ সুখবাদ এবং কৃচ্ছ্রতাবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে

পূর্ণতাবাদ আত্মসুখবাদ এবং পরসুখবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। আত্মসুখবাদ অনুযায়ী মানুষের লক্ষ্য কেবলমাত্র নিজের সুখ; অপরের সুখের কথা চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। পরসুখবাদীদের মতে মানুষ নিজের সুখ কামনা করছে না, অপরের সুখ তার কাম্য হওয়া উচিত। সুতরাং এই দুই মতানুসারে মানুষের নিজের কল্যাণ এবং অপরের কল্যাণ পরস্পরবিরোধী। পূর্ণতাবাদ অনুসারে মানুষের নিজের কল্যাণ এবং সাধারণের কল্যাণের মধ্যে বিরোধ নেই। বস্তুতঃ, একটিকে ছাড়া আর একটির কোন অর্থ হয় না। নিজের পরমকল্যাণ এবং সর্বসাধারণের পরমকল্যাণ এক ও অভিন্ন।

পূর্ণতাবাদ আত্মসুখবাদ এবং পরসুখবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে

পূর্ণতাবাদ অনুসারে সমাজের মধ্যে বাস করেই ব্যক্তিকে এই পূর্ণতালাভ করতে হবে। পূর্ণতাবাদীরা সমাজ ও ব্যক্তির আঙ্গিক সম্পর্ককে (organic relation)

স্বীকার করে নিয়েছেন। দেহের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান, সমাজের সঙ্গে সমাজস্থ ব্যক্তির সম্পর্কও প্রায় সেই জাতীয়। ব্যক্তিগত কল্যাণ এবং জনকল্যাণ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। জনকল্যাণসাধনের আদর্শের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার স্বীয় কল্যাণ লাভ করতে পারে। আত্মোৎসর্গের মাধ্যমেই আত্মোপলব্ধি সম্ভব। আত্মার পূর্ণ বিকাশই ব্যক্তির লক্ষ্য, কিন্তু ব্যক্তির আত্মার পূর্ণ বিকাশের অর্থই হল সামাজিক আত্মার (Social Self) পূর্ণ বিকাশ। বস্তুতঃ, সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তিমনের (Individual self) কোন স্থান নেই। ব্যক্তিমনের বিকাশ সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তির সহযোগিতাতেই কেবলমাত্র সম্ভব।[1]

ব্যক্তির আত্মার পূর্ণ বিকাশের অর্থ হল সামাজিক আত্মার পূর্ণ বিকাশ

পূর্ণতাবাদ অনুভূতি ও বিচার-বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়পরতা ও বুদ্ধিপরতা উভয়ের দাবীকেই স্বীকার করে নিয়েছে। পূর্ণতাবাদীদের মতে উভয়ই মানুষের প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, উভয়কে নিয়েই মানুষের মনের সামগ্রিক রূপ ; কামনা বাসনা, আবেগ অনুভূতি নৈতিক জীবনের উপাদান বা বিষয়বস্তু এবং বিচার-বুদ্ধি হল নৈতিক জীবনের আকারগত সত্তা। আকার ও বিষয়বস্তুকে কখনও বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

পূর্ণতাবাদ ইন্দ্রিয়পরতা ও বুদ্ধিপরতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, আমাদের 'আমি'কে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি—'ইন্দ্রিয়প্রধান আমি' আর 'বুদ্ধিপ্রধান আমি'। আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতালাভের অর্থ হল—'ইন্দ্রিয়প্রধান আমি'কে বশীভূত করে 'বুদ্ধিপ্রধান আমি'র অধীনে এনে 'পূর্ণ-আমি'কে প্রকটিত করা।

শেথ (*Seth*) মানুষের ব্যক্তিত্ববোধের (Personality) এবং তার স্বাতন্ত্র্যবোধের (Individuality) মধ্যে প্রভেদ করেছেন। মানব প্রকৃতির দুটি দিক আছে, একটি উচ্চতর এবং অপরটি নিম্নতর। মানুষের বিচার-বুদ্ধির দিকটি হল তার উচ্চতর প্রকৃতি ; মানুষের ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির দিকটি হল তার নিম্নতর প্রকৃতি। মানুষের উচ্চতর প্রকৃতি তার ব্যক্তিত্ববোধের প্রকাশক, মানুষের নিম্নতর প্রকৃতি তার স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশক। স্বাতন্ত্র্যবোধে মানুষ কেবলমাত্র তার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি, কামনা, বাসনা, নিজের স্বার্থ ও সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করে। সে তার নিজের ক্ষুদ্র সত্তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ব্যক্তিত্ববোধে মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। ক্ষণিক কামনা-বাসনাগুলি তখন

1. ম্যাকেঞ্জি-র মতে, সামাজিক সংগঠনের মধ্যে প্রতিটি মানুষের একটা নিজের স্থান ও কাজ নির্দিষ্ট আছে এবং নিজ অবস্থানুযায়ী কর্তব্য সম্পন্ন করা প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

—Mackenzie : A Manual of Ethics ; Page 203.

বিচার-বুদ্ধির সূত্রের দ্বারা এক ঐক্যের বন্ধনে সুসংবদ্ধ হয়। ব্যক্তিত্ববোধে মানুষ আত্মসচেতন, আত্মশাসিত ও আত্মসংযত হয়। সে আর তখন একক নয় এবং তার একাত্মবোধ তার নিজের সত্তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে না। নিজের ক্ষুদ্র সীমিত গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সে সমাজস্থ সকলের কল্যাণের মধ্যে নিজের কল্যাণকে উপলব্ধি করে আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতালাভের জন্য সচেষ্ট হয়। ব্যক্তিত্ববোধে মানুষ বহু সম্বন্ধযুক্ত, কেবলমাত্র ক্ষণিক কামনা-বাসনার দ্বারা চালিত নয়, বা নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়।

শেথ্ মানুষের ব্যক্তিত্বের ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে প্রভেদ করেছেন

আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতাবাদ অনুযায়ী আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধকে আমাদের ব্যক্তিত্ব-বোধের সঙ্গে একীভূত করে আমাদের আত্মাকে বিকশিত করে তুলতে হবে। হেগেল এর ভাষায় 'Be a person', অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকাশ কর। ম্যাকেঞ্জি বলেন, "সামাজিক লক্ষ্য উপলব্ধি করেই আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তা বা পূর্ণ কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারি। এ করার জন্য আমাদের পৃথক সত্তাকে বিসর্জন দিতে হবে, কারণ এটি আমাদের আসল সত্তা নয়। আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েই আমাদের আত্মোপলব্ধি লাভ করতে হবে।" হেগেল এ প্রসঙ্গে বলেছেন—'Die to live', অর্থাৎ পৃথক সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে পূর্ণ সত্তাকে লাভ কর। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের বৃহত্তর সত্তাকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করাই হল-আত্মোপলব্ধি। মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণই তার সামাজিক কল্যাণ।

নিজের বৃহত্তর সত্তাকে বিকশিত করাই হল আত্মোপলব্ধি

পূর্ণতাবাদ অনুযায়ী আমাদের বিবেক হল সমগ্র সত্তা, আর আমাদের কামনা-বাসনা নিয়ে আমাদের যে ক্ষুদ্রতর সত্তা তা হল আংশিক সত্তা। আমাদের সমগ্র সত্তাই তার নিজের ওপর বা তার বিভিন্ন অংশ বিশেষের ওপর নৈতিক নিয়মগুলিকে চাপিয়ে দেয়। অর্থাৎ নৈতিক নিয়ম কোন বহিরাগত নিয়ম নয়, এ হল অন্তরের নিয়ম। এ হল বিবেকের বা সমগ্র সত্তার নির্দেশ। সে কারণে, নৈতিক বাধ্যতাবোধ আসে অন্তর থেকে এবং নৈতিক জগতে আমরা বাইরের কোন কর্তৃপক্ষের কাছে বাধ্য নই। নৈতিক উন্নতি যতই হোক না কেন, নৈতিক বাধ্যতাবোধ কখনও বিদায় নেয় না। আমাদের বৃহত্তর সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি যেদিন হবে সেদিনই ঘটবে নৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি। কাজেই এই আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কখনও সম্ভব নয়। চলমান জীবনের পথে অগ্রসর হতে হতে আমরা ধীরে ধীরে তাকে উপলব্ধি করতে

নৈতিক নিয়ম বিবেকের বা সমগ্র সত্তার নির্দেশ

নৈতিক বাধ্যতাবোধ কখনও বিদায় নেয় না

থাকব, আমাদের নৈতিক অন্তঃদৃ'ষ্টি হবে গভীর থেকে গভীরতর, তবু সেই আদর্শকে একেবারে লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই। স্পেন্সার মনে করেন, আদর্শ সমাজে যখন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে তখন নৈতিক বাধ্যতাবোধ আর থাকবে না—পূর্ণতাবাদীরা এ মত স্বীকার করেন না।

নৈতিক আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কখনও সম্ভব নয়

পূর্ণতাবাদীরা বলেন, আত্মোপলব্ধিই হল মানুষের পরমকল্যাণ। সুখবাদীরা বলেন, সুখই হল পরমকল্যাণ। পূর্ণতাবাদীরা বলেন, নৈতিক জীবনে যখন বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আমাদের কামনা-বাসনার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপিত হয়, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি যখন বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন মনে আনন্দের অনুভূতি জাগে। তবে এ আনন্দের অনুভূতি সুখবাদীদের সুখ (pleasure) নয় ; এ হল শান্তি (happiness)। ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফলে মানুষ সুখ লাভ করে, আর কামনা, বাসনা, আবেগ, অনুভূতির মধ্যে যখন বিচার বুদ্ধির সহায়তায় সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি স্থাপিত হয় তখন মানুষ লাভ করে যথার্থ শান্তি। সুখ ক্ষণিক, শান্তি চিরস্থায়ী। পৃথক পৃথক ভাবে কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তিতে শান্তি আসে না, কামনা বাসনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হলেই শান্তি আসে।[1]

পূর্ণতাবাদ সুখ ও শান্তির মধ্যে প্রভেদ করে

আত্মোপলব্ধি হলে এ শান্তি অবশ্যই লভ্য হবে। কাজেই ধার্মিক ব্যক্তির সুখী, সৎ জীবন হল শান্তিপূর্ণ জীবন। পূর্ণতাবাদীরা কিন্তু শান্তিকে জীবনের লক্ষ্য বলে অভিহিত করেন নি। আত্মোপলব্ধিই হল জীবনের পরমকল্যাণ এবং আত্মোপলব্ধি এলেই শান্তি তার অনুগমন করে।

৩। কল্যাণবাদ (Eudæmonism) :

আমরা পূর্বে যে পূর্ণতাবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলাম তাকে কল্যাণবাদ বা Eudaemonism নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। Eudæmonism কথাটি এসেছে গ্রীক '*Eudæmonia*' শব্দ থেকে যার অর্থ হল কল্যাণ (wellbeing, welfare)। লিলি বলেন, "কল্যাণবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলতে পারি যে, এটি হল এমন একটি নৈতিক মতবাদ যা মানুষের সমগ্র প্রকৃতির পূর্ণতাকে নৈতিক আদর্শরূপে গণ্য করে এবং যে আদর্শের সঙ্গে জড়িত আছে তার ক্ষমতার উপলব্ধির পূর্ণ সুখ।[2]

1. লিলি বলেন, "আমাদের দেহ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন কাজ করে গেলেই শান্তি আসে যা সুখ থেকে স্বতন্ত্র।' —William Lillie : An Introduction to Ethics ; Page 227.

2. Lillie : Ibid : Page 226

লিলি-র মতে এ মতবাদ অনুযায়ী শান্তি সুখের থেকে পৃথক ; যেহেতু কোন একটি কাজ থেকেই শান্তি আসে না, মানুষের সকল কাজের সামঞ্জস্যের ফলেই শান্তি আসে। দ্বিতীয়তঃ, এ শান্তি স্থায়ী এবং মনের পরিবর্তনশীল অবস্থা নয়। এ শান্তি কাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত কিন্তু কাজ শান্তির অংশ নয়। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল উভয়েই কল্যাণবাদী। প্লেটো-র মতে মানুষের মনের সবচেয়ে প্রধান উপাদান হল তার বিচার-বুদ্ধি। এই বিচার-বুদ্ধি যখন মানুষের মনের নিম্নতর উপাদান অর্থাৎ কামনা-বাসনা-প্রভৃতিকে বশীভূত করার পর মনের মধ্যে সঙ্গতি আনয়ন করে তখনই আসে মানুষের প্রকৃত আত্মোপলব্ধি। প্লেটো মনে করেন যা ন্যায় তাহল আমার কল্যাণ, আত্মার সকল উপাদানের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য—বিভিন্ন অংশ যেখানে সমগ্রের বশীভূত। অন্যায় হল আত্মার অকল্যাণ ও অসুস্থতা এবং সেক্ষেত্রে নীচ প্রবৃত্তি উচ্চ প্রবৃত্তির ওপর আধিপত্য করে। অ্যারিস্টটল বিচার-বুদ্ধির তুলনায় কর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে আত্মোপলব্ধি হল মানুষের সুপ্ত শক্তিকে পরিস্ফুট করে তোলা। এ আত্মোপলব্ধি এলে একটা আনন্দের অনুভূতি আসে, তবে আত্মোপলব্ধি এ আনন্দ-লাভের উপায় নয়। মানুষকে যেমন তার ছায়া অনুগমন করে, ঠিক তেমনিভাবে আত্মোপলব্ধির অনুগ হল আনন্দের অনুভূতি। কল্যাণ নিজেই উদ্দেশ্য, কোন কিছু ভাল করার উপায় নয়। সুতরাং অ্যারিস্টটলের মতে আদর্শ কল্যাণ (Ideal well-being or welfare) হল জীবনের লক্ষ্য। আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই এই আদর্শ কল্যাণ লাভ সম্ভব হবে এবং তখনই আসবে এক আনন্দের অনুভূতি, পরম শান্তি। বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম করলেই এ আত্মোপলব্ধি আসবে।

অ্যারিস্টটল-এর কল্যাণবাদ

বর্তমান যুগের অন্যতম প্রধান কল্যাণবাদী হেগেল-এর মতে ব্রহ্ম (Absolute) বা ঈশ্বর হল পরম সত্তা (Ultimate Reality) এবং জীবাত্মা, এই বিশ্ব এবং বিশ্বের যাবতীয় সকল কিছুই এই ব্রহ্মের প্রকাশ। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি বিরাজমান। আমাদের বিচার-বুদ্ধি ঈশ্বরেরই বিচার-বুদ্ধি ; বস্তুতঃ ঈশ্বরের বিচার-বুদ্ধিই আমাদের বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে ক্রিয়া করছে। মানুষ যদি নিজের প্রকৃতির এই ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক দিকটুকু পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে তবেই আসবে মানুষের আত্মোপলব্ধি। মানুষ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা তার ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে যদি নিজে কর্তব্য সম্পাদন করে এবং নিজের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যটুকু উপলব্ধি করার জন্য সচেষ্ট হয়, তবেই মানুষ পরমকল্যাণ লাভ করতে পারে।

হেগেল-এর কল্যাণবাদ

শেথ্ প্রমুখ হেগেল এর সমর্থকবৃন্দও কল্যাণবাদের সমর্থক ; তবে তাঁরা আত্মোপলব্ধি (self-realisation) এবং সন্তোষের অনুভূতি (feeling of satisfaction), উভয়কেই নৈতিক আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাদের মতে অনুভূতিকে নৈতিক আদর্শ থেকে বিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ, অনুভূতি নৈতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের পরমকল্যাণ হল বিচার বুদ্ধি ও অনুভূতি, আনন্দ ও ইন্দ্রিয়সুখ, এ উভয়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য। তাঁর মতে শান্তি বা সন্তোষের অনুভূতিই হল নৈতিক উন্নতির মাপকাঠি।

শেথ্-এর মত

এখানে প্রশ্ন হল, কল্যাণবাদ এবং পূর্ণতাবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

আজকাল কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁদের মতে পূর্ণতাবাদ অনুযায়ী পূর্ণতা হল নৈতিক আদর্শ। এই পূর্ণতা অনিবার্যভাবে সঙ্গে নিয়ে আসে শান্তি বা আনন্দ। কিন্তু পূর্ণতাবাদ এই আত্মতৃপ্তি বা আনন্দকে নৈতিক আদর্শের অংশরূপে গণ্য করে না। অপরদিকে, কল্যাণবাদ অনুযায়ী পূর্ণতা এবং আনন্দ বা শান্তি উভয়ই নৈতিক আদর্শের উপাদান, উভয়ই নৈতিক আদর্শের সঙ্গে যুক্ত। এ কারণে কল্যাণবাদকে অনেক সময় 'আনন্দবাদ' (Happiness Theory) বা 'শান্তিবাদ' (Blessedness Theory) নামে অভিহিত করা হয় যাতে সুখবাদীদের সুখবাদের সঙ্গে একে এক এবং অভিন্ন বলে মনে করা না হয়।

কল্যাণবাদ ও পূর্ণতাবাদের মধ্যে পার্থক্য

আনন্দবাদ বা শান্তিবাদ

পূর্ণতাবাদ ও কল্যাণবাদের মধ্যে পূর্বোক্ত পার্থক্যের কোন প্রয়োজন নেই। যখন শেথ্ সমগ্র আত্মার উপলব্ধির কথা বলেন তখন তিনি বলেন আত্মোপলব্ধি আনন্দ ও শান্তি আনে সত্য, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে লাভ করার উপায় (means) হিসেবে প্রথমটিকে বিচার করা উচিত হবে না। লিলি বলেন, "এই সামঞ্জস্যপূর্ণ সহযোগিতা একটা আনন্দের অনুভূতি উৎপন্ন করে যা হল শান্তি এবং যা নৈতিক দিক থেকে কেবলমাত্র সুখের থেকে শ্রেষ্ঠ।[1] সুতরাং, পূর্ণতাবাদ এবং কল্যাণবাদের মধ্যে স্পষ্টতঃ কোন পার্থক্য নেই।

1. "Eduæmonism has again emphasized this truth by showing that such harmonious co-operation produces a hedonic quality that is morally superior to that of mere pleasantness, namely, happiness.

—Lillie : An Introduction to Ethics ; Page 227.

৪। হেগেলের দুটি নীতিবাক্যঃ

হেগেল-এর দুটি নীতিবাক্যকে ব্যাখ্যা করলেই পূর্ণতাবাদ বা কল্যাণবাদের স্বরূপটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যথা—

(ক) **Be a person—অর্থাৎ মানুষ হও।** এই নীতিবাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হল তোমার ব্যক্তিত্বকে (Personality) বিকাশ বা উপলব্ধি কর। তোমার স্বাতন্ত্র্যবোধকে (Individuality) পরিহার করে তোমার প্রকৃত সত্তাকে (True Self) উপলব্ধি করার জন্য সচেষ্ট হও। হেগেল ব্যক্তিত্ববোধ এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যখন কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তার কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তিই যখন তার কাছে একমাত্র লক্ষ্য হয়, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে যখন বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারে না তখনই মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ; তখন মানুষ এক স্বতন্ত্র সত্তা, সে একক। তখন সে অপরের সঙ্গে সংগ্রাম করে, প্রতিযোগিতা করে, নিজের আবেগ অনুভূতি বা প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে চায় কেবল নিজের সুখ। কিন্তু মানুষের জীবন তো কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে নয় ; মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে এক বৃহত্তর সত্তা, আছে একাত্মবোধ, আছে সহযোগিতার মনোভাব যার জন্য সে কেবলমাত্র নিজের সুখ-সুবিধার ও ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা না ভেবে পরের মঙ্গলের বা কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। যখন মানুষের মধ্যে বিচার-বুদ্ধি বড় হয়ে দেখা দেয় তখন সে ইন্দ্রিয় জয় করে, তার আবেগ ও প্রবৃত্তিকে সংযত করে। সে উপলব্ধি করে তার নিজের কল্যাণ দশের কল্যাণের মধ্যেই নিহিত এবং সকলের কল্যাণের সঙ্গে নিজের কল্যাণকে মিশিয়ে দিয়ে তখন সে আত্মোপলব্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। এই আত্মপ্রসারতা বা সকলের সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধির মধ্যেই তার যথার্থ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ মানুষকে দশজনের থেকে স্বতন্ত্র করে, তার ব্যক্তিত্ববোধ তাকে দশজনের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

আত্মোপলব্ধিতে মানুষ স্বতন্ত্র সত্তার কথা ভুলে যায়

দশের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিলেই যথার্থ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, মানুষ তার প্রবৃত্তি, তার ক্ষুধা, কামনা, বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে যখন সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর জগতের সকলের সঙ্গে একাত্মবোধ লাভ করে তখন তার এই ক্ষুদ্র সত্তাই হয়ে ওঠে বৃহত্তর সত্তাকে লাভ করার উপায়স্বরূপ, তখনই আসে তাঁর জীবনে পরমকল্যাণের উপলব্ধি বা পূর্ণতা। এই হল যথার্থ আত্মোপলব্ধি। এই প্রসঙ্গে শেথ্ বলেন, "প্রত্যেক নৈতিক মতবাদই

আত্মোপলব্ধি" পদটি ব্যবহারের দাবী করে।[1] কিন্তু প্রশ্ন হল, আত্মা কি বা কোন্ আত্মার উপলব্ধি করতে হবে? সুখবাদীরা উত্তরে বলেন—'ইন্দ্রিয়ময় আত্মার'; বিচারবাদী বা বুদ্ধিবাদীরা বলে—'বুদ্ধিময় আত্মার'; কল্যাণবাদ বলে—'সমগ্র আত্মার—ইন্দ্রিয়ময় এবং বুদ্ধিময় উভয়ই।'

(খ) **Die to live—অর্থাৎ মরে বাঁচ বা প্রাণদান করে প্রাণবান হও।** মানুষের নিম্নতর জীবন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ময় জীবনের অবসান হলেই উচ্চতর বা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করা সম্ভব হয়। প্রকৃত মানুষের মতো বাঁচতে হলে নিজের ক্ষুদ্র জীবন, নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধকে বিসর্জন দিতে হবে। মানুষ যখন কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন তার আত্মকেন্দ্রিক জীবন তাকে সমাজের আর দশ-জনের কাছ থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে, তখন নিজের কল্যাণই হয় মানুষের কাম্য। কিন্তু এই ক্ষুদ্র আত্মকেন্দ্রিক জীবন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বের মধ্যে নিজেকে বিস্তৃত করে দিতে না পারলে মানুষের মতো বাঁচা হবে না। সে কারণে হেগেল বলেন, 'মরে বাঁচ'। নিজের স্বতন্ত্র, একক, স্বার্থময়, আত্মকেন্দ্রিক জীবন পরিহার করে বৃহত্তর জীবনের, মহৎ জীবনের অধিকারী হও।

আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে স্বতন্ত্র করে

৩। পলসেন-এর শক্তিবাদ (Energism):

পলসেন (*Paulsen*)-এর শক্তিবাদ[2] পূর্ণতাবাদের নামান্তর মাত্র। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা তখনই যখন মানুষ তার উচ্চতর শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করতে সমর্থ হয় এবং মানুষের নিম্নতর কার্যকলাপকে উচ্চতর কার্যকলাপের বশীভূত করে। যে জীবন পশুর প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়ভোগেচ্ছা এবং অন্ধ আবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সে জীবন, নিম্নস্তরের অস্বাভাবিক জীবন। পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য জীবন বলতে বুঝব সে জীবন যে জীবনে মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এবং চিন্তা, কল্পনা ও কাজের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তির চরম বিকাশ হয়েছে। তবে আমাদের প্রবৃত্তির দিককে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করবার প্রশ্ন ওঠে না। আহারে-বিহারে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের যে তৃপ্তি পূর্ণ বিকশিত জীবন থেকে তাকে বাদ দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন তারাই আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত না করে। সুতরাং পলসেনও আত্মোপলব্ধি, পূর্ণতা বা জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশকেই নৈতিক জীবনের আদর্শরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

---

1. "Every ethical theory...might claim the terms "self realisation." The question is what is the self, or, which self is to be realised? Hedonism answers the sentient self, Rationalism the rational self, Eudæmonism' the total self rational and sentient."

—J. Seth; Ethical Principles; Page 198,

2. A System of Ethics, Book II. Ch. II; Pages 271-279.

৬। হেগেল-এর সমর্থক—গ্রীন, ব্রাড্‌লে এবং বোসাঙ্কোয়েত-এর মতবাদঃ

গ্রীন, ব্রাড্‌লে এবং বোসাঙ্কোয়েত (*Bosanquet*)—এঁরা সকলেই হেগেল-এর সমর্থক। গ্রীন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ '*Prolegomena to Ethics*'-এ তাঁর মতবাদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃতির মধ্যে এক আধ্যাত্মিক চেতনা, এক শাশ্বত বিশ্ব-চেতনা বর্তমান এবং জড়প্রকৃতি ও প্রাণীদের মধ্যেও এই চেতনার উপস্থিতি আছে। প্রকৃতির মধ্যে এই চেতনা আছে সুপ্ত হয়ে কিন্তু মানুষের মধ্যে এই চেতনা আছে সুপরিব্যক্ত হয়ে। ম্যাকেঞ্জি-র ভাষায়, "নৈতিক জীবনের তাৎপর্য হল মানুষের মধ্যে এই চেতনাকে অধিক থেকে অধিকতরভাবে সুপরিস্ফুট করে তোলা। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, আত্মসচেতন এবং ঐশ্বরিক প্রকৃতিকে অধিক থেকে অধিকতর ভাবে প্রকাশ করা।[1] জীবের চেতনা এই বিশ্ব-চেতনারই সসীম রূপ। মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, আত্মসচেতন এবং ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন (Man is rational, self-conscious and spiritual)। বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তিচেতনার মধ্য দিয়ে যদি এই বিশ্ব-চেতনাকে উপলব্ধি করতে পারে তবেই মানুষের জীবনের পরমার্থ লাভ সম্ভব হবে। নৈতিক জীবনের অর্থ হল মানুষের অবিরাম প্রচেষ্টা কিভাবে বিশ্বের এই শাশ্বত চেতনাকে ব্যক্তিচেতনার মধ্যে পরিস্ফুট করে তুলতে পারা যায়।

গ্রীন-এর মতবাদ

আত্মোপলব্ধি একাধারে ব্যক্তিগত কল্যাণ এবং সামাজিক কল্যাণ। নৈতিক দিক দিয়ে যা কল্যাণকর তা মানুষের বিচার-বুদ্ধিসম্মত কল্যাণও বটে। নৈতিক কল্যাণ অর্থেই বুঝতে হবে আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতা। এক আধ্যাত্মিক বা স্বর্গীয় শক্তি মানুষের মধ্যে ক্রিয়া করছে। মানুষের বৃহত্তম সত্তা হল তার সমগ্র সত্তা, তার আধ্যাত্মিক সত্তা। সমাজের মধ্যে থেকে, অন্য মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তবে এ বৃহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। লিলি বলেন, "হেগেল-এর সঙ্গে গ্রীন-এর এ বিষয়ে মিল আছে যে, যে সমাজ-জীবনে আমরা অন্যান্য আত্মসচেতন ব্যক্তিদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করি সেই সমাজ-জীবনেই নৈতিক আদর্শকে ক্রমশঃ লাভ করতে হবে।"[2] নৈতিক

1. ...... "the significance of the moral life consists in the constant endeavour to make this principle more and more explicit—to bring out more and more compl tely our rational, conscious spiritual nature."
Mackenzie : A Manual of Ethics ; P. 213.

1. "Green was in agreement with Hegel that the moral ideal is thus to be progressively attain d only in a social life which we share with other lfconscious being."
—Lill'e : An Introduction to Ethics ; Page 223.

উন্নতি অর্থে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তুলতে হবে। তার ফলে একদিকে যেমন আসবে নিজের পূর্ণতা, অপর দিকে আসবে সমাজের নৈতিক উন্নতি। পরিশেষে এমন একটি আদর্শ সমাজের সৃষ্টি হবে যেখানে ব্যক্তির চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটবে, যেখানে ব্যক্তিকেই সকল সময় মনে করা হবে লক্ষ্য, উপায় হিসেবে তাকে কখনও ব্যবহার করা হবে না।

ব্রাডলে[1]-এর মতে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির নিজ নিজ অবস্থান ও বুদ্ধি অনুযায়ী কর্তব্য নির্দিষ্ট করা আছে এবং নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী কর্ম করলেই তার পক্ষে আত্মোপলব্ধি লাভ করা সম্ভব হবে। প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ কর্তব্যসাধন করে সমাজের নৈতিক কল্যাণসাধন করতে পারে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পন্ন করে দেহের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করে ঠিক তেমনভাবে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পন্ন করে সমাজের কল্যাণসাধন করতে পারে। মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ জনকল্যাণের বিরোধী নয়, বরং উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি বর্তমান। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সর্বসাধারণের ইচ্ছা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নৈতিক নিয়ম, কর্মপন্থা, নৈতিক বিচারের আদর্শ আংশিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। মানুষ যদি এগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করে তবেই মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং সর্বসাধারণের ইচ্ছার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে। সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তির পক্ষে আত্মোপলব্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। আত্মোপলব্ধি লাভ করতে হলে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে পরিবার, সমাজ, জাতি ও মনুষ্য সমাজের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করতে হবে। সমাজ-সেবার মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের ক্ষুদ্র সত্তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর সত্তার উপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়।

ব্রাডলে এর মতবাদ

প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ কর্তব্য করে সমাজের কল্যাণসাধন করতে পারে

বোসাঙ্কোয়েত নৈতিক জীবনের মান বা মূল্যকে (value) প্রাধান্য দিয়েছেন। সত্য, শিব ও সুন্দর—এই মূল্যগুলিকে উপলব্ধি করতে পারলেই জীবনে আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতা আসবে। আমাদের ক্ষুদ্র সত্তাকে পরিহার করে বৃহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। ম্যাকেঞ্জি বলেন,"বৃহত্তম সত্তার উপলব্ধির অর্থই হল জীবনের পরমার্থ বা প্রধান মূল্যগুলির উপলব্ধি।"[2]

বোসাঙ্কোয়েত-এর মতবাদ

1. F. H. Bradley: Ethical studies.
2. "The realisation of the highest self means the realisation of the supreme values in life." —Mackenzie: A Manual of Ethics, Page 211.

৭। পূর্ণতাবাদের সমালোচনা (Criticism of Perfectionism) ঃ

পূর্ণতাবাদের আদর্শ হল আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতা। কিন্তু এই 'পূর্ণতা' বা 'আত্মোপলব্ধি'র প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় আমাদের পক্ষে একভাবে অসম্ভব। বস্তুতঃ, যথার্থ আদর্শ কখনও পূর্ণভাবে বাস্তবজগতে প্রকাশিত হতে পারে না—হলে সে আদর্শ আদর্শ-ই থাকে না। ফলে পূর্ণতাবাদ এমন কোন নৈতিক নিয়ম আমাদের দিতে পারে না যার দ্বারা আমরা কোন একটি বিশেষ কাজের নৈতিক মূল্য সঠিকভাবে বিচার করতে পারি। অল্প কথায়, পূর্ণতাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলেও আমাদের বলতে হয় এর ব্যবহারিক প্রয়োগ আমাদের সাধ্যাতীত।

বস্তুত', এ পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে একটা কথা হয়ত ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোন একটি নির্দিষ্ট বাদ বা মতানুসারে আমাদের কাজের নৈতিক মূল্য সব সময় স্থির করা যায় না। বহুবিধ নৈতিক মতবাদ বর্তমান থাকার অন্যতম হেতু হচ্ছে আমাদের নৈতিক জীবন বৈচিত্র্যময় এবং কোন একটি মতবাদের সাহায্যে একে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। অর্থাৎ, আমাদের নৈতিক জীবনকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে প্রয়োজনানুসারে সকল মতবাদের সাহায্য নিতে হবে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন মতবাদই অকেজো নয় এবং প্রতি মতবাদেরই নৈতিক জগতে স্থান এবং মূল্য আছে।

প্রত্যেক মতবাদেরই নৈতিক জগতে স্থান এবং মূল্য আছে

সুখবাদের মূল্য হল যে, জনসাধারণ নৈতিক জগতে যা চায় ও যে ভাবে ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করে তা এ মতবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। শেথ্-এর ভাষায় সুখবাদ হল নৈতিক বস্তুবাদ (Ethical Realism)। ন্যায়সঙ্গতভাবে চলে যদি সুখই না পেলাম, অন্যায় করে শাস্তি যদি না পাই, তবে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যের অর্থ কোথায়—সাধারণ লোক এভাবে চিন্তা করে এবং এ চিন্তার পেছনে যুক্তি আছে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সে যুক্তি হল যে, ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য নিছক মানুষের সৃষ্টি নয়—এ পার্থক্য জগতের স্বরূপ দ্বারা স্থিরীকৃত। কাণ্ট ও প্রকারান্তরে তাঁর শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বা পরমার্থ (Supreme Good) ও সম্পূর্ণ মঙ্গল (Complete Good)-এর বিভাগে এ যুক্তিটিকে স্বীকার করেছেন।

সুখবাদের সার্থকতা

কৃচ্ছ্রতাবাদের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। এ মতবাদে নৈতিক জীবনে অনুভূতি ও বুদ্ধির যে দ্বন্দ্ব স্বীকার করা হয়েছে তা যথার্থই হয়েছে। প্রকৃত নৈতিক জীবন হচ্ছে

ভাল-মন্দের রণক্ষেত্র, যেখানে মানুষের নীচ প্রবৃত্তির সঙ্গে তার শুভবুদ্ধির অহরহ বিবাদ চলেছে এবং একে অপরকে নিঃশেষ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এ ছাড়া, কৃচ্ছ্রতাবাদ নৈতিক জীবনে বুদ্ধির যে প্রাধান্য স্বীকার করেছে তাও যথাযথ হয়েছে। মানুষ যে মানুষ তার অন্যতম হেতু হচ্ছে সে বুদ্ধির অধিকারী এবং তার বুদ্ধিই তার বৃহৎ ও মহৎ জীবনের নির্দেশক। শেথ্-এর ভাষায় কৃচ্ছ্রতাবাদ হচ্ছে নৈতিক ভাববাদ (Ethical Idealism)।

কৃচ্ছ্রতাবাদের সার্থকতা

বিবর্তনসম্মত সুখবাদও সঠিকভাবে নির্ণয় করেছে যে মানুষের নৈতিক জীবনের বিকাশ ও অগ্রগমন রাতারাতি সম্ভব নয়, ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কখনও উত্থান, কখনও পতনের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব।

কিন্তু এ সকল বিভিন্ন নৈতিক মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলির কোন তাৎপর্য থাকে না, যদি নৈতিক জীবনের প্রধান উপাদান অর্থাৎ এর পরমাদর্শ, যাকে বলা হয়েছে পরমকল্যাণ বা পূর্ণতা, শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ, একে লাভ করার জন্য এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের না থাকে। জীবনের পরমাদর্শ বলেই এ আদর্শের কোন পূর্ণ পার্থিব প্রকাশ থাকতে পারে না, অথচ একে নিছক কল্পনার বস্তু বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। এক কথায় পরমকল্যাণ একাধারে বাস্তব ও বাস্তবাতীত। এই পরমকল্যাণের সুষ্ঠু ও প্রকৃষ্ট রূপ পূর্ণতাবাদই আমাদের কাছে তুলে ধরে। সেজন্য পূর্ণতাবাদকেই আমরা সকল মতবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিই। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, পূর্ণতাবাদের পূর্ণরূপের উপাদান অন্যান্য মতবাদের দ্বারা প্রদত্ত। এই সমন্বয়মূলক পূর্ণতাবাদই আমাদের স্বীকৃত মতবাদ।

পূর্ণতাবাদের সার্থকতা

প্রশ্নমালা

প্রথম অধ্যায়

নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকৃতি

1, Define Ethics and explain your definition.

2. Define Ethics and indicate its scope.

3. State and explain the exact problem of Ethics.

4. How is right related to good ? Is there a highest moral good ?

5. Give your own opinion on the following :

Can one and the same action be both right and wrong either at the same time or at different times.

6. ‘Ethics is the normative science of the conduct of human beings living in societies"—Analyse this definition of ethics, and add your own comments.

7. Describe the nature and scope of Ethics in the light of the following definition. "Ethics is the normative science of the conduct of human beings living in societies (*Lillie*).

8. Write a short note on Sumum bonum or Supreme good.

9. Explain the terms positive, normative and practical as applied to Ethics as a Science. Discuss the suitability of each.

10. Give a general idea of Ethics as a normative science.

11. How far is it correct to say that Ethics is a practical science ?

12. Explain the end or aim of Ethics.

13. Comment on the following :

(a) The highest good is beyond good and evil.

14.. Give your considered opinion on the following :

(a) Is good conduct an art ?

(b) There are no holidays from virtue.

দ্বিতীয় অধ্যায়

নীতি-সম্বন্ধীয় এবং নীতি বহির্ভূত ক্রিয়া

1. Explain the distinguishing characteristics of moral actions as compared with non moral actions.

2. State the meanings of the terms 'moral and 'non moral'. Inl what sense are all voluntary actions moral ? Give in this connection, a short analysis of a voluntary action.

3. Distinguish between moral and non-moral action. Consider in this connection whether non-moral action can be regarded as immoral.

4. Distinguish between (i) Moral and non moral actions and (ii) non-moral and immoral actions. Are we morally responsible for actions that have become habitual ?

5. Indicate the various stages in the development of a voluntary action and discuss what particular element or elements in it should determine its moral quality.

6. How would you distinguish between motive and intention ? Is the moral judgment concerned with motive or with intention ?

7. Distinguish between moral and non-moral actions. Which of these actions constitute the subject-matter of Ethics, and why ?

8. What are habits ? Do they imply moral responsibility ?

9. Give an analysis of Desire and point out its characteristics. Distinguish human desires from organic wants and anima appetites.

10. Comment on the following :

(a) There is some characteritsic which belongs and must belong to absolutely all right voluntary actions and to no wrong ones.

তৃতীয় অধ্যায়
নৈতিক বিচারের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু

1. What is the distinctive character of moral judgment ?

2. What is exactly the object of moral judgment—motive, intention or consequences of action ?

3. What exactly is the object of moral judgment ?

4. Whom do you judge first, ourselves or others ? Fully discuss this question.

5. Do you agree with the view that 'the end justifies the means ?'

6. A person finds himself in such circumstances that he cannot in any way earn a living ; he is consequently faced with starvation and death. To save his life and also his family ; he commits burglary in the house of his neighbour. How would you judge his conduct ?

7. What is meant by Moral Judgment ? How would you account for its objective validity ? What is the proper object of moral judgment ?

8. What in your opinion is the proper object of Moral Judgment ? How would you judge the conduct of the following :

(a) An affectionate father who punishes his son in order that the son may shake off evil habits ; (b) A kind-hearted man who steals leather in order to make shoes for the poor.

9. "The end justifies the means"—Discuss fully.

10. "Analyse voluntary action and bring out the element or factor that constitutes the freedom of the will."

11. What makes an action right—motive or consequence? Is rightness a character of action or of the person who acts?

12. Do moral judgments possess any objective validity? Examine in this connection the following view: "Moral Judgments are not judgments at all but are of the nature of commands, exclamations or wishes.

13. Comment on the followNig:

(a) The question whether an action is right or wrong always depends on its actual consequences.

(b) "There is some characteristic which belongs and must belong to absolutely all right voluntary actions and to no wrong ones."

(c) Moral Judgments are not Judgments at all, but are of the nature of commands, exclamations or wishes.

চতুর্থ অধ্যায়
প্রধান প্রধান নৈতিক আদর্শ

1. What is the standard of moral judgment?

2. Discuss whether Law can be used as standard of moral judgment.

3. What do you understand by Moral Law? Describe the nature of Moral Laws.

4. What is a moral standard? Discuss whether the moral law or the moral end is the moral standard.

5. Distinguish between legal ethics and teleological ethics. Can external law be taken as the moral standard?

পঞ্চম অধ্যায়

সুখবাদ

1. Discuss whether pleasure can be used as a standard of moral judgment. What is paradox of hedonism ?

2. What is a standard of moral judgment ? Examine the claim of pleasure to be such a standard.

3. Critically consider Bentham's theory of Hedonism, emphasizing the chief points of distinction between his theory and that of Mill.

4. Give a critical estimate of Mill's Utilitarianism. Is it consistent with hedonism ?

5. What is Altruistic Hedonism ? What improvements were made by Mill upon Bentham's view of it ?

6. Give a critical estimate of Mill's Utilitarianism.

7. What is Hedonism and what are its different forms ? Is Hedonism in any of its forms a satisfactory ethical theory ?

8. Distinguish between Psychological Hedonism and Eithical Hedonism.

9. Is there any place for Egoism in moral life ? Discuss whether there is any conflict between Egoism and Altruism.

10. Explain and criticise Psychological Hedonism.

11. What are the grounds of conflict between Hedonism and Rigorism ? How far can the conflict be resolved ?

12. Critically examine Mills Utilitaranism as a theory of morality. Is psychological hedonism consistent with Utilitarianism.

13 What is Ethical Hedonism ? Estimate its merits and demerits as a moral standard.

14. Explain J. S. Mill's doctrine of Utilitarianism. How does Mill try to improve upon Bentham's theory ? Is Mill a consistent hedonist ?

15. Suppose it is a fact that we do seek pleasure but does it support the principle that we should seek pleasure ? Answer fully.

16. State and examine the doectrine of Psychological Hedonism ? Is there any passage from psychological hedonism to ethical hedonism.

17. Give a brief criticial exposition of altruistic hedonism.

18. Give your considered opinion on the following :

Is there any passage from psychological hedonism to ethical hedonism ?

19. Give an account of the different types of ethical hedonism. How is ethical hedonism related to psychological hedonism ? —Discuss.

20. Discuss critically the central tenets of Utilitarianism.

21. Explain and criticise psychological hedonism. Should ethical hedonism be based upon psychological hedonism.

22. Discuss the merits and demerits of Utilitarianism as advocated by Mill.

23. Comment on the following :

(a) To get pleasure is to forget it.

(b) Altruism is only magnified egoism.

24. Write short notes on : Paradox of Hedonism.

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবর্তনসম্মত সুখবাদ

1. Explain how the theory of evolution is applied to the study of Ethics.

2. Enumerate the merits and defects of Evolutional Hedonism.

3. What is the difference between the evolutionist criterion of morality and that of the utilitarian ?

4. Estimate the value of evolutionary hedonism propounded by H. Spencer.

5. What is Evolutionary Hedonism ? Give a critical account of evolutionary hedonism as formulated by Herbert Spencer.

6. 'Conduct is the continuous adjustment of the internal relations to external relations'.—*Herbert Spencer.*—Discuss this statement. Is the theory of Evolution consistent in upholding pleasure as the criterion of good conduct ?

সপ্তম অধ্যায়

বিচারবাদ বা কৃচ্ছ্রতাবাদ

1. Critically expound Kant's doctrine of the categorical imperative. Determine its practical value.

2. Critically expound Kant's doctrine of the Categorical Imperative.

3. What is Kantian Formalism ?

4. Does morality necessarily imply complete elimination of emotions and passions ? Examine in this connection Kant's theory of 'Duty for Duty's sake.'

5. Give a critical exposition of Kant's theory of moral standard.

6. Discuss the view that the highest good of the self consists in self-abnegation.

7. Comment on the following :

(a) Thou aughtest implies thou canst.

(b) Kantian Ethics is formalistic in character.

8. What does Kant mean by the Categorical Imperative ? Examine his conception of duty for duty's sake as a moral theory.

9. Explain fully Kant's doctrine of Categorical Imperative. How far is the charge of formalism levelled against Kant ?—Justified.

10. (a) There is nothing in the world or even out of it that can be called good without qualifications except a good will."

(b) 'Nothing is intrisically good, unless it is or contains an excess of pleasure over pain. Attempt a comparative estimate of the above two views.

11. Give a short account of Kant's ethical theory. "The most fundamental objection to Kant's theory is just that he conceived of a good will as willing in a vacuum."— Do you agree ?

12. Comment on the following :

(a) Act so that your line of action may become a law universal.

13. "Good will is good in itself"—Elucidate.

14. Explain Kant's conception of the moral law and consider the interpretation Kant puts upon the phrase. "Duty for Duty's sake."

অষ্টম অধ্যায়

পূর্ণতাবাদ

1. It has been said that self-realisation is the moral ideal. What is the self to be realised ?—Discuss.

2. 'Perfectionism embodies all the elements of truths contained in other systems of morality '—justify the remark .

3. What are the merits of perfectionism and do you think it to be the most satisfactory view of morality ?

4. Explain the Perfectionistic reconciliation of Hedonism with Rationalism and of Egoism with Altruism.

5. How do you distinguish between Perfectionism and Eudaemonism ?

6. Is Pleasure or Perfection the real ethical standard ?

7. Discuss the merits and demerits of Perfectionism as a theory of the ethical standard.

8. What is meant by the Ethics of self-realization ? How does it reconcile hedonism with rationalism ?

9. Discuss how far self-realisation can be regarded as a moral ideal.

10. When is a man said to have attained moral perfection ? Answer in the light of your understanding of Perfectionism.

11. Critically examine Eudœmonism as a theory of moral standard.

12. State and examine the main tenets of Eudæmonism. Show how it tries to reconcile the rival theories of moral standard.

13. State the main features of the theory of Perfection as moral standard. Show how "the view of the standard as perfection provides in some measure a middle way between ontological and teleological theories of ethics".

পারিভাষিক

Absolute Ethics—নিরপেক্ষ নীতিবিজ্ঞান
Active—কর্মপ্রবৃত্তিমূলক
Actual self—বাস্তব 'আমি'
Aesthetic Judgment—সৌন্দর্য সম্পর্কীয় বিচার
Asthetic Sense Theory—সৌন্দর্য-চেতনাবাদ
Affective—অনুভূতিমূলক
Altruistic Hedonism—পরসুখবাদ, বহুসুখবাদ
A Posteriori—অভিজ্ঞতালব্ধ
A Priori—অভিজ্ঞতাপূর্ব
Appetite—আকাঙ্ক্ষা
Art—কলা
Casuistry—ধর্মাধর্মবিচারবিদ্যা
Categorical Imperative—শর্তহীন আদেশ
Character—চরিত্র
Conduct—আচরণ
Conflict of Desire—কামনার দ্বন্দ্ব
Conscience—বিবেক
Demerit—অগৌরব, নৈতিক অপকর্ষ
Desire—কামনা
Determinate Duties -নির্দিষ্ট কর্তব্য
Duty—কর্তব্য
Egoistic Hedonism—আত্মসুখবাদ
End—লক্ষ্য, উদ্দেশ্য
Energism—শক্তিবাদ
Ethical Hedonism—নীতিবিজ্ঞানসম্মত সুখবাদ
Eudæmonism—কল্যাণবাদ
Evil—মন্দ, অনিষ্ট, অকল্যাণ
Evolutional Hedonism—বিবর্তনবাদসম্মত সুখবাদ
External Law—বহির্বিধি
External Sanctions—বহির্নিয়ন্ত্রণ
Fallacy of Composition—সমষ্টি হেত্বাভাস
Fallacy of Division—ব্যষ্টি হেত্বাভাস
Formal Goodness—আকারগত ভালত্ব
Freedom of will—ইচ্ছার স্বাধীনতা
Good—ভাল, কল্যাণ
Gross Hedonism—স্থূল বা অসংযত সুখবাদ
Habit—অভ্যাস
Habitual—অভ্যাসসিদ্ধ, অভ্যাসলব্ধ
Hapiness—শান্তি
Hedonism—সুখবাদ
Hedonistic calculus—সুখবাদের গণনা প্রণালী
Highest Good—পরমার্থ, পরমকল্যাণ
Ideal Self—আদর্শ আত্মা
Ideo-motor Action—ভাবজ-ক্রিয়া
Imitative Action—অনুকরণশীল ক্রিয়া
Imparti l spectator—নিরপেক্ষ দর্শক
Indeterminate Duties—অনির্দিষ্ট কর্তব্য
Individuality—স্বাতন্ত্র্য
Instinctive Activites—সাহজিক ক্রিয়া
Intellectual—জ্ঞানসম্পর্কীয়
Intention—অভিপ্রায়
Internal Sanction—অন্তরের নিয়ন্ত্রণ
Intrinsically Good—নিজসত্তায় কল্যাণকর
Introspection—অন্তঃদৃষ্টি
Intuition—স্বজ্ঞা
Intuitionism—স্বজ্ঞাবাদ
Judgment of Fact—ঘটনার অবধারণ
Legal Ethics—নিয়মমূলক নীতিবিজ্ঞান
Material Goodness—বস্তুগত ভালত্ব
Material Science—জড়বস্তু সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান
Mental Scienee—মন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান
Merit—গৌরব, নৈতিক উৎকর্ষ
Metaphysics—অধিবিদ্যা
Moral Actions—নীতি-সম্বন্ধীয় ক্রিয়া
Moral Consciousness—নৈতিক চেতনা
Moral Faculty—নৈতিক বৃত্তি
Moral Idea—নৈতিক আদর্শ
Moral Insight—নৈতিক অন্তঃদৃষ্টি
Morality—নীতি, নৈতিকতা
Moral Ju lgment—নৈতিক বিচার

Moral Obligation—নৈতিক বাধ্যতাবোধ, নৈতিক বাধ্যবাধকতা
Moral Progress—নৈতিক অগ্রগতি
Moral Sanctions—নৈতিক নিয়ন্ত্রণ
Moral Sense Theory—নীতি-ইন্দ্রিয়বাদ
Moral Sentiment—নৈতিক মনোভাব
Mores—রীতিনীতি, অভ্যাস
Motive—উদ্দেশ্য
Natural Science—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান
Natural Selection—প্রাকৃতিক নির্বাচন
Non-evolutionary Hedonsim—বিবর্তনবাদ, নিরপেক্ষ সুখবাদ
Normative Science—আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান
Objective—ব্যক্তিনিরপেক্ষ
Object of Moral Judgement—নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু
Organic Theory—আঙ্গিক মতবাদ
Organic Unity—আঙ্গিক ঐক্য
Other-regarding—পরকেন্দ্রিক
Oughtness—ঔচিত্যবোধ
Paradox of Hedonism—সুখবাদের হেঁয়ালি বা বিরোধাভাস
Psychological—মনস্তত্ত্বমূলক
Perfectionism—পূর্ণতাবাদ
Pleasure—সুখ
Positive Science—বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান
Postulate—স্বীকার্য সত্য
Practical Science—ব্যবহারিক বিজ্ঞান
Preventive—প্রতিরোধাত্মক
Prudence—বিজ্ঞতা, চাতুর্য
Psychological Hedonism—মনস্তত্ত্বসম্মত সুখবাদ
Refined Hedonism—সূক্ষ্ম বা সংযত সুখবাদ
Reflex Action—প্রাবর্তক ক্রিয়া
Reformative—সংশোধনাত্মক
Relative good—আপেক্ষিক কল্যাণ
Retributive—প্রতিশোধাত্মক
Relative Ethics—সাপেক্ষ নীতিবিজ্ঞান
Right—যথোচিত, সার্বিক যথার্থ অধিকার
Rigorism—কৃচ্ছ্রতাবাদ
Self—সত্তা, আত্মা
Self-consciousness—আত্ম-সচেতনতা
Self-realisation—আত্মোপলব্ধি
Self-regarding—আত্মকেন্দ্রিক
Social-Self—সামাজিক আত্মা
Spontaneons Action—স্বতঃসম্ভূত ক্রিয়া
Spring of Action—ক্রিয়ার মূল উৎস
Standard of Morality—নৈতিক আদর্শ
Subjective—ব্যক্তিসাপেক্ষ
Summum Bonum—পরমকল্যাণ, পরমার্থ
Supreme Good—পরমার্থ, পরমকল্যাণ
Teleological Ethics—পরিণতিমূলক নীতিবিজ্ঞান
Theoretical—তাত্ত্বিক বা তত্ত্বনিষ্ঠ
Transcendental—বাস্তবাতীত
Transference of Interest—স্বার্থের স্থানান্তরকরণ
Value—মূল্য, মান
Vice—অধর্ম, অসদাচার
Virtue—সততা
Voluntary Actions—ঐচ্ছিক ক্রিয়া
Want—অভাব
Will—সঙ্কল্প
Wish—ইচ্ছা
Universe of Desire—কামনার জগৎ
Utilitariannism—উপযোগবাদ

প্রথম পত্র

'খ'—বিভাগ

ভারতীয় দর্শন

[INDIAN PHILOSOPHY]

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ত্ব
(Basic characteristics of Indian Philosophy)

১। দর্শনের অর্থ (Meaning of Darsana) :

চলতি কথায় 'দর্শন' শব্দটি ইংরেজী Philosophy শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

'দৃশ্' ধাতু থেকে দর্শন শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হল 'দেখা'[1]। এই 'দেখা' নানারকমের হতে পারে। দেখা বললে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকে বোঝাতে পারে বা ধারণাগত জ্ঞানকে (conceptual knowledge) বোঝাতে পারে বা স্বজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতাকে (intuitional experience) বোঝাতে পারে। স্বজ্ঞা হল বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রতীতি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া বস্তুর যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি। এই দেখা হতে পারে ঘটনার পর্যবেক্ষণ, যৌক্তিক অনুসন্ধান বা আত্মার পরিজ্ঞান (insight of the soul)। সাধারণতঃ দর্শন বলতে বোঝায় উপলব্ধ সত্যের বিচারমূলক ব্যাখ্যা (critical exposition), বা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত চিন্তার সংহতি। অবশ্য এই অর্থে, দার্শনিক চিন্তাধারার আদিস্তরে, দর্শন কথাটি ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, তখন দর্শন ছিল অনেকটা স্বজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতা, অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়বস্তু। কিন্তু দর্শনের সঙ্গে স্বজ্ঞার সম্পর্ক থাকলেও দর্শন নিছক স্বজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতা নয়। সত্যের সাক্ষাৎ প্রতীতি যদি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত না হয়, তাহলে দর্শন হয় না। এই কারণেই দর্শন পদটির সুবিবেচিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এই অর্থে যে, দর্শন হল চিন্তার সংহতি বা সুসংবদ্ধ রূপ (thought system), যা স্বজ্ঞামূলক অভিজ্ঞতার দ্বারা লব্ধ এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থিত।

'দেখা' তিন প্রকারের হতে পারে

দর্শন কথাটির যথার্থ অর্থ

দর্শন হল স্বজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতার প্রমাণ এবং তার যৌক্তিক প্রচার। যে কোন দর্শনের ক্ষেত্রেই দর্শন বলতে যুক্তি-বিচারের মাধ্যমে সত্যের ব্যাখ্যাকেই (logical exposition of the truth) বোঝায়। এই সত্যকে স্বজ্ঞার সাহায্য ছাড়া চিন্তার মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে।

---

1. Radhakrisnan : Indian Philosophy ; Second Edition, Vol. I., Page 93.

পাশ্চাত্ত্য দেশে যাকে 'Philosophy' বলা হয় ভারতে তাকেই আমরা দর্শন বলে অভিহিত করি। দর্শন যদিও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণকে বোঝায়, এক্ষেত্রে দর্শন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণ নয়। দর্শন মানে তত্ত্বদর্শন, জগতের এবং জীবের স্বরূপ উপলব্ধি। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা তত্ত্ব সাক্ষাৎকারই দর্শন। সত্য কাকে বলে? যে মূল তত্ত্বের সাহায্যে জগৎ ও জীবনের যথাযথ স্বরূপকে জানা যায় এবং ব্যাখ্যা করা যায় তাকেই সত্য বলে। যা জ্ঞাত হলে সব কিছুই জ্ঞাত হয় তাই সত্য। এই সত্যচর্চাই দার্শনিকের কাজ। সে কারণে ভারতীয়দের দৃষ্টিতে তিনিই দার্শনিক যার সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়েছে, যার তত্ত্ব সাক্ষাৎকার ঘটেছে, যিনি এই বিশ্বজগতের ও জীবনের স্বরূপ জেনেছেন।

Philosophy হল জ্ঞানের জন্য অনুরাগ

সত্য উপলব্ধির পথে প্রধান অন্তরায় হল, কেবল চোখে দেখে বা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার দ্বারা সব সময় সত্যকে জানা যায় না। এজন্য যা আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হয় তা সকল সময় সত্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে তা মিথ্যা বা সত্যের আভাস মাত্র। মিথ্যার আড়ালকে সরিয়ে দিতে না পারলে সত্যের স্বরূপ আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না। বস্তুর দুটি রূপ আছে—একটি তার বাহ্যরূপ এবং অপরটি তার স্বরূপ বা যথার্থ রূপ। এই বাহ্যরূপটিকে বলা হয় অবভাস বা প্রতিভাস (appearance)। দার্শনিকের কাজ বস্তুর বাহ্যরূপের আড়ালে অবস্থিত তার যথার্থ স্বরূপটিকে আবিষ্কার করা।

বস্তুর বাহ্যরূপ ও যথার্থ রূপ

ইংরেজী 'Philosophy' এবং 'Philosopher' শব্দ দুটি গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গ্রীক শব্দ 'Philos' মানে হল অনুরাগ (loving) এবং 'sophia' শব্দটির অর্থ হল জ্ঞান (knowledge)। সুতরাং; Philosophy শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ (love of knowledge) বা সত্যের প্রতি অনুরাগ। কাজেই 'philosopher বলতে আমরা বুঝি সেই ব্যক্তিকে যিনি জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী বা সত্যের প্রতি অনুরাগী।

ইংরেজী Philosopher-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে বিচার করতে গেলে ভারতীয়রা যাকে দর্শন নামে অভিহিত করে তা ইংরেজী philosopher-র প্রতিশব্দ নয়; কারণ তত্ত্বদর্শন বা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের বিষয়টি philosophy-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নয় বা philosophy-র অর্থ নয়। তবু আলোচনার বিষয়বস্তু, দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি এবং জীবনের সঙ্গে উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে 'দর্শন' এবং 'philosophy'-র মধ্যে মিল লক্ষ্য করে 'philosophy'-র প্রতিশব্দ হিসেবে দর্শন কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

দর্শন ও Philosophy-র মধ্যে মিল

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ইংরেজী philosophy শব্দের সঙ্গে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনে philosophy-র বিভিন্ন সংজ্ঞা এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে, দর্শন বিশেষ করে বুদ্ধির আলোকে সত্যের অনুসন্ধান (an intellectual quest for truth)। ভারতীয় দর্শন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক এবং ভারতীয় দর্শন সকল সময়ই সত্যের ব্যবহারিক উপলব্ধির (practical realisation of truth) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। দর্শন বলতে দুটি বিষয়কে বোঝায়—সত্যের উপলব্ধি এবং সত্য উপলব্ধির উপায় (means)। দর্শন কেবলমাত্র সত্যের সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ উপলব্ধি বা সত্যের বাস্তব প্রত্যক্ষণকে বোঝায় না। যে পথ অনুসরণ করে এবং যার মাধ্যমে এই উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয় তাকেও বোঝায়। সেই কারণে ভারতীয় দর্শনে প্রায় সব দার্শনিক সম্প্রদায়ই সত্য উপলব্ধির জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রক্রিয়া অবলম্বনের কথা বলেছেন।

আত্মাকে জান—ভারতীয় দর্শনের মূল কথা

শাশ্বত সত্যের সন্ধানে ভারতীয় দর্শন তাই 'অন্তরের গহণতম কেন্দ্রে প্রবেশ খুঁজেছেন'; বাইরের জগতের থেকে অন্তর্জগতের দিকেই তার দৃষ্টি অধিক। আন্তরসত্তার উপলব্ধির ভিত্তিতেই বাইরের জগতকে বুঝবার চেষ্টা করেছে ভারতীয় দার্শনিক। তাই 'আত্মানং বিদ্ধি' বা 'আত্মাকে জান' প্রায় সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের দার্শনিক চিন্তাধারার মূল কথা।

দর্শন হল আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষণ

কাজেই 'দর্শন'[1] হল আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষণ, এক পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি যা আত্মার চেতনার কাছে প্রকাশিত হয়। আত্মার এই দৃষ্টিই হল দার্শনিকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই দৃষ্টি তখনই সম্ভব হয় যখন এই দর্শনই হয়ে ওঠে দার্শনিকের জীবন। কাজেই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের পক্ষেই দর্শন সম্ভব যাদের রয়েছে চিত্তের শুদ্ধিতা। এই শুদ্ধিতার ভিত্তি হল দার্শনিকের মধ্যে অন্তর্নিহিত এক গভীর শক্তি, যার জন্য তিনি শুধু জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেন না, তাকে অনুধাবন করেন, উপলব্ধি করেন। এই অন্তরতম উৎস থেকেই দার্শনিক আমাদের কাছে জীবনের সত্যকে প্রকাশ করেন, যে সত্যকে শুধুমাত্র বুদ্ধি আবিষ্কার করতে পারে না।

কাজেই যদিও দর্শন মানে 'দেখা', তবু যে-কোন দেখাই দর্শন নয়। সত্যকে দেখা

1. "A 'darsana' is a spiritual perception, a whole view revealed to the soul sense."—Radhakrisnan : Indian Philosophy ; Second Edition.
Vol. 1, Page 44.

এবং সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করাই হল দর্শন এবং যে শাস্ত্রে সত্যকে দর্শন করার পথ, পদ্ধতি ও পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাই হল দর্শনশাস্ত্র। দর্শন হল তত্ত্বদর্শন, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকরণ। সে কারণে দার্শনিক কেবল তত্ত্ব-জ্ঞানী নন, তিনি তত্ত্বদর্শীও বটে। তিনি সত্যানুরাগী, তিনি সত্যদ্রষ্টা। জগৎ ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ দর্শনের জন্য দার্শনিক সর্বদাই সচেষ্ট। তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেন ও সত্যকে জীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধির করার জন্য ব্রতী হন এবং উপলব্ধ সত্যকে যুক্তিতর্কের আলোকে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন।

দার্শনিকের পরিচয়

২। ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি (The Nature of Indian Philosophy):

ভারতীয় দর্শনকে অনেকে 'হিন্দু দর্শন' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ভারতীয় দর্শন ও হিন্দুদর্শন সমার্থক নয়। অবশ্য হিন্দু বলতে যদি বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে না বুঝে 'ভারতীয়' বুঝি, তাহলে ভারতীয় দর্শনকে 'হিন্দু দর্শন' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু হিন্দু বলতে যদি আমরা মনে করি বিশেষ একটি সম্প্রদায়, তাহলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দু দর্শনরূপে অভিহিত করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতামত আলোচিত হয়েছে। হিন্দু, অ-হিন্দু, আস্তিক, নাস্তিক সকলের দার্শনিক মতবাদই ভারতীয় দর্শনে স্থান লাভ করেছে। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' আমরা বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের আলোচনা পাশাপাশি দেখতে পাই। একদিকে যেমন আমরা সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দু দর্শনের আলোচনা দেখি, তেমনি বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেরও আলোচনা দেখতে পাই।

ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু দর্শন সমার্থক নয়

ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতামত আলোচনা করে

দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও ব্যাপকতা ভারতীয় দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যদিও অনেক পার্থক্য আছে, তবু একথা ভুললে চলবে না যে, কোন একটি বিশেষ দর্শন অপর দর্শনের প্রচারিত মতবাদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করত এবং সেগুলিকে জানবার জন্য সচেষ্ট হত। অপরের মতবাদগুলি ভালভাবে জেনে ও কিভাবে সেগুলি খণ্ডন করা যায় তা স্থির করে তবেই যে কোন দর্শন নিজের সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হত। অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ভাব থেকেই ভারতে দার্শনিক আলোচনার এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করার রীতি প্রবর্তিত হয়। কোন দার্শনিক নিজের মতবাদ

দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও ব্যাপকতা

আলোচনার বিশেষ রীতি

প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে সর্বপ্রথম প্রতিপক্ষের মতবাদ ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করতেন, যাকে বলা হয় **পূর্বপক্ষ**। তারপর শুরু হত, পূর্বপক্ষের **খণ্ডন**। এরপর দার্শনিক যুক্তি-তর্কের সহায়তায় নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতেন, একে বলা হয় **উত্তরপক্ষ** বা সিদ্ধান্ত। প্রতিপক্ষের দার্শনিক মতবাদের সুষ্ঠু সম্যক আলোচনার এই উদার প্রচেষ্টা ভারতীয় প্রতিটি দর্শনের মধ্যে এনেছিল সম্পূর্ণতা এবং তাকে করে তুলেছিল বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ।

দর্শনালোচনার তিনটি ক্রম—পূর্বপক্ষ, খণ্ডন ও উত্তরপক্ষ

প্রতিটি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রই এই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শঙ্কর, রামানুজ প্রমুখ বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন ভাষ্যকার বেদান্ত দর্শনের আলোচনা ছাড়াও চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের মতবাদগুলিও তাদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে বৌদ্ধ বা জৈন দর্শন সম্পর্কীয় গ্রন্থেও আমরা অন্যান্য দার্শনিক মতবাদগুলির সুষ্ঠু আলোচনা পেয়ে থাকি। অপরের মতামতকে জানার এই দুর্নিবার স্পৃহা ভারতীয় দর্শনগুলিকে করে তুলেছিল উদার, বিস্তৃত এবং অমূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডার।

পারস্পরিক আলোচনায় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি

ভারতীয় দর্শনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার আধ্যাত্মিক পটভূমিকা (Spiritual background)। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনায় ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বালোচনা নয়, এ হল সত্যের সন্ধান ও উপলব্ধি। ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তাত্ত্বিক (Theoretical) নয়, এর একটি প্রয়োগের (Practical) দিকও আছে। ভারতীয় দার্শনিক মনে করেন যে, দর্শনের সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। দার্শনিক জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে সহায়তা করে, যথাযথ জীবনযাপনে সাহায্য করে। ভারতীয় দর্শন বিশেষ করে আধ্যাত্মিক, যেহেতু ভারতে দর্শন ও ধর্মের মধ্যে এক গভীর সংযোগ বর্তমান। ভারতীয়দের কাছে ধর্ম মানে নিছক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা নয় ; ধর্ম হল আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ উপলব্ধি যা মানুষকে মোক্ষলাভে সহায়তা করে। ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ লাভই (Liberation) হল পরমার্থ (*Summum Bonum*)। ভারতীয়দের চোখে দর্শনই নীতি ও ধর্মের মূল ভিত্তি।

আধ্যাত্মিক পটভূমিকা

দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে দর্শনের গভীর সংযোগ

ভারতীয় দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার সংশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি (Synthetic outlook)। ভারতীয় দর্শনের আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই এই দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মতো ভারতীয় দর্শনও অধিবিদ্যা, (Metaphysics),

নীতিবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) সম্পর্কীয় বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করে, তবে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মতো এগুলি পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে না। একই দার্শনিক সমস্যা—অধিবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচিত হয়। ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনা পদ্ধতির এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই অনেকে সংশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বলে অভিহিত করেছেন।

সংশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি

৩। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা বা দর্শন সম্প্রদায় (The Schools of Indian Philosophy) :

ভারতীয় দর্শনগুলিকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা—আস্তিক (Orthodox) এবং নাস্তিক (Heterodox)। সাধারণতঃ ষড়-দর্শন বলতে আমরা যে ছয়টি দর্শনকে বুঝে থাকি; যথা—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত—এরা হল আস্তিক এবং চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হল নাস্তিক।

চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হল নাস্তিক, অন্যগুলি আস্তিক

'আস্তিক' এবং 'নাস্তিক'—এই শব্দ দুটিকে এখানে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আস্তিক বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে বুঝি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আস্তিক বলা হয়েছে তাদের যারা বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদের সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে। সুতরাং, কোন দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েও যদি বেদে বিশ্বাসী হয় তাকে আস্তিক বলা হবে। অপরদিকে, ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সেগুলিই নাস্তিক যেগুলি বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে না এবং বেদকে প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করে না। এই বিভাগ অনুসারে সাংখ্য এবং মীমাংসা দর্শন যদিও জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তবু এই উভয় দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু উভয় দর্শনই বেদে বিশ্বাসী এবং বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়।

আস্তিক ও নাস্তিক শব্দ দুটির ব্যবহার

যে ষড়দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, তাদের মধ্যে একদিকে যেমন অনেক বিষয়ে মতের মিল আছে, তেমনি নানা বিষয়ে মতভেদও আছে। যেমন, সাংখ্য এবং যোগ, উভয় দর্শনই পুরুষ ও প্রকৃতিকে স্বীকার করে তাদের দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেছে; কিন্তু সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, অথচ যোগ দর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সাংখ্য দর্শন-মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না এবং এই জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার

ষড়দর্শনের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ

কোন প্রয়োজন নেই। যোগদর্শন পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুই তত্ত্ব ছাড়াও ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে এবং এর মতে এই জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা ও পরিণামই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মীমাংসা দর্শনের মধ্যেও আমরা দুটি প্রধান মতবাদের পার্থক্য লক্ষ্য করি। একদিকে প্রভাকর মিশ্র এবং অপরদিকে কুমারিল ভট্ট উভয়েই মীমাংসাবাদী হওয়া সত্ত্বেও এঁদের মধ্যে মতের পার্থক্য আছে। মীমাংসকগণ ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাসী নন। অনুরূপভাবে, বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে শঙ্কর তাঁর অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন এবং রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ, রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। শঙ্করের মতে কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা মায়ার সৃষ্টি; কিন্তু রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করে ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়কেই সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; তবুও এগুলিকে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু এরা সকলেই বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে মনে করে।

মতবিভেদ সত্ত্বেও ষড়দর্শন বেদে বিশ্বাসী এবং সেহেতু আস্তিক

অপরদিকে, তিনটি প্রধান নাস্তিক দর্শন হল—চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন। চার্বাক দার্শনিকরা জড়বাদী। তাঁরা কেবলমাত্র জড়ের অস্তিত্বই স্বীকার করেন, আত্মার পৃথক সত্তা স্বীকার করেন না এবং তাঁদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষণই একমাত্র জ্ঞানলাভের উপায় বা প্রমাণ এবং যেহেতু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেহেতু ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। জৈন দার্শনিকরা দ্বৈতবাদী। দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে তাঁরা তাকে 'অস্তিকায়' এবং 'নাস্তিকায়'—এই দু' ভাগে বিভক্ত করেন। অস্তিকায় অর্থে যার বিস্তৃতি, কায় বা দেহ বর্তমান; যেমন—'জীব' বা 'অজীব'। কাল (time) হল নাস্তিকায়, যেহেতু এর কোন বিস্তৃতি নেই। অস্তিকায় দ্রব্যকে দুভাগে ভাগ করা হয়; যথা—জীব এবং অজীব। জীব চেতন দ্রব্য, অজীব অচেতন দ্রব্য। জীব এবং আত্মা সমার্থক। আত্মা চেতনস্বভাব।

নাস্তিক দর্শনের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ

জগৎস্রষ্টারূপে কোন ঈশ্বরের সত্তায় জৈন দর্শন বিশ্বাস করে না। জৈন দার্শনিকদের মতে এই জগৎ ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন এবং নানা যুক্তির সাহায্যে জৈনগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। জৈন দর্শন নাস্তিক দর্শন। জৈনগণ শুধু যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তা নয়, বেদকেও প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করে না। বৌদ্ধ দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় মানুষের জীবন। জরামরণের

হাত থেকে মানুষ কিভাবে মুক্তিলাভ করতে পারে বুদ্ধদেব তারই পথ নির্দেশ করেছেন। জটিল দার্শনিক তত্ত্বালোচনাকে তিনি নিরর্থক ও মূল্যহীন মনে করতেন। বৌদ্ধরা মনে করেন, এ জগতের সব কিছুই অনিত্য। কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরস্থায়ী নয়। জগতের সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনই জগতের একমাত্র সত্য। যেহেতু কোন কিছুই নিত্য বা শাশ্বত নয়, সব কিছুই অনিত্য এবং ক্ষণিক, সেহেতু চিন্ময় সত্তারূপে কোন আত্মা নেই। বৌদ্ধধর্মেও ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। অতএব চার্বাক, জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক, যেহেতু এরা কেউ বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে না।

চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করে

এই প্রসঙ্গে বেদ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ভারতীয় চিন্তাধারার সূচনা ও ক্রমবিকাশের পথে বেদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। বেদ ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য এবং পরবর্তী কালের চিন্তাধারা —বিশেষ করে দার্শনিক ধারণা বেদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে যেসব দর্শন বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের মধ্যে দুটি দর্শন, অর্থাৎ মীমাংসা এবং বেদান্ত প্রত্যক্ষভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় চিন্তাধারায় বেদের স্থান

বেদের মন্ত্রগুলির দুটি দিক আছে—একটি কর্মের দিক এবং অপরটি জ্ঞানের দিক। মীমাংসা দর্শন বেদের যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতাই প্রমাণ করেছে এবং বেদান্ত দর্শন বেদের জ্ঞানের দিকটি অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ, জীবাত্মার ও পরমাত্মার সম্পর্ক প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বগুলি যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে আলোচনা করেছে। মীমাংসা এবং বেদান্ত উভয়ই সাক্ষাৎভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে, সময় সময় উভয়কেই একই নামে অর্থাৎ মীমাংসা নামে অভিহিত করা হয়; তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ করার জন্য প্রথমটি বলা হয় 'পূর্ব-মীমাংসা' বা 'কর্ম মীমাংসা' এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'উত্তর-মীমাংসা' বা 'জ্ঞান-মীমাংসা'। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা মীমাংসা দর্শন বলতে কর্মমীমাংসাকেই বুঝে থাকি এবং শেষোক্ত দর্শনকে বেদান্ত নামেই অভিহিত করে থাকি।

মীমাংসা বেদের কর্মের দিক ও বেদান্ত বেদের জ্ঞানের দিক আলোচনা করে

সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন যদিও বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে তবু এই সব দর্শন দার্শনিক আলোচনায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পদ্ধতি অনুসরণ করে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজ নিজ যুক্তি পদ্ধতির সহায়তায় এই সব

দর্শন নিজেদের মতবাদগুলি আলোচনা করে এবং নিজ নিজ দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে। বেদের প্রাধান্য এরা অস্বীকার করেনি বরং এরা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, নিজ নিজ স্বাধীন পদ্ধতি ও যুক্তিতর্ক অনুসরণ করলেও এদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়, বরং বেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এদের সিদ্ধান্তের অনেকটা সামঞ্জস্য এবং মিল আছে। এই সব দর্শন যদিও মীমাংসা ও বেদান্তের মতো সাক্ষাৎভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তবু বেদের প্রাধান্যকে স্বীকার করার জন্য এগুলিকে আস্তিক দর্শন বলা হয়।

সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিকের নিজ নিজ স্বাধীন চিন্তাপদ্ধতি অনুসরণ

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলিকে নীচে ছকের সাহায্যে দেখান হচ্ছে :
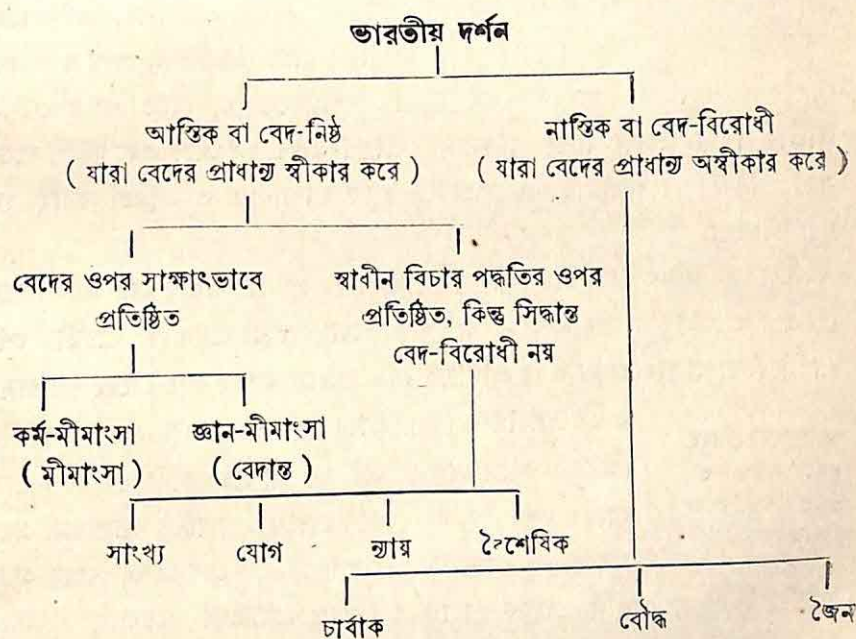
৪। ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগের বিচার (Consideration of some charges levelled against Indian Philosophy) :

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কতকগুলি অভিযোগ আনা হয়। ভারতীয় দর্শনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হলে এই সব অভিযোগগুলি বিচার করে দেখা প্রয়োজন এবং এই সব অভিযোগের মূলে কতখানি সত্যতা আছে

তা নির্ধারণ করা দরকার। ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয় তার মধ্যে যেগুলি প্রধান, সেগুলিই আমরা এখন পরপর আলোচনা করছি :

(ক) ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন (Indian Philosophy is dogmatic) : ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তার মধ্যে একটি প্রধান অভিযোগ হল, ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন। বিচারবিযুক্ত দর্শন বলতে কি বোঝায় তাই সর্বপ্রথম আলোচনা করা যাক। সাধারণতঃ, তাদেরই বিচারবিযুক্ত দার্শনিক বলা হয় যারা মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং তার সীমা সম্পর্কে কোন বিচার না করেই তত্ত্বালোচনা শুরু করে দেয় এবং কতকগুলি মনগড়া সিদ্ধান্তে পৌছায়। এই জাতীয় দর্শন স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ না করে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা থেকেই সিদ্ধান্ত গঠন করে। বিনা বিচারে এরা অনুশাসন বাক্য (Dogma) গ্রহণ করে এবং সেগুলির অকাট্যতা স্থাপনে প্রয়াসী হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, এ জাতীয় দর্শনে স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ হল গৌণ এবং গৃহীত মতের সত্যতা বিনা বিচারে স্বীকার করে নেওয়া বা তাকে ব্যাখ্যা করা ও প্রতিষ্ঠা করাই হল মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিচারবিযুক্ত শব্দটির অর্থ

যেহেতু অনেক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে মনে করে, সেহেতু অভিযোগকারীরা বলেন যে, ভারতীয় দর্শন স্বাধীন চিন্তা বা যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বেদকে ব্যাখ্যা করা, বেদের অনুশাসন ও উপদেশবাণীকে বিনা বিচারে গ্রহণ এবং প্রচার করাই ভারতীয় দর্শনের একমাত্র কাজ। এই সব অভিযোগকারী যে কেবলমাত্র আস্তিক দর্শন; অর্থাৎ যেগুলি বেদকে প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করে তা নয়, যেগুলি নাস্তিক দর্শন; অর্থাৎ যেসব দর্শন বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় বা যেগুলি বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেনা সেগুলিকেও বিচারবিযুক্ত দর্শন বলে মনে করে। নাস্তিক দর্শন সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এই যে, এগুলি বেদের অনুশাসনকে অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে না সত্য, কিন্তু এসব দর্শনও বিনাবিচারে মহাপুরুষ ও ধর্মপ্রবর্তকদের বাণী ও উপদেশাবলীকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নেয়। যেমন—বৌদ্ধ দার্শনিক ও জৈন দার্শনিকেরা যথাক্রমে বুদ্ধদেব ও মহাবীরের অনুশাসন বা উপদেশাবলীকে অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ করেন এবং ঐ সব অনুশাসন তাঁদের দার্শনিক আলোচনার সীমা নির্দেশ করে দেয়। অপরের অনুশাসন বা উপদেশই যদি বিচারের পথ নির্ধারণ করে; তবে স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিতর্কের

অভিযোগকারীদের দৃষ্টিতে আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দর্শনই বিচারবিযুক্ত

অবকাশ কোথায়? সুতরাং ভারতের আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দর্শনই সমানভাবে বিচারবিযুক্ত দর্শন।

এবার ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য বিচার করা যাক: সর্বপ্রথমেই একথা বলা যেতে পারে, ভারতীয় দর্শনের মধ্যে একাধিক দর্শনই তত্ত্বালোচনার পূর্বে জ্ঞান-সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যাগুলি ; যেমন—জ্ঞানের প্রকৃতি, জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের পরিধি ও জ্ঞানের যাথার্থ্য নিয়ে আলোচনা করেছে। কিন্তু বিচারবিযুক্ত দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল, জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করে কতকগুলি মনগড়া মতকে সত্য বলে প্রচার করা।

নাস্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগের যৌক্তিকতা বিচার

দ্বিতীয়তঃ, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এই সব নাস্তিক দর্শন বেদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে না বা বেদের অনুশাসনগুলিকে অভ্রান্ত বা প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না। স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে এরা নিজ নিজ দার্শনিক মতগুলি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে। চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষণকে একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করে এবং সত্যাদ্রষ্টা ঋষিদের আপ্তবচনকে প্রমাণরূপে কখনও গ্রহণ করে নি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই চার্বাক দর্শনের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। বৌদ্ধ দর্শনও স্বাধীন বিচার ও যুক্তিতর্কের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। একথা সত্য যে, বৌদ্ধধর্মের সমর্থকবৃন্দ বুদ্ধদেবের প্রচারিত বাণীকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যার জন্য বুদ্ধদেবের অনুশাসনকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ না করে তাকে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জৈন দর্শনের তত্ত্বালোচনাও স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের দার্শনিক মতবাদ এই সব তত্ত্বালোচনার ভিত্তি নয়।

আস্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার

এবার দেখা যাক, আস্তিক দর্শনগুলির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কতখানি যুক্তিযুক্ত। ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, যোগ এবং বৈশেষিক দর্শন যদিও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে তবু এই সব দর্শন সাক্ষাৎভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই সব দর্শন স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহন করেই নিজ নিজ দার্শনিক মতগুলি প্রতিষ্ঠা করেছে। বেদের কথা ব্যাখ্যা বা প্রমান করাকে এরা নিজেদের কাজ বলে মনে করে নি। এরা দেখিয়েছে যে, যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণের সহায়তায় এরা যেসব দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সেগুলি বেদবিরোধী নয়। বেদের সঙ্গে যদি তাদের ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বা বেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি তাদের সিদ্ধান্তের কোন

মিল থাকে, তাহলে তাদের চিন্তার বা ভাবনার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই– এই সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়।

ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্তই সাক্ষাৎভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় দর্শনেরই কাজ হল বেদের কথা ব্যাখ্যা করা ও প্রমাণ করা। সুতরাং ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিচারবিযুক্ততার অভিযোগটি প্রধানতঃ এদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে, এ অভিযোগও অযৌক্তিক।

প্রথমতঃ, বলা যেতে পারে যে, উভয় দর্শনই যদিও বেদকে প্রামাণ্য শাস্ত্র (Authority) হিসেবে গ্রহণ করেছে, তবু তারা যেসব দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে সেগুলি স্বাধীন যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ, বেদান্ত দর্শনের সূক্ষ্ম জটিল যুক্তিতর্ক এবং সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিশ্লেষণই বেদান্ত দর্শনের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। মীমাংসা ও বেদান্ত বেদনির্ভর এবং বেদকে কেন্দ্র করেই তাদের আলোচনা শুরু—এ কথা সত্য, কিন্তু যে সকল বৈদিক তত্ত্বকে তারা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছে, তাদের যদি অপসারিত করা হয়, তাহলেও স্বাধীন বিচার ও যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে তাদের সিদ্ধান্তগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে এবং যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন অন্য দর্শনের সঙ্গে সমানভাবে তুল্য হতে পারবে।

মীমাংসা ও বেদান্ত বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করলেও স্বাধীন যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত

তাছাড়া যদি দেখা যায় যে, বেদান্ত ও মীমাংসার সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিগ্রাহ্য হবার পরও মহাপুরুষ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত; তাহলে তাতে সেসব দর্শনের মূল্য কমে যায় না, বরং বেড়েই যায়। ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিদের আপ্ত-বচন অবহেলার বস্তু নয়। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সুযোগ তাঁদের হয়েছিল, সেহেতু তত্ত্বের যুক্তিসম্মত আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য গ্রহণে বাধা কোথায়? তাছাড়া, এইসব সত্যদ্রষ্টা ঋষি এই কথাই প্রচার করেছেন যে, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা সত্যদর্শন সকলেরই আয়ত্তের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "সাধারণ লোকের কাছে যা অনুশাসনবাক্য, শুচি হৃদয়ের কাছে তাই অভিজ্ঞতা স্বরূপ।"[1]

বেদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্য যুক্তিবিরোধী নয়

অবশ্য একথা সত্য যে, কোন দর্শনের ওপর পরবর্তীকালে বিভিন্ন দার্শনিক যখন ভাষ্য রচনা করেন, তখন তাঁদের আলোচনার মধ্যে কিছুমাত্রায় দার্শনিক গোঁড়ামি দেখা

1. "What is dogma to the ordinary man is experience to the pure in heart."
—S. Radhakrisnan ; Indian Philosophy, Vol. 1, Page 51.

দেয়। তাহলেও সমগ্র ভারতীয় দর্শনকে বিচারবিযুক্ত দর্শন নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন নয়। ভারতীয় দর্শন যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ, ভারতীয় দার্শনিকদের আদর্শই হল যা যুক্তিযুক্ত তাই গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া, নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় দার্শনিক প্রতিপক্ষের বক্তব্য বিষয়কেও বিচার করে দেখে। সুতরাং, ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি অন্ধ গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে, বিচার-বিশ্লেষণ না করে অপরের গৃহীত মতকে ব্যাখ্যা করা নয়, বরং স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, বিচার ও বিশ্লেষণ করে সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া।

(খ) ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী (Indian Philosophy is pessimistic): ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হল যে, ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী। দুঃখবাদ অনুসারে এই জগৎ ও জীবনে কোন সুখ ও আনন্দ নেই; জীবন হল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পূর্ণ। দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যের বেদনায় মানুষের কাতরতার সীমা নেই। প্রতিটি মানুষ ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে কেবল দুঃখের অনলে দগ্ধ হচ্ছে। সমালোচকদের মতে ভারতীয় দার্শনিক কেবল জীবনের এই অন্ধকারময় রূপটিকেই তাঁদের দর্শনে চিত্রিত করেছেন।

জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পূর্ণ—এই মতবাদই দুঃখবাদ

সমালোচকদের এই অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, ভারতীয় দার্শনিকরা দর্শনের সঙ্গে মানুষের জীবনের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ, ভারতীয়দের কাছে দর্শন কেবলমাত্র তত্ত্বালোচনা নয়; তাঁদের মতে দর্শন হল জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালিত করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পন্থা। তাই বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় দার্শনিকরা জীবনের দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণার কথা অস্বীকার করতে পারেননি। বৌদ্ধদর্শনে আমরা এই দুঃখবাদের এক সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাই। বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে 'সর্বং দুঃখম্'—সকলই দুঃখময়। 'জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মরণ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ, কামনার ব্যাঘাত দুঃখ।' এ জগতের সবই দুঃখপূর্ণ। পৃথিবীতে যে সুখ নেই তা নয়, তবে 'দুঃখোদর্ক সুখ'। প্রত্যেক সুখই দুঃখোদর্ক, অর্থাৎ সকল সুখের মাঝেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। এ ছাড়া 'সর্বং অনিত্যং', 'সবই অনিত্য'। বুদ্ধদেব বলেন, 'যৎ অনিত্যং তৎ দুঃখম্', 'যা অনিত্য তাই দুঃখ'।

অভিযোগের খণ্ডন

ভারতীয় দর্শন জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারেনি

শুধু বৌদ্ধ দর্শনে নয়, উপনিষদে এবং গীতায়ও আমরা এই দুঃখবাদ দেখতে পাই। উপনিষদের মতে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া আর সবই দুঃখময়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎকে দুঃখের আলয় বলে অভিহিত করেছেন।[1] ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব-মীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসা (বেদান্ত), ষড়দর্শনের প্রত্যেকটির মধ্যে এই দুঃখবাদ আমরা দেখতে পাই। সাংখ্যকার কপিলের মতে এ জীবনে অনাবিল সুখের স্থান নেই; জগৎ এবং জীবন উভয়ই দুঃখপূর্ণ। তিনি তিন প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।[2] যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলির মতেও এই সংসার দুঃখময়। দুঃখ তিন প্রকার—পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ, এবং সংস্কার দুঃখ।[3]

কিন্তু এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় যে, দুঃখেই জীবন শুরু, দুঃখেই জীবন শেষ—এই নৈরাশ্যময় জীবনের চিত্র কোন ভারতীয় দর্শনেই আমরা পাই না। বরং সকল ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করেছে যে, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় আছে এবং মানুষ নিজের চেষ্টায় দুঃখময় জীবন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। বুদ্ধদেব যেমন দুঃখময় জীবনের কথা বলেছেন তেমনই দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি ও দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়ও নির্দেশ করেছেন। কারও কারও মতে 'নির্বাণং পরমং সুখম্'। জীব যখন নির্বাণ লাভ করে তখন সে পরম সুখ লাভ করে, সে ভূমানন্দের অংশীদার হয়।

ভারতীয় দর্শন বলে দুঃখেই মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি নয়

সাংখ্যকারও বলেন যে, দুঃখ আছে বলেই দুঃখপীড়িত মানুষ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সন্ধান করে এবং তারই ফলে দর্শনের উদ্ভব[4]। সাংখ্য দর্শনে চিরদুঃখ নিবৃত্তির অবস্থাকে পুরুষার্থ বা শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু বলে নির্দেশ করা হয়েছে। যোগ দর্শনও জাগতিক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সমাধিকেই শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে নির্দেশ করেছে এবং এই সমাধির দ্বারাই জীব মোক্ষ বা চিরমুক্তি লাভ করে। এই মোক্ষই চিরদুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা। নৈয়ায়িকগণও বলেন যে, দুঃখের মূল উৎস মিথ্যাজ্ঞান এবং

---

1. "অনিত্যম্ অসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" গীতা ৯।৩৩

2. আধ্যাত্মিক দুঃখ : শারীরিক ও মানসিক দুঃখ।
   আধিভৌতিক দুঃখ : মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয়। যেমন—নরহত্যা, সর্পাঘাত।
   আধিদৈবিক দুঃখ : ভূত, প্রেত প্রভৃতি অলৌকিক কারণ থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয়।

3. বিষয় সুখের পরিণাম দুঃখপ্রদ। দ্বেষজনিত দুঃখ হল তাপ দুঃখ ; যে বিষয়-সুখে বাধা সঞ্চার করে তার প্রতি দ্বেষ জন্মায়। সংস্কার দুঃখ হল বাসনারূপ সংস্কার হেতু যে দুঃখ।

4. "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ"—সংখ্যকারিকা ১

সত্যজ্ঞানের সাহায্যে মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হলে জীব অপবর্গ বা মোক্ষ লাভ করে। বৈশেষিক দর্শনও স্বীকার করে যে, সত্যজ্ঞান লাভ হলেই সব দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে। বেদান্তে বলা হয়েছে যে, অবিদ্যাই দুঃখের মূল এবং ব্রহ্মই সত্যজ্ঞান, আনন্দ ও অমৃতস্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানই অবিদ্যাকে দূরীভূত করে মানুষকে ভূমানন্দের অধিকারী করে, মানুষকে পরম শান্তির রাজ্যে উত্তীর্ণ করে।

প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ করেছে

এই যদি ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হয়, তাহলে ভারতীয় দর্শনকে কোন মতেই দুঃখবাদী বলা চলে না। ম্যাক্সমূলার বলেন, "সুতরাং সকল ভারতীয় দর্শনই যখন দুঃখ দূর করতে সমর্থ বলে দাবী করে তখন দুঃখবাদী বলতে সাধারণতঃ যা বুঝে থাকি সেই অর্থে তাদের দুঃখবাদী বলা চলে না।"[1] **ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী তো নয়ই, বরং আশাবাদী** (optimistic)। ভারতীয় দর্শনের শুরুতে দুঃখ থাকলেও, দুঃখেই তা শেষ হয়নি। ম্যাক্সমূলারের মতে জগতে দুঃখের উপস্থিতিই তাদের দার্শনিক চিন্তার প্রথম প্রেরণা যোগায়।[2] ভারতীয় দার্শনিকরাই দুঃখপীড়িত, ক্লেশ-জর্জরিত মানুষকে প্রথম আশার বাণী শুনিয়েছেন।

ম্যাক্সমূলারের অভিমত

উপনিষদের ঋষিই দুঃখ ও মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, অজ্ঞানান্ধকারের পরবর্তী সেই জ্যোতিঃস্বরূপ সর্বব্যাপী পুরুষকে জেনেই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে। এ ছাড়া মৃত্যু উত্তরণের অপর কোন পথ নেই। অতৃপ্ত জীবের অমৃতলাভের প্রার্থনা এই ভারতীয় দার্শনিকের কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে—"আমায় অসৎ থেকে সৎ-এ, অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু থেকে অমৃত-লোকে নিয়ে চল"।[3] ভারতীয় দার্শনিক শুধু দুঃখকে জানেননি, দুঃখের কারণের অনুসন্ধানও করেছেন। সকল দুঃখের কারণ একই, যাকে বেদান্ত বলেছে অবিদ্যা, সাংখ্য বলেছে অবিবেক, ন্যায় বলেছে মিথ্যাজ্ঞান। অবিদ্যার ফলে মানুষের বদ্ধাবস্থা এবং সত্য জ্ঞানই মানুষকে এনে দেয় চিরমুক্তি বা

উপনিষদের ঋষির আশার বাণী

1. "If therefore, all Indian Philosophy professes its ability to remove pain, it can hardly be called pessimistic in the ordinary sense of the word."
—Max Mullar : Six Systems of Indian Philosophy ; Page 108.

2. "They simply state that they received the first impulse to philosophical reflection from the fact that there is suffering in the world." Ibid, Page 106.

3. "অসতো মা সৎগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"

মোক্ষ। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, "ভারতীয় দার্শনিকরা দুঃখবাদী, যেহেতু তারা এ জগৎকে মন্দ ও মিথ্যা বলে অভিহিত করে, কিন্তু তারা আশাবাদী, যেহেতু তারা অনুভব করে যে এ জগৎ থেকেই সত্যের রাজ্যে উত্তীর্ণ হবার পথ আছে এবং এই সত্য হল মঙ্গল।"[1]

রাধাকৃষ্ণনের অভিমত

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী নয়, আশাবাদী। ভারতীয় দর্শনের মতে আদিতেই দুঃখ, পরিণামে দুঃখ নিবৃত্তি, মুক্তি বা মোক্ষ। দুঃখই জীবনের শেষ কথা নয়; সাধনার দ্বারা সত্যোপলব্ধিই হল মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং সত্যোপলব্ধির আনন্দই মানুষের এই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, দুঃখপূর্ণ জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলে।

ভারতীয় দর্শনের শুরুতে দুঃখ, পরিণামে নয়

(খ) **ভারতীয় দর্শন কেবল নীতি ও ধর্মে সীমাবদ্ধ** (Indian philosophy is ethico-religious): ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল যে, ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মবিষয়ক আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। এতে কেবলমাত্র জীবন দর্শন আছে; জগদ্দর্শন নেই। এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যেসব পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতে এই জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য অপূর্ব রহস্য মানুষের মনে যে বিপুল বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তার থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। দার্শনিক প্লেটো বিস্ময়কেই দর্শনের জনক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক জগৎ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে জীবন-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিস্ময় বা কৌতূহল নয়, জীবনের লক্ষ্য কি এবং কিভাবে ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় এই বিষয়ই ভারতীয় দর্শনের প্রথম প্রশ্ন বা সমস্যা। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকরা এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে দেখলেন জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, জ্বালাযন্ত্রণায় মানুষ কাতর। এই দুঃখের হাত থেকে কিভাবে মুক্তিলাভ করা যেতে পারে তারই উপায় নির্ধারণ করার জন্য ভারতীয় দার্শনিকরা সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণে নীতি ও ধর্মের আলোচনা ভারতীয় দর্শনের অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে এবং ভারতীয় দার্শনিক আলোচনা করেছেন মানুষের পুরুষার্থ (*Summum bonum*) কি এবং কি উপায়ে এই পুরুষার্থ লাভ করা যায়। তার কাছে **প্রশ্ন হল: ধর্ম কি? অধর্ম কি?** সম্যক চরিত্র বা আচরণের স্বরূপ কি? পাপ কর্মের ফলাফল কি এবং দুঃখ থেকে

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল ভারতীয় দর্শনে জগদ্দর্শন নেই

1. S. Radhakrisnan : Indian Philosophy ; Vol. 1, Page 5 .

নির্বাণলাভের পথে এই কর্মের ফলাফল কিভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করে? উপনিষদের ঋষি বলেন, ব্রহ্মের জ্ঞানই মানুষকে সব দুঃখ থেকে মুক্ত করে, যেহেতু অবিদ্যা থেকে দুঃখের উদ্ভব। তাহলে প্রশ্ন জাগে, ব্রহ্ম কি? এ জগতের অন্তরালে কি কোন পরমসত্তার অস্তিত্ব আছে? ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের কি সম্পর্ক? ব্রহ্মই কি ঈশ্বর? ঈশ্বর আমাদের জীবনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন? এভাবে নীতি ও ধর্মের আলোচনাতেই ভারতীয় দার্শনিকরা প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ভারতীয় দর্শনে নীতি ও ধর্মের আলোচনারই প্রাধান্য

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত নয়। যদিও ভারতীয় দর্শন নীতি ও ধর্মের আলোচনার উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছে, তবু একথা সত্য নয় যে, ভারতীয় দর্শনে জগৎ সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, মীমাংসা ও যোগ দর্শনে নীতি এবং ধর্ম ব্যতীত অন্য তত্ত্বালোচনাও করা হয়েছে। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত নিছক তত্ত্বালোচনায় ভারতীয় দার্শনিকদের আগ্রহ না থাকলেও ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মে সীমাবদ্ধ নয়।

ভারতীয় দৃষ্টিতে দর্শন হল 'সত্য দর্শন', সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, যথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান শুধু এই জীবনের নয়, জগতেরও। এ জগৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞানই মানুষকে এ জগতে তার নিজের স্থান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেয় ও মানুষ উপলব্ধি করে কী তার কাম্য, কী তার পুরুষার্থ? এই পুরুষার্থ লাভই তার ধর্ম, তার জীবনের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য প্রয়োজন নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা, নিজের চিত্তবৃত্তিকে সংযত করা। সম্যক জ্ঞান ও সম্যক আচরণ—এই উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান। সুতরাং, জগৎ এবং জীবন এই উভয়ের স্বরূপ ও মূল্য অবধারণই দার্শনিকের কাজ। ভারতীয় দর্শনে তাই কেবল জীবনের ব্যাখ্যাই নেই, এ জগতেরও ব্যাখ্যা আছে।

অভিযোগের উত্তর

আমরা আগেই দেখেছি যে, ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয়েছে সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি (Synthetic outlook)। পৃথক পৃথক ভাবে নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, বা তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা না করে ভারতীয় দার্শনিক একই দার্শনিক প্রশ্নকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন। সেই কারণে একই বিষয়ের আলোচনায় নীতি, ধর্ম ও তত্ত্ব সব আলোচনাই পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। সুতরাং ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মশাস্ত্র নয়; ভারতীয় দর্শন হল জীবনদর্শন, জগদ্দর্শন—সংক্ষেপে সত্যদর্শন বা সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

ভারতীয় দর্শনের সংশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সব আলোচনা পাশাপাশি স্থান পেয়েছে

(ঘ) ভারতীয় দর্শন নীতি নিস্পৃহ দর্শন (Indian Philosophy is non-ethical in character) ঃ ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে কেউ কেউ এমন অভিযোগ এনেছে যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন। অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করার ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। তাদের মতে এর কারণ হল, ভারতীয় দর্শন মোক্ষদর্শন। ভারতীয় সাধনা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাধনা এবং এরই অনিবার্য পরিণতি হল নৈতিক ও সামাজিক কর্মবিমুখতা এবং পার্থিব জগৎ ও জীবনের প্রতি নিস্পৃহতা।

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল ভারতীয় দর্শন কর্মবিমুখতার দর্শন

প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই আত্মার মোক্ষ লাভকেই জীবের পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। জীবের বদ্ধাবস্থাই তার সব দুঃখের কারন এবং এই বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করাই তার একমাত্র কাম্য বস্তু। অবশ্য আত্মার বন্ধন ও মোক্ষকে বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে যে, আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও মুক্ত, আত্মা সনাতন। কর্মের জন্যই আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয় এবং দেহ ধারণের জন্যই আত্মার বন্ধন সূচিত হয়। বৌদ্ধ দর্শনেও সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য নির্বাণের কথা বলা হয়েছে। নির্বাণ লাভ করার ফলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। পূর্বজন্মে কৃত সকাম কর্মই বর্তমান জীবন ধারণ করার কারণ স্বরূপ। সাংখ্য দর্শনেও বলা হয়েছে যে—প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগই দুঃখ ও বন্ধন, এই সংযোগের অবসানই পুরুষের মুক্তি। জগতের প্রতি নিস্পৃহ ভাব ও ভোগ লালসার প্রতি বিতৃষ্ণা যখন জীবের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করে তখনই তার মধ্যে বিবেকজ্ঞান জন্মে এবং তখনই সে পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে—যে পুরুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য। যোগ দর্শনেও আত্মোপলব্ধিকেই মোক্ষরূপে অভিহিত করা হয়েছে এবং সমাধি বা যোগের সাহায্যেই এই মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। মীমাংসকদের মতে বৈদিক কর্ম সম্পাদন করেই মানুষ তার পুরুষার্থ অর্থাৎ স্বর্গকে প্রাপ্ত হয়। মীমাংসকদের মতে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান ও বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের উপায়। ন্যায় দর্শনেও বলা হয়েছে যে, আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ বা অপবর্গ এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই এই মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। বেদান্তেও বলা হয়েছে যে, জীব স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ; অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার জন্যই তার বদ্ধাবস্থা ; যথার্থ জ্ঞানই জীবকে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত করে।

মোক্ষের বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ভারতের প্রায় সকল দর্শনই মোক্ষ বা

মুক্তিকেই জীবের পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করেছে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই এই মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। জাগতিক সুখ-দুঃখে যে ব্যক্তি উদাসীন, ভোগ, কামনা-বাসনার প্রতি যার বিতৃষ্ণা, অর্থাৎ যাঁর মনে বৈরাগ্যে সঞ্চার হয়েছে, তিনিই নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম।—এই দৃষ্টিভঙ্গিই নাকি ভারতীয় দার্শনিককে কর্মবিমুখ করে তুলেছে। মোক্ষলাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞান, যোগ বা শ্রবণ, সমাধি, মনন, নিদিধ্যাসনই প্রশস্ত পথ। বেদনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন এবং ঈশ্বর ভজনই মুক্তিলাভের উপায়। এ কারণেই সমালোচকরা বলেন যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন।

ভারতীয় দর্শন মতে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব

কিন্তু ভারতীয় দর্শনের গভীরে প্রবেশ করলেই এ যুক্তির অসারত্ব উপলব্ধ হয়। জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনকে নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন কোন মতেই বলা চলে না। জৈন দর্শনে মোক্ষলাভের জন্য কেবলমাত্র সম্যক দর্শন (Right insight), সম্যক জ্ঞানকেই স্বীকার করা হয়নি, সম্যক চরিত্রকেও স্বীকার করা হয়েছে।[1] সম্যক চরিত্র অর্থে সৎ কর্ম সম্পাদন করা এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকা। বৌদ্ধ দর্শনেও নির্বাণ লাভের জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্যক কর্মান্ত (Right conduct) এবং সম্যক আজীব (Right livelihood)—এই উভয়কে স্বীকার করা হয়েছে। সম্যক কর্মান্ত অর্থে সৎকর্ম সম্পাদন করা; যেমন—চুরি না করা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি থেকে বিরত থাকা ও প্রাণী হত্যা না করা এবং সম্যক আজীব অর্থে সৎ পথ অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করা।

অভিযোগের অসারতা

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে

সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে যে, অজ্ঞানতাই দুঃখের মূল। যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যেই এই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। কিন্তু সাংখ্যকার এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, সৎ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যদি চিত্ত শুদ্ধ ও পবিত্র না হয়, তাহলে চিত্তে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয় না। যোগ দর্শনে যোগ সাধনার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলেই সর্বপ্রথম চিত্তের পবিত্রতা ও শুদ্ধতা প্রয়োজন। ক্রোধ, হিংসা, লোভ, রাগ প্রভৃতি রাজস ও তামস বৃত্তিগুলিকে বর্জন করে সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলিকে, যেমন—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি চিত্তে জাগ্রত করতে হবে। সংযত জীবন যাপন ও অসৎ প্রবৃত্তির নিরোধই চিত্তে শুদ্ধতা আনয়ন করে। যোগ শাস্ত্রের অষ্টমার্গের যম ও নিয়মে নৈতিক শুচিতার কথাই বলা হয়েছে। অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ হল যম। নিয়মের অর্থ সৎ অভ্যাস

1. "সম্যক-দর্শন-জ্ঞান-চরিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ।"

অর্জন করা। মুমুক্ষু ব্যক্তিকে অহিংস হতে হবে, সত্যনিষ্ঠ হতে হবে ও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে এবং পরের দ্রব্য অপহরণ করা ও বিনা প্রয়োজনে কোন দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত হতে হবে। মীমাংসা দর্শনে যদিও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য বৈদিক কর্ম সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে, তবু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মগুলি 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সম্পাদন'—এই নীতি অনুসারে সম্পাদন করতে হবে। তছাড়া, ইন্দ্রিয় সংযম, ভোগ-লালসার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করা থেকে বিরত হওয়া যে পুরুষার্থ লাভের পক্ষে অপরিহার্য—এ সত্যও মীমাংসকগণ স্বীকার করেছেন। ন্যায় দর্শনেও বিহিত কর্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের ফলাফলের কথা বলা হয়েছে। বিহিত কর্ম সম্পাদনে ধর্ম উৎপন্ন হয় এবং তার ফল সুখ ; নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনে অধর্ম উৎপন্ন হয় এবং তার ফলাফল দুঃখ। বেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষলাভের উপায় বলা হলেও যিনি মুমুক্ষু তাকে ইন্দ্রিয় সংযম ও মনঃস্থির করতে হবে এবং ভোগবিমুখ হতে হবে। মুমুক্ষু ব্যক্তির শম, দম, তিতিক্ষা ও শ্রদ্ধা থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

সকল ভারতীয় দর্শনেই নৈতিক শুচিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ

সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন নয়। যদিও ভারতীয় দর্শন অবিদ্যা ও অজ্ঞানতাকেই সর্বপ্রকার দুঃখের মূল বলে স্বীকার করে এবং যথার্থ জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের পরিপূরক মনে করে, তবু প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই নৈতিক ও সামাজিক কর্ম সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চিত্তের শুদ্ধিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, সৎকর্ম সম্পাদন, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, ভোগবিমুখতা—সংক্ষেপে নৈতিক জীবন যাপনের ওপরই জীবের মোক্ষলাভ একান্তভাবে নির্ভর। যদিও মোক্ষই ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ, তবু চতুর্বর্গের অপর তিনটিকে—ধর্ম, অর্থ, কামকে ভারতীয় দর্শন উপেক্ষা করে নি। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণনের মতে ভারতীয় দর্শনে ধর্মের ধারণা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা। নৈতিক পূর্ণতা ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথম স্তর।

সকল ভারতীয় দর্শনে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ

(৬) ভারতীয় দর্শন গতিহীন বা নিশ্চল (Indian Philosophy is stationary) : ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ হল যে, ভারতীয় দর্শন গতিহীন বা নিশ্চল। ভারতীয় দর্শনে একই বিষয়ের গতানুগতিক আলোচনাই দৃষ্ট হয়। চিন্তার ক্ষেত্রে কোন অভিনবত্বের বিকাশ নেই।

এ অভিযোগ, যুক্তিযুক্ত নয়। যদি অভিযোগকারীরা একথা বলতে চান যে, বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের আলোচ্য বিষয় মোটামুটি একই, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সকল দর্শনের ক্ষেত্রে কি এই গতিহীনতা চোখে পড়ে না ? ঈশ্বর, স্বাধীনতা, অমরত্ব—

সেই অতি পুরাতন সমস্যা এবং পুরাতন সমাধানগুলিই বারে বারে আলোচিত হয়েছে এবং এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সত্য এক ও অখণ্ড এবং তার প্রকাশও সর্বক্ষেত্রে একই রকমের।

যদি অভিযোগের অর্থ এই হয় যে, ভারতীয় দার্শনিকরা অতীত ও প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সে কারণেই পুরাতন বিষয়গুলিকেই কেবলমাত্র নতুনভাবে গ্রহণ করেছেন, তাহলে বলতে হয় যে, ভারতীয় চিন্তাধারার এ হল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় চিন্তাধারা বিকাশের বৈশিষ্ট্যই হল পুরাতন বা অতীতের যা ভাল তাকে গ্রহণ করা এবং নতুন বিষয়কে তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া।

অভিযোগের অসারতা

যদি অভিযোগের অর্থ হয় এই যে, ভারতীয় চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে দৃষ্টিপাত করেনি এবং সেহেতু ব্যর্থ, তাহলে বলা যেতে পারে যে, এ অভিযোগও সত্য নয়। বরং একথা বলা যেতে পারে যে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক মতবাদ ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের বিরোধিতা না করে অনেক ক্ষেত্রে তাকে সমর্থনই করেছে।

ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতির পথে অবশ্য কিছুটা নিশ্চলতা দেখি সেই স্তরে যখন ভারতীয় দর্শনের ভাষ্য রচনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তখন চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন নির্জীবতা দেখা দিয়েছে, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন সক্রিয় অবদানের দ্বারা ভারতের চিন্তার ভাণ্ডার নতুন সম্পদে পূর্ণ হতে পারে নি। অবশ্য পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য দার্শনিকদের নতুন চিন্তাধারা ভারতীয় দর্শনের এই নিশ্চল অবস্থার অবসান করে ভারতীয় চিন্তাধারাকে পুনরায় গতিশীল করে তুলেছে। যেহেতু ভারত বর্তমানে স্বাধীন এবং স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশের সম্ভাবনা প্রচুর, সেহেতু আশা করা যায় যে, ভারতীয় দার্শনিকরা যদি অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বজায় রাখেন, নতুন চিন্তাধারাকে বরণ করে নেবার উদারতা যদি তাঁদের থাকে এবং সর্বশেষ সত্য উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা যদি তাঁদের মধ্যে জাগরূক থাকে তাহলে ভারতীয় দর্শন সাময়িক নিশ্চলতা বা গতিহীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে।

ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতির পথে নিশ্চলতার কারণ ও তার সমাধান

৫। ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশ (Development of Indian Philosophy) :

ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে প্রধান প্রধান যে সব দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছিল সেগুলি একটির পর একটি

আবির্ভূত হয়েছিল। কোন একটি দার্শনিক মতবাদ কিছুদিন ধরে সকলের স্বীকৃতি এবং সমাদর লাভ করার পর, নিজের প্রভাব ও প্রাধান্য হারিয়ে নতুন কোন দার্শনিক মতবাদকে তার জায়গাটি ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনগুলি বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হয়েও সুদীর্ঘকাল পরেও নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখে পাশাপাশি বিরাজ করছে। বিভিন্ন দর্শনের সহ-অবস্থান এবং দীর্ঘকাল সমানভাবে বিকাশ লাভ করা, ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আস্তিক ও নাস্তিক, জড়বাদী এবং ভাববাদী, নিরীশ্বর ও সেশ্বর সবরকম দার্শনিক মতবাদই একই সময়ে প্রচারিত হয়েছে এবং একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে; কিন্তু কোন দর্শনই এর জন্য নিজের স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য হারায়নি।

পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশের পার্থক্য

এর কারণ হল, প্রথমতঃ, ভারতীয় দার্শনিকের কাছে দর্শন নিছক তত্ত্বালোচনা ছিল না, তা ছিল জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য অন্যতম হাতিয়ার। দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে দার্শনিক মতবাদগুলির ছিল নিবিড় সংযোগ। এজন্য কোন একটি দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদল শিষ্য বা সমর্থকবৃন্দ সেই দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালনা করার জন্য ব্রতী হত এবং পরবর্তীকালে তাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সেই মতবাদ অনুযায়ী তাদের জীবনধারা পরিচালিত করত। এভাবে দার্শনিক মতবাদটি হয়ে উঠত তাদের জীবন-দর্শন এবং শিষ্যদের জীবনধারা ও সক্রিয় প্রচারের মাধ্যমে এক একটি দার্শনিক মতবাদ দার্শনিকদের তিরোধানের পরও সুদীর্ঘ কাল স্থায়ী হত। এই কারণেই বুদ্ধদেব বা মহাবীরের তিরোধানের পরও অগণিত শিষ্য এবং অনুরাগীবৃন্দের মাধ্যমে উভয় মহাপুরুষের প্রচারিত মতবাদ সুদীর্ঘকাল ধরে প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে বিরাজ করেছে। এখনও ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ—যেগুলির পূর্বের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে—সক্রিয় এবং অনুরাগী শিষ্যমণ্ডলীর মাধ্যমে বিরাজ করছে।

ভারতীয় দর্শনে দর্শনের সঙ্গে জীবনের গভীর সংযোগের স্বীকৃতি

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে বিভিন্ন দর্শনগুলি একই সময়ে বিরাজ করার জন্য পারস্পরিক আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করত এবং পরস্পরকে ভালভাবে জানবার সুযোগ লাভ করত। সে কারণে প্রতিটি দর্শন তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আনীত অভিযোগগুলি ব্যাখ্যা করে, সেগুলিকে খণ্ডন করে, নিজের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করত। প্রতিটি

ভারতীয় দর্শনগুলির পরস্পরের ওপর প্রভাব

দর্শনই অপরের অভিযোগগুলিকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করে দেখত। এর ফলে প্রতিটি দর্শন তার নিজ বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার ও নিজের মতামতকে সুদৃঢ় করার সুযোগ লাভ করেছিল। ভারতীয় দর্শনগুলির ক্রমবিকাশের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনগুলির এই পারস্পরিক প্রভাবের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তিকাল সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করেই যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। বেদই ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ভারতীয় চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। বেদ কখন রচিত হয় এবং কারা বেদ রচনা করেছেন—সে বিষয়টি নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। বেদকে সকল সময়ই শাশ্বত এবং অপৌরুষেয় বলেই বিশ্বাস করা হয়েছে। বস্তুতঃ, ভারতীয়দের বিশ্বাস, কোন মানুষ বেদ রচনা করেননি, বেদ স্বয়ং ব্রহ্মের বাণী। বেদের রচনাকাল সম্পর্কে সকলে একমত নন। ম্যাক্সমূলার খ্রীঃ পূঃ ১২০০ থেকে ৬০০ বৎসরকেই বেদের রচনাকাল বলে নির্দেশ করছেন। কারও কারও মতে এই রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ থেকে ২৫০০ বৎসর। বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্বে যে উপনিষদের চিন্তাধারার বিকাশ শুরু হয়েছিল, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। অনেকে এমন কথা বলেন যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে দর্শনের যে শুধু বিকাশ ঘটেছিল তা নয়, দর্শনের একটা পরিণত অবস্থাও লক্ষ্য করা যায়।

বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব

বেদের রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত

আমরা ইতিপূর্বে ভারতীয় দর্শনের দুটি ধারার কথা উল্লেখ করেছি—একটি আস্তিক দর্শন অর্থাৎ বেদানুগামী এবং অপরটি নাস্তিক, অর্থাৎ বেদবিরোধী। আস্তিক দর্শনের বিকাশ শুরু হয় বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করে। বেদ এবং উপনিষদের পরই উল্লেখযোগ্য হল সূত্র-সাহিত্য বা দর্শনের সূত্রগুলি। সূত্র কথার সাধারণ অর্থ হল সূতা এবং এই প্রসঙ্গে এর অর্থ হল সংক্ষিপ্ত স্মৃতি-সহায়ক বচন বা উপদেশ। যেমন, সুতো দিয়ে অনেক ফুলকে একটি মালায় গেঁথে রাখা যায়, অনুরূপভাবে এই সূত্রগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাগুলিকে একত্র গ্রথিত করা হত। এই সূত্রগুলির উৎপত্তির একটি বিশেষ কারণ এই যে, অতীতে দার্শনিক তত্ত্বসমূহ মুখে মুখেই আলোচিত হত এবং মুখে মুখেই গুরুর কাছ থেকেই শিষ্যদের মধ্যে সেগুলি প্রচারিত হত। সেহেতু লিখিত গ্রন্থের অভাব পূর্ণ করার জন্য সূত্রের মাধ্যমে এই দার্শনিক চিন্তাগুলি একত্র গ্রথিত ও

বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করেই আস্তিক দর্শনের শুরু

সংরক্ষিত করার প্রয়োজন হয়েছিল। সূত্রগুলির মধ্যেই অতি সংক্ষেপে দার্শনিক সমস্যা, দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত, তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অভিযোগ এবং এই অভিযোগের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেত। এক একটি দর্শন-সূত্রে অনেকগুলি সূত্রকে একসঙ্গে সঙ্কলিত করা হত। এ বিষয়ে **বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র** একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। বেদের, বিশেষ করে উপনিষদের আলোচনাই ব্রহ্মসূত্রে করা হয়েছে। উপনিষদের মতবাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সূত্র-সাহিত্যের উদ্ভব ও তার মাধ্যমে দার্শনিক চিন্তার সংরক্ষণ

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র ছাড়াও অন্যান্য দর্শনের সূত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন জৈমিনির **মীমাংসাসূত্র,** গৌতমের **ন্যায়সূত্র,** কণাদের **বৈশেষিকসূত্র,** পতঞ্জলির **যোগসূত্র,** কপিলের **সাংখ্যসূত্র** ইত্যাদি।

এই সূত্রগুলি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, সে কারণে সূত্রগুলির অর্থ সহজবোধ্য ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়াও অসম্ভব ছিল না। এই কারণে সূত্রগুলির অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য ভাষ্যকারের প্রয়োজন দেখা দিল। বিভিন্ন দার্শনিকের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই সব সূত্রের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দর্শনের সূত্রের ভাষ্য রচিত হতে লাগল। অনেক সময় বিভিন্ন দার্শনিক নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি, যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একই দর্শনের সূত্রগুলিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেন। একমাত্র ব্রহ্মসূত্রের ওপরই শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, বলদেব ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ভাষ্য রচিত হয়েছে। এ সব ভাষ্যের মধ্যে শঙ্কর ও রামনুজের ভাষ্য ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ। কিছুকাল পরে আবার ভাষ্যেরও ভাষ্যের প্রয়োজন দেখা দিল; সাধারণ ভাবে একে বলা হয় **টীকা**। ভাষ্য যেমন সূত্রের ব্যাখ্যা, টীকা তেমনিই ভাষ্যের ব্যাখ্যা। ভাষ্য এবং টীকা ছাড়াও বিভিন্ন দর্শনের ওপর স্বাধীনভাবে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থের অনেকগুলিই ছন্দে লেখা। এতে রচয়িতা সংক্ষেপে এবং প্রাঞ্জলভাবে মূল বিষয়গুলিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। **'সাংখ্যকারিকা'** এ জাতীয় রচনা। এ ছাড়াও কোন কোন দর্শনের ওপর ছন্দে লেখা সাধারণ আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কুমারিলের **'শ্লোকবর্তিকা'** বা সুরেশ্বরের **'বর্তিকা'** এ জাতীয় রচনা; অবশ্য এগুলির ওপরও ভাষ্য রচিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দর্শনের ওপর গদ্যে লেখা অনেক পরিণত রচনা দেখতে পাওয়া যায়। কোন ক্ষেত্রে হয়ত লেখক কতকগুলি নির্বাচিত সূত্রকে অবলম্বন করেই আলোচনায় এগিয়ে গেছেন বা স্বাধীনভাবে কোন দর্শনের আলোচনা করেছেন। জয়ন্তের **'ন্যায়-মঞ্জরী'** প্রথমোক্ত

ভাষ্য—টীকা ও সমালোচনামূলক গ্রন্থ

শ্রেণীর ও মধুসূদন সরস্বতীর **'অদ্বৈতসিদ্ধি'** দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সব রচনা দৃঢ় যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে রচয়িতারা উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী। অবশ্য এগুলিরও ভাষ্য রচিত হয়েছে।

আস্তিক দর্শনের বিকাশের ইতিহাস যেভাবে ঘটেছে নাস্তিক দর্শনের বিকাশও সেইভাবে হয়েছে। তবে আস্তিক দর্শনের মতো নাস্তিক দর্শনের কোন সূত্র ছিল না।

নাস্তিক দর্শনের বিকাশ আস্তিক দর্শনের অনুরূপ

রাধাকৃষ্ণন[1] ভারতীয় দর্শনের বিকাশের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে চারটি পর্যায়ের কথা বলেছেন :

(১) বৈদিক যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ বৎসর)।

(২) মহাকাব্যের যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০ অব্দ)। রামায়ণ, মহাভারত ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন, শিব ও বৈষ্ণব চিন্তাধারার উদ্ভব এই যুগেই হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের বিকাশের চারটি পর্যায়

(৩) সূত্র-যুগ (২০০ অব্দ থেকে এর শুরু)।

(৪) পাণ্ডিত্যের যুগ—এরও শুরু দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে। এই সময়েই শঙ্কর, রামানুজ, কুমারিল, শ্রীধর, মধ্ব, বাচস্পতি, উদয়ন, ভাস্কর, জয়ন্ত, বিজ্ঞানভিক্ষু এবং রঘুনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতদের আবির্ভাব ঘটে।

৬। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণ (The Common characters of the Indian system) :

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, নানা বিষয়ে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু নানারকম পার্থক্য ও মতভেদ সত্ত্বেও এদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য আছে, যেগুলিকে আমরা ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণরূপেই অভিহিত করতে পারি। নানারকম বৈষম্যের মাঝেও এই সাদৃশ্যের একটা সঙ্গত কারণ আছে। যে কোন দেশের দর্শনই সে দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ছাপ ধারণ ও বহন করে। সে কারণে যে কোন দেশের দর্শন শাস্ত্রে সে দেশের পরিবেশে যেসব চিন্তা ও ধারণাগুলি বিরাজ করে, তার একটা প্রভাব অজানিতেই সেই দর্শনে মুদ্রিত হয়ে যায়। সুতরাং ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রগুলির মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা কৃষ্টিগত সাদৃশ্য, একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণ-গুলি এবার আমরা একে একে আলোচনা করছি :

ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ

1. S. Radhakrisnan : Indian Philosophy ; Vol. 1, Page 56.

(ক) ভারতীয় দর্শনগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হল এই যে, সব ভারতীয় দর্শনই জীবনের সঙ্গে দর্শনের নিগূঢ় সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়েছে। সকলেই দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটির ওপর বিশেষভাগে গুরুত্ব আরোপ করেছে, জীবন যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য দর্শনের অনুশীলন যে একান্ত প্রয়োজন, তা স্বীকার করেছে। সে কারণে ভারতীয়দের কাছে দর্শন নিছক তত্ত্বালোচনা বা বিস্ময়প্রসূত কৌতূহলের পরিতৃপ্তি নয়, তাহল দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় মহৎ ও উন্নত জীবনযাপন করা। ভারতীয় দর্শনগুলিতে তত্ত্বালোচনা ছাড়াও মানবজীবনের চরম কাম্য বস্তু পুরুষার্থের আলোচনাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

দর্শনের সঙ্গে জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের স্বীকৃতি

ব্যবহারিক প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কোন কোন পাশ্চাত্য সমালোচক ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মশাস্ত্র—এই বলে তার বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ সমালোচনা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। ভারতীয় দর্শনে ব্যবহারিক (practical) এবং তাত্ত্বিক (theoretical) উভয় দিকের ওপরই সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; তাত্ত্বিক দিকটিকে উপেক্ষা করে আলোচনার পরিসরটিকে সঙ্কুচিত করা হয়নি।

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ

(খ) তবে একটা আধ্যাত্মিক অশান্তি বা অতৃপ্তি ভারতীয় দার্শনিককে দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। জগৎকে তাঁরা দুঃখময় দেখেছেন। শুরুতে দুঃখবাদী হয়েও পরিশেষে আশাবাদী হওয়া ভারতীয় দর্শনগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই কম-বেশী দুঃখবাদী। সাংখ্য, যোগ এবং বৌদ্ধ দর্শনে এই দুঃখবাদ সুস্পষ্ট আকারে দেখা দিয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে 'সর্বং দুঃখম্'—সবই দুঃখময়, যাকে সুখ বলে মনে করা হয় তাও দুঃখ। সব সুখের মাঝেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। জীবনের সব অভিজ্ঞতাই দুঃখপূর্ণ বা পরিণামে দুঃখ ডেকে নিয়ে আসে। এজন্য সুখ কামনা করে আমরা প্রতারিত হই। এই দুঃখবোধই দার্শনিককে জগতের স্বরূপ এবং মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক জীবনে দুঃখকে স্বীকার করে নিলেও দুঃখেই জীবনের পরিসমাপ্তি এমন কথা বলেনি। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখবাদের এক চরম রূপ চিত্রিত করা হলেও বৌদ্ধ দর্শনেই নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে এই আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, মানুষ নিজের চেষ্টায় দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। ভারতীয় দর্শন দুঃখ নিয়ে শুরু হলেও স্পষ্টই স্বীকার করে যে, দুঃখই জীবনের শেষ পরিণতি নয়। সর্বদুঃখ নিরোধ বা মোক্ষই

ভারতীয় দর্শন চিন্তার মূলে আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি

জীবনের শেষ পরিণতি। অতএব একথা বলা যেতে পারে যে, শুরুতে দুঃখবাদী হলেও সমাপ্তিতে ভারতীয় দর্শন সুখবাদী।

(গ) চার্বাক ব্যতীত সব ভারতীয় দর্শনই কর্মবাদে, সর্বকালব্যাপী জন্মান্তরবাদে এবং এক নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলায় (eternal moral order) বিশ্বাসী। এক হিসেবে ভারতীয় দুঃখবাদের ভিত্তি হল কর্মবাদ। কর্মবাদকে বলা যেতে পারে নৈতিক কার্য-কারণবাদ। মানুষ যেমন কর্ম করবে, তাকে তেমন ফল ভোগ করতে হবে। সৎ কাজের ফল পুণ্য এবং সুখ, অসৎ কাজের ফল পাপ এবং দুঃখ। সৎ কাজ এবং অসৎ কাজ এমন এক অদৃষ্ট অর্থাৎ অদৃশ্য শক্তি (unseen potency) উৎপন্ন করে যে, ব্যক্তির কর্মানুযায়ী ভবিষ্যতে তার সুখ এবং দুঃখ আসবেই।

কর্মবাদে বিশ্বাসী

এই কর্মবাদের ওপরই জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুর পরে আত্মার পুনর্জন্ম হয় এবং তা নতুন দেহ ধারণ করে। এই মতবাদই জন্মান্তরবাদ। এই জন্মান্তরবাদ কর্মবাদের উত্তরফলস্বরূপ। ভারতীয় দর্শনের মতানুসারে কর্মের ফলভোগ এক জীবনে শেষ না হলে, জীবকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে ফলভোগের জন্য সংসারে আসতে হয়। কর্ম এবং কর্মের ফলভোগ—এই উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বর্তমান। কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে, কর্মফল কখনও বিনষ্ট হয় না। এ জীবনে না হলেও কোন ভবিষ্যৎ জীবনে শুভ, অশুভ, পাপ, পুণ্য – সব নৈতিক মূল্যই কর্মফলের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে। একে বলা হয়েছে, নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম (Law of the Conservation of Moral Values)। তবে নিষ্কাম কর্মের জন্য জীবকে ফলভোগ করতে হয় না। সকাম কর্মের জন্যই জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয়।

কর্মবাদের ওপর জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত

ভারতীয় দার্শনিকরা এক সর্বকালব্যাপী নৈতিক নিয়ম এবং শৃঙ্খলায় (An eternal moral order) বিশ্বাসী। সর্বত্রই নিয়ম এবং শৃঙ্খলা। ঋগ্‌বেদে এই চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য জাগতিক শৃঙ্খলাকে 'ঋত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই শৃঙ্খলা জাগতিক ও নৈতিক উভয়ই। এই নিয়ম দেবতাদেরও মেনে চলতে হয়, কেউই একে লঙ্ঘন করতে পারে না। এই বিশ্বাসই মীমাংসকদের 'অপূর্ব', ন্যায় বৈশেষিকদের 'অদৃষ্ট' এবং 'কর্মবাদে'র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সনাতন নৈতিক শৃঙ্খলা আছে বলেই সৎ কাজ করার ফল পুণ্য ও সুখ; অসৎ কাজ করার ফল পাপ ও দুঃখ। এই বিশ্বাসই ভারতীয় দার্শনিককে আশাবাদী করে তুলেছে, যার জন্য ভারতীয় দর্শন বলে, জীব নিজের কর্মের দ্বারাই নিজের ভাগ্যকে গঠন করতে পারে। ভারতীয়

এক সনাতন নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী

ভারতীয় কর্মবাদ অদৃষ্টবাদ নয়

কর্মবাদ কিন্তু অদৃষ্টবাদ (Fatalism) নয়, কারণ, প্রতিটি জীবই স্বাধীন ইচ্ছা ও পুরুষকারের দ্বারা নিজেকে মহৎ ও উন্নত করে তুলতে পারে।

(ঘ) কর্মফলে বিশ্বাস করার জন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ এই বিশ্বসংসারকে এক নৈতিক রঙ্গমঞ্চরূপে কল্পনা করেছেন, যেখানে প্রতিটি জীব অভিনয় করার জন্য তার যোগ্যতানুযায়ী সাজপোশাক ও ভূমিকা লাভ করেছে। জীব যে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অধিকারী হয়েছে বা যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, সবই তার পূর্বজন্মের কর্মফল। পর-জন্মে যাতে জীবের উর্ধ্বগতি হয় তার জন্য প্রতিটি জীবকে যথাযথ কর্তব্য পালন করতে হবে।

(ঙ) সব ভারতীয় দর্শনই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকেই জীবের বন্ধনের (bondage) ও দুঃখভোগের কারণ মনে করে এবং জগতের ও আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানই যে জীবকে দুঃখভোগের ও বন্ধনের হাত থেকে চিরমুক্তি এনে দিতে পারে—এই বিশ্বাস করে। শাশ্বত ও চিরমুক্ত আত্মার দেহের অধীনতা স্বীকার করা ও কর্মফল ভোগ করার জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করা এবং জাগতিক দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুর অধীন হওয়াই জীবের বন্ধন। এই জন্মমৃত্যু-চক্রের হাত থেকে মুক্তিলাভ করা, সংক্ষেপে পুনর্জন্ম বন্ধ করাই হল মুক্তি বা মোক্ষ। জীব এই জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় এই মোক্ষ লাভ করতে পারে।

অবিদ্যাই দুঃখভোগ ও বন্ধনের কারণ

(চ) প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে যে, সম্যক্ জ্ঞান বা বিদ্যাই অবিদ্যা দূরীভূত করে জীবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে। কিন্তু কেবলমাত্র সত্যের ধ্যানই সত্য উপলব্ধিকে যথার্থ করে অবিদ্যা দূরীভূত করতে পারে। যোগদর্শনে যোগসাধনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যোগদর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, ন্যায় বৈশেষিক এবং বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনেও সত্যের ধ্যানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মোক্ষ লাভের পথ অতি দুর্গম। মনের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাসগুলি বহু গভীরে তাদের মূলগুলিকে প্রোথিত করেছে সেগুলিকে উৎপাটিত করতে হলে কেবল সত্যের জ্ঞান নয়, সত্যের অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। এজন্য চাই একনিষ্ঠা, একাগ্রতা, কঠোর সাধনা। এই সত্য জ্ঞান লাভ করলেই আমরা জানতে পারি যে, আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য-স্বভাব; দেহ ও আত্মা পৃথক এবং দেহের বন্ধন আত্মার বন্ধন সূচিত করে না।

সম্যক্ জ্ঞান জীবকে মোক্ষ লাভের উপযুক্ত করে তোলে

(ছ) চার্বাক ছাড়া সব ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে যে, সম্যক জ্ঞানের জন্য সংযম বা নৈতিক শুচিতার প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন আত্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

জৈব প্রবৃত্তিকে যদি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহলে মানুষ ভোগ বাসনার দাস হয়ে পড়ে। সংযমের অর্থ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করা নয়, সৎ অভ্যাস অনুশীলন করা। সে কারণে ভারতীয় নীতিবিদ্যা কেবলমাত্র কৃচ্ছ্রতাবাদ (regorism) প্রচার করেছে—এ অভিযোগও যুক্তিযুক্ত নয়। যোগদর্শনে যেমন 'যম'[1] বা কি করা উচিত নয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনই 'নিয়ম'[2] বা সৎ অভ্যাস অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেও অহিংসার সঙ্গে মৈত্রী এবং করুণার অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে।

মোক্ষ লাভের জন্য সংযম ও নৈতিক শুচিতার প্রয়োজন

(জ) চার্বাক ভিন্ন সব দর্শনই মোক্ষকেই (liberation) একমাত্র পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছে। অবশ্য এই মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে সকলে এক মত নয়। তবে সকলেই স্বীকার করেছে যে, মোক্ষ হল সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা। আবার কারও কারও অভিমত যে, মোক্ষ কেবলমাত্র দুঃখ নিবৃত্তি নয়—পরম শান্তি, যে মোক্ষ লাভ করে সে ভূমানন্দের অংশীদার হয়।

মোক্ষই একমাত্র পুরুষার্থ

(ঝ) চার্বাক ভিন্ন সব ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, বাইরের জগতের চাইতে আন্তর-সত্তাই তাদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের জগদ্দর্শনের ভিত্তি হল আত্মোপলব্ধি—সে কারণে প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। যদিও আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে মতভেদ আছে।

বাইরের জগতের তুলনায় আন্তর-সত্তাই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে

---

1. যম: অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।
2. নিয়ম: শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের মৌলিক ধারণা

(Fundamental Concepts of Indian Philosophy)

১। ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ (Concept of Karma in Indian Philosophy):

জড়বাদী চার্বাক দর্শন ব্যতীত সব ভারতীয় দর্শনই কর্মবাদে বিশ্বাসী। কর্মবাদ অনুযায়ী মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যে যেরূপ কর্ম করবে তাকে সেরূপ ফল ভোগ করতে হবে। কর্মবাদের নীতিটি খুবই প্রাচীন। বেদে এই কর্মবাদের উল্লেখ আছে। এ হল এমন একটি নীতি যা মানুষের এবং দেবতাদেরও মান্য করতে হয়। এই নীতি অলঙ্ঘনীয়।

কর্ম শব্দটি 'কৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'কৃ' ধাতুর অর্থ কার্য করা, শারীরিক এবং মানসিক সব রকম কার্যই কর্ম। প্রত্যেক কর্মই নিজ নিজ ফল উৎপাদন করে। সব কর্মের ফল তিন প্রকার—ভাল, মন্দ এবং মিশ্র ; কর্ম যে প্রকার তার ফলও তার অনুরূপ হবে। জীব কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করে। সৎ কর্মের ফল পুণ্য এবং সুখ ; অসৎ কর্মের ফল পাপ এবং দুঃখ। কর্মবাদকে বলা যেতে পারে নৈতিক কার্যকারণবাদ, কারণ থাকলেই যেমন কার্য, তেমন কর্ম থাকলেই কর্মফলভোগ। কোন জীবের পক্ষেই কর্মফলভোগকে এড়ান সম্ভব নয়।

কর্মবাদের স্বরূপ

এই কর্মবাদের ওপরেই জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত। জন্মান্তরবাদ অনুসারে মৃত্যুর পর আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে। জীব যে সকল কর্ম করে তার ফলভোগ এক জীবনে শেষ না হলে জীবকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে ফলভোগের জন্য সংসারে আসতে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৌদ্ধদর্শন কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও বৌদ্ধদর্শন কর্মবাদে বিশ্বাসী এবং কর্মফল ভোগের জন্য জীবের পুনর্জন্মগ্রহণের কথাও স্বীকার করেছে।

জন্মান্তরবাদে

বেদান্ত কর্মবাদে বিশ্বাসী, তবে বেদান্ত মতে কর্মবাদের যথাযথ ব্যাখ্যার জন্য নিত্য আত্মার বা আত্মার অপরিণামী সত্তা স্বীকার করা প্রয়োজন। বেদান্ত মতে কর্মফলের নিয়মে কর্তা এবং ভোক্তা অভিন্ন। কর্মশৃঙ্খল যেমন আদি ও অন্তহীন তেমনি আত্মাও অনাদি ও অনন্ত।

[1]একটি নীতি অনুসারে কর্মকে প্রধানতঃ দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়—(১) **অনারব্ধ কর্ম** অর্থাৎ যে কর্মের ফলভোগ এখনও শুরু হয়নি, (২) **আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম** অর্থাৎ যে কর্মের ফলভোগ শুরু হয়ে গেছে। প্রারব্ধ কর্ম হল পূর্বকৃত কর্মফল অর্থাৎ সেই সব কর্ম যা অতীতে সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু যার ফল ভোগ শুরু হয়ে গেছে। যেসব কর্ম করার জন্য আমরা দেহ ধারণ করেছি এবং এই স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করেছি তাদের হেতু প্রারব্ধের কর্মরাশি। অনারব্ধ কর্মকে আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(i) **প্রাক্তন বা সঞ্চিত কর্ম** অর্থাৎ যেসব কর্মের ফলভোগ হয়নি সেগুলিই সঞ্চিত কর্ম নামে অভিহিত। আর (ii) **বর্তমান, ক্রিয়মান, আগমী বা সঞ্চীয়মান কর্ম**। সঞ্চীয়মান কর্ম হল সেই কর্ম যেগুলি এই জীবনে সম্পাদিত হচ্ছে এবং যার ফলভোগ মানুষ এই জীবনেই ভোগ করতে পারে অথবা ইহজীবনের কর্মফল পরবর্তী জীবনেও ভোগ করতে পারে।

সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও সঞ্চীয়মান কর্ম

ভারতীয় দর্শন কর্মবাদ স্বীকার করে নিলেও জীবের স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করে না। বর্তমান অতীতের দ্বারা নির্ধারিত হলেও, জীব তার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের পুনর্জন্ম রোধ করতে পারে এবং মোক্ষ লাভ করতে পারে। জীবের ইচ্ছা ও কর্মের ওপরই তার ভবিষ্যৎ নির্ভর।

কর্মের ফলভোগ করতেই হবে, কর্মফল কখনও বিনষ্ট হয় না। তবে সকামকর্মের জন্যই জীবকে ফলভোগ করতে হয়, নিষ্কাম কর্মের জন্য জীবকে ফলভোগ করতে হয় না। রাগ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত হয়ে যে কর্ম করা হয় তা সকাম। এই সকাম কর্মবাসনাই সংসারের প্রতি জীবের বন্ধন সূচনা করে। কিন্তু জগৎ ও জীবনের স্বরূপ জেনে এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত হয়ে যদি কর্ম সম্পাদন করা হয় তাহলে সে কর্ম হল নিষ্কাম কর্ম।

সকাম ও নিষ্কাম কর্ম

মীমাংসকদের মতে সকাম কর্ম সম্পাদনের ফলে জীবকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং জাগতিক সুখদুঃখ ভোগ করতে হয়। নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন করলে সঞ্চিত কর্মফল বিনষ্ট হয় এবং কর্মফলভোগের সম্ভাবনা না থাকায় পুনর্জন্মগ্রহণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। মীমাংসকদের মতে কর্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যে কর্ম প্রতিদিনই করা প্রয়োজন তাহল নিত্যকর্ম। যেমন, প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করা। কোন বিশেষ উপলক্ষে যে কর্ম করা হয় তাহল নৈমিত্তিক কর্ম—যেমন, চন্দ্রগ্রহণের বা

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম

1. দেবী-ভাগবত ৬।১০

সূর্যগ্রহণের সময় গঙ্গায় স্নান করা। কোন নির্দিষ্ট ফল লাভের কামনায় যে কর্ম করা হয় তাহল কাম্য কর্ম—যেমন, স্বর্গাদি সুখ লাভের জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম বাধ্যতামূলক। এই সকল কর্ম সম্পাদনে পূর্বজন্মার্জিত পাপের ক্ষয় হয়। যিনি কাম্য কর্ম সম্পাদন করেন তাঁকেও নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম সম্পাদন করতে হবে। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম বেদ বিহিত বলেই সম্পাদন করতে হবে।

জৈন দর্শনে কর্মবাদ

জৈন দর্শনেও কর্মবাদের বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। জৈন দর্শন মতেও সকাম কর্মের জন্যই আত্মার দেহ ধারণ এবং কর্মফল ভোগের জন্যই জীবের পুনর্জন্মগ্রহণ। কামনা, বাসনা ও ভোগ-লালসার বিরতি ঘটলেই জীব মুক্তিলাভ করে। জৈনগণের মতেও কর্মই বন্ধনের কারণ।

প্রশ্ন হল, কর্ম দীর্ঘ ব্যবধানে কিভাবে ফল প্রদান করে? জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক এবং মীমাংসা দার্শনিকদের মতে কৃতকর্ম থেকে একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই শক্তিই কর্মফল প্রদান করে। জৈন মতে জীবের কৃতকর্ম থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি প্রথমে ভাব কর্মরূপে আত্মায় প্রবৃত্তি বা কষায় উৎপন্ন করে এবং পরে দ্রব্য কর্মরূপে সূক্ষ্ম পুদ্গল পরমাণু সৃষ্টি করে জীবের কার্মন শরীর গঠন করে। ন্যায় বৈশেষিক মতে জীবের পাপপুণ্য যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে তার নামই অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টশক্তি অচেতন, এর নিজের কোন নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নেই। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই অদৃষ্টশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে জীবের পাপ-পুণ্যের বিচার করে তার ফলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। মীমাংসকদের মতে বেদবিহিত কর্মই সৎ:কর্ম ও বেদনিষিদ্ধ কর্ম অসৎ কর্ম। বেদবিহিত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্তব্য কর্ম। ইহলোকে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি কিভাবে ঘটে? মীমাংসকদের মতে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে আত্মায় একটি অদৃশ্য শক্তি উৎপন্ন হয় যার নাম অপূর্ব এবং এই শক্তি যথাসময়ে ফল প্রদান করে। মীমাংসকগণ যাগযজ্ঞ এবং তার ফলের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে অপূর্বকে স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে পূর্ব বা অতীত জীবনে যেসব কর্ম সম্পাদিত হয় সেসব কর্ম একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে যাকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার হল অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ। এই সংস্কারের জন্যই পুনর্জন্ম হয়ে থাকে।

কর্মের ফল প্রদানের বিষয়টির ব্যাখ্যা

সব কর্মবাদী দার্শনিকই মোক্ষলাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সকাম কর্মই বিষয়ানুরাগ ও বন্ধন সৃষ্টি করে যার ফলে জীবের

পুনর্জন্ম ঘটে। নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে বিষয়ানুরাগের কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং ফলে পুনর্জন্মেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। কোন কোন বৌদ্ধ দার্শনিকের মতে নির্বাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয় এবং নির্বাণ লাভের পর যদি অনাসক্তভাবে কর্ম সম্পাদন করা যায় তাহলে বন্ধনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। মীমাংসা দার্শনিকদের মতে কর্মের জন্যই কর্ম করতে হয়, কোন ফললাভের আশায় নয়। নিষ্কামভাবে বেদবিহিত নিত্য কর্ম সম্পাদনে স্বর্গসুখভোগ ঘটে। শঙ্কর কর্মবাদ স্বীকার করে নিয়েছেন। ফল-কামনায় যে সব কর্ম করা হয় তারা কর্মবাদের নীতি অনুসারে ফল দান করে। অবিদ্যা থেকে কর্ম, কর্ম থেকে ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি। আমরা ক্রিয়া অনুরূপ কার্যের ফললাভ করি।

নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব

শঙ্করের মত

কর্মদ্বারা মোক্ষ হয়, শঙ্কর এই মত স্বীকার করেন না। মোক্ষ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল নয়। কর্মফল অনিত্য, মোক্ষ নিত্য। কর্ম জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত করে। জ্ঞানলাভের পথে যে অন্তরায় তা দূর করতে কর্ম সাহায্য করে। পূর্ণজ্ঞান লাভ হলে কর্মের বীজ ধ্বংস হয় এবং পুনর্জন্মের রোধ হয়। জীবের লক্ষ্য কর্মের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করা। অবিদ্যা থেকে মুক্তি পেলে কর্ম থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। কৈবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। ভেদজ্ঞান বন্ধনের কারণ। কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং জীবাত্মা ও ব্রহ্মের অভেদত্ব জ্ঞানই মুক্তি আনয়ন করতে পারে।

২। ভারতীয় দর্শনে আত্মা (Concept of Self in Indian Philosophy) ঃ

সাধারণতঃ আত্মা বলতে দেহাতিরিক্ত কোন অজড় নিত্য দ্রব্যের ধারণা করা হয়, চৈতন্য যার স্বাভাবিক গুণ। এই আত্মার জন্যই জীব জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। এই আত্মার অস্তিত্বের জন্যই ব্যক্তি-অভিন্নতা (self-identity) সূচিত হয়। ভারতীয় দর্শনে আত্মা এবং মন সমার্থক শব্দ নয়। আত্মা মন থেকে ভিন্ন এক সত্তা। মন হল অন্তরিন্দ্রিয় যার সাহায্যে আত্মা বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলি প্রত্যক্ষ করে।

জড়বাদী চার্বাক দার্শনিকরা দেহাতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। চার্বাকদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। 'আমি রুগ্ন', 'আমি অন্ধ', 'আমি স্থূল' প্রভৃতি উক্তিই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, দেহ ও আত্মা সমার্থক। চার্বাক মতে চৈতন্য কোন অতিমানস সনাতন আত্মার গুণ নয়, চৈতন্য দেহেরই গুণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ—এই চারটি মহাভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে যখন জীবদেহের উৎপত্তি ঘটে, তখন সেই দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, যে চারটি

মহাভূতের দ্বারা জীবদেহ গঠিত, তাদের কোনটিই যখন চৈতন্যধর্মবিশিষ্ট নয় তখন তাদের সংমিশ্রণে জীবদেহে চৈতন্যের আবির্ভাব কিভাবে ঘটতে পারে? এর উত্তরে চার্বাকরা বলেন যে, পান, চুন ও সুপারি—এই তিনটির কোনটির মধ্যেই কোন লাল আভা নেই, তবু এদের একত্রে চর্বণ করলে একটা লাল আভা দেখা যায়। অনুরূপভাবে চারটি মহাভূতের কোনটিই চৈতন্যধর্মবিশিষ্ট না হলেও এগুলির বিশেষ সংমিশ্রণে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটতে পারে। চৈতন্য জড়ের উপবস্তু। যেহেতু দেহাতিরিক্ত কোন চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই, সেহেতু আত্মার বিনাশের প্রশ্ন অবান্তর। দেহের বিনাশেই জীবনের পরিসমাপ্তি। আত্মার অমরতা, কর্মফলভোগ, জন্মান্তর, বন্ধন, মুক্তি সবই অর্থহীন। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষের মাধ্যমে কোন অজড় নিত্য চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে না।

চার্বাক মত

অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণও কোন শাশ্বত বা চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কোন এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আমরা যেসব মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দেখি, সেই সব মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহই আত্মা। এই প্রবাহের অন্তরালে কোন শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব নেই। মানুষের মধ্যে কোন অপরিবর্তনীয় সত্তার অস্তিত্ব না থাকলেও, মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে, তারই দ্বারা ব্যক্তি-অভিন্নতা ব্যাখ্যা করা চলে। সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করেও বুদ্ধদেব জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেছেন এবং তাঁর মতে জন্মান্তর অর্থে কোন চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহণ নয়। জন্মান্তর অর্থে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব। জীব হল মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ। এই মানসিক প্রক্রিয়াই এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে প্রবাহিত হয়। মানুষ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। এই পঞ্চস্কন্ধ হল—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। বুদ্ধদেবের মতে যাঁরা শাশ্বত অখণ্ড আত্মার কথা বলেন তাঁরা পঞ্চস্কন্ধকে একত্রে বা কোন একটিকে প্রত্যক্ষ করে শাশ্বত আত্মার কথা বলে থাকেন।

বৌদ্ধমত

জৈন দার্শনিকদের মতে আত্মার সত্তা অস্বীকার করা চলে না। আত্মা চৈতন্যধর্মবিশিষ্ট এবং চৈতন্য আত্মার স্বরূপ লক্ষণ। আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। আত্মা নিত্য এবং দেহাতিরিক্ত সত্তা। আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই। আত্মার অস্তিত্ব স্বপ্রকাশ। প্রতিটি বিষয়-জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতারূপে আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎ প্রতীতির সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম, এগুলি প্রত্যক্ষ করার সময় আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। আত্মার অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যেও

জানা যায়। শকটের যেমন চালক আছে, তেমনি দেহের পরিচালক হল আত্মা। তাছাড়া দেহের গঠন কর্তারূপে কোন নিমিত্ত কারণ আছে, তাহল আত্মা। চৈতন্য দেহের গুণ নয়, তাহলে মৃতদেহেও চৈতন্য থাকত। জড়ভূতের সংগঠন থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি। একথা স্বীকার করতে গেলে সংগঠন কর্তারূপে কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কর্মফলভোগের জন্য আত্মা যখন যে দেহ ধারণ করে, সেই দেহের অবস্থা লাভ করে। জৈনরা বহু আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সুতরাং জৈনদের মতে আত্মা সচেতন, সগুণ, নিত্য ও সক্রিয় দ্রব্য।

জৈন মত

নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা হল দ্রব্য এবং এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা থাকে। আত্মা হল জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবগুলিই আত্মার করণ, (instrument) যেগুলি আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আত্মা দেহ, বাহ্য-ইন্দ্রিয় এবং মনের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র সত্তা। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয় বা অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন আত্মায় চেতনার আবির্ভাব ঘটে। নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ আত্মা তখনই সগুণ এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আত্মা জ্ঞাতা, ভোক্তা এবং কর্তারূপে সব কিছু জানে, সকল কর্ম সম্পাদন করে এবং সকল কিছু ভোগ করে। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন দ্রব্য এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে।

ন্যায় মত

বৈশেষিকদের আত্মা সম্পর্কে ধারণা নৈয়ায়িকদের ধারণার অনুরূপ। আত্মা হল এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য। আত্মা হল জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা বিভু হলেও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা নিত্য, আত্মার কোন বিনাশ নেই। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, কিন্তু দেহের সংস্পর্শে এসেই আত্মা চেতনা লাভ করে। যেহেতু আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, সেকারণে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তুক গুণ।

বৈশেষিক মত

বৈদান্তিকদের মতে আত্মা বহু নয়, এক। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন মতে জীবাত্মা বহু, কেননা, যদি জীবাত্মা এক হত তাহলে একের সুখে সকলেই সুখ, একের দুঃখে সকলেই দুঃখ বোধ করত।

মীমাংসকগণের মতে আত্মা দেহ, মন ও বুদ্ধি ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সত্তা। প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভট্ট উভয়ের মতে আত্মা একটি দ্রব্য, তবে প্রভাকরের মতে আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয় কিন্তু মীমাংসকদের মতে আত্মা জ্ঞাতা, সেহেতু আত্মা জ্ঞেয় হতে পারে না।

মীমাংসা মত

তবে বিষয়ের উপলব্ধির সময় জ্ঞাতারূপে আত্মার উপলব্ধি ঘটে। ভাট্ট মীমাংসকদের মতে প্রতি বিষয়ের উপলব্ধির সঙ্গে আত্মা জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হয় না, কেবলমাত্র আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে আত্মা বিষয়রূপে উপলব্ধ হয়।

সাংখ্য, যোগ ও অদ্বৈত বেদান্ত মত

সাংখ্য ও যোগ দর্শনমতে আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা জড়জগতের কোন বস্তু নয়। আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা চৈতন্যগুণবিশিষ্ট দ্রব্য নয়। চিৎ বা জ্ঞান আত্মার ধর্ম বা গুণ নয়, আত্মাই চিৎস্বরূপ, বা জ্ঞানস্বরূপ। আত্মা নিত্য, অপরিণামী, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। সাংখ্য ও যোগ দর্শন মতে আত্মা চিত্তবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র এক আধ্যাত্মিক সত্তা।

অদ্বৈতবেদান্ত মতেও আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মা সচ্চিদানন্দ, আত্মার স্বরূপই হল আনন্দ। সাংখ্যমতে আত্মা স্বপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ নয়। অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা নিরবয়ব বা নিরংশ। আত্মা নির্বিশেষ, নিত্য, অখণ্ড, আদি ও অন্তহীন। আত্মার বহুত্ব সম্ভব নয়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মা বহু, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা এক। পরমাত্মাই ব্রহ্ম। এক ব্রহ্ম মায়া প্রভাবে নানা উপাধিযুক্ত হয়ে বহু জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে আত্মা এক নয়, বহু। সাংখ্যকার পারমার্থিক দৃষ্টিতেও আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেছেন।

মতামতের সমালোচনা

আত্মা সম্পর্কে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতামতের সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের আত্মাসম্পর্কীয় ধারণা সন্তোষজনক নয়। তাদের মতে আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন এবং নির্গুণ, কিন্তু এ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, আত্মা যদি স্বরূপতঃ অচেতন হয়, তাহলে আত্মার সঙ্গে জড়বস্তুর পার্থক্য নির্ধারন করা কিভাবে সম্ভব হয়? নিষ্ক্রিয় আত্মার সাহায্যে সক্রিয় মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। নিষ্ক্রিয় আত্মার পক্ষে কিভাবে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা হওয়া সম্ভব? যদি বলা যায় অবিদ্যাবশতঃই আত্মা নিজেকে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা মনে করে তাহলে প্রশ্ন ওঠে, নিষ্ক্রিয় আত্মার এই অবিদ্যারূপ ভ্রান্তি কিভাবে ঘটা সম্ভব? তাছাড়া, আত্মা যে এক চৈতন্যময় সত্তা, সাক্ষাৎ প্রতীতির সাহায্যেই তা জানা যায়। সাংখ্যের বহুপুরুষবাদও সমর্থনযোগ্য নয়। সাংখ্যের আত্মা যদি বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হয়, তাহলে পারমার্থিক দৃষ্টিতে কিভাবে আত্মার বহুত্ব কল্পনা করা যায়? বিশুদ্ধ চৈতন্যের বিভাগ সম্ভব নয়। জৈন দর্শন মতে ও বৈষ্ণব দার্শনিকদের মতানুযায়ী আত্মা সগুণ ও সক্রিয়—এই মতবাদই যুক্তিযুক্ত।

*৩। ভারতীয় দর্শনের পুরুষার্থ (Purusartha in Indian Philosophy) :

পুরুষার্থ বলতে বোঝায় পুরুষের প্রয়োজনসাধক বস্তু বা কাম্যবস্তু। পরম পুরুষার্থ বলতে বোঝায় পরম কাম্যবস্তু, যা কামনা করার পর আর কামনা করার কিছুই থাকে না, যা লব্ধ হলে মানুষ তার চরম অভীষ্ট লাভ করে। সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে, পুরুষের প্রয়োজনসাধক বর্গচতুষ্টয় হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

ধর্ম প্রথম পুরুষার্থ কেন?

প্রশ্ন হল, বর্গচতুষ্টয়ে ধর্মকে প্রথমে রাখার কারণ কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় দর্শনে ধর্ম বর্জন করে কোন অভিলাষ সিদ্ধির কথা বলা হয়নি। ধর্মপথেই অর্থ আহরন, ধর্মপথেই কামসেবা এবং ধর্মপথেই মোক্ষলাভ।

চারটি পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে কেন?

এখন আলোচনা করে দেখা যাক, মানুষের জীবনে এই চারটি প্রয়োজনসাধক বস্তুর বা পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে কেন? জীবাত্মা যখন দেহ ধারণ করে, তখন সে দুটি দেহের অধিকারী হয়—একটি স্থূল ও অপরটি সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা গঠিত এবং সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির দ্বারা গঠিত। তাছাড়া জীব হল সমাজে বসবাসকারী জীব। সামাজিক জীব হিসেবে তার যেমন নানা ধরনের অধিকার আছে, তেমনি নানা প্রকারের কর্তব্যও রয়েছে। জীব দেহ ও আত্মার সমষ্টি। জীব হল পার্থিব-ঐশ্বরিক সত্তা। জীব সমাজে বসবাস করে, সেহেতু তার চারটি পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

পুরুষার্থগুলির ব্যাখ্যা

জীব দেহের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দেহের উপযোগী বস্তু কামনা করে এবং দেহের পক্ষে উপযোগী নয় এমন বস্তু থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। কাজেই দেহ উপযোগী বস্তুর প্রাপ্তি ও ভোগ জীবের কাম্য হয়ে ওঠে, সেই কারণে কাম জীবের পুরুষার্থ। কিন্তু সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বসবাস করে কাম্যবস্তু ভোগ করতে হলে সমাজে জীবকে অর্থ, সম্পত্তি, ক্ষমতা এবং সামাজিক মর্যাদার ওপর নির্ভর করতে হয়; নতুবা কাম্যবস্তু লব্ধ হবে না। সে কারণে জীবের জীবনে অর্থ হয়ে পড়ে অন্যতম পুরুষার্থ।

কিন্তু সমাজের মধ্যে বসবাস করে জীবকে যদি অর্থ সংগ্রহ ও ভোগ করতে হয়, অবশ্যই তাকে ধর্মপথে থেকে সেই অর্থ সংগ্রহ ও ভোগ করতে হবে। প্রতিটি সমাজ

* পুরুষ + অর্থ (প্রয়োজন) = পুরুষার্থ

সৎ আচরণ ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করে। সমাজে বসবাসকারী জীবের পক্ষে তার আচরণে এই নীতিগুলিকে অনুসরণ করা নৈতিক কর্তব্য। কাজেই ধর্ম বা সততাও জীবের পুরুষার্থ। ধর্মপথেই কামের নিবৃত্তি। ধর্মপথেই অর্থসংগ্রহ ও ভোগ। কাজেই পুরুষের প্রয়োজনসাধক বস্তুর মধ্যে ধর্মের এতখানি গুরুত্ব। ধর্মবিযুক্ত সামাজিক জীবন নিন্দনীয়।

প্রশ্ন হল ধর্ম কি? ভারতীয় দর্শনে ধর্মের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে, 'যতঃ অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি, স ধর্মঃ'। ঐহিক অভ্যুদয় আর পারলৌকিক নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি—এই দুটি যা থেকে উৎপন্ন হয়, তাকেই ধর্ম বলে। বৌদ্ধ দর্শনে অষ্ট মার্গ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি ধর্মের লক্ষণের অন্তর্গত। আবার যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ); নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রনিধান), আসন, প্রাণায়াম (শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ), প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয়গুলির বাহ্য বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্তি), ধারণা (অভীষ্ট বস্তুতে চিত্তনিবেশ), ধ্যান (ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের একতানতা) ধর্মের অন্তর্গত। মীমাংসা দর্শনমতে 'চোদনা লক্ষণো ধর্মঃ' অর্থাৎ বৈদিক বিধি অনুযায়ী কর্তব্য করাই ধর্ম এবং তাই হল জীবের পক্ষে সৎকর্ম এবং কর্তব্য কর্ম। বেদ নির্দেশ করে কি কর্তব্য করা দরকার এবং কি পরিহার করা দরকার। যে কর্ম বেদ নিষিদ্ধ তাই অধর্ম বা অসৎ কর্ম। সে কারণে বলা হয় 'বেদ প্রনিহিত ধর্মঃ'। প্রাচীন মীমাংসকগণ স্বর্গ সুখভোগকেই পুরুষার্থ মনে করেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্বর্গ সুখভোগ লাভ করা যায়। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে 'বেদস্মৃতিঃ সদাচার, স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ, এতচ্ চতুর্বিধম্ প্রাহু সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্।' অর্থাৎ চতুর্বেদ, স্মৃতি, নিবন্ধ, সদাচার ও আত্মপ্রসাদ ধর্মের চতুর্বিধ লক্ষণ। বিষ্ণুসংহিতায় বলা হয়েছে, "ইজ্যা অধ্যায়ন দানানি তপঃ সত্যম্ ধৃতি ক্ষমা ও অলোভ ইতি মার্গায়াম্ ধর্মস্য অষ্টঃবিধ স্মৃতঃ"। অর্থাৎ যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপঃ, সত্য, ধৃতি, ক্ষমা ও অলোভ—এই আটটি ধর্মের পথ; এগুলির মধ্যে প্রথম চারটি দম্ভপ্রকাশক, শেষোক্ত চারটি যথার্থ ধর্মের প্রতিপাদক। 'বস্তু বাস্তবং অত্র বেদ্যং শিবদম্ তাপত্রয়োন্মূলনং'। শ্রীমৎভাগবতে ধর্মের এই ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে।

ধর্মের পরিচয় ও ব্যাখ্যা

এই পুরুষার্থের স্বরূপ নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন ভারতীয় দার্শনিক যেমন চার্বাক অর্থ, কাম বা সুখভোগ, ধর্ম ও মোক্ষ—এই

চারটির মধ্যে প্রথম দুটিকে পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। চার্বাক দর্শন মোক্ষ এবং ধর্মকে পুরুষার্থ বলে স্বীকার করে না। চার্বাক মতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাম বা সুখ এবং অর্থ—এ দুটিকেই পুরুষার্থ মনে করেন এবং তাকে লাভ করার জন্যই সচেষ্ট হন। এ দুটির মধ্যে সুখই মুখ্য পুরুষার্থ, অর্থ সুখলাভের উপায় মাত্র, সে বিচারে অর্থ হল গৌণ পুরুষার্থ।

পুরুষার্থের স্বরূপ নিয়ে মতভেদ—চার্বাক মত

প্রাচীন মীমাংসকদের মতে স্বর্গ-সুখভোগই হল পুরুষার্থ এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্বর্গসুখ লাভ করা যায়। পরবর্তী মীমাংসকগণ মোক্ষকেই জীবনের পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। মোক্ষ অবস্থা সুখের অবস্থা নয়; মোক্ষাবস্থায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে।

মীমাংসকদের মত

কিন্তু কাম এবং অর্থ জীবকে সন্তোষ প্রদান করতে পারে না, কারণ এগুলি ক্ষণস্থায়ী। সেহেতু জীব এমন এক পুরুষার্থের অনুসন্ধান করতে চায় যা কামনা করার পর আর কামনা করার কিছুই থাকে না, যা হল শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। জীব মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ রূপে আবিষ্কার করে।

অধিকাংশ ভারতীয় দর্শন মোক্ষকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। অবশ্য মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতবিভেদ লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ দর্শনে মোক্ষ হল নির্বাণ যা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে বোঝায়। জৈন দর্শনে আত্মার দেহধারন আত্মার বদ্ধদশা। আত্মা অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দের আধার। আত্মা পুদগলমুক্ত হলে নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার যখন সংযোগ নষ্ট হয়, এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে, তখনই মোক্ষ লাভ হয়। সাংখ্য দর্শনমতে পুরুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগের উচ্ছেদ ও পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। অদ্বৈত বেদান্তমতে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার বা ব্রহ্মের একাত্মতার উপলব্ধিই মোক্ষ। রামানুজের মতে আত্মা যে দেহ থেকে ভিন্ন এবং আত্মা যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অংশ, জীবের এই উপলব্ধিই হল মোক্ষ। যাঁরা সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের উপাসক তাঁরা ঈশ্বরে স্থিতিকেই বা ভগবত প্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলে অভিহিত করেন।

অনেকের মতে মোক্ষই পুরুষার্থ

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৈষ্ণব দর্শনমতে পঞ্চম পুরুষার্থ হল ভগবৎ প্রেম, যা ভাগবৎ ধর্মে অনুপ্রবিষ্ট। ধর্ম হল 'অহৈতুকী ভক্তি অধোক্ষজে, অর্থাৎ পরম পুরুষ বিষ্ণুতে যে অহৈতুকী ভক্তি, তাই হল বৈষ্ণব দর্শনমতে পরম পুরুষার্থ।

৪। ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ (Liberation in Indian Philosophy) :

জড়বাদী চার্বাক দার্শনিক ছাড়া সকলেই মোক্ষকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। অবশ্য মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে সকলে একমত নন।

বৌদ্ধ মত

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভকেই নির্বাণ বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে মোক্ষকে নির্বাণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অনেকের মতে নির্বাণ হল দুঃখের একান্ত অভাব। এ অবস্থা ভাবাত্মক কি অভাবাত্মক তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আবার কারও কারও মতে নির্বাণের অর্থ হল শাশ্বত আনন্দের অবস্থা। 'নির্বাণং পরমং সুখং'। 'নির্বাণ শুধু পরম আনন্দ নয়, নির্বাণ পরম শান্তি'। অনেকের মতে বুদ্ধদেব নির্বাণের অবস্থাকে শাশ্বত আনন্দের অবস্থারূপে কোনখানেই ব্যাখ্যা করেননি, কাজেই নির্বাণকে আত্যন্তিক দুঃখ নিরোধের অবস্থারূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। বৌদ্ধমতে অষ্টাঙ্গিক মার্গ (সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি) অনুসরণ করে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব।

জৈন মত

জৈন দর্শনমতে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। আত্মা সাধারণতঃ অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দের আধার। কর্মশক্তি প্রভাবে আত্মায় পুদ্গল বা জড়-কণার সংযুক্তি ঘটে এবং আত্মা দেহধারণ করে। আত্মার দেহধারণই আত্মার বদ্ধদশা। আত্মা পুদ্গলমুক্ত হলে নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। জীবের কামনা-বাসনা পুদ্গল সংযুক্তির কারণ এবং কামনা-বাসনার মূলে রয়েছে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে মিথ্যাজ্ঞান। সম্যক্ জ্ঞানের সাহায্যেই মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়। সম্যক্ জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সম্যক্ দর্শন এবং সম্যক দর্শনের জন্য প্রয়োজন সম্যক্ চারিত্র। কাজেই সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চারিত্র মোক্ষলাভের উপায়।

ন্যায়-বৈশেষিক মত

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে যে, দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার যখন সংযোগ নষ্ট হয় এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে তখনই মোক্ষলাভ হয়। আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ, নিক্রিয় অচেতন দ্রব্য। মোক্ষ দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি নয়, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। শরীর ধারণ করার জন্যই জীবের দুঃখভোগ। মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরকে আত্মার সঙ্গে অভেদ কল্পনা করাই হল মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যা জ্ঞানই সকল দোষ ও দুঃখের কারন। আত্মার যথাযথ স্বরূপের জ্ঞানই মিথ্যা জ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষ লাভের উপায়।

সাংখ্য দর্শনমতে পুরুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগের উচ্ছেদ ও পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। পুরুষ ও প্রকৃতির অবিবেক অর্থাৎ অভেদজ্ঞানই পুরুষের বন্ধনের কারণ। অবিবেক যেহেতু বন্ধনের কারণ, সেহেতু বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। তত্ত্বাভ্যাসের মাধ্যমেই বিবেকজ্ঞান লব্ধ হয়। তত্ত্বাভ্যাসের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কেবলতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপলব্ধিই তত্ত্বজ্ঞান। যোগদর্শনমতে পুরুষের আত্মস্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য। সাংখ্যযোগদর্শনমতে বিবেকখ্যাতিই দুঃখহানির এবং কৈবল্য লাভের উপায়। বিবেকখ্যাতির অর্থ হল আত্মা যে শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা এবং আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার থেকে পৃথক এই প্রখ্যাত জ্ঞান। চিত্তশুদ্ধি না ঘটলে এই প্রখ্যাত জ্ঞান লাভ করা যায় না। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং বিবেকখ্যাতি জাগে, যার ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে। এই অষ্ট অঙ্গ হল—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অদ্বৈত বেদান্তমতে মোক্ষাবস্থা এক আনন্দঘন অবস্থা।

সাংখ্য-যোগদর্শন মত

সাংখ্য যোগদর্শনমতে মোক্ষ অবস্থা আনন্দঘন অবস্থা নয়। প্রাচীন মীমাংসকদের মতে স্বর্গসুখ লাভই মোক্ষ এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্গসুখভোগ ঘটে। প্রাচীন মীমাংসকদের মতে আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নির্বিশেষ এবং আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। মোক্ষ অবস্থায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। যেহেতু চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তুক গুণ; সেহেতু মোক্ষ অবস্থায় আত্মা চৈতন্যহীন অবস্থায় অবস্থান করে। সুতরাং মোক্ষ অবস্থা আনন্দের অবস্থা নয়। আত্মজ্ঞান এবং জগতের প্রতি নিস্পৃহতা বা বৈরাগ্যই মোক্ষল্যভের সোপানস্বরূপ।

প্রাচীন মীমাংকদের মত

অদ্বৈত বেদান্তমতে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার বা ব্রহ্মের একাত্মতার উপলব্ধিই মোক্ষ। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। 'আমিই ব্রহ্ম'—এই তত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রতীতি হলেই মোক্ষ ঘটে। মোক্ষ এক আনন্দঘন অবস্থা, কেবলমাত্র দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়। কেননা, ব্রহ্ম সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। মুমুক্ষু ব্যক্তিকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হতে হলে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহলোক ও পরলোকের ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি অর্জন এবং মোক্ষের ইচ্ছা—এই সাধন চতুষ্টয়ের অধিকারী হতে হবে এবং তারপর গুরুর কাছে বেদান্ত পাঠ করতে হবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বেদান্ত পাঠের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। মুক্তি দু'প্রকার—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি—নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের

অদ্বৈত বেদান্ত মত

মাধ্যমে জীবন্মুক্তের যখন পূর্ব সঞ্চিত কর্মের ফল বিনষ্ট হয়, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জীবন্মুক্ত বিদেহমুক্তি লাভ করে।

রামানুজের মতে কর্মফলভোগ হেতু জীবের বদ্ধদশা। নিজ নিজ কর্মানুযায়ী প্রতিটি জীব একটি জড়দেহ ধারণ করে। আত্মার বদ্ধদশা মানেই হল আত্মার দেহ ধারণ করা। অবিদ্যাপ্রসূত কর্মই বদ্ধদশার কারণ। আত্মার অনাত্মার সঙ্গে একাত্মবোধের নাম অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই অবিদ্যা। বেদান্ত পাঠের দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হয়। তখন জীব উপলব্ধি করে যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অংশ। কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগেই মোক্ষ লাভ সম্ভব। কর্ম অর্থে নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন এবং বেদান্ত পাঠের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ। বেদান্ত পাঠের মাধ্যমে মুমুক্ষু ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, ব্রহ্মই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা এবং জীবাত্মা ও দেহ অভিন্ন নয়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়।

রামনুজের মত

চার্বাকদের মতে চরম ইন্দ্রিয় সুখই মানবজীবনের একমাত্র পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাকরা সুখ এবং অর্থকেই একমাত্র কাম্যবস্তু মনে করেছেন। চার্বাকমতে মোক্ষ অবস্থা যদি হয় আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি, তাহলে এ অবস্থা লাভ কেবলমাত্র মৃত্যুতেই সম্ভব। চার্বাকগণ কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেহেতু মৃত্যুর পর আত্মার দেহমুক্তি মোক্ষ নয়। আত্মাই যখন নেই, তখন মৃত্যুর পর আত্মার দেহমুক্তির প্রশ্ন ওঠে না।

চার্বাক মত

৫। পরমার্থলাভের বিভিন্ন পথ: কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি (Different paths of realisation of the supreme end : Pathways of action, knowledge and devotion) :

একমাত্র চার্বাক দার্শনিক ছাড়া প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই মোক্ষ বা মুক্তিকেই মানবজীবনের পরমার্থরূপে নির্দেশ করেছেন। এই মুক্তির উপায় হিসেবে তিনটি পথের কথা বলা হয়েছে—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। তাই শাস্ত্রে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই তিনপ্রকার সাধনপথ সুপরিচিত। কর্ম শব্দে বোঝায় 'স্মৃত্যুক্ত' নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম এবং দেবদেবীর পূজার্চনাদি, আর জ্ঞান বলতে কেউ বোঝেন অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান, কেউ বোঝেন জীবেশ্বরে ভেদজ্ঞান, কেউ বা বোঝেন ভেদাভেদ জ্ঞান। আমরা এবার এই তিন প্রকার সাধন পথের সংক্ষিপ্ত আলোচন করব :

তিনটি সাধন মার্গ—
কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

(ক) **কর্মমার্গঃ** ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিকাশে বেদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। বেদের চারভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ নিয়ে কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে বিবিধ যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে এবং এই যাগযজ্ঞ সম্পাদনকেই পুরুষার্থ বলা বলা হয়েছে। দর্শনসমূহের মধ্যে জৈমিনিসূত্র বা পূর্বমীমাংসায় কর্মমার্গ এবং ব্যাসসূত্র বা উত্তর-মীমাংসায় জ্ঞানমার্গ বিবৃত হয়েছে।

বৈদিক সভ্যতা প্রধানতঃ ক্রিয়াকলাপের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে বেদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বেদে তত্ত্ববিচার এবং দার্শনিক চিন্তাধারার অভাব ছিল না। তবে বেদে কর্মই প্রধান চিন্তা, তত্ত্ববিচার তার অঙ্গমাত্র এবং তার স্থান গৌণ। বেদের ব্রাহ্মণভাগ যাগযজ্ঞের বিস্তৃত বিধি ও নিয়মে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বর্ণিত এই সব বিধি-নিয়মের বিরোধিতা দূরীকরণ ও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য জৈমিনিসূত্র বা পূর্ব-মীমাংসা গ্রন্থ প্রণীত হয়। এই পূর্ব-মীমাংসারই অপর নাম কর্ম-মীমাংসা। মীমাংসা দর্শন পরবর্তীকালের, কিন্তু কর্মমার্গ সবচেয়ে প্রাচীন। বর্তমানে কর্মমার্গ বলতে উপরিউক্ত আচার-অনুষ্ঠানকেই বোঝায়।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে যাগযজ্ঞের বিধি

মীমাংসকরা বেদের কর্মকাণ্ডের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রাচীন মীমাংসকদের মতে স্বর্গলাভই জীবের পরমার্থ। স্বর্গ অনন্ত সুখের আলয়। বেদবিহিত যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্গ ও অমৃতত্ব লাভ হয়। যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানই জীবের একমাত্র ধর্ম—কারণ তাই হল বেদের আজ্ঞা। বেদ নিত্য, স্বতঃপ্রমাণ এবং অপৌরুষেয়—'কর্ম তার বাহ্য অভিব্যক্তি, কর্ম তার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। বেদবিহিত কর্মই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। পূর্ব-মীমাংসা বিশ্বাস করে যে, কর্ম সর্বশক্তিমান এবং কেউ কর্মের শক্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

মীমাংসকদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা

মীমাংসকদের মতে কর্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য[1]। মীমাংসকদের মতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম বাধ্যতামূলক এবং এই কর্ম বেদবিহিত বলেই সম্পাদন করতে হবে, অন্য কোন কারণে নয়।

কর্মবাদীগন পরমার্থ লাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কর্মবাদীদের মতে বেদের কর্মকাণ্ডই সার্থক। যাগযজ্ঞাদিই প্রকৃত ধর্ম, স্বর্গই

1. শ্রেণীবিভাগের বিস্তারিত আলোচনার জন্য ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ দ্রষ্টব্য।

একমাত্র পুরুষার্থ, তাতেই সব দুঃখনিবৃত্তি। এ ছাড়া, ঈশ্বরতত্ত্ব বলে কিছু নেই। কাজেই যাগযজ্ঞই বড় কথা, আর সব মিথ্যা।

কর্ম বলতে সেকালে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্মই বোঝাত। গীতা কর্মের অর্থ সম্প্রসারিত করে, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত করে মীমাংসকের স্বর্গপ্রদ কাম্যকর্মকে মোক্ষপ্রদ বিশুদ্ধ নিষ্কাম কর্মে পরিণত করল। গীতায় নিষ্কাম কর্মসাধনের কথা বলা হয়েছে। জীব অনাসক্তভাবে কর্মের ফলাফলে উদাসীন হয়ে, নির্দ্বন্দ্ব ও সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে এবং ঈশ্বরে সর্ব কর্মফল সমর্পণ করে যদি কর্ম করে, তবে সে কর্মে কোন বন্ধন হয় না।

গীতার নিষ্কাম কর্ম

জ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ কেউই কর্মকে মোক্ষপ্রদ বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে কর্মত্যাগ করে জ্ঞানমার্গে বিচরণ করলেই মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু গীতার মতে দেহধারী জীব একেবারেই কর্মত্যাগ করতে পারে না। প্রকৃতির গুণে বাধ্য হয়ে সকলকেই কর্ম করতে হয়। কর্ম যখন করতেই হবে তখন অনাসক্ত ভাবে কর্ম করাই উচিত; কারণ অনাসক্ত হয়ে কর্মানুষ্ঠান করলে মোক্ষলাভ করা যায়।

প্রশ্ন হল, কর্মযোগ কিভাবে মোক্ষলাভে সহায়ক হয়? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কর্মযোগ আত্মশুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে কর্মযোগীকে মোক্ষের পথে চালিত করে। কর্মযোগীগণ ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম করে থাকেন। নিরাসক্তভাবে কর্ম সম্পাদন করার জন্য কর্মযোগীর অহংভাব বিলুপ্ত হয়, যার ফলে তাঁর আত্মা, দেহ ইন্দ্রিয়ের প্রভাবমুক্ত হয়ে শুদ্ধ চেতনারূপে প্রকাশিত হয়।

কিভাবে কর্মযোগ মোক্ষপ্রদ হয়

কর্মমার্গ মোক্ষপ্রদ হলেও খুব সহজ মার্গ নয়। এই মার্গ খুবই কঠিন। কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক কামনা-বাসনামুক্ত হয়ে, হর্ষবিষাদশূন্য হয়ে বিশেষ করে, অহংভাব বর্জন করে কর্ম করা খুবই কঠিন। এই কারণে অনেকের মতে উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

কর্মমার্গ কঠিন পথ

কর্মযোগের পথে যেসব বাধা দেখা দেয় তিনভাবে সেগুলিকে দূর করা যেতে পারে। প্রধানতঃ, রাজযোগের দ্বারা, বিশেষ করে, যম, নিয়ম ও প্রত্যাহারের মাধ্যমে বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে অপসারিত করে। যোগাভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তির অহংভাব বিদূরিত হয় এবং ব্যক্তি আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহংকার থেকে পৃথক শুদ্ধ চেতন সত্তারূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ব্যক্তিকে রিপুর দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করতে

কর্মযোগের পথে বাধা দূর করার উপায়

এবং ইন্দ্রিয়কে ঈশ্বরাভিমুখী করতে সমর্থ করে। ঈশ্বরে চিত্ত স্থির করতে পারলেই, অনন্য ভক্তিযোগে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করলেই, ইন্দ্রিয় বিষয়ে রাগ, দ্বেষ লোপ পায়, কামনা দূর হয়। সর্বশেষে আত্মতত্ত্বের স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মতত্ত্বের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হয় এবং কর্মযোগীকে ইন্দ্রিয় দমন ও অহংভাব বর্জন করতে সমর্থ করে। কাজেই ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ কর্মযোগের পক্ষে সহায়ক।

(খ) **জ্ঞানমার্গ:** বৈদিক ধর্মের দুটি প্রধান শাখা—কর্ম ও জ্ঞান বা প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ। জ্ঞানবাদীরা মনে করেন, জ্ঞানের পথই শ্রেয়ঃ পথ, কর্মের পথ নয়। তাঁরা মনে করেন যে, পরমেশ্বরের জ্ঞান ছাড়া কেবল কর্মদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় না।

সকল প্রকার কর্মই বন্ধনের সামিল

নামরূপাত্মক দৃশ্য প্রপঞ্চের অতীত যে নিত্য, শাশ্বত, অক্ষয়, অব্যয়, অনাদিতত্ত্ব তাই পরমতত্ত্ব, তাই ব্রহ্ম। জ্ঞানযোগে তাকেই জানতে হবে। আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক। জীব মায়ামুক্ত হলে এই একত্ব-এর জ্ঞান লাভ করে। এই হল প্রকৃত জ্ঞান। একেই আত্মজ্ঞান, ব্রহ্ম-আত্মার ঐক্য জ্ঞান, পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক বা ভেদজ্ঞান, কৈবল্য, মুক্তি প্রভৃতি নানা কথায় ব্যক্ত করা হয়েছে। জ্ঞানেই মুক্তি, কর্মে নয়। কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানবাদীদের প্রধান আপত্তি হল সদসৎ, সুকৃতি দুষ্কৃতি সব রকম কর্মই বন্ধনের কারণ। কর্মদ্বারা জীব বদ্ধ হয়, জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়। সে কারণে পারদর্শী যতিগণ কর্ম করেন না।[1] সুতরাং কর্মমার্গ মুক্তিপ্রদ নয়।

কর্মমাত্রই দোষমুক্ত বা বন্ধনের কারণ। কর্মফলে দেহধারণ, আবার দেহধারণ হলেই কর্ম। এই জন্ম-কর্মচক্রের নিবৃত্তি নেই। কাজেই কিভাবে জীব এই কর্মচক্র থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে? জ্ঞানবাদীরা বলেন, আত্মজ্ঞান ভিন্ন কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না। কেউ কেউ আত্মা-অনাত্মার বিচার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারের কথা বলেন।

অনেকের মতে মোক্ষলাভের জন্য যে সব পথ স্বীকৃত তার মধ্যে জ্ঞানের পথই সবচেয়ে কঠিন। বস্তুতঃ, অন্যান্য পথগুলি অতিক্রম করে এলেই মুমুক্ষু ব্যক্তি

মতান্তরে জ্ঞানমার্গ ই কঠিনতম মার্গ

এই পথ অনুসরণের সামর্থ্য অর্জন করে। তবে এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে যে, অন্যান্য মোক্ষমার্গের সঙ্গে জ্ঞানমার্গের বিরোধিতা বর্তমান। তবে জ্ঞানবাদীদের মতে জ্ঞানমার্গ সব মার্গেরই শ্রেষ্ঠ মার্গ এবং সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে।

---

1. কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে
তস্মাৎ কর্ম ন কুর্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ। —মহাভারত

মোক্ষ লাভের জন্য জ্ঞানযোগ যে জ্ঞানের কথা বলে, সে জ্ঞান হল পরমতত্ত্বের জ্ঞান। এ জ্ঞান সাধারণ বিচারমূলক জ্ঞান নয়, সত্যের অপরোক্ষ অনুভব বা সাক্ষাৎ উপলব্ধি। পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য যোগের আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা সব ভারতীয় দর্শনেই স্বীকৃত। আত্মশুদ্ধি না হলে পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা যায় না। আত্মশুদ্ধি লাভের প্রশস্ত পথ হল যোগসাধনা। তারপর কর্মফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে ব্যক্তিকে সব কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। সর্বশেষে প্রয়োজন ঈশ্বরে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করা। কাজেই জ্ঞানমার্গের জন্য কর্ম ও ভক্তিমার্গের প্রয়োজন আছে।

জ্ঞানমার্গের জন্য কর্মমার্গের ও ভক্তিমার্গের আবশ্যকতা

ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা দর্শন (পূর্বমীমাংসা) কর্মবাদী, অন্যান্যগুলি জ্ঞানবাদী। অদ্বৈত বেদান্তমতে কর্ম অজ্ঞানতাপ্রসূত। কাজেই কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় হয় না এবং নির্গুণ ব্রহ্মে ভক্তিও সম্ভব নয়। কাজেই নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম ও ভক্তির স্থান নেই। শঙ্কর কর্মযোগ স্বীকার করেন না। কর্মদ্বারা মোক্ষ হয়, এ মতও স্বীকার করেন না।

কর্ম সম্পর্কে অদ্বৈত বেদান্ত মত

ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জীব এই জন্মেই মোক্ষ লাভ করতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মজ্ঞান সাধারণ বিচারমূলক জ্ঞান নয়। সাধারণ বিচারজ্ঞানকে বুদ্ধি নামে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধি হল অপূর্ণ ও অপরিপক্ব, তার সাহায্যে ব্রহ্মকে জানা যায় না। 'এর জন্য প্রয়োজন অসাধারণ বিচারশক্তি বা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা বুদ্ধির চরমোৎকর্ষ, পূর্ণতম বিকাশ, প্রকৃষ্ট রূপ, উচ্চতম অবস্থা ও শ্রেষ্ঠ ফল।' এই প্রজ্ঞার সহায়তায় সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মকে জানা যায়। 'ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে জানতে হবে।' নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদে কর্মের স্থান চিত্তশুদ্ধি পর্যন্ত, ভক্তির স্থান নেই।

ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রবণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম সোপান। এর অর্থ গুরুর কাছ থেকে উপনিষদের বাণী শ্রবণ। দ্বিতীয় সোপান মননের অর্থ—যৌক্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এই উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি। তৃতীয় ও চরম সোপান নিদিধ্যাসনের অর্থ—বুদ্ধি অনুমোদিত তত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান। এরই মাধ্যমে পরমজ্ঞান লাভ হয়। এরই নাম প্রজ্ঞা। এরই মাধ্যমে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ দর্শন ও সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। শঙ্করের মতে মোক্ষ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল নয়। কর্ম জীবকে জ্ঞানলাভের জন্য প্রস্তুত করে এবং জ্ঞানলাভের পথে যে অন্তরায় সেগুলি দূর করতে জীবকে সাহায্য করে।

ব্রহ্মজ্ঞানের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ

যদিও জ্ঞানবাদীরা জ্ঞানকেই মুক্তির উপায় রূপে বর্ণনা করে, তবু উপনিষদের অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচার শুরু হলে এই জ্ঞানমার্গেও মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং বিবিধ দর্শনের উৎপত্তি ঘটে।

জ্ঞানবাদীদের মতে আলোক এবং অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গতি ও স্থিতি যেমন একত্র অবস্থান করতে পারে না, কর্ম ও জ্ঞানও সেরূপ একত্রে থাকতে পারে না। কর্ম মায়া বা অজ্ঞানতাসম্ভূত। কাজেই কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগ সম্ভব নয়।

(গ) **ভক্তিমার্গঃ** মীমাংসকদের কর্মযোগে, অদ্বৈত বেদান্তীর জ্ঞানযোগে এবং পতঞ্জলির ধ্যানযোগে বা রাজযোগে ভক্তির সম্পর্ক নেই। ঈশ্বরতত্ত্ব অতি গৌণ এবং প্রায় অস্বীকৃত।

বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মবাদে ভক্তির সমাবেশ হয় না। নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যাঁকে জগৎস্রষ্টা, ঈশ্বর বা প্রভু, কোন ভাবেই বর্ণনা করা যায় না—তাকে ধারণা করা মানুষের পক্ষে কঠিন এবং তার সঙ্গে ভাবভক্তির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ পরমতত্ত্বকে যতখানি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে চায় ততখানি বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করতে চায় না। তাই এসে পড়ে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কল্পনা এবং ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের কথা।

ভক্তিমার্গে সগুণ ঈশ্বরের কল্পনা

দর্শনের দৃষ্টিতে যা চরমতত্ত্ব, ধর্মের দৃষ্টিতে তাই ভগবান বা ঈশ্বর। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই ভক্তের ভগবান, জীবের উপাস্য দেবতা। বস্তুতঃ উপনিষদে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ বর্ণনাই আছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের মন্ত্রাদির বক্তা শাণ্ডিল্য ঋষিকেই সগুণ উপাসনা বা ভক্তিমার্গের প্রবর্তক বলা হয়। বস্তুতঃ, ভক্তিমার্গ বেদোপনিষৎ থেকেই উদ্ভূত এবং পরে অবতারবাদ ও প্রতিমা পূজার প্রবর্তন হলে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে। পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব, প্রতীকোপাসনা বা মূর্তিপূজা এবং ইষ্টমূর্তির নানাবিধ ধ্যানধারণা প্রভৃতি ভক্তিমার্গের আবশ্যক অঙ্গ।

ভক্তিমার্গের উপাসক সব সম্প্রদায়ই অনির্দেশ্য ব্রহ্মতত্ত্বের বদলে ভক্তের ভগবানরূপে একটি উপাস্য বস্তু স্বীকার করেন। ভক্তিমার্গে অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য নির্গুণ তত্ত্বের কোন উপযোগিতা নেই। ভক্তিমার্গের উপাসকদের মতে ভগবান সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই ভগবানই নির্গুণভাবে অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অক্ষয় ব্রহ্ম ; সগুণভাবে তিনিই বিশ্বরূপ, জগতের সৃষ্টিকর্তা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, প্রভু, সখা, শরণ ও সুহৃদ। তিনি প্রকৃতির অধীশ্বর, বিশ্বপ্রকৃতির সকল জাতির, সকল কর্মের নিয়ামক।

শ্রবণ-মননাদি জ্ঞানমার্গের সাধনা, প্রাণায়ামাদি যোগমার্গের এবং উপাসনা ভক্তি-মার্গের সাধনা। উপাসনাই ভক্তিমার্গের প্রাণ। ভক্তিবাদীরা মনে করেন জ্ঞানমার্গ ক্লেশজনক; কিন্তু ভক্তিমার্গে যেহেতু প্রত্যক্ষ ও ব্যক্ত ঈশ্বরের উপসনা করা হয়, সেহেতু এই মার্গ সুখসাধ্য। ভক্তিমার্গে বলা হয় আত্মজ্ঞান পরমাত্মা শ্রীভগবান থেকেই আসে। ভগবানে চিত্ত সমর্পণে, অনন্য ভক্তিযোগে ভগবানে আত্মসমর্পণে জীবের বদ্ধদশা দূর হয়। ব্রহ্মবাদীদের মতে মোক্ষই চরম পুরুষার্থ। মোক্ষ অর্থে ব্রহ্মে লয়, ভক্তিবাদীদের মতে ঈশ্বরপ্রাপ্তিই মোক্ষ। মুক্ত পুরুষের মতো স্বরূপ বিলোপের আশঙ্কা ভক্তের নেই।

ভগবানের স্বরূপ

উপাসনাই ভক্তিমার্গের প্রাণ

মোক্ষলাভের জন্য স্বীকৃত সাধনমার্গগুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে ভক্তিমার্গকে অনেকে সহজতর ও সুখসাধ্য বলে মনে করেন। অনুরাগ বা ভালবাসা মানুষের একটি স্বাভাবিক আবেগ এবং এই স্বাভাবিক আবেগের ওপরই ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত। ভক্তিমার্গের ক্ষেত্রে এই অনুরাগ ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়। ভক্তিযোগের প্রস্তুতির জন্য রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের আবশ্যকতা অনেকেই স্বীকার করেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জাগরিত হতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ব্যক্তির মনে তখনই জাগ্রত হয় যখন ব্যক্তি জানে ও বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর করুণাময় এবং জীবের কল্যাণকামী। যখন ব্যক্তির দেহ-মন শুচি হয়ে ওঠে তখনই শাস্ত্রবাক্য পাঠ করে এবং গুরুর উপদেশ শ্রবণ করে তার মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগ্রত হয়। কাজেই ভক্তিমার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গকে উপেক্ষা করতে পারেন না।

ভক্তিমার্গের জন্য অন্যান্য মার্গের আবশ্যকতা

অনুরাগই ভক্তির স্বরূপ, ভক্তি কোন লৌকিক চিত্তবৃত্তি নয়। এ হল 'পরম দিব্য-ভাব যা ভগবৎকৃপালভ্য।' ভক্তিশাস্ত্রে নয় প্রকার ভক্তির সাধন উল্লিখিত আছে। যেমন—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখা, আত্মনিবেদন। ভগবানই একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র অগতির গতি—এই ভাব অবলম্বন করে ভগবানে আত্মসমর্পণই ভক্তিমার্গের একটি প্রধান ভাব। ভক্তিমার্গের আর একটি উচ্চতর ভাব 'তুমিই আমার'। একেই বলা হয় প্রেমভক্তি—ব্রজের ভাব। এ হল বিশুদ্ধ প্রেম। জ্ঞানমিশ্র ভক্তি তাই ভক্তি সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। জ্ঞানমিশ্র ভক্তি থেকে প্রেমভক্তিতে উত্তীর্ণ হতে গেলে চিত্তকে ঐশ্বর্য জ্ঞানমুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ, 'শুদ্ধাভক্তি'ই প্রেমভক্তির সিংহদ্বার, শুদ্ধাভক্তি আনে প্রেম যা ভক্তির শেষ কথা। শুদ্ধাভক্তির পরেই আসে প্রেমভক্তি। ভক্তিবাদীদের বক্তব্য, 'ঈশ্বরে শরণ নাও, তাঁকে কাতর প্রাণে ডাক।' ভক্ত যদি সর্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণ নেন তাহলে

অনুরাগ ভক্তির স্বরূপ

তিনি মায়ামুক্ত হয়ে ভগবানকে পেতে পারেন। প্রেমভক্তির পথের প্রথম কথাই হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা থেকে ক্রমশঃ রুচি, রাগ, ভাব ও নির্মল প্রেমের বিকাশ। প্রেমভক্তির গাঢ়তানুযায়ী বিভিন্ন স্তর বর্তমান—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, পিতৃ বা মাতৃভাব ও মধুর। এর প্রত্যেকটিই উত্তরোত্তর মহত্তর।

প্রেমভক্তির স্বরূপ

ভক্তির আর একটি উন্নত স্তর আছে যেটি হল পরাভক্তির বা প্রেমের স্তর। দীর্ঘকাল যাবৎ ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তি এই স্তরে উন্নীত হয়। এই স্তরে মোক্ষকামী ব্যক্তি নিজের জন্য কিছুই কামনা করে না, ঈশ্বরই তার একমাত্র ধ্যানের বস্তু হয়, এবং সে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। একেই বলা হয় আর্তপ্রপত্তি। ভগবৎ শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ যোগ ভক্তিমার্গের সার কথা।

শরণাগতির লক্ষণ

শ্রীরামানুজ প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মুখ্য সিদ্ধান্ত হল অবিদ্যার চরমতত্ত্ব এবং ধর্মের ঈশ্বর অভিন্ন। তিনি নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের ভেদ অস্বীকার করেন। ব্রহ্ম নির্গুণ নন। ব্রহ্ম ঈশ্বর এবং তাঁর গুণাবলী অসংখ্য। রামানুজের সাধন পথ ভক্তির পথ। তাঁর মতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাকে রামানুজ বলেছেন আত্মপ্রপত্তি, এর অভাব ঘটলে ঈশ্বরের কৃপালাভ করা যায় না। ঈশ্বরে প্রপত্তি বা আত্মনিবেদনই মুক্তির সর্বাপেক্ষা সহজ এবং স্বাভাবিক উপায়। ভক্তি ও শরণাগতিই জীবের মুক্তির একমাত্র উপায়।

রামানুজের অভিমত

মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীমধ্বাচার্য, যিনি ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের দ্বৈতমত ব্যাখ্যা করেন, মনে করেন, ঈশ্বর ও জীব সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ঈশ্বরের কৃপাই মুক্তিপথের একমাত্র উপায়।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীনিম্বার্ক তাঁর প্রচারিত মত ভেদাভেদবাদে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সমালোচনা করে বলেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ নন। তিনি সমস্ত সৎগুণের আশ্রয়। ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং ভগবান। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সকলের আদি কারণ। ভক্তি এবং ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মলাভ হতে পারে।

বল্লভ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীবল্লভাচার্যের প্রচারিত মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হয়। তিনিও মোক্ষলাভের জন্য ভক্তিমার্গকে যথার্থ সাধনপথ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। বল্লভের মতে কৃষ্ণই চরম সত্তা। তিনিই উপনিষদের ব্রহ্ম এবং ভাগবতের পরমাত্মা। বল্লভ চরম সত্তাকে সাকার ব্রহ্ম নামে অভিহিত করেছেন। বল্লভের দর্শন ধর্মমূলক এবং তাঁর মতে অদ্বৈতের সঙ্গে ভক্তির কোন বিরোধ নেই।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদ নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের সাধনপথ জ্ঞানকর্মবিবর্জিত বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ। শ্রীচৈতন্য ভক্তিহীন জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ সম্পূর্ণ পরিহার করে প্রেমভক্তি ও হরিনাম প্রচার করার পক্ষপাতি।

মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন সাধনপথের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই, বরং তারা পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক। সবকটি সাধনপথের একই লক্ষ্য—মোক্ষ বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি।

বিভিন্ন সাধনপথগুলিও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রাজযোগের আত্মশুদ্ধি এবং আত্মানুশীলন অন্যান্য যোগের পক্ষে অত্যাবশ্যক। আবার ঈশ্বরের ধ্যান ও ঈশ্বরে ভক্তি রাজযোগের যোগাভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। রাজযোগে যে ধ্যান শিক্ষা দেওয়া হয়, তা ভক্তি-যোগের এবং জ্ঞানযোগের অন্তর্ভুক্ত। আবার আত্মার যথাযথ স্বরূপের জ্ঞান এবং ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ কর্মযোগকে সহজসাধ্য করে তোলে। আবার আত্মার ও ঈশ্বরের জ্ঞান এবং নিরাসক্তভাবে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন ভক্তিযোগের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সর্ব-শেষে জ্ঞানযোগের জন্য অন্যান্য যোগের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। কাজেই বিভিন্ন সাধনপথের মধ্যে ঐক্য বর্তমান এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় আপাতবিরোধী জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সুসঙ্গত সমন্বয় ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। গীতা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে সম্পূর্ণ সাধনতত্ত্ব প্রচার করেছেন। এই হল গীতার পূর্ণাঙ্গ যোগ। গীতার সাধনমার্গকে ভক্তিযোগ বলা হয়। এতে কর্ম, জ্ঞান ও ধ্যান ভক্তিযোগের অঙ্গস্বরূপে গৃহীত হয়েছে।

গীতা ভাগবতের পুরুষোত্তম তত্ত্বে নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ঈশ্বরবাদের সমন্বয় করেছেন।

গীতার ভক্তিযোগ

নির্গুণ ব্রহ্ম আর সগুণ ব্রহ্ম—শ্রীভগবানই সব। নির্গুণ, সগুণ, দু-ই তার বিভাগ। গীতায় শ্রীভগবান নির্গুণ হয়েও সগুণ। নিরাকার হয়েও সাকার। শ্রীভগবানই অক্ষয় অব্যক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব। ভগবানপ্রাপ্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ গীতার উপদেশের সারকথা।

ধ্যান, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—গীতা এই চারটি বিভিন্ন সাধনপথের উল্লেখ করেছে এবং গীতার জ্ঞানকর্মমিশ্র ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য থাকলেও এর যে কোন একটি মার্গে সাধন

উপসংহার

আরম্ভ করলে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়, এই কথা বলে। বস্তুতঃ, গীতার এই সিদ্ধান্তই অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—তিন মার্গেরই শেষ ফল অদ্বয় তত্ত্বোপলব্ধি। পার্থক্য যেটুকু সেটুকু শুরুতে, সাধনাবস্থায়। অভীষ্ট লক্ষ্য সব ক্ষেত্রেই এক।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(A brief sketch of the systems of Indian Philosophy)

১। চার্বাক দর্শন : (The Chārvāka Philosophy) :

ভারতীয় দর্শনে জড়বাদী দর্শন বলতে আমরা চার্বাক দর্শনকেই বুঝে থাকি। জড়বাদ বলতে আমরা সেই দার্শনিক মতবাদই বুঝি, যে মতবাদ অনুযায়ী অচেতন জড়েরই একমাত্র সত্তা আছে এবং এই জগতের সব কিছুই জড় থেকে উদ্ভূত, এমন কি প্রাণ এবং মনও। চার্বাক দর্শন অতি প্রাচীন দর্শন। বেদ, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য এবং রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যে এই মতবাদের উল্লেখ দেখা যায়।

চার্বাক দর্শন জড়বাদী দর্শন

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দর্শন এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। চার্বাক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি যদিও পরবর্তীকালে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেনি, তবু অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় নিজ দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চার্বাকমত খণ্ডন করেছেন।

চার্বাক দর্শন সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া না যাওয়াতে, 'চার্বাক' শব্দের মূল অর্থকে কেন্দ্র করে মতভেদ দেখা যায়। কারও কারও মতে চার্বাক নামে একজন ঋষিই চার্বাক দর্শনের প্রবর্তক এবং তাঁরই নামানুসারে এই দর্শনের নাম চার্বাক দর্শন হয়েছে। আবার কারও কারও মতে 'চার্বাক' কথাটির অর্থ চারু + বাক্ বা মধুর কথা। 'যতদিন বাঁচ সুখেই বাঁচ, ঋণ করেও ঘি খাও।' এই সব মধুর কথা চার্বাক দর্শন সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করত বলেই এই দর্শনের নাম চার্বাক দর্শন।

চার্বাক শব্দের বিভিন্ন অর্থ

কেউ কেউ মনে করেন, লোকপুত্র বৃহস্পতিই জড়বাদের প্রবর্তক। 'চার্বাক' শব্দের মূল অর্থ যাই হোক না কেন, বর্তমান যুগে চার্বাক বলতে আমরা জড়বাদী নাস্তিককেই বুঝে থাকি। সাধারন মানুষের চিন্তা ও ভাবধারা এই মতবাদের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে বলে এই দর্শনকে 'লোকায়ত' দর্শন নামেও অভিহিত করা হয়।

যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় 'প্রমা' এবং যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালীকে বলা হয় 'প্রমাণ'।

চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। চার্বাকরা 'অনুমান' (Inference) এবং 'শব্দ'কে (Testimony) প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন না। অনুমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা চলে না; কেননা অনুমান হল ব্যক্তিজ্ঞাননির্ভর। 'যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি'—ধূম ও বহ্নির মধ্যে এই নিয়ত ও অব্যভিচারী সম্বন্ধ বর্তমান থাকলেই, প্রত্যক্ষগোচর ধূমের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষগোচর বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা সম্ভব। ধূম এবং বহ্নি বা অনুমানের হেতু ও সাধ্যের মধ্যে এই নিয়ত ও অব্যভিচারী সম্বন্ধকেই ব্যপ্তিজ্ঞান বলে। চার্বাক মতে এই ব্যপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। কেননা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধূমের সঙ্গে বহ্নির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা গেলেও, সর্বকালে এবং সর্বদেশে উভয়ের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান অন্য অনুমানের সহায়তায় জানা যেতে পারে না, কেননা তাহলে সেই অনুমান যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ওপর নির্ভর সেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে অন্য অনুমানের সহায়তায় জানতে হবে। ফলে, অনবস্থা দোষ (fallacy of infinite regress) ঘটবে। এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন থেকে লাভ করা যেতে পারে, একথাও বলা চলে না, কেননা, কোন ব্যক্তি যে বিশ্বাসযোগ্য, সে জ্ঞানই অনুমাননির্ভর। তাছাড়া, অনুমান করার জন্য যদি সব ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনের ওপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে কারও পক্ষেই নিজে নিজে অনুমান করা সম্ভব হবে না। এছাড়াও অনুমানলব্ধ জ্ঞান সব সময়ই যথার্থ হয় না; কোন কোন ক্ষেত্রে যথার্থ হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। সুতরাং, অনুমান প্রমাণরূপে স্বীকৃত হতে পারে না।

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ

অনুমান ও শব্দ প্রমাণ নয়

শব্দ (Testimony) হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শব্দ, প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না, কেননা শব্দ অনুমাননির্ভর। কোন ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা তার আচার ব্যবহার, কথাবার্তা বা চরিত্র থেকে অনুমান করতে হয়। কাজেই অনুমানই যখন প্রমাণ নয় তখন শব্দ কিরূপে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হতে পারে? বেদের বচনও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা, বেদ ধূর্ত ও ভণ্ড ব্রাহ্মণদেরই রচনা যারা বিশ্বাসপ্রবণ, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রতারিত করে জীবিকা নির্বাহ করত।

শব্দ প্রমাণ নয়

বেদ বিশ্বাসযোগ্য নয়

যেহেতু 'অনুমান' এবং 'শব্দ' প্রমাণরূপে গৃহীত হতে পারে না সেহেতু প্রত্যক্ষই (Perception) একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষই যদি একমাত্র প্রমাণ হয় তাহলে যাকে প্রত্যক্ষ করা চলে তারই সত্তা স্বীকার করে নিতে হয়। ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক এবং অদৃষ্টশক্তি প্রভৃতির সত্তাকে বিশ্বাস স্থাপন করা

যা প্রত্যক্ষগোচর—তারই সত্তা আছে

যায় না, কারণ এগুলির কোন সত্তা নেই। বস্তুতঃ, জড়বস্তুরই সত্তা আছে। অতীন্দ্রিয় বস্তু যেহেতু প্রত্যক্ষগোচর নয় সেহেতু তার কোন সত্তা নেই।

চার্বাকরা চারটি মহাভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন

চার্বাকরা ক্ষিতি (earth), অপ্ (water), তেজঃ (fire) ও মরুৎ (air)—এই চারটি মহাভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যেহেতু ব্যোমকে (ether) প্রত্যক্ষ করা যায় না সেহেতু এর কোন অস্তিত্ব নেই। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য চারটি মহাভূতের দ্বারাই জগৎ গঠিত। কেবলমাত্র জড়বস্তু নয়, জীবদেহও এই চারটি মহাভূতের সৃষ্টি। চার্বাকমতে চেতনা যেহেতু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, সেহেতু তার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। চেতনা দেহের ধর্ম, কোন অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সত্তা অর্থাৎ আত্মার ধর্ম নয়। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত কোন অতীন্দ্রিয় আত্মার অস্তিত্ব নেই। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ—এই চারটি মহাভূতের কোনটিতেই যখন চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই তখন এই মহাভূতের সংমিশ্রণে যে দেহ গঠিত হয় তাতে চৈতন্যের আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব? তার উত্তরে চার্বাকরা বলেন যে—পান, সুপারি ও চুন এদের কোনটির মধ্যেই কোন লাল আভা নেই, তবু এদের একসঙ্গে চর্বন করলে একটা লাল আভা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ যদিও চৈতন্যধর্মবিশিষ্ট নয়, তবু নির্দিষ্ট পরিমাণে এদের সংমিশ্রণে যে জীবদেহ গঠিত হয় তাতে চৈতন্যরূপ গুণের আবির্ভাব ঘটে। চৈতন্য হ'ল উপবস্তু, দেহ ভিন্ন চৈতন্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। যেহেতু দেহ ভিন্ন চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই, সেহেতু আত্মার অমরতার প্রশ্ন অবান্তর। দেহের মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। জন্মান্তর, পরলোক, স্বর্গ, নরক কতকগুলি অর্থহীন শব্দ মাত্র।

চেতনার অস্তিত্ব আছে কিন্তু আত্মার কোন সত্তা নেই

চৈতন্য দেহের ধর্ম

যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয় সেহেতু ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। জড় উপাদানের দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট এবং এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কোন জগৎ-স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ—এই চারটি জড় উপাদান নিজ নিজ অন্তর্নিহিত স্বভাবধর্ম-বশতঃ ক্রিয়া করে এবং তার ফলে এই জগৎ ও সব জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম অনুযায়ী এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং জগৎ জড় উপাদানের স্বাভাবিক পরিণতি।

ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই

মীমাংসকদের মতে পুরুষার্থ হ'ল স্বর্গসুখভোগ যা বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লাভ করা যায়। কিন্তু চার্বাকরা মৃত্যুর পর কোন জীবনের অর্থাৎ আত্মার

স্বর্গসুখভোগ জীবনের পুরুষার্থ নয়

অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বলে মৃত্যুর পর স্বর্গসুখভোগের বিষয়টি মেনে নেন না। স্বর্গ ও নরক—ধূর্ত ও ভণ্ড পুরোহিতদেরই সৃষ্টি। মোক্ষকেও অনেক ভারতীয় দার্শনিক জীবনের পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। মোক্ষ বলতে কেউ কেউ মনে করেন, আত্মার বন্ধনমুক্তি এবং স্বরূপে অবস্থান। আবার কেউ কেউ মোক্ষ বলতে মনে করেন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। কিন্তু চার্বাকরা এর কোনটিই স্বীকার করেন না। আত্মারই যখন কোন সত্তা নেই, তখন তার বন্ধনমুক্তির কোন প্রশ্ন ওঠে না। আর মোক্ষ বলতে যদি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বুঝতে হয়, তা এ জগতে সম্ভব নয়। কেননা, দেহ থাকলেই সুখ ও দুঃখ থাকবেই। মৃত্যুতেই কেবলমাত্র দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব। মানবজীবনের পরম কাম্যবস্তু হ'ল সুখলাভ করা। সুখই মানুষের পরমকল্যাণ।

সুখলাভই কাম্যবস্তু

যথাসম্ভব দুঃখ পরিহার করাই মানবজীবনের লক্ষ্য

ইন্দ্রিয় সুখই মানুষের পরম পুরুষার্থ। সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশে থাকে বটে, কিন্তু সে কারণে সুখ অন্বেষণ থেকে বিরত হওয়া মূর্খতারই সামিল। ধান ছাড়িয়ে চাল করতে হয় বলেই কি ভাত না খেয়ে পারা যায়? কাঁটা আছে বলে কি লোক মাছ খাবে না? চরম ইন্দ্রিয় সুখই মানবজীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু। চার্বাকরা ইন্দ্রিয় সুখকে মানসিক সুখের তুলনায় অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। **চার্বাকদর্শন স্থূল অসংযত আত্মসুখবাদের** (gross egoistic hedonism) **প্রচারক।** ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাকগণ সুখ এবং অর্থকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বা একমাত্র কাম্যবস্তু বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য সুখ হ'ল উদ্দেশ্য, অর্থ সুখলাভের উপায়মাত্র।

সুখ এবং অর্থই কেবলমাত্র পুরুষার্থ

চার্বাকরা বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানকে খুবই বিদ্রূপ করেছেন। স্বর্গ, নরক প্রভৃতির অস্তিত্ব অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই নরকযন্ত্রণা এড়াবার জন্য পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির কল্পনা মূর্খতা ছাড়া কি? পরলোকে সুখপ্রাপ্তির জন্য পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান অর্থহীন।

ভারতীয় দর্শনে চার্বাক দর্শনের স্থান

পরবর্তীকালে চার্বাক দর্শন বিশেষভাবে নিন্দিত হলেও ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে চার্বাক দার্শনিক মতবাদ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। চার্বাক দর্শনই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভারতীয় দর্শনকে বিচারবিযুক্তবাদের (dogmatism) হাত থেকে রক্ষা করেছে। চার্বাক দর্শন সংশয়বাদী (sceptic) দর্শন, কিন্তু চার্বাক দর্শনের সংশয়বাদ গতানুগতিক চিন্তাধারাকে বিনা

বিচারে স্বীকার করে না নিয়ে স্বাধীন চিন্তাধারার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পরবর্তীকালে অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করার সময় চার্বাক মত খণ্ডনে ব্রতী হয়েছে। সুতরাং, চার্বাক দর্শন জড়বাদী হলেও ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে এর অবদান অস্বীকার করা যায় না।

২। জৈন দর্শন (The Jaina Philosophy):

জৈন দর্শন খুবই প্রাচীন দর্শন এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে জৈন ধর্মের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর এই ধর্মের প্রচারক। সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর হলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হলেন বর্ধমান, যাঁর অপর নাম মহাবীর। তিনি ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ব্যক্তি এবং তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। বস্তুতঃ মহাবীরকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা বলে সাধারণতঃ ধারণা করা হয়। মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জিন্ শব্দের অর্থ জয়ী। জৈনরা তীর্থঙ্করদের জিন্ নামে অভিহিত করেন, কারণ এই সব তীর্থঙ্কর সাধনার দ্বারা রাগ, দ্বেষ, কামনা, বাসনা জয় করে মোক্ষলাভ করেছেন।

চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জৈন ধর্মের প্রচারক

জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। এই সকল তীর্থঙ্করদেরই তাঁরা সিদ্ধপুরুষ মনে করে উপাসনা করেন। এঁরা ছিলেন পূর্বে বদ্ধ পুরুষ, কিন্তু নিজ সাধনাবলে কর্মের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হয়ে মোক্ষলাভ করেছেন। তাই এঁরা হলেন মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষ। জৈনদের বিশ্বাস, প্রতিটি জীবই নিজ প্রচেষ্টায় জিন্দের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, মুক্ত ও অসীম আনন্দের অধিকারী হতে পারে।

তীর্থঙ্কররা সিদ্ধপুরুষ

কালক্রমে জৈন ধর্মাবলম্বীগণ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। জৈন ধর্ম ও দর্শনের মূলনীতিকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ই তীর্থঙ্করদের উপদেশ মেনে চলতেন, তবে ধর্মীয় আচার মেনে চলার ব্যাপারে দিগম্বরগণ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু শ্বেতাম্বরগণ উদারপন্থী।

জৈনসম্প্রদায়—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর

জৈনদের মতে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান পাঁচ প্রকার—মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল। ইন্দ্রিয় এবং মনের সাহায্যে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাকেই মতি বলা হয়। অন্তঃপ্রত্যক্ষ, বাহ্যপ্রত্যক্ষ, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা মতিজ্ঞানের অন্তর্গত। শাস্ত্র বা বিশ্বাস-যোগ্য ব্যক্তির বচন থেকে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা হল শ্রুত। জৈনদের মতে বেদ শব্দ প্রমাণ নয়। খুব দূরবর্তী ও সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান, যা কেবলমাত্র সাধনা ও অতীন্দ্রিয়

শক্তিপ্রভাবে জানা যায় তাকে অবধি বলে; যখন কোন ব্যক্তি সরাসরি অপরের মানসিক অবস্থাগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তখন তার জ্ঞানকে মনঃপর্যায় বলা হয়। যিনি অন্তর থেকে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি দূর করতে সক্ষম হন তিনিই জ্ঞানলাভের অধিকারী হতে পারেন। কর্মবন্ধন-মুক্ত সিদ্ধপুরুষগণ সর্বজ্ঞতা হেতু সকল কিছুর সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করেন, এই জ্ঞানকে বলা হয় কেবল জ্ঞান।

প্রমা পাঁচ প্রকার—মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল

জৈনদের মতে অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল জ্ঞান হল অপরোক্ষ, যেহেতু এই জ্ঞান ইন্দ্রিয় বা মনের মাধ্যমে লব্ধ না হয়ে সাক্ষাৎ ভাবে লব্ধ হয়। মতি ও শ্রুত পরোক্ষ জ্ঞান। মতি ও শ্রুত সাধারণ জ্ঞান এবং অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল অসাধারণ জ্ঞানের অন্তর্গত।

জ্ঞান দুপ্রকার—অপরোক্ষ ও পরোক্ষ

সাধারণভাবে জৈনগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ— এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন। চার্বাক মতানুযায়ী প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, কিন্তু জৈনগণ অনুমান ও শব্দকেও প্রমাণ-রূপে স্বীকার করায়, চার্বাক মত খণ্ডন করেন। জৈনরা বলেন যে, যদি চার্বাকদের বক্তব্য এই হয় যে, অনুমান ও শব্দ প্রমাণরূপে স্বীকৃত হতে পারে না, কেননা সেগুলি কখনও কখনও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, তাহলে অনুরূপ যুক্তিবলে একথা বলা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষও কখনও কখনও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যেমন—রজ্জুকে সর্পরূপে প্রত্যক্ষ করা বা শুক্তিকে রজত রূপে প্রত্যক্ষ করা। তাছাড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় বলে অনুমানলব্ধ জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয় ও সেহেতু অনুমান প্রমাণ হতে পারে না, এই সিদ্ধান্তও অনুমানের সাহায্যে করা হয়েছে। চার্বাকরা যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সত্তা অস্বীকার করেন তখন তাঁরা অনুমানেরই সাহায্য গ্রহণ করেন।[1] তাছাড়া, কোন কোন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে যথার্থ উপলব্ধি করে এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র যথার্থ কিনা তা প্রত্যক্ষ না করে যখন তাঁরা প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করেন। যেহেতু কোন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সব প্রত্যক্ষই প্রমাণ—এই সিদ্ধান্ত অনুমানের মাধ্যমেই লব্ধ। জৈনরা প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণরূপ স্বীকার করেন।

জৈনগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দপ্রমাণ স্বীকার করেন

অনুমান সম্পর্কে চার্বাক মত খণ্ডন

---

1. 'যা প্রত্যক্ষগোচর তারই সত্তা আছে।'
'ঈশ্বর প্রত্যক্ষগোচর নয়'
সুতরাং, ঈশ্বরের সত্তা নেই।'

জৈনদের মতে যে-কোন বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধর্ম আছে। কিন্তু অপূর্ণ মানুষ তার সীমিত জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা বিশেষ সময়ে বস্তুর বিশেষ একটি ধর্ম বা গুণকেই জানতে পারে। সব গুণগুলিকে জানা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। একমাত্র যেসব সিদ্ধপুরুষ কেবল জ্ঞানের অধিকারী, তাঁরাই সব গুণগুলিকে জানতে পারেন। কাজেই কোন একটি বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধর্মের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ বা ধর্ম সম্পর্কে আংশিক জ্ঞানকেই জৈনরা 'নয়' বলেছেন। ব্যবহারিক জীবনে আমাদের অবধারণ (Judgment)-গুলি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয় বলে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, সেই বিশেষ গুণ সম্পর্কে সত্য—একথা আমরা ভুলে যাই বলেই আমাদের মধ্যে এত মতবিরোধ। বস্তুতঃ, বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের জগৎ-ব্যাখ্যা বস্তুতঃ জগৎকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং, কোন অবধারণ (নয়) যে চরম সত্য নয়—একটা বিশেষ দিক দিক থেকে সত্য, এটুকু প্রকাশ করার জন্য প্রতিটি অবধারণের পূর্বেই 'স্যাৎ' বা 'একদিক' থেকে কথাটি জুড়ে দেওয়া উচিত। যেমন, ফুলটি হলদে না বলে বলা উচিত 'একদিক থেকে ফুলটি হলদে'। জৈনদের এই মতবাদই স্যাদ্‌বাদ নামে পরিচিত। আমাদের প্রতিটি অবধারণের সত্যতা যে শর্তাধীন এটুকু বোঝানোই স্যাদ্‌বাদের উদ্দেশ্য। জৈনদের মতে 'নয়' হল সপ্তভঙ্গী।

যে কোন বস্তুর অসংখ্য গুণ বা ধর্ম আছে

'নয়' (Naya)

স্যাদ্‌বাদ

জৈনমতে যে কোন বস্তুর অনন্ত ধর্ম আছে। এই ধর্ম দু'প্রকার—**ভাবাত্মক** (Affirmative) এবং **অভাবাত্মক** (Negative)। ভাবাত্মক ধর্ম হ'ল সেগুলি, যার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ বা প্রকৃতি নিরূপণ করা যায়; যেমন, মানুষের ক্ষেত্রে এই ভাবাত্মক ধর্ম হ'ল মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, জাতি, বর্ণ, গঠন, জন্মস্থান ইত্যাদি। মানুষের মধ্যে যে-ধর্মের অভাব থাকার জন্য তাকে অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক করা যায় সেগুলি হ'ল অভাবাত্মক ধর্ম; যেমন—মানুষটি কৃষ্ণবর্ণ নয়, বেঁটে নয়, অশিক্ষিত নয়, আফ্রিকাবাসী নয় ইত্যাদি। জৈনমতে কোন বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান বলতে বস্তুর এই অসংখ্য ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক ধর্মের জ্ঞান বোঝায়। এই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কেবলমাত্র সর্বজ্ঞ, কেবল জ্ঞানী সিদ্ধপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব।

ভাবাত্মক ধর্ম ও অভাবাত্মক ধর্ম

জৈনদের মতে যা গুণ এবং পর্যায়বিশিষ্ট তাই দ্রব্য। দ্রব্য গুণ ও পর্যায়ের আশ্রয়। যাতে ধর্ম আছে বা থাকে, তাই ধর্মী এবং তাই দ্রব্য। যা দ্রব্যের স্বরূপগত ধর্ম এবং

যার জন্য দ্রব্য স্থিতিশীল তাকে বলা হয় গুণ ; যেমন, আত্মার চৈতন্য ধর্ম। যা দ্রব্যের আগন্তুক ধর্ম এবং যার জন্য দ্রব্য পরিবর্তনশীল তাকে বলা হয় পর্যায়। যেমন, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার আগন্তুক ধর্ম। গুণের দিক থেকে দ্রব্য স্থিতিশীল এবং পর্যায়ের দিক থেকে দ্রব্য পরিবর্তনশীল। জৈন দার্শনিকগণ বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদ এবং বেদান্ত দর্শনের নিত্যবাদ উভয়ই অস্বীকার করেন। জৈনদের মতে পরিবর্তন ও স্থায়িত্ব উভয়ই সত্য।

যা গুণ এবং পর্যায়-বিশিষ্ট তাকে দ্রব্য বলে

জৈনদের মতে দ্রব্য দু'শ্রেণীতে বিভক্ত—অস্তিকায় ও অনস্তিকায়। যার বিস্তৃতি বা কায় আছে, অর্থাৎ যা দেশ জুড়ে থাকে তাকে অস্তিকায় বলে। যার বিস্তৃতি বা কায় নেই, যা দেশ জুড়ে থাকে না, তাকে অনস্তিকায় বলে। কাল হ'ল অনস্তিকায়। অস্তিকায় দ্রব্য আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত—জীব এবং অজীব। জীব এবং আত্মা এক ও অভিন্ন। জীবকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়—মুক্ত এবং বদ্ধ। বদ্ধজীব আবার দু'প্রকার—ত্রস বা বিচরণশীল এবং স্থাবর বা গতিহীন। স্থাবর জীব ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও উদ্ভিদ—এই পাঁচ প্রকার দেহে বাস করে। অজীব চার প্রকার—ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল। পুদ্গল দু'প্রকার—অণু এবং সংঘাত।

দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

জৈন মতে যে দ্রব্যের চেতনা আছে তাই জীব। জীব ও আত্মা অভিন্ন। চৈতন্য আত্মার স্বরূপগত ধর্ম। সকল রকম ধর্মের বন্ধন থেকে যারা মুক্ত, সেই মুক্ত জীবদের চেতনা সবচেয়ে বেশী এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও উদ্ভিদ দেহধারী জীবের চেতনা সবচেয়ে কম। আত্মাই জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। আত্মা নিত্য ও অপরিণামী, যদিও এর অবস্থাগুলি পরিবর্তনশীল। আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এক অতিরিক্ত সত্তা এবং আত্মসচেতনতার মাধ্যমে আত্মার অস্তিত্ব সাক্ষাৎভাবে জানা যায়। জৈনগণ চার্বাক মত খণ্ডন করেন। তাঁদের মতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যেও জানা যায়। শকটের যেমন চালক আছে, তেমনি দেহেরও চালক এবং নিয়ন্ত্রক আছে, তা হ'ল আত্মা। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মাই চালনা করে। কুম্ভকার যেমন ঘটের নির্মাতা, তেমনি এই দেহের নির্মাতা হল আত্মা। জৈনমতে আত্মা এক নয়, বহু।

জীব ও আত্মা অভিন্ন

আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি

জৈনমতে অজীবের কোন প্রাণ বা চেতনা নেই। এই অজীব পাঁচ প্রকার—পুদ্গল (matter), আকাশ (space), কাল (time), ধর্ম ও অধর্ম। জৈন দর্শনে

জড়কে পুদ্গল নামে অভিহিত করা হয়। কোন স্থূল জড় দ্রব্যকে ক্রমান্বয়ে বিভক্ত করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থা আসে যখন তাকে আর বিভক্ত করা চলে না। এই সূক্ষ্ম অবিভাজ্য জড়কণাগুলিকে অণু বলা হয়। দুই বা ততোধিক অণু একত্র মিলিত হলে সংঘাত বা স্কন্ধের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেহ এবং জড়দ্রব্য হ'ল সংঘাত। পুদ্গলের চারটি গুণ আছে—স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ।

অজীব পাঁচ প্রকার—পুদ্গল, আকাশ, কাল, ধর্ম ও অধর্ম

যে সমস্ত বস্তুর বিস্তার আছে সেগুলি আকাশে অবস্থান করে। পুদ্গল, আত্মা, ধর্ম ও অধর্ম সব কিছুই আকাশে অবস্থান করে। জৈন মতে আকাশ দু'প্রকার—লোকাকাশ (filled space) এবং অলোকাকাশ (empty space)। আকাশ প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যেই জানা যায়। কালও (time) প্রত্যক্ষগোচর নয়, অনুমানের সাহায্যেই কালের অস্তিত্ব জানা যায়। দ্রব্যের বর্তনা বা অবিচ্ছিন্নতা (continuity), গতি, পরিবর্তন, নতুনত্ব, প্রাচীনত্ব প্রভৃতি কালের জন্যই সম্ভব হয়। কাল অনস্তিকায় এবং এর কোন বিস্তৃতি নেই। কাল এক ও অবিভাজ্য। একই কাল জগতের সর্বত্র বিরাজ করছে। আকাশ এবং কালের মতো ধর্ম ও অধর্মও অনুমানের সাহায্যে জানা যায়। 'ধর্ম' এবং 'অধর্ম' যথাক্রমে পুণ্য ও পাপ অর্থে জৈনশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়নি, এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্ম আছে বলে গতিশীল পদার্থের গতি এবং অধর্ম আছে বলে স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতি সম্ভব।

জৈন নীতিশাস্ত্রই জৈন দর্শনের উল্লেখযোগ্য অংশ। জৈনমতে সম্যক্ চরিত্র গঠনের জন্যই অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার প্রয়োজন। সম্যক্ চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্য হ'ল মোক্ষলাভ। আত্মা স্বরূপতঃ মুক্ত এবং অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী। কর্মের জন্যই আত্মার বদ্ধ-অবস্থা। পূর্বজন্মের কৃত-কর্মের ফলে ভোগ, লালসা, কামনা-বাসনার সৃষ্টি হয় এবং এই কামনা-বাসনার জন্য আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয়। জীবদেহ পুদ্গল-পরমাণুর দ্বারা সৃষ্ট এবং আত্মা যখন বিশেষ একটি দেহ ধারণ করে, তখন সেই দেহ গঠনের জন্য বিশেষ ধরনের পুদ্গল-পরমাণু আত্মায় সংযুক্ত হয়। আত্মার এই দেহধারণ আত্মার স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকাশের পথে বাধা সঞ্চার করে। একেই বলা হয় আত্মার বদ্ধাবস্থা বা জীবের বন্ধন। ক্রোধ, মান, মায়া এবং লোভ আত্মায় পুদ্গল-পরমাণুকে সংযুক্ত করে। এগুলিই বন্ধনের কারণ। এদের কষায় বলা হয়।

জীবের বন্ধন-দশার কারণ

জীবের বদ্ধদশা বলতে যদি আত্মাতে পুদ্গল সংলগ্ন হওয়া বোঝায় তাহলে জীবের মোক্ষ বলতে বোঝায় আত্মা সম্পূর্ণভাবে পুদ্গলমুক্ত হওয়া। এর জন্য প্রয়োজন পূর্ব

থেকে আত্মাতে যে পুদ্গল সংলগ্ন হয়ে আছে তা দূর করা এবং নতুন পুদ্গল যাতে আত্মাতে সংযুক্ত না হয় তার জন্য সচেষ্ট হওয়া। প্রথম প্রক্রিয়ার নাম নির্জরা এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার নাম সংবর। জীবের কামনা-বাসনাই আত্মাতে পুদ্গল-সংযুক্তির কারণ এবং এই কামনা-বাসনার মূলে রয়েছে অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞান। সম্যক্-জ্ঞানের সাহায্যেই এই অজ্ঞানতা দূর করা যেতে পারে। সিদ্ধপুরুষ তীর্থঙ্করদের উপদেশাবলী মনযোগ সহকারে পাঠ করলেই সম্যক্-জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। কিন্তু সম্যক্-জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সম্যক্-দর্শন। তীর্থঙ্করদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁদের উপদেশ যে নির্ভরযোগ্য অর্থাৎ প্রামাণ্য, এই বিশ্বাসই সম্যক্-দর্শন। কিন্তু জ্ঞান যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হয় তাহলে তা নিরর্থক, সেহেতু মোক্ষলাভের জন্য তৃতীয় অপরিহার্য শর্ত হ'ল সম্যক-চারিত্র। কামনা, বাসনা, ইন্দ্রিয়, চিন্তা, বাক্য ও প্রবৃত্তিকে সংযত করাই হল সম্যক্-চারিত্র। সম্যক্-চারিত্র লাভ করার জন্য কোন কোন জৈন গ্রন্থকার পঞ্চমহাব্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলি হ'ল অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা), ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ (বিষয়-আসক্তি পরিহার করা)। সম্যক্-দর্শন, সম্যক্-জ্ঞান এবং সম্যক্-চারিত্র—জৈন নীতিশাস্ত্রকারদের মতে এই তিনটি গুণ ত্রিরত্নের সমতুল্য। এই তিনটি গুণের অনুশীলনের দ্বারা জীবের মোক্ষলাভ ঘটে।

জীবের বন্ধনমুক্তি কিভাবে সম্ভব

সম্যক্ দর্শন

সম্যক্-চারিত্র

জীবের মোক্ষাবস্থার স্বরূপ

জৈনরা নিরীশ্বরবাদী। এই নিরীশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে জৈনদের যুক্তি হল, কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান, কোনটির সাহায্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। যার দেহ আছে তিনিই কার্যের কর্তা হতে পারেন ; ঈশ্বর যখন বিদেহী বা নিরবয়ব, তখন তিনি এই জগতের কর্তা হবেন কিভাবে ? নিত্যত্ব, পূর্ণতা, অখণ্ডত্ব সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি ঈশ্বরের গুণ হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ : ঈশ্বরই যদি সর্বশক্তিমান হন তাহলে তিনি সব কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন ; কিন্তু তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা নন, যেমন—ঘট, পট ইত্যাদি।

নিরীশ্বরবাদের পক্ষে যুক্তি

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও মুক্তাত্মা, সিদ্ধপুরুষ তীর্থঙ্করদের পূজা ও ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা জৈনগণ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। এই সকল মুক্তপুরুষ দেবসুলভ গুণের অধিকারী। সাধারণ জীবের কর্তব্য, এই সকল পবিত্র সিদ্ধপুরুষদের পবিত্র চরিত্রকে অনুসরণ করে মোক্ষলাভের দুর্গম পথে অগ্রসর হওয়া। সাধনার

দুর্গম পথে এই সকল সিদ্ধপুরুষ আলোকবর্তিকার কাজ করেন। তবে জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, মোক্ষলাভ অপরের অনুগ্রহে ঘটে না, নিজের প্রচেষ্টাতেই এই মোক্ষলাভ সম্ভব।

জৈন ধর্মে সহানুভূতি ও অহিংসা

সকল জীবের প্রতি সহানুভূতি ও অহিংসা পালন করাই জৈন ধর্মের এক অন্তরঙ্গ দিক। জৈনরা স্বর্গের দেবতাকে নয়, মানুষকেই বড় করে দেখেছেন। তাই জৈন ধর্ম ও দর্শন মানবিকার সুরে মুখর।

৩। বৌদ্ধ দর্শন (The Buddha Philosophy) :

হিমালয়ের পাদদেশে প্রাচীন কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশের এক রাজপরিবারে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখে তিনি উপলব্ধি করলেন এই জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ। এক শান্ত, সৌম্যদর্শন নির্ভীক সন্ন্যাসীর দেখা পেয়ে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য তিনি সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করে উনত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার পরিত্যাগ করেন। প্রায় ছ'বছর ধরে কঠোর তপশ্চর্যার ও দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমেও যখন তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন না, তখন তিনি চরম কৃচ্ছ্র সাধনার ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত হলেন। এরপর তিনি কঠোর তপস্যা ও সাধনার মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হলেন এবং জগতের দুঃখের যে রহস্য তার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক্-জ্ঞান লাভ করলেন। সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ বা সম্যক্-জ্ঞানী। সত্যের সন্ধান পেয়েও তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। কেবলমাত্র নিজের মুক্তির জন্য নয়, বিশ্বের লোককে দুঃখ-কষ্ট থেকে চিরমুক্ত করার জন্য তিনি তাঁর ধর্মবাণী প্রচার করার সঙ্কল্প করলেন। তাঁর এই বাণীই বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি।

বুদ্ধের জীবনী

বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থই রচনা করেননি। তিনি মুখে মুখে তাঁর উপদেশবাণী প্রচার করতেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরে তাঁর অমূল্য উপদেশবাণীগুলিকে সংরক্ষিত করার প্রয়োজন দেখা দেওয়াতে তাঁর শিষ্যরা সেগুলিকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এগুলিকে 'পিটক' বলা হয় এবং এগুলি পালি ভাষায় লেখা। এই পিটকের সংখ্যা তিনটি এবং সংক্ষেপে এগুলিকে 'ত্রিপিটক' বলা হয়। এই পিটকগুলি হ'ল—(১) বিনয়পিটক, (২) সুত্তপিটক এবং (৩) অভিধম্ম-পিটক। বিনয়পিটকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের আচরণ সম্পর্কীয় নিয়মাদি, সুত্তপিটকে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্দেশ্য, সাধনা ও ফল এবং অভিধম্মপিটকে বুদ্ধদেবের বচনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ভাষ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ত্রিপিটক—বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধম্মপিটক

দুঃখ এবং দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তাঁকে চারটি সত্যের সন্ধান দিয়েছিল। এই চারিটি সত্য বৌদ্ধ দর্শনে 'চত্বারি আর্য সত্যানি' বা 'চারটি আর্য সত্য' নামে পরিচিত। এই চারটি সত্য হ'ল—(১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণ আছে, (৩) দুঃখের নিরোধ আছে এবং (৪) দুঃখ নিরোধের পথ আছে।

চারটি আর্য সত্য

প্রথম আর্য সত্য : দুঃখ আছে—এই সংসার দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক, ক্লেশ, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা, প্রিয়-বিয়োগ, অপ্রিয়-সংযোগ, সংক্ষেপে যা কিছু আসক্তিপ্রসূত, তাই দুঃখময়। এই সংসারে জীব ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন। সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী। এগুলিই দুঃখের সৃষ্টি করে। মানুষের কামনাই বাসনা সৃষ্টি করে এবং এই কামনার অপরিপূর্ণতাই মানুষের দুঃখ উৎপন্ন করে। সব কিছুই অনিত্য। যা অনিত্য, তাই দুঃখময়।

'দুঃখ আছে'—প্রথম আর্য সত্য

দ্বিতীয় আর্য সত্য : দুঃখের কারণ আছে—সংসারে যেমনি দুঃখ আছে তেমনি দুঃখের কারণ আছে। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' নীতি অনুসারে এ জগতে প্রত্যেক ঘটনাই কোন কারণবশতঃ ঘটে থাকে। সুতরাং দুঃখেরও কারণ আছে। জরা-মরণের কারণ হ'ল জাতি বা জন্ম, জাতির কারণ ভব বা পুনরায় জন্মগ্রহণের আকুলতা। ভবের কারণ উপাদান যা জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি, উপাদানের কারণ হ'ল তৃষ্ণা বা ভোগস্পৃহা, তৃষ্ণার কারণ বেদনা বা পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ সুখানুভূতি, বেদনার কারণ সংযোগ বা স্পর্শ। স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন বা ছয় ইন্দ্রিয় এবং ষড়ায়তনের কারণ নামরূপ বা দেহ-মন সংগঠন। নামরূপের কারণ চেতনা বা বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার বা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ। এই সংস্কারের কারণ হ'ল অবিদ্যা বা চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। অবিদ্যাহেতু মানুষ মিথ্যাকে সত্য, অনিশ্চিত ও অনিত্য বস্তুকে ধ্রুব ও নিত্য জ্ঞান করে। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের কার্যকারণ-শৃঙ্খলের কথায় আমরা দেখতে পাই মোট বারটি বা দ্বাদশ কারণ। এই কার্যকারণ শৃঙ্খলকে **দ্বাদশ নিদান** বা **ভবচক্র** বলে।

'দুঃখের কারণ আছে'—দ্বিতীয় আর্যসত্য

তৃতীয় আর্য সত্য : দুঃখের নিরোধ আছে—যে কারণের জন্য দুঃখের উদ্ভব তার ধ্বংসতেই দুঃখের নিরোধ। দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তিই নির্বাণ। নির্বাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়। নির্বাণ লাভের পর অনাসক্তভাবে কর্ম করলে বন্ধনের সম্ভাবনা থাকে না।

'দুঃখের নিরোধ আছে'—তৃতীয় আর্য সত্য

চতুর্থ আর্য সত্য ঃ দুঃখ নিরোধের মার্গ বা পথ আছে—এই পথকে বৌদ্ধ দর্শনে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই পথের আটটি স্তর বা অঙ্গ হল—

'দুঃখ নিরোধের মার্গ আছে'—চতুর্থ আর্যসত্য

(১) সম্যক্ দৃষ্টি বা চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। (২) সম্যক্-সঙ্কল্প অর্থাৎ পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি অনাসক্তি, ভোগ-বাসনা জয় করার ইচ্ছা এবং হিংসা, দ্বেষ ও রাগ বিসর্জন দেওয়ার সঙ্কল্প। (৩) সম্যক্-বাক্ বা বাক্-সংযম, অর্থাৎ সত্য কথন, সংযত শিষ্ট প্রীতিপদ আলাপ আলোচনা। (৪) সম্যক্-কর্মান্ত বা সংযত আচরণ, অর্থাৎ প্রাণী হত্যা, চৌর্য ও ইন্দ্রিয় সেবা থেকে বিরত হওয়া। (৫) সম্যক্-আজীব বা সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা। (৬) সম্যক্-ব্যায়াম, অর্থাৎ কুচিন্তার বিনাশ এবং সৎচিন্তার সংরক্ষণ ও উৎপাদনে সচেষ্ট হওয়া। (৭) সম্যক্-স্মৃতি, অর্থাৎ জগৎ, দেহ ও মন যে অনিত্য, এই বিষয়টি সকল সময় মনে রাখা। (৮) সম্যক্-সমাধির চারটি স্তর আছে। বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত—(১) প্রজ্ঞা, (২) শীল এবং (৩) সমাধি।

বুদ্ধদেব তত্ত্ববিদ্যার জটিল সমস্যার আলোচনায় কোন আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তবু তাঁর নৈতিক শিক্ষার মূলে কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব আছে এবং তাঁর নীতিশাস্ত্র এই দার্শনিক তত্ত্বগুলির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই দার্শনিক তত্ত্বগুলি হ'ল প্রধানতঃ—(১) প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি, (২) কর্মবাদ, (৩) অনিত্যবাদ এবং (৪) নৈরাত্ম্যবাদ।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি

(১) **প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির** অর্থ, যা কিছু আছে তা কারণ পরম্পরা থেকে উদ্ভূত। যা কিছু ঘটে তা কোন পূর্ববর্তী কারণের ওপর নির্ভর। এ মতবাদ অনুসারে জগতের কোন পরিণতি কারণ (final cause) নেই। এমন কোন শাশ্বত সত্তা নেই যা কারণ নির্ভর না হয়ে অনন্তকাল ধরে বিরাজ করতে পারে। (২) **কর্মবাদ ঃ** এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যে যেরূপ কর্ম করবে তাকে সেরূপ ফল-

কর্মবাদ

ভোগ করতে হবে। কর্ম দু'প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। নিষ্কাম কর্মের কোন কর্মফল ভোগ নেই। (৩) **অনিত্যবাদ ঃ** সব কিছুই অনিত্য, কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরন্তন নয়। পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অর্থাৎ

অনিত্যবাদ

সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিকগণ বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদকেই ক্ষণিকত্ব-বাদে পরিণত করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী প্রতিটি বস্তুই একটি মাত্র ক্ষণের জন্য স্থায়ী হয়। (৪) **নৈরাত্ম্যবাদ ঃ** বুদ্ধদেব কোন শাশ্বত বা চিরন্তন

আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যেহেতু সব কিছুই অনিত্য এবং ক্ষণিক সেহেতু কোন চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব নেই। কোন এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে যেসব মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দেখি, সেই মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহই আত্মা। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে জন্মান্তর অর্থে কোন চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহ নয়। জন্মান্তর অর্থে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব। জীব হ'ল মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ। এই মানসিক প্রক্রিয়াই এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে প্রবাহিত হয়।

নৈরাত্ম্যবাদ

বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বৌদ্ধমতে পরিণতি কারণরূপে (final cause) কোন জগৎ-কর্তার অস্তিত্ব নেই। কর্মবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণাকে প্রয়োজনহীন প্রতিপন্ন করে। কর্ম থেকে বড় কিছু নেই।

কোন জগৎ-কর্তার অস্তিত্ব নেই

বুদ্ধদেব জীবিত থাকাকালীন তাঁর শিষ্যবর্গ তাঁর নির্দেশ অনুসারে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যবর্গ বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন দিকগুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন; এর ফলে চারটি দর্শন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

(১) **মাধ্যমিক দর্শন:** এই দর্শন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন নাগার্জুন। এই মতবাদ অনুযায়ী কি বাহ্যবস্তু, কি মানসিক প্রক্রিয়া সবই শূন্য। বস্তু বা মন কোন কিছুরই সত্তা নেই; জড়জগৎ এবং মনোজগৎ উভয়ই মিথ্যা।

মাধ্যমিক দর্শন

(২) **যোগাচার দর্শন:** অসঙ্গ, বসুবন্ধ, মৈত্রেয়নাথ, দিঙ্‌নাগ প্রমুখ দার্শনিকগণ যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদের (idealism) সমর্থক। এই মতবাদ অনুসারে জড়বস্তুর সত্তা নেই সত্য, কিন্তু চেতনার সত্তা আছে। চেতনার অস্তিত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। চেতনার কোন অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে কোন যুক্তিতর্কের বা বিচারের সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না।

যোগাচার দর্শন

(৩) **সৌত্রান্তিক দর্শন:** তক্ষশিলার কুমারলাতকেই এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। সৌত্রান্তিকরা সর্বাস্তিবাদী। এই দার্শনিকগণ জড়বস্তু এবং মন উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। বস্তুর জ্ঞান অনুমানলব্ধ, তবু বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই মতবাদ বাহ্যানুমেয়বাদ নামেও পরিচিত।

সৌত্রান্তিক দর্শন

(৪) **বৈভাষিক দর্শন**ঃ বৌদ্ধগ্রন্থ অভিধর্মের ওপর বিভাষা নামে একটি ভাষ্য রচিত হয়েছিল। বৈভাষিকরা এই বিভাষা অনুসরণ করেই তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যার জন্য একে বৈভাষিক দর্শন বলা হয়। বৈভাষিকরা জড়জগৎ ও মনোজগৎ উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। তবে তাঁদের মতে বস্তুর অস্তিত্ব আমরা অনুমানের সাহায্যে জানি না, বস্তুকে আমরা সাক্ষাৎ-ভাবে প্রত্যক্ষ করি।

বৈভাষিক দর্শন

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী—এই দুটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। প্রাচীনপন্থীরা বুদ্ধদেবের নীতি ও আদর্শকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত করতে রাজী নন এবং এঁরা হলেন হীনযানী। নবীনপন্থীরা ছিলেন পরিবর্তনের পক্ষপাতী এবং এঁরা হলেন মহাযানী। হীনযানী বৌদ্ধগণ বুদ্ধের ধর্মোপদেশ, নীতি ও বাণী যথাযথ অনুসরণ করার পক্ষপাতী। নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্য হ'ল আত্মমুক্তি এবং এই আত্মমুক্তি হবে প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য। এই নির্বাণের জন্য অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়। মহাযানীরা মনে করতেন যে, আত্মমুক্তির আদর্শটি স্বার্থদুষ্ট। নির্বাণের লক্ষ্য আত্মমুক্তি নয়, পরমজ্ঞান লাভ করা এবং পরমজ্ঞান ও ভালবাসার দ্বারা বিশ্বের দুঃখজর্জরিত মানুষের দুঃখ দূর করে তাদের মোক্ষলাভে সহায়তা করা।

হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়

৪। ন্যায়দর্শন (The Naya Philosophy)ঃ

মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। ন্যায়দর্শন প্রধানতঃ যথাযথ জ্ঞান লাভের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। কি উপায়ে বা কোন্ কোন্ বিধি অনুসরণ করে যুক্তিতর্ক করলে আমরা যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারি, ন্যায়দর্শন প্রধানতঃ তারই আলোচনা করে।

মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা

নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার—প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Comparison) এবং শব্দ (Testimony)। প্রত্যক্ষ হ'ল বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান। কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে প্রত্যক্ষ হ'ল সাক্ষাৎ জ্ঞান। প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা—লৌকিক (Ordinary) ও অলৌকিক (Extraordinary)। লৌকিক প্রত্যক্ষ আবার দু'প্রকার; যথা—বাহ্য এবং মানস। অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ।

প্রমাণ চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান ও শব্দ

আশ্রয় করেই চেতনা থাকে। চেতনা আত্মারই ধর্ম, আত্মা হল জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিষ্ক্রিয় এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। আত্মা নিরবয়ব এবং নিত্য ; আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, আত্মা বিভু বা সর্বব্যাপী।

চেতনা আত্মার ধর্ম

অপবর্গ বা মোক্ষ লাভই জীবের পুরুষার্থ। গৌতমের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই হ'ল অপবর্গ। আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ চৈতন্যহীন দ্রব্য। আত্মা মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হলেই বুদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখ, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণগুলি আত্মাতে আবির্ভূত হয়। মন ও দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা সূচনা করে। যতক্ষণ আত্মা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ এই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। শরীর ধারণ করার জন্যই জীবকে দুঃখভোগ করতে হয়। ধর্মাচরণের ফলস্বরূপ সুখভোগ এবং অধর্মাচরণের ফলস্বরূপ দুঃখভোগের জন্যই জীবের জন্মগ্রহণ ও শরীর ধারণ। শুভ প্রবৃত্তি এবং অশুভ প্রবৃত্তি থেকেই যথাক্রমে ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি। শুভাশুভ প্রবৃত্তির মূলে আছে কাম্যবস্তুর প্রতি আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রতি দ্বেষ। এই উভয়কে দোষ নামে অভিহিত করা হয়। মিথ্যাজ্ঞান দোষের কারণ। মন, ইন্দ্রিয়, শরীর প্রভৃতিকে আমিরূপে বা আত্মারূপে ধারণা করাই হ'ল মিথ্যাজ্ঞান। আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর কোনটির সঙ্গে অভিন্ন নয়। মিথ্যাজ্ঞানের জন্য জীবের মধ্যে রাগ, দ্বেষ, মোহ এই সব দোষের উৎপত্তি। আত্মার যথাযথ স্বরূপের জ্ঞান হ'ল যথার্থ জ্ঞান এবং এই যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে মিথ্যাজ্ঞানকে বিনষ্ট করতে হবে। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলে জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না, তাহলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হ'ল মোক্ষলাভের উপায়। শ্রবণের অর্থ হ'ল—আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করা, মননের অর্থ হ'ল—এই উপদেশ নিজের মনে চিন্তা করা এবং নিদিধ্যাসন হ'ল—যোগাভ্যাসের দ্বারা আত্মার স্বরূপ ধ্যান করা।

আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই অপবর্গ

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষ লাভের উপায়

আত্মা দু'প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন এবং ধ্বংস করেন। ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ। ঈশ্বর শাশ্বত ও নিত্য বস্তুগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন। ঈশ্বর জীবের কর্মফলদাতা। ঈশ্বর অদৃষ্টের (পাপ-পুণ্যের) অধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরই জীবের পাপ-পুণ্যের বিচার করে তার ফল প্রাপ্তির

পরমাত্মাই ঈশ্বর

ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নন। ঈশ্বর এক, অসীম ও শাশ্বত। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সকল জীবের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেন। নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একাধিক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন—(১) আদি কারণ-বিষয়ক যুক্তি; এ জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ, যেমন—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি হ'ল কার্য, সেহেতু এগুলি অংশের সমষ্টি এবং সীমিত পরিসরযুক্ত। কিন্তু এই সব বস্তুগুলির উপাদান কারণগুলি নিজে নিজেই সংযুক্ত হতে পারে না। সুতরাং, এমন কোন কর্তা আছেন যিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, যিনি এদের সংযুক্ত করেন। এই কর্তাই ঈশ্বর। (২) নৈতিক যুক্তি; জীবের সংকর্ম ও অসংকর্ম সম্পাদনের ফলে পুণ্য ও পাপরূপ অদৃষ্টশক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই অদৃষ্টের জন্য জীবের সুখভোগ এবং দুঃখভোগ। অচেতন অদৃষ্টশক্তির পক্ষে কার কতটুকু প্রাপ্য বিচার করা সম্ভব নয়। সুতরাং, এমন কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান কর্তা আছেন যিনি এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জীবের কর্ম অনুযায়ী তার পাপ-পুণ্যের বিচার করেন। এই কর্তা কে? ঈশ্বরই হলেন এই কর্তা বা অধিষ্ঠাতা। (৩) বেদের কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি; বেদ প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত গ্রন্থ। কিন্তু বেদ কিভাবে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত হতে পারে? যদি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কোন পরমাত্মা বেদের কর্তা হন তাহলেই তা সম্ভব হতে পারে। এই সর্বজ্ঞ পরমাত্মাই হ'ল ঈশ্বর। (৪) ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে শ্রুতির যুক্তি; ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে আর একটি প্রমাণ হল শ্রুতির যুক্তি। বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ আছে।

ঈশ্বরের প্রকৃতি

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি

নৈয়ায়িকদের জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ। প্রমা ও প্রমাণ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের বিস্তারিত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ওপর ভারতীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত।

৫। বৈশেষিক দর্শন (The Vaisesika Philosophy):

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ঋষি কণাদ। ন্যায় দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র বলা হয়। উভয়ের মতেই মোক্ষই জীবের পরম পুরুষার্থ। উভয় দর্শনই মনে করে যে, অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞানই সকল দুঃখের মূল কারণ। মোক্ষ হ'ল দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান বা বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যেই মোক্ষ লাভ করা সম্ভব। বৈশেষিক দর্শনে দুটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। উপমান ও শব্দ অনুমানেরই

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি কণাদ

চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ তাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। মন এই অন্তরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, আত্মা মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে, একে বলা হয় মানস-প্রত্যক্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ ঘটে। অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। মনুষত্বের মাধ্যমে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করাই হ'ল সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ, কারণ 'মনুষ্যত্ব' এই সামান্য ধর্মকে লৌকিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা চলে না। 'বরফ দেখতে ঠাণ্ডা', এ হ'ল জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষের উদাহরণ। বস্তুর কোন বিশেষ গুণের প্রত্যক্ষ যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সাধারণতঃ ঘটে থাকে, তার দ্বারা না হয়ে যখন অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হয়, তাকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। যোগীরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য অতীত এবং ভবিষ্যৎ, দূরবর্তী এবং অতি সূক্ষ্ম বস্তুও প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এ হ'ল যোগজ প্রত্যক্ষ। নির্বিকল্পক (indeterminate) প্রত্যক্ষ হ'ল কোন বস্তুর নিছক অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। সবিকল্পক (determinate) প্রত্যক্ষ হ'ল বস্তুর ধর্ম বা জাতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) হ'ল বস্তুকে পূর্ব পরিচিত বস্তু বলে চিনতে পারা।

লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষ—নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক

'অনু' শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, আর 'মান' শব্দের অর্থ জ্ঞান। সুতরাং অনুমান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান অন্য জ্ঞানকে অনুসরণ করে। লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ জ্ঞানের অর্থাৎ ব্যাপ্তি-জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ লিঙ্গের (হেতুর) জ্ঞান থেকে অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গের (সাধ্যের) জ্ঞানে পৌঁছবার প্রণালীকে অনুমান বলা হয়। প্রত্যেক অনুমানে তিনটি পদ এবং কমপক্ষে তিনটি তর্কবাক্য বা বচন থাকবেই। যে বচনগুলির দ্বারা অনুমান গঠিত হয় সেই বচনগুলিকে অনুমানের অবয়ব বলা হয়। তিনটি পদ হ'ল সাধ্য (major term), পক্ষ (minor term) এবং হেতু (middle term)। হেতুর অপর নাম লিঙ্গ বা সাধন। হেতুর সাহায্যে যাকে লাভ করতে চাই তাই হ'ল সাধ্য। যেখানে সাধ্যের অস্তিত্ব স্থির করা হয় তার নাম পক্ষ। হেতু, সাধ্য এবং পক্ষের মধ্যে যোগসাধন করে। পর্বতে ধূম দেখে অনুমান করি, সেখানে বহ্নি আছে, যেহেতু যেখানে ধূম, সেখানেই বহ্নি। এখানে পর্বত হ'ল পক্ষ, বহ্নি হ'ল সাধ্য, ধূম হ'ল হেতু বা মধ্যম পদ। ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা যে কোন নির্ভুল অনুমিতির পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন। ব্যাপ্তি হ'ল হেতু বা লিঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের অব্যভিচারী নিয়ত সম্পর্ক এবং পক্ষধর্মতা হ'ল পক্ষে হেতুর অবস্থিতি।

অনুমানের স্বরূপ

পূর্বপরিচিতি কোন একটি পদার্থের সঙ্গে নতুন ও অপরিচিত কোন পদার্থের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যখন নতুন পদার্থ টির সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি তখন জ্ঞানলাভের এই প্রণালীকে উপমান বলা হয়। কোন ব্যক্তি পূর্বে 'গবয়পশু' (নীলগাই) প্রত্যক্ষ করেনি। কোন একজন আরণ্যক তাকে বলল, 'গো সদৃশ গবয়', অর্থাৎ গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদৃশ্য আছে। ব্যক্তিটি অরণ্যে গিয়ে একটি নতুন প্রাণী প্রত্যক্ষ করল এবং লক্ষ্য করল যে, প্রাণীটির সঙ্গে গরুর সাদৃশ্য আছে। তখন এই জাতীয় পশু গবয়পদবাচ্য, এরূপ সংজ্ঞাজ্ঞান তার হ'ল। উপমানের সাহায্যেই এই নতুন জ্ঞান সে লাভ করল। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর যে সম্বন্ধ তাকে উপমান বলে।

উপমান

নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হ'ল চতুর্থ প্রমাণ। নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হ'ল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শব্দের প্রকৃত অর্থ যিনি অবহিত, যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য—তিনিই শব্দতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনিই আপ্ত।

শব্দ-প্রমাণ

নৈয়ায়িকরা বারটি প্রমেয় (object of knowledge) স্বীকার করেছেন—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় বা অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব (rebirth), ফল, দুঃখ এবং মোক্ষ। এছাড়া নৈয়ায়িকরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাবের কথাও স্বীকার করেন। এই সব প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় এ জগতে দৃষ্ট হয় না। যেগুলি ভৌতিক বা ভূত দ্বারা গঠিত সেগুলিই দৃষ্ট হয়।

প্রমেয়

নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা একটি দ্রব্য। এক একটি বিশেষ আত্মা এক একটি দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলি হ'ল কতকগুলি গুন। যেহেতু দ্রব্য ছাড়া কোন গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, সেহেতু এই গুণগুলির আধার বা আশ্রয় রূপে কোন দ্রব্য আছে ; এই দ্রব্য হ'ল আত্মা। দেহ আত্মা হতে পারে না, কারণ দেহ চৈতন্যহীন এবং চৈতন্য দেহের গুণ নয় বা দেহের ধর্ম নয়। দেহই চেতনার বস্তু। দেহ হ'ল আত্মার করণ (instrument), যার মাধ্যমে আত্মা নিজ উদ্দেশ্যসাধন করে। আত্মা ইন্দ্রিয় হতে পারে না ; ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক, কিন্তু চেতনা ভৌতিক নয়। মনও আত্মা হতে পারে না ; মন হল অন্তরিন্দ্রিয় যার সাহায্যে আত্মা বিভিন্ন মানসিক অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করে। আত্মা ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ নয়। আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য নয় বা প্রাণের সঙ্গেও অভিন্ন নয়। আত্মা দ্রব্য এবং এই দ্রব্যকে

আত্মা

অন্তর্গত। জ্ঞান দু'প্রকার—স্মৃতি (Recollection) এবং অনুভব (Apprehension)। অনুভব যথার্থ এবং অযথার্থ উভয়প্রকার হতে পারে। যথার্থ অনুভব হল প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমিতি। অযথার্থ অনুভব হ'ল সংশয় (doubt) এবং বিপর্যয় (illusion)।

পদের দ্বারা যে বিষয় সূচিত হয় তাই হ'ল পদার্থ এবং যা প্রমিতির বিষয় তাই পদার্থ। বৈশেষিক দর্শন সাতটি পদার্থ স্বীকার করে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। গুণ এবং ক্রিয়া যে পদার্থকে আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে তাকেই দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র বস্তু। দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা এবং মন। এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে বলা হয় ভূত। এরা ভৌতিক পদার্থ। এদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ গুণ আছে। গন্ধ হ'ল ক্ষিতির, রস হ'ল অপের, রূপ হ'ল তেজের, স্পর্শ হ'ল বায়ুর এবং শব্দ হ'ল আকাশের বিশেষ গুণ। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণুগুলি নিত্য। এই সব পরমাণুর সংযোগে যেসব যৌগিক বস্তু উৎপন্ন হয়, সেগুলি অনিত্য। এই জগতের যাবতীয় উৎপত্তি-শীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হল পরমাণু। বৈশেষিক মতে যে কোন অবয়ববিশিষ্ট বা অংশযুক্ত বস্তুকে যদি ক্রমাগত বিভাগ করা যায় তাহলে আমরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, তারপর আরও ক্ষুদ্র এইভাবে এমন এক অবিভাজ্য সূক্ষ্ম অংশে এসে উপনীত হই যে তারপর তাকে আর ভাগ করা চলে না। এই ক্ষুদ্রতম সূক্ষ্ম জড় কণিকাগুলিই হ'ল পরমাণু। এই পরমাণুগুলি হ'ল সৎ, নিত্য, অনুমেয়, অবিভাজ্য এবং অকারণ। এই পরমাণুগুলি এত ক্ষুদ্র যে, এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনুমানের সাহায্যেই আমরা এগুলির অস্তিত্ব জ্ঞাত হই। পরমাণুগুলি নিত্য, সেহেতু এদের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। পরমাণু সংখ্যায় বহু এবং বিভিন্ন। প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যার জন্য কোন একটি পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে পৃথক। আকাশ হ'ল নিত্য, সর্বব্যাপী এবং অতীন্দ্রিয়। শব্দগুণ যাকে আশ্রয় করে থাকে তাই হ'ল আকাশ। দিক্ হ'ল এক, অখণ্ড এবং সর্বব্যাপী। 'দূর', 'নিকট', 'পূর্ব', 'পশ্চিম' প্রভৃতির ধারণা বা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দিকের অস্তিত্ব অনুমান করি। দিকের মতো কালও এক, অনন্ত এবং সর্বব্যাপী। অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ হ'ল কাল। আত্মা শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য। আত্মা জ্ঞান

সাতটি পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব

দ্রব্য

পরমাণু

আকাশ, দিক ও কাল

বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা দু'প্রকার—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। পরমাত্মাই ঈশ্বর। আত্মা বিভু হলেও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, সে কারণে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তুক গুণ। মনও আত্মার মতো একটি নিত্য দ্রব্য।

আত্মা

মন হ'ল অন্তরিন্দ্রিয় যার সাহায্যে আত্মা সুখ, দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতি গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। মন পরমাণু বিশেষ, সেকারণে মন অতি ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম পদার্থ। মন নিত্য। এর উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই।

মন

গুণ সব সময় দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা আছে, কিন্তু গুণের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। গুণ দ্রব্যে থাকে কিন্তু গুণের কোন গুণ নেই। গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকলেও গুণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। গুণ গতিহীন এবং নিষ্ক্রিয়। গুণ চব্বিশ প্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম এবং শব্দ।

গুণ

কর্ম হল জড় পদার্থের গতি। গুণ যেমন কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে, কর্মও অনুরূপভাবে কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। কর্ম পাঁচ প্রকার—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।

কর্ম

একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সমভাবে বর্তমান থাকে। একে সামান্য বলে। 'মনুষ্যত্ব' এই সাধারন বৈশিষ্ট্য সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান, যার জন্য সব মানুষই মনুষ্য পদবাচ্য। সামান্য হ'ল নিত্য পদার্থ। দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু সামান্য হ'ল নিত্য, এর কোন বিনাশ নেই। যদিও সামান্য বহু ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান তবু সামান্যের ব্যক্তি বা বস্তু-নিরপেক্ষ সত্তা আছে। সামান্যের আর এক নাম জাতি।

সামান্য

বিশেষ হ'ল সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। অংশহীন নিত্য দ্রব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হ'ল বিশেষ। অনিত্য পদার্থের বিশেষ নেই। নিত্য পদার্থেই বিশেষের অধিষ্ঠান। প্রতিটি পরমাণুর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে একটি পরমাণু আর একটি পরমাণু থেকে পৃথক। 'বিশেষ' কথাটি থেকেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি।

বিশেষ

দুটি পদার্থ যখন এমন এক অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয় যে, পদার্থ দুটির মধ্যে

একটি আর একটিতে থাকে, তখন ঐ সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। সংযোগ সম্বন্ধ হ'ল অনিত্য ও বাহ্য সম্বন্ধ। কিন্তু সমবায় হ'ল নিত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ— যেমন অবয়বের সঙ্গে অবয়বীর, দ্রব্যের সঙ্গে গুণের, সূত্রের সঙ্গে বস্ত্রের, সমগ্রের সঙ্গে অংশের এবং জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ।

সমবায়

অভাব হ'ল নঞর্থক পদার্থ (Negative Category)। 'অভাব' মানে যার অস্তিত্ব নেই। যখন বলি বিশুদ্ধ জলে গন্ধ নেই, টেবিলের ওপর কলমটি নেই তখন বস্তুতঃই কতকগুলি বস্তুতে অন্য বস্তুর অভাবের কথা বলছি। অভাব দু'প্রকারের—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব বলতে কোন কিছুতে অন্য কোন কিছুর অভাব বোঝায়। অন্যোন্যাভাব বলতে বোঝায় যে একটি বস্তু আর একটি বস্তু নয়। সংসর্গাভাব তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব। উৎপন্ন হবার পূর্বে উপাদানে বস্তুর যে অভাব থাকে এবং উৎপন্ন হলে যা থাকে না, তাকে প্রাগভাব বলে। যেমন, মাটিতে মূর্তির অভাব। কোন বস্তু উৎপন্ন হবার পর ধ্বংস হ'লে বস্তুটির যে অভাব তাকে ধ্বংসাভাব বলে। ঘট ভেঙে গেলে ঘটের ধ্বংসাভাব হ'ল ; কারণ, ঘটের ভাঙা টুকরোগুলিতে আর ঘটের অস্তিত্ব নেই। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেই অর্থাৎ সকল সময়েই দুটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের অভাবই অত্যন্তাভাব। যেমন—বায়ুতে রূপের অভাব, ঘটে চেতনার অভাব। দুটি বস্তুর পারস্পরিক ভেদ হ'ল অন্যোন্যাভাব ; যেমন—ঘট বস্ত্র নয়। ঘট বস্ত্র থেকে পৃথক, সুতরাং ঘটে বস্ত্রের অভাব, আর বস্ত্রে ঘটের অভাব।

অভাব

বৈশেষিক দর্শন পরমাণুবাদের সাহায্যেই এই জড় জগতের সৃষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা করে। পরমাণুর সংযোগ এবং বিয়োগেই যথাক্রমে যৌগিক বস্তুর উৎপত্তি এবং বিনাশ। পরমাণুগুলি আপনা আপনি সংযুক্ত বা বিযুক্ত হতে পারে না। সুতরাং, কোন বুদ্ধিমান কর্তা পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত এবং বিযুক্ত করেন। এই বুদ্ধিমান কর্তা হলেন ঈশ্বর। নিত্য পদার্থের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, পরমাণু জগতের উপাদান কারণ। বৈশেষিকরা দ্বৈতবাদী। তাঁরা ঈশ্বর এবং পরমাণু উভয়েরই সহ-অবস্থানের কথা স্বীকার করেন।

জড়জগতের সৃষ্টি এবং লয়

৬। সাংখ্য দর্শন (The Sankhya Philosophy) :

মহর্ষি কপিলদেব সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। সাংখ্য দর্শনে মাত্র দুটি মূল তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে—পুরুষ ও প্রকৃতি। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতিতত্ত্ব সৎকার্যবাদের ওপর নির্ভর।

দুটি মূলতত্ত্ব— পুরুষ ও প্রকৃতি

সাংখ্য দর্শনের কার্যকারণবাদকেই সৎকার্যবাদ নামে অভিহিত করা হয়। কারণ

ব্যতীত কোন কার্যই ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে কি উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে? সাংখ্য দার্শনিকদের মতে উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে কার্য উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে, তবে অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। যেমন—ঘট মৃত্তিকার মধ্যে অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। কুম্ভকার চক্রযষ্টির সাহায্যে সেই ঘটকে ব্যক্ত বা প্রকট করেন। সাংখ্য দার্শনিকের মতে 'সৎ' থেকেই 'সৎ'-এর উৎপত্তি; অসৎ থেকে 'সৎ'-এর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয়।

সৎকার্যবাদ

সৎকার্যবাদের দুটি রূপঃ পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ থেকে যখন কার্যের উৎপত্তি ঘটে, তখন কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। মৃত্তিকা থেকে যখন ঘটের উৎপত্তি হয় তখন মৃত্তিকা প্রকৃতই ঘটে পরিণত হয়। ঘট মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম। সাংখ্য দার্শনিকরা পরিণামবাদের সমর্থক। বিবর্তনবাদ অনুসারে কারণ বাস্তবিকই কার্যে পরিণত হয় না, কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। যেমন—রজ্জুতে সর্পভ্রম। অদ্বৈত বেদান্ত বিবর্তবাদের সমর্থক।

সাংখ্য দর্শনের দুটি মূল তত্ত্বের মধ্যে একটি হ'ল পুরুষ। সাংখ্য দর্শনে আত্মাকেই পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা জড়-জগতের কোন বস্তু নয়। পুরুষ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষ চৈতন্যগুণবিশিষ্ট দ্রব্য নয়। কারণ চৈতন্য বা জ্ঞান পুরুষের ধর্ম বা গুণ নয়। পুরুষই চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞান-স্বরূপ। পুরুষ জড়ের প্রকাশক। পুরুষ নিত্য। পুরুষ কূটস্থ নির্বিকার। পুরুষ অসঙ্গ, যেহেতু পুরুষ নির্গুণ। পুরুষের সুখ-দুঃখ নেই, সেহেতু সে উদাসীন। পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব। পুরুষ অপরিণামী। পুরুষ প্রাকৃতিক বিকারের অতীত। পুরুষ এক নয় বহু। যদি আত্মা বহু না হয়ে এক হত তাহলে একজনের জন্ম হলে সকলের জন্ম বা একজনের মৃত্যু হলে সকলের মৃত্যু হত বা একজন ব্যক্তি কোন কার্যে প্রবৃত্ত হলে অন্য সকলেও সেই কার্যে প্রবৃত্ত হোত, কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না।

পুরুষ

সাংখ্য দর্শনের দ্বিতীয় মূল তত্ত্বটি হ'ল প্রকৃতি। প্রকৃতিই এই জড়জগতের মূল উপাদান কারণ। প্রকৃতি বিশ্বের অমূল মূল। প্রকৃতি বিভু, পূর্ণ ও অসীম। প্রকৃতি বহু নয়, এক। প্রকৃতি চেতন নয়, জড়। প্রকৃতির আর একটি নাম হ'ল অব্যক্ত। প্রকৃতি নির্বিশেষ ও নিরবয়ব; সেহেতু প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়। প্রকৃতির আদি বা অন্ত নেই। প্রকৃতি নিত্য এবং অবিনাশী। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি।

প্রকৃতি

সাংখ্য দর্শনে গুণ বলতে উপাদানকে বোঝায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ প্রকৃতির ধর্ম নয়। এগুলি প্রকৃতির স্বরূপ অর্থাৎ এগুলি প্রকৃতির উপাদান। একখণ্ড রজ্জু যেমন তিনটি তার বা গুণের দ্বারা নির্মিত হয় সেইরূপ এই জগতের প্রতিটি বস্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি উপাদানের দ্বারা গঠিত হয়। এই জন্যই এদের গুণ বলা হয়। এরা পুরুষের উদ্দেশ্যসাধন করে এবং পুরুষ বা আত্মাকে জগতের সঙ্গে বেঁধে রাখে। গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কারণ এগুলি খুব সূক্ষ্ম। জগতের বিভিন্ন বস্তু এই সব গুণগুলির কার্য এবং এই কার্য থেকেই এদের অস্তিত্ব অনুমান করে নেওয়া হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ যথাক্রমে সুখদায়ক, দুঃখদায়ক এবং বিষাদাত্মক। জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই যদি সুখ, দুঃখ ও বিষাদ—এই তিনটি উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তাহলে জাগতিক বস্তু সকলের আদি বা মূল কারণের মধ্যেও এই তিনটি উপাদান অবশ্যই থাকবে। এই তিনটি উপাদানকেই সাংখ্য দার্শনিকরা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে অভিহিত করেছেন। সুখের সর্ববিধ অবস্থা, যেমন—আনন্দ, প্রীতি, সন্তোষ, উল্লাস প্রভৃতি সত্ত্বগুণের জন্যই বস্তুতে উপস্থিত থাকে। রজোগুণের স্বভাব হ'ল প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া। রজঃ হ'ল গতিশীল ও উত্তেজক। রজোগুণ দুঃখস্বরূপ এবং সকল রকম দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কারণ। তমোগুণ বস্তুর নিষ্ক্রিয়তা ও অসারতার কারণ। ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা, আলস্য, তন্দ্রালুতা প্রভৃতি তমোগুণের উপস্থিতির জন্যই উৎপন্ন হয়। তমোগুণের জন্যই মনে নিস্পৃহতা বা বিষাদের সৃষ্টি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণ সব সময় একত্রে ক্রিয়া করে।

গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ

সাংখ্য দর্শনে ব্যবহারিক পুরুষ (empirical self) এবং পারমার্থিক পুরুষ (transcendental self) এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে 'ব্যবহারিক' পুরুষকে জীব এবং 'পারমার্থিক' পুরুষকেই পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষ কর্তা নয়, ভোক্তা নয়; জীবই কর্তা এবং ভোক্তা। পুরুষই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে জীব নামে অভিহিত হয়। মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে সাংখ্যে অন্তঃকরণ বলা হয়।

জীব ও পুরুষ

প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগের মাধ্যমেই জগতের অভিব্যক্তি শুরু হয়। দর্শন শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু যেমন চলনশক্তিসম্পন্ন অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে, ঠিক তেমনিভাবে নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষ এবং সক্রিয় অচেতন প্রকৃতি, উভয়ে মিলিত হয়ে জগতের অভিব্যক্তিকে (evolution) সম্ভব করে তোলে। প্রকৃতির পরিণামের দুটি প্রয়োজন—প্রথমতঃ, পুরুষের ভোগ, দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি থেকে মোক্ষ। প্রকৃতির জন্যই পুরুষের বন্ধন।

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে জগতের অভিব্যক্তি

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হেতু গুণক্ষোভ ঘটে এবং সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয়। মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধি প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। এই জগতের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টির বীজ বলেই একে 'মহৎ' বা বিরাট বলা হয়। আবার জীবের মধ্যে বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয় বলে একে 'বুদ্ধি' বলা হয়। 'অহঙ্কার' প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। অহঙ্কারের জন্যই পুরুষ নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। অভিমান বা মমত্ববুদ্ধি অহঙ্কারের লক্ষণ। অহঙ্কারের বিকারের ফলে যেমন একদিকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,[1] পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়[2] ও মন) আবির্ভাব, তেমনি অপর দিকে পঞ্চতন্মাত্রের আবির্ভাব। অহঙ্কারতত্ত্বে তমোগুণ প্রবল হলে তন্মাত্রের আবির্ভাব ঘটে। এই তন্মাত্র পাঁচ প্রকার—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। এরা যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি উৎপাদন করে। সাংখ্যের পরিণামবাদে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হ'ল প্রকৃতি, পঞ্চ মহাভূত, ত্রয়োদশকরণ এবং পঞ্চতন্মাত্র। প্রকৃতি জড়, অচেতন ও অবিবেকী হলেও প্রকৃতির পরিণাম উদ্দেশ্যমূলক।

জগতের অভিব্যক্তির পরিচয়

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব

সাংখ্য দর্শন মতে প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। সাংখ্য দর্শনে উপমান (Comparison), অর্থাপত্তি (Postulation) এবং অনুপলব্ধিকে (Non-cognition) অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করা হয়নি। কেননা এই প্রমাণ হয় প্রত্যক্ষ, কিংবা শব্দ, কিংবা অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। সাংখ্য দার্শনিকরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য (Intrinsic Validity) স্বীকার করেন অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন শর্তের ওপর নির্ভর নয়।

প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ

সাংখ্য দার্শনিকদের মতে এই জগৎ এবং জীবন দুঃখময়। দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ব্যাধি, আঘাত প্রভৃতি শারীরিক দুঃখ, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য প্রভৃতি মানসিক দুঃখ আধ্যাত্মিক দুঃখের অন্তর্ভুক্ত। জীব-এর হত্যা, সর্পাঘাত প্রভৃতি আধিভৌতিক দুঃখ। ভূত, প্রেত প্রভৃতি অপ্রাকৃত কারণ থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয় তাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হ'ল মোক্ষ। দুঃখ নিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক বা বৈদিক কোন

ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ

1. চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও ত্বক।

2. বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

উপায়ই পর্যাপ্ত নয়। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান। প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান হল এই তত্ত্বজ্ঞান। সাংখ্যমতে পুরুষ বা আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষ দেহ, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি কোনটিরই সঙ্গে অভিন্ন নয়। পুরুষ এগুলির অতিরিক্ত সত্তা। পুরুষ সুখ, দুঃখ রাগ, দ্বেষ ও মোহশূন্য। সুখ, দুঃখ, ধর্ম ও অধর্ম এ সবই অন্তঃকরণের ধর্ম। অবিদ্যাহেতু পুরুষ অন্তঃকরণের ধর্মকেই নিজের ধর্ম বলে মনে করে। পুরুষ বুদ্ধির ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলে ধারণা করে এবং নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। বস্তুতঃ, পুরুষ দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, এই হ'ল পুরুষের বন্ধন। সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতির অবিবেক অর্থাৎ অভেদজ্ঞানই পুরুষের বন্ধনের কারণ। **বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।** তত্ত্বাভ্যাসের মাধ্যমেই বিবেকজ্ঞান লব্ধ হয়। পুরুষ-প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপলব্ধিই তত্ত্বজ্ঞান। আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত সত্তা এবং এদের সঙ্গে কোনমতেই অভিন্ন নয়, এর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহায়তায়, অর্থাৎ দীর্ঘ ও সুকঠিন যোগসাধনার মাধ্যমেই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। সকল রকম দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মুক্তি বা পুরুষার্থ। পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষের 'স্বস্থ' হওয়া বা স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। এই অবস্থায় পুরুষের সুখ-দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব সবই তিরোহিত হয়। মুক্তি দু'প্রকার—জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি: তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে জীব মোক্ষ লাভ করে, দুঃখ তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শরীর ধারণ চলতে থাকে। মৃত্যুর পর জীবন্মুক্ত বিদেহমুক্তি লাভ করে। এই অবস্থায় স্থূল ও শরীর উভয়বিধ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এবং প্রকৃতির নিবৃত্তিহেতু পুরুষ আত্যন্তিক এবং ঐকান্তিক এই দুই প্রকার কৈবল্য লাভ করে। একেই বলা হয় বিদেহ কৈবল্য।

পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

প্রাচীন সাংখ্য দার্শনিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন; যেমন—(১) এই জগৎ যেহেতু কার্য, অবশ্যই তার একটা কারণ থাকবে। কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু নিত্য, অপরিণামী, শুদ্ধ চেতন সত্তা, সেহেতু ঈশ্বর জগতের কারণ নয়, প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। (২) প্রকৃতির পরিচালক হিসেবে কোন সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সত্তা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নয়; কেননা ঈশ্বরের কর্ম-প্রবৃত্তির কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। স্বার্থ এবং করুণা, কোনটিই ঈশ্বরের কর্মপ্রবৃত্তির কারণ হতে পারে

ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে যুক্তি

না। (৩) জীবের স্বাধীন সত্তা ও অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। (৪) ঈশ্বর অসিদ্ধ, কারণ ঈশ্বর হয় বদ্ধ পুরুষ কিংবা মুক্ত পুরুষ, কিন্তু ঈশ্বর এ দুটির কোনটিই নয়। (৫) কর্মফলের সিদ্ধিদাতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ কর্ম স্বাভাবিকভাবে ফল প্রদান করে। বাচস্পতি মিশ্র ও অনিরুদ্ধের মতেও সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদী কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু ও কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাতার মতে সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদী নয়। বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও, ঈশ্বরকে এক আদি পুরুষরূপেই গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু গুণময়ী প্রকৃতি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চেতনা লাভ করে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং তারই ফলে জগৎসৃষ্টি।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর এক আদি পুরুষ

৭। যোগ দর্শন (The Yoga Philosophy) ঃ

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। মহর্ষি পতঞ্জলির নামানুসারে এই দর্শনের নাম পাতঞ্জল দর্শন। সাংখ্য ও যোগ একই দর্শনের দুটি ভিন্ন দিক। বস্তুতঃ, যোগ দর্শনে সাংখ্য দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগই সূচিত হয়েছে। যোগ দর্শন সাংখ্য দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব সাধারণভাবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং সাংখ্য দর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও অতিরিক্ত তত্ত্ব স্বীকার করেছে, সেটি হল ঈশ্বর। মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ যে বিবেকজ্ঞানের কথা সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে যোগ দর্শন তাকে স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু যোগ দর্শন মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ যোগসাধনার ওপরই অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছে।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা

সাংখ্যের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন—এই তিনের একীভূত অবস্থাই হ'ল চিত্ত। পতঞ্জলি সাধারণতঃ যোগসূত্রে চিত্তের কথাই বলেছেন। বিষয়ের সঙ্গে সংযোগের ফলে চিত্তের বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়ার নামই বৃত্তি। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমান, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রমাণ হ'ল যথার্থ জ্ঞান। প্রমাণ তিনভাবে সাধিত হয়—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। যে জ্ঞান বস্তুর যথাযথ স্বরূপের অনুরূপ নয়, সেই জ্ঞানই বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান। যেমন—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান। শুধু শব্দকে আশ্রয় করে আমাদের যে জ্ঞান হয়, যদিও সেই শব্দের অর্থানুসারে কোন বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব নেই, তাকেই বিকল্প বলা হয়। যেমন—আকাশকুসুম, অনন্ত। জাগ্রত চৈতন্য ও স্বপ্নকালীন অভিজ্ঞতার অভাবহেতু চিত্তে যে বৃত্তির উদয় হয় তাই হল নিদ্রা। অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরাবৃত্তিই হ'ল স্মৃতি। এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি অবস্থা বিশেষে আবার দু'প্রকার—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। যে

চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি

চিত্তবৃত্তি—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট

সকল চিত্তবৃত্তি ক্লেশদায়ক সেগুলিকে বলা হয় ক্লিষ্ট এবং যেগুলি ক্লেশনাশকারী সেগুলিকে বলা হয় অক্লিষ্ট। যে ভ্রান্তজ্ঞান দুঃখপ্রদ তাকেই ক্লেশ বলে। ক্লেশ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। সব ক্লেশের মূলে অবিদ্যা। অস্মিতাদি ক্লেশ সমূহের চারিটি অবস্থা—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে বস্তু আসলে যা নয় তাকে সেরূপ বলে স্থির করাই অবিদ্যা। অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান, অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান হ'ল অবিদ্যারূপ ক্লেশের লক্ষণ। আত্মাকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা অস্মিতা। এই অস্মিতা ক্লেশের ফলে পুরুষ নিঃসঙ্গ ও উদাসীন হয়েও নিজেকে কর্তা এবং ভোক্তা মনে করে। এই অস্মিতা থেকেই রাগ নামক ক্লেশের উৎপত্তি। রাগের অর্থ হ'ল আসক্তি। এই রাগ থেকে দ্বেষের উৎপত্তি। দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা হ'ল দ্বেষ। অভিনিবেশ হ'ল দ্বেষ। অভিনিবেশ হ'ল মৃত্যুভয়রূপ ক্লেশ। চিত্তে যখন পরিণাম বা বিকার ঘটে তখন আত্মা তাতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং বিবেকজ্ঞানের অভাবহেতু তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। ফলতঃ, জাগতিক বস্তুর প্রতি আত্মার সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ দেখা দেয়, এ হ'ল আত্মার বন্ধন। সুতরাং, মোক্ষ লাভ করতে হলে যাবতীয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ আবশ্যক।

যে ভ্রান্তজ্ঞান দুঃখপ্রদ তাই ক্লেশ

ক্লেশ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ

যোগের উদ্দেশ্য হ'ল অবিবেকজ্ঞান দূর করে বিবেকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যতক্ষণ চিত্তের পরিণাম বা বিকার থাকবে এবং আত্মা বা পুরুষের চৈতন্য তাতে প্রতিফলিত হবে, ততক্ষণ এই চিত্তবৃত্তিগুলি পুরুষ বা আত্মারই বৃত্তি বলে মনে হবে। সেই কারণেই যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তিনিরোধের কথা বলা হয়েছে। চিত্তের সহজ অবস্থার নাম চিত্তভূমি। চিত্তের পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা আছে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা যোগসাধনের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়, কেননা এই অবস্থাগুলিতে স্থায়িভাবে চিত্তসংযম এবং মনঃসংযোগ হয় না বলে এ অবস্থাগুলি যোগের উপযোগী হয়েও যোগাবস্থা নয়। 'একাগ্র' অবস্থা হ'ল চিত্তের কোন বিষয়ের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে স্থিরভাবে মনোযোগী হওয়া; কিন্তু এ অবস্থায়ও চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ ঘটে না। পঞ্চম চিত্তভূমির নাম নিরুদ্ধভূমি। এই অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন হয়। একাগ্র বৃত্তিতে চিত্তের কোন-না-কোন অবলম্বন থাকে কিন্তু নিরুদ্ধ অবস্থায় কোন অবলম্বনই থাকে না। নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত এবং শান্ত ও সমাহিত অবস্থায় থাকে।

চিত্তের পাঁচটি ভূমি—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ

যোগসাধনার উপযোগী ও অনুপযোগী অবস্থা

শেষোক্ত অবস্থা দুটিই যোগসাধনার উপযোগী। যোগ বা সমাধি প্রধানতঃ দু'প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত। ধ্যেয় বা ভাব্য বস্তুরজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয় না বলে প্রথমোক্ত সমাধির নাম 'সম্প্রজ্ঞাত' এবং কোন প্রকার বৃত্তি বা জ্ঞান থাকে না বলে দ্বিতীয় প্রকার সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত। ধ্যানের বিষয়ভেদে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, সমাধির শেষ স্তর। যখন কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় উপনীত হন তখন তিনি সকল ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভ করে মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ করেন।

সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগ

যোগ দর্শন মতে বিবেকখ্যাতিই দুঃখনাশের এবং কৈবল্য লাভের উপায়। বিবেকখ্যাতির অর্থ হ'ল আত্মা যে শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা এবং আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার থেকে পৃথক এই প্রখ্যাত জ্ঞান। চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় না হলে এই প্রখ্যাত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং বিবেকখ্যাতি জাগে যার ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি সাধনাকে যম বলা হয়। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচটিকে নিয়ম বলে। যোগাভ্যাস করার জন্য যেভাবে শরীরকে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ কোন ক্লেশের কারণ ঘটে না, তাকেই আসন বলে। আসন বহু প্রকার। যেমন—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, দণ্ডাসন, বীরাসন ইত্যাদি। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়ামের ফলে যোগের অন্তরঙ্গসাধনে যোগ্যতা হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে চিত্তের অনুগত করাই হ'ল প্রত্যাহার। বাহ্য বা অভ্যন্তর যে কোন অভীষ্ট বস্তুতে চিত্ত নিবিষ্ট করার নাম ধারণা। ধ্যেয় বস্তুতে যদি চিত্তের একতানতা জন্মায় তাহলে তাকে ধ্যান বলে। ধ্যান যখন গাঢ় হয় তখন ধ্যানের বিষয়ে চিত্ত এমনভাবে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে যে, চিত্ত ধ্যানের বিষয়ে লীন হয়ে যায়। চিত্তের এই জাতীয় অবস্থার নাম সমাধি।

বিবেকখ্যাতিই কৈবল্য লাভের উপায়। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে বিবেকখ্যাতি জাগে

যোগসাধনার মাধ্যমে যোগীরা নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি ও বিভূতির অধিকারী হন সত্য, কিন্তু এই সব সিদ্ধি কৈবল্য লাভের পক্ষে বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধক স্বরূপ। যোগীকে অবশ্যই এই সব অলৌকিক শক্তিলাভের প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে কৈবল্য বা মোক্ষলাভের জন্য যোগসাধনায় ব্রতী হতে হবে।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও আর এক তত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার করেছেন। এই কারণে পাতঞ্জল দর্শনের অপর এক নাম 'সেশ্বর সাংখ্য'।

যোগদর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব

যোগ দর্শনে ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলা হয়েছে। অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় যাকে স্পর্শ করতে পারে না, এরূপ পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে। ঈশ্বর সর্বক্লেশমুক্ত, সর্বদোষমুক্ত, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। মুক্ত পুরুষ ঈশ্বর নয়, কেননা তিনি বর্তমানে ক্লেশমুক্ত হলেও এককালে ক্লেশের অধীন ছিলেন। ঈশ্বরের কোন পূর্ব বন্ধন নেই, কোনও ভবিষ্যৎ বন্ধনের সম্ভাবনা নেই। ঈশ্বর নিত্যমুক্ত, নিত্য ঐশ্বর্যশালী।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ

ঈশ্বর এক বা অদ্বিতীয়। ঈশ্বর কূটস্থ, নিত্য, সর্বজ্ঞ, সর্বস্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞানের আকর। ঈশ্বর পরমগুরু। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ—(১) যা কিছু তারতম্যযুক্ত তার একটা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্তর স্বীকার করতে হয়, যেমন পরিমাণ। জ্ঞান এবং শক্তির ক্ষেত্রেও এই তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ পুরুষের জ্ঞান ও শক্তি সীমিত। সুতরাং ঈশ্বর হলেন পুরুষবিশেষ, যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। (২) পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটি বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন নিত্য সত্তার মধ্যে কিভাবে সংযোগ ঘটাতে পারে? একমাত্র কোন সর্বজ্ঞ শক্তিমান পূর্ণ চেতন পুরুষের দ্বারাই এই কাজ সম্ভব। এই পুরুষ হলেন ঈশ্বর, যিনি পুরুষবিশেষ। (৩) বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র ঈশ্বরকে পরমাত্মা, পরমপুরুষ, পরমতত্ত্ব ও জ্ঞানকর্তারূপে বর্ণনা করেছেন। শ্রুতি অভ্রান্ত প্রমাণ, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এছাড়া যোগশাস্ত্রমতে ঈশ্বরই শ্রুতির কর্তা বা রচয়িতা, কারণ স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট জীব কখনই শ্রুতির রচয়িতা হতে পারে না।

পুরুষের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই কৈবল্য

দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান, অর্থাৎ পুরুষের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই কৈবল্য। পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা। এই শুদ্ধ চৈতন্য সত্তায় যখন যখন বুদ্ধির ধর্ম আর প্রতিফলিত হয় না, পুরুষ যখন চৈতন্যমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন পুরুষের সেই স্বরূপ অবস্থানকেই কৈবল্য বলে।

৮। মীমাংসা দর্শন (The Mimāmsa Philosophy):

মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাসূত্রের প্রণেতা। এই গ্রন্থটিই মীমাংসা দর্শনের মূল গ্রন্থ। বেদ দুটি কাণ্ডে বিভক্ত—পূর্বকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড। মীমাংসা দর্শন পূর্বকাণ্ড বা কর্মকান্দ এবং বেদান্ত দর্শন উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্মের ও অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা ও সমর্থন করাই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। বেদান্ত দর্শন বেদের জ্ঞানের দিকটি অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মের

সঙ্গে জীবের সম্পর্ক প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বগুলি যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে আলোচনাতে নিযুক্ত। মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শন উভয়ই সাক্ষাৎভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে সময় সময় উভয়কেই একই নামে অর্থাৎ মীমাংসা নামে অভিহিত করা হয়। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ করে মীমাংসা দর্শনকে বলা হয় পূর্ব-মীমাংসা বা কর্মমীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শনকে বলা হয় উত্তর-মীমাংসা বা জ্ঞান-মীমাংসা। কারও কারও মতে মীমাংসা দর্শনকে 'পূর্ব-মীমাংসা' এবং বেদান্তকে 'উত্তর-মীমাংসা' বলার কারণ, মীমাংসা সূত্র, ব্রহ্মসূত্রের-পূর্বে রচিত হয়েছিল। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে মীমাংসা দর্শন যেহেতু বৈদিক বিধি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন নিয়ে আলোচনা করে এবং যেহেতু কর্ম আগে, জ্ঞান এবং মোক্ষ পরে; সেহেতু মীমাংসাকে 'পূর্ব-মীমাংসা' এবং বেদান্তকে 'উত্তর-মীমাংসা' নামে অভিহিত করা হয়। যা হোক, আমরা মীমাংসা দর্শন বলতে 'কর্ম মীমাংসাকে' বুঝি এবং 'উত্তর-মীমাংসাকে' বেদান্ত নামেই অভিহিত করে থাকি। মীমাংসা দর্শনের অপর এক নাম জৈমিনি দর্শন।

বেদের কর্মকাণ্ডের ওপর মীমাংসা দর্শন প্রতিষ্ঠিত

শবরস্বামী মীমাংসা সূত্রের একজন ভাষ্যকার। কুমারিল ভট্ট এবং প্রভাকর মিশ্র মীমাংসা দর্শনের খ্যাতনামা ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার। বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যার আলোচনায় উভয়ের মধ্যে মতবিভেদ লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের নামানুসারে মীমাংসা দর্শনে দুটি পৃথক শাখার উদ্ভব ঘটেছে—একটি প্রাভাকর সম্প্রদায় এবং অপরটি ভাট্ট সম্প্রদায়।

প্রাভাকর সম্প্রদায় এবং ভাট্ট সম্প্রদায়

যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালীকে বলা হয় প্রমাণ। জৈমিনির মতে প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। শব্দ প্রমাণ অর্থাৎ বেদকেই জৈমিনি শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ শব্দ প্রমাণের তুলনায় নিকৃষ্ট। প্রভাকরের মতে প্রমাণ পাঁচ প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি। কুমারিল প্রভাকরের পাঁচ প্রকার অনুমান ছাড়াও অনুপলব্ধিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি প্রমাণের ব্যাখ্যা নৈয়ায়িকদের ব্যাখ্যার অনুরূপ। কিন্তু উপমানের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে মীমাংসকরা তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নৈয়ায়িকদের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন।

প্রমাণের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ

মীমাংসকদের উপমানের ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয়েছে—কোন ব্যক্তি পূর্বে একটি গরু প্রত্যক্ষ করেছে, তারপর বনে গিয়ে সে 'গবয়' (নীলগাই) প্রত্যক্ষ করে বলল, 'এই গবয়টি গো সদৃশ'। গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞানই উপমান। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা চলে না, কারণ বনেতে কোন

উপমান

গরু উপস্থিত ছিল না। নৈয়ায়িকদের মতে সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তার জ্ঞানই হল উপমান। মীমাংসকদের মতে নৈয়ায়িকরা যেভাবে উপমানের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তাতে উপমানকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। যে অনিবার্য অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনা না করলে আপাতবিরোধের ক্ষেত্রে কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনাই হ'ল অর্থাপত্তি। দেবদত্ত জীবিত, অথচ সে তার বাড়িতে নেই। সুতারাং কল্পনা করতে হয় যে দেবদত্ত বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও আছে। এইরূপ কল্পনা না করলে দেবদত্তের বাড়িতে না থাকার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কুমারিল ভট্ট অভাবের জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুপলব্ধিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যখন আমরা বলি 'ঘরের মধ্যে কোন ঘট নেই', তখন ঘরের মধ্যে ঘটের অভাব অনুপলব্ধি প্রমাণের সাহায্যে জানা যায়। তখন ঘটকে প্রত্যক্ষ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, কিন্তু অনুপলব্ধিতে সেই সংযোগ ঘটে না। 'ঘরে ঘট নেই'—এই জ্ঞান আমরা লাভ করি ঘরের মধ্যে অন্য বস্তু-গুলি দেখে নয়, ঘরেতে ঘট না দেখে। প্রভাকরের মতে এই অনুপলব্ধি অনুমান ছাড়া কিছুই নয়।

অর্থাপত্তি

অনুপলব্ধি

জ্ঞান যথার্থ হয় কখন? মীমাংসকদের মতে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য কতকগুলি কারণের (conditions) যথাযথ উপস্থিতির প্রয়োজন আছে, যেগুলি উপস্থিত না থাকলে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেমন—জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় যদি উপস্থিত না থাকে, তাহলে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হতে পারে না। কাজেই জ্ঞানের কারণগুলি যদি যথাযথ উপস্থিত থাকে এবং সেগুলি যদি দোষমুক্ত হয় তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। যেমন, সুস্পষ্ট দিবালোকে সুস্থ ও ত্রুটিমুক্ত দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোন বিষয়ের যখন সংযোগ ঘটে তখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু দর্শন-ইন্দ্রিয় যদি অসুস্থ বা ত্রুটিযুক্ত হয়, কিংবা স্পষ্ট আলোকের যদি অভাব ঘটে, তাহলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। কাজেই জ্ঞানের কারণগুলি যথাযথ উপস্থিত থাকলে এবং কারণগুলি দোষমুক্ত হ'লে আমরা জ্ঞানকে যথার্থ বলে মনে করি এবং সেই জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির কারক হয়। এরই ভিত্তিতে মীমাংসকগণ দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—(১) জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, এবং (২) জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যথার্থ বলে জ্ঞাত হয়।

জ্ঞানের প্রামাণ্য

প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করেই মীমাংসকগণ জগতের সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করেন।

প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর সত্যতা প্রমাণিত হয়। মীমাংসকগণ বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও ক্ষণিকত্ববাদ এবং অদ্বৈতবেদান্তের মায়াবাদ স্বীকার করেন না। যা কিছু প্রত্যক্ষগোচর তার তো অস্তিত্ব আছেই। এছাড়াও অনুমান প্রভৃতির প্রমাণে সাহায্যে মীমাংসকগণ আত্মা, স্বর্গ, নরক ও যেসব দেবতাদের উদ্দেশ্যে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাদের অস্তিত্বও স্বীকার করেন। জগৎ-স্রষ্টারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসকগণ স্বীকার করেন না। মীমাংসকগণ বস্তুবাদী (realist) এবং বহুত্ববাদী (pluralist)।

জগতের সত্তা আছে, জগৎ মিথ্যা নয়

কার্যকারণ তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে মীমাংসকগণ বলেন যে, প্রত্যেক কারণে এক অপ্রত্যক্ষ শক্তি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজ করে এবং কোনরূপ বাধা উপস্থিত না হ'লে তা কার্য উৎপাদন করে। বীজের মধ্যে অঙ্কুর উৎপাদনের শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে এবং সে কারণেই বীজ অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হয়। কিন্তু যদি কোন কারণে বাধা উপস্থিত হয় তাহলে কার্য উৎপাদিত হয় না। যেমন—বীজকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হ'লে তার সেই অঙ্কুর উৎপাদনের প্রচ্ছন্ন শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়।

কারণের মধ্যে শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে

এই মতবাদের সাহায্যেই মীমাংসকগণ ব্যাখ্যা করেন যে, ইহলোকে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হলেই তা পরলোকে বাঞ্ছিত ফলদানে সমর্থ হয়। মীমাংসকদের মতে এই জন্মে যেসব যাগযজ্ঞ সম্পাদিত হয়, সেগুলি যজ্ঞকারীর আত্মার মধ্যে এক অপ্রত্যক্ষ শক্তি জন্মায় যাকে বলা হয় 'অপূর্ব'। এই শক্তি ঐ আত্মায় বর্তমান থাকে এবং প্রয়োজনমত যজ্ঞকারীকে তার কার্যের ফল প্রদান করে। অবশ্য এই অপূর্ববাদ কর্মবাদেরই ভিন্ন রূপ মাত্র।

ন্যায় বৈশেষিকদের মতে মীমাংসকগণও মনে করেন যে, আত্মা এক নিত্য ও বিভু দ্রব্য। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অতিরিক্ত সত্তা। আত্মা অবিনাশী, দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না। দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আত্মার বিনাশ ঘটত তাহলে স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিষয়টি অর্থহীন হয়ে পড়ে। কর্মফল ভোগের জন্যই আত্মা একটির পর একটি দেহ ধারণ করে। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, আগন্তুক ধর্ম। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখনই আত্মায় চেতনার আবির্ভাব ঘটে। সুষুপ্তি এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মার অস্তিত্ব থাকলেও, আত্মাতে চৈতন্যের উপস্থিতি থাকে না। আত্মার

আত্মা বা প্রকৃতি

আত্মার উপলব্ধি কিভাবে ঘটে—প্রাভাকর ও ভাট্ট মত

উপলব্ধি সম্পর্কে ভাট্ট ও প্রাভাকার মীমাংসকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ভাট্ট মতে যখনই আমরা কোন বিষয়কে জানি তখন বিষয়কে জানার সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও জ্ঞান হয় না। কেবলমাত্র অহংবৃত্তিতে, যখন আত্মাই জ্ঞানের বিষয় হয় তখনই আত্মাকে জানা যায়। কিন্তু প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে জ্ঞাতা কোন অবস্থাতেই জ্ঞেয় হতে পারে না।

মীমাংসা দর্শনে বেদের থেকে বড় কিছু নেই, সে কারণে মীমাংসকগণ ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করেন না, পাছে বেদের প্রাধান্যকে খর্ব করা হয়। মীমাংসকদের মতে 'চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'। 'চোদনা' কথার অর্থ বৈদিক বিধি। বৈদিক বিধি অনুযায়ী কর্তব্য করাই ধর্ম এবং তাই হ'ল সৎ কর্ম। যে কর্ম বেদনিষিদ্ধ তাই অধর্ম বা অসৎ কর্ম। বেদেতে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ রয়েছে। কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করতে হবে, যাগযজ্ঞ সম্পাদন বেদবিহিত। সুতরাং, সে কারণেই যাগযজ্ঞ করতে হবে, কোন পুরস্কারের লোভে নয়; কোন দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য নয় বা নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য নয়। তবে কর্মকর্তা কর্মফলের নিয়মানুযায়ী কর্মফল ভোগ করবেনই। বেদ শাশ্বত ও স্বতঃপ্রমাণ। বেদের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। যা সৃষ্ট তা অনিত্য। বৈদিক শব্দের নিত্যতা সব সন্দেহের অতীত।

বৈদিক বিধি অনুযায়ী কর্তব্য করাই ধর্ম

প্রাচীন মীমাংসকদের মতে স্বর্গলাভই জীবের পরম পুরুষার্থ এবং বেদবিহিত কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে এই স্বর্গলাভ ঘটে। স্বর্গ সুখ ও শান্তির চির আবাসস্থল। বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন ব্যতীত স্বর্গলাভ সম্ভব নয়, মীমাংসকদের মতানুযায়ী করণীয় কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে; যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য। প্রতিদিন যে কর্ম করণীয়, তাই নিত্যকর্ম, যেমন—সন্ধ্যা, বন্দনাদি। বিশেষ উপলক্ষে যে কর্ম সম্পাদন করা হয় তাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে। কোন ফল-লাভের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় তা হ'ল কাম্য কর্ম। কাম্য কর্মই বেদবিহিত কর্ম, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম লৌকিক কর্মের পর্যায়ভুক্ত; যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বৈদিক কর্ম। বৈদিক কর্মের দ্বারা কর্মকর্তা স্বর্গলোকে সুখলাভ করেন।

কর্মের শ্রেণীবিভাগ

পরবর্তীকালে মীমাংসকগণ মোক্ষকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। সকাম কর্মের জন্যই জীবের দুঃখভোগ এবং এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ। এই জগৎ দুঃখপূর্ণ—এই বিষয়টি জীব যখন উপলব্ধি করতে পারে তখন তার জগৎ ও জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়ে মনে বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং সকাম কর্ম-সম্পাদনের ইচ্ছা সে পরিত্যাগ করে। তারপর আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে নিষ্কাম ভাবে বেদবিহিত নিত্য কর্ম

মোক্ষই পুরুষার্থ

সম্পাদন করলে সঞ্চিত কর্মফলের বিনাশ ঘটে এবং নতুন কর্মফলভোগের সম্ভাবনা আর থাকে না; ফলে পুনর্জন্ম বন্ধ হয়ে যায়। মুক্ত অবস্থা সুখ বা আনন্দের অবস্থা নয়, কেননা আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়। মুক্ত আত্মার যেহেতু কোন চৈতন্য থাকে না, সেহেতু সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতিও থাকে না, তবে মোক্ষ অবস্থায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। মোক্ষ অবস্থায় আত্মা সুখদুঃখের অতীত অচেতন দ্রব্যরূপে বিরাজ করে।

মীমাংসকগণ কোন জগৎকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কর্ম নিয়মানুযায়ী জগৎসৃষ্টি এবং জীবের কর্মফলভোগ। সুতরাং, কর্মদাতারূপেও ঈশ্বরকে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। ম্যাক্সমূলারের মতে যেহেতু মীমাংসা দর্শন বেদনির্ভর, সেহেতু মীমাংসা দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী বলা চলে না। কিন্তু যেহেতু প্রাচীন মীমাংসকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই বলেননি এবং পরবর্তীকালের মীমাংসকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক প্রমাণগুলিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন, সেহেতু মীমাংসা দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলে অভিহিত না করে উপায় নেই। মীমাংসায় বৈদিক দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উল্লেখ থাকলেও, এরা জগৎকর্তা; জীবের কর্মফলদাতা বা জীবের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রক নয়। যেহেতু এইসব দেবতাদের উদ্দেশ্য করে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়, সে কারণেই এদের অস্তিত্ব বা সত্তা স্বীকার করা হয়। এরা বৈদিক প্রয়োজনসাধন করে মাত্র। যে মন্ত্রে যে দেবতার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান হয়, সেই মন্ত্রকেই সেই দেবতা বলে স্বীকার করে নিলে বিষয়ের ব্যাখ্যাটি সুস্পষ্ট হয়। মীমাংসা দর্শনে মন্ত্রের অতিরিক্ত কোন শরীরী দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি। বস্তুতঃ মীমাংসা দর্শনে বেদই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছে এবং অতিমাত্রায় বেদনির্ভর হওয়াতে কোন ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রচারের প্রয়োজন মীমাংসকগণ অনুভব করেননি।

মীমাংসা কি নিরীশ্বরবাদী?

৯। বেদান্ত দর্শন (The Vedanta Philosophy):

মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা। মহাভারত, পুরাণ এবং ভাগবৎ রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং বাদরায়ণ একই ব্যক্তি বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ সম্পর্কে মতবিভেদ আছে। বেদান্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'বেদের অন্ত বা শেষ'। বেদান্ত বলতে প্রধানতঃ উপনিষদকেই বোঝায়। উপনিষদকে বেদের অন্ত বলার কারণ উপনিষদ বেদের সর্বশেষ অংশ। বেদের তিনটি অংশের মধ্যে সংহিতা, তারপর ব্রাহ্মণ এবং তারপর উপনিষদ। পাঠক্রম অনুসারেও প্রথমে বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা, দ্বিতীয়তঃ আরণ্যক

বেদান্ত শব্দের অর্থ

এবং সর্বশেষে উপনিষদের স্থান। বৈদিক চিন্তাধারার সর্বোচ্চ ও পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে উপনিষদে।

'উপনিষদ' শব্দের অর্থ হল 'যা মানুষকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের কাছে নিয়ে যায়', বা 'যা শিষ্য গুরুর কাছে এসে শিক্ষা করে'। বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপনিষদেই প্রকাশিত, সে কারণে উপনিষদকে বেদোপনিষদ নামে অভিহিত করা হয়।

উপনিষদ শব্দের অর্থ

উপনিষদ সংখ্যায় অনেক এবং এইসব উপনিষদে যেসব দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদ উদ্ভূত এইসব মতামতগুলির মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন মতবাদগুলিকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেছিলেন। ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়, সে কারণে বেদান্ত দর্শনকে ব্রহ্মসূত্র নামেও অভিহিত করা হয়। ব্রহ্মসূত্র বেদান্তসূত্র, শারীরিক মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা নামেও পরিচিত। ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়াতে ব্রহ্মসূত্রের ওপর বিভিন্ন ভাষ্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সব ভাষ্যকারদের কেন্দ্র করে এক-একটি বেদান্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই ভাষ্যকারদের মধ্যে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নির্বাক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে শঙ্কর ও রামানুজের মতবাদই সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ।

ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। জীবাত্মা ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন তা প্রমাণ করাই বেদান্ত দর্শনের লক্ষ্য। বেদান্ত মতে 'সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম'—সমস্তই, ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জগতের মূল কারন। জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বৈদান্তিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদের প্রচারক, তাঁর মতে জীব ও ব্রহ্ম দুটি ভিন্ন তত্ত্ব। শঙ্করাচার্য ও রামানুজ উভয়ে বাদরায়ণকে অনুসরণ করে অদ্বৈতবাদ প্রচার করলেও, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ কৈবলা-দ্বৈতবাদ এবং রামানুজের অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত।

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবাদ

ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার প্রশস্তি লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে কারও কারও মতে বেদবহু ঈশ্বরবাদী, কিন্তু ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতা একই সত্তার প্রকাশ, একথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। পুরুষ সূক্তে এক মহাপুরুষের এবং নাসদীয় সূক্তে এক নির্বিশেষ পরমসত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পরমতত্ত্ব বা এক সর্বব্যাপী সত্তার ধারণা যা বৈদিক ঋষিদের অন্তর্দৃষ্টির কাছে ধরা পড়েছে,

ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে এক সর্বব্যাপী সত্তার ধারণা পাওয়া যায়

তাই যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আলোচিত হয়ে উপনিষদে একটা সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত দার্শনিক মতবাদরূপে গড়ে উঠেছে। এই পরমসত্তাকেই উপনিষদে কখনও আত্মা বা কখনও কেবলমাত্র সৎ বলে অভিহিত করা হয়েছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধি কোনটির সঙ্গেই অভিন্ন নয়। আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। উপনিষদে আত্মজ্ঞান বা আত্মবিদ্যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা পরাবিদ্যা এবং অন্যান্য জ্ঞানকে অপরাবিদ্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে। আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়। যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানে স্বর্গলাভ ঘটতে পারে কিন্তু মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। উপনিষদে ব্রহ্মকে কেবল সত্য বা জ্ঞানস্বরূপ নয়, আনন্দস্বরূপ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম সত্যই জগৎস্রষ্টা এবং সৃষ্ট জগৎ সত্য। আবার কোথাও কোথাও এমন বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম আদৌ জগৎস্রষ্টা নন, জগৎ মিথ্যা অবভাস মাত্র। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে এই সকল মতবাদের যাথার্থ্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে বিভিন্ন ভাষ্যকার বেদান্তসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন। এই সকল ভাষ্যের মধ্যে দুটি ভাষ্য বা মত বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। একটি শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ও অপরটি রামানুজের ভাষ্য। উভয় মত একই বেদান্ত সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। শঙ্করাচার্যের মতে সৃষ্টি মিথ্যা, ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা নন এবং রামানুজের মতে সৃষ্টি সত্য, ব্রহ্মই জগৎস্রষ্টা। শঙ্করাচার্যের মতবাদ 'কৈবলাদ্বৈতবাদ' বা 'অদ্বৈতবাদ' এবং রামানুজের মতবাদ 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। উভয়েই প্রমাণ এবং প্রয়োগে শ্রুতির ওপরই নির্ভর করেছেন।

শঙ্করভাষ্য ও রামানুজভাষ্য

শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদী। শঙ্করের মতে সবই ব্রহ্ম। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে, জগতের কোন যথার্থ সত্তা নেই। জগৎ প্রপঞ্চ সত্য নয়, মিথ্যা অবভাসমাত্র। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। 'জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ'। জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সব, জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন; শঙ্করের মতে জীবাত্মাই ব্রহ্ম। জীবাত্মা এবং ব্রহ্ম অভিন্ন।

ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে

ব্রহ্ম, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরাকার ও নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মের মধ্যে স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত কোনরূপ ভেদাভেদ নেই। ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন, তাহলে ব্রহ্মকে কখনও জগতের স্রষ্টা, সংরক্ষক এবং সংহারকরূপে কল্পনা করা যেতে পারে না। আবার জগৎ

যদি সত্য হয় তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জগৎ বিনষ্ট হতে পারে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে অসৎ বিনষ্ট হতে পারে, কিন্তু সৎ-এর বিনাশ ঘটতে পারে না। শঙ্করের মতে যা সৎ তা কখনও অসৎ এবং যা অসৎ তা কখনও সৎ হতে পারে না। কোন বস্তুর পক্ষে একই সময়ে সৎ ও অসৎ হওয়া সম্ভব নয়। এই জগতের কোন সত্তা বা সত্যতা নেই। এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত মিথ্যা অবভাস মাত্র। শুধুমাত্র জড়জগৎ নয়, মনোজগতেরও কোন সত্তা নেই। একমাত্র চৈতন্য বা আত্মাই সৎ পদার্থ।

ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ

ব্রহ্ম মায়াশক্তি প্রভাবে জগৎরূপে প্রকাশিত হন এবং অবিদ্যাবশতঃ মানুষ জগতের সত্তা আছে বলে ধারণা করে। আত্মজ্ঞানের উদয় হলেই ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য, ব্রহ্মেরই সে সত্তা আছে এবং জগতের কোন যথার্থ সত্তা নেই এই সত্যের উপলব্ধি ঘটে।

শঙ্করের মতে জগৎ মায়ার সৃষ্টি। শঙ্করের মতে এই মায়া এক অনির্বচনীয় শক্তি। মায়া সৎ নয়, কেননা তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ নয়, মায়াও নয়। আবার মায়া অসৎও নয়, কেননা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎ সাধারণ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষের বিষয়। পাছে কেউ মনে করেন যে, ব্রহ্ম এবং মায়া—এই দুই সত্তার স্বীকৃতিতে অদ্বৈতবাদের হানি ঘটেছে, সেহেতু শঙ্কর বলেন যে, ব্রহ্ম ও মায়া অভিন্ন। অগ্নির দাহিকাশক্তিকে যেমন অগ্নি থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনি ব্রহ্মের মায়াশক্তিকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক করা যায় না।

মায়া অনির্বচনীয় শক্তি

শঙ্করের মতে অজ্ঞানতাবশতঃই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। দৈনন্দিন জীবনের অধ্যাস বা ভ্রম প্রত্যক্ষের (illusion) সাহায্যে শঙ্কর বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপই হ'ল অধ্যাস। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম, রজতে শুক্তিভ্রম। এই অধ্যাসকে বিশ্লেষণ করলে দুইটি বিষয় দেখা যায়। প্রথমতঃ, প্রতি অধ্যাসের ক্ষেত্রে একটি অধিষ্ঠান থাকে, যার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাব ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই বস্তুতে অন্য এক মিথ্যা বস্তুর আরোপ। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম—এই অধ্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমে রজ্জুর যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ঘটে এবং রজ্জুতে মিথ্যা সর্পের আরোপ করা হয়। কাজেই অবিদ্যার দু'টি শক্তি—একটি আবরণশক্তি ও অপরটি বিক্ষেপশক্তি। অবিদ্যা আবরণশক্তির দ্বারা প্রথমে অধিষ্ঠানকে আবৃত করে এবং বিক্ষেপশক্তির সাহায্যে মিথ্যা বস্তুর সৃষ্টি করে। শঙ্করের মতে অবিদ্যাবশতঃই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। অবিদ্যা তার আবরণশক্তির দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মকে বা আত্মাকে আবরণ করে এবং তারপর ব্রহ্মে জগৎ

অজ্ঞানতাবশতঃই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়

বিক্ষেপ করে জগৎ প্রপঞ্চ বোধ করায়। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালশক্তি যেমন অজ্ঞ দর্শককে প্রতারিত করে, ঐন্দ্রজালিক নিজে যেমন তার দ্বারা প্রতারিত হন না তেমনি ব্রহ্মের মায়াশক্তি অজ্ঞ ব্যক্তিকেই প্রতারিত করে, ব্রহ্ম তার দ্বারা প্রতারিত হন না। ব্রহ্মকে জগৎ জ্ঞান, অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান, সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান—এ সবই অধ্যাসমূলক। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অধ্যাস বিনষ্ট হয়। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে, ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে এবং জগৎ মিথ্যা অবভাস মাত্র।

শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। পরিমাণবাদ অনুসারে কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। যেমন, ঘট মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম। পরিণামবাদীদের মতে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং সৃষ্টির মাধ্যমে অব্যক্ত জগৎ ব্রহ্মে কার্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। বিবর্তবাদ অনুসারে কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম নয়, কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। সৎ ব্রহ্ম মায়াশক্তির প্রভাবেই মিথ্যা জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন।

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত

শঙ্করের মতে ব্রহ্মকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ সত্য; ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, সংরক্ষক ও সংহারক। ব্রহ্ম অনন্তশক্তিসম্পন্ন, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সক্রিয় ও মায়াশক্তি-বিশিষ্ট। এই ব্রহ্ম হলেন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এই সগুণ ব্রহ্মই পূজা এবং উপাসনার বস্তু। সগুণ ব্রহ্মের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম অসীম, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবাত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। যেহেতু ব্রহ্ম অসীম, সেহেতু নির্গুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম নির্বিশেষ। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত সকল প্রকার ভেদরহিত। শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরোপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার উপায়স্বরূপ।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ সত্য, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা

শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন আত্মাই ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্যেই আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মা দেহ ও মনের সঙ্গে অভিন্ন নয়, আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় প্রকার শরীরই অবভাস। আত্মা নিত্য, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, অখণ্ড এবং অনাদি। আত্মা সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। সাধারণ অভিজ্ঞতার তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। সুষুপ্তিকালে শুধু আত্মচৈতন্য থাকে, কোন বিষয় বা বিষয়ের স্মৃতি থাকে না, যা জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থায়

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন

বিদ্যমান থাকে। সুষুপ্তিতেই জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপের আভাস লাভ করা যায়। সাধক তুরীয় অবস্থায় এই স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন।

জীবাত্মা স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। অবিদ্যাহেতু অনাত্মার সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করার জন্যই জীবের বন্ধদশা। অজ্ঞানতাবশতঃ জীব নিজেকে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা মনে করে এবং জাগতিক সুখ-দুঃখ, রোগ-শোককে নিজের সুখ-দুঃখ বলে অনুভব করে। আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানের অভাবই জীবের বন্ধদশার কারণ।

অনাত্মার সঙ্গে আত্মার একাত্মতা-বোধই জীবের বন্ধনের কারণ

এই বন্ধদশা থেকে মুক্তিলাভের উপায় কি? শঙ্করের মতে আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। জীব আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, জীব উপলব্ধি করে যে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, জীবের যখন এই জ্ঞান হয় তখনই জীবের মোক্ষলাভ ঘটে। শঙ্করের মতে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করে, সেহেতু অজ্ঞানতাপ্রসূত ও অদ্বৈতজ্ঞানের অন্তরায়স্বরূপ। শঙ্করের মতে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য চতুর্বিধ সাধনার প্রয়োজন, নিত্য ও অনিত্য বস্তুর ভেদাভেদ সম্পর্কে জ্ঞান, ইহলোক ও পরলোকের ফলভোগে বিরাগ বা অনাসক্তি, অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহের সংযম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ভোগবিরাগ, চিত্তের একাগ্রতা, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস এবং মুক্তিলাভের জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা। এই সাধন চতুষ্টয় মুমুক্ষু ব্যক্তিকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী করলে মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান বা গুরুর কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করবেন।

মোক্ষলাভের উপায়

শঙ্করের মতে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মজ্ঞান লাভের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রথমে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাসহকারে গুরুর কাছ থেকে উপনিষদের বাণী শ্রবণ করতে হবে। তারপর যুক্তিতর্কের সাহায্যে এই উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। একে বলা হয় মনন; সর্বশেষে গুরুর কাছ থেকে লব্ধ এই জ্ঞান নিরন্তর ধ্যান করতে হবে। এইভাবে আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানতা দূরীভূত হবে, তখন গুরু তাকে 'তত্ত্বমসি'— এই শ্রুতিবাক্যের উপদেশ দেবেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি এই ঔপনিষদিক বাণীর নিরন্তর ধ্যান করবেন এবং সর্বশেষে 'সোঽহম্' (আমিই ব্রহ্ম) এই সত্যের উপলব্ধি হবে; এইভাবে আত্মার স্বরূপের জ্ঞান হলে জীবের মোক্ষলাভ হবে। মোক্ষলাভের পরেও জীবের দেহধারণ চলতে পারে, তবে তখন জীবের মধ্যে আর কোন দেহাত্মবোধ থাকে না। জগতের প্রতি তখন তার কোন আসক্তি থাকে না, একে বলা হয় জীবন্মুক্তি। পূর্বজন্মের কর্মফলভোগ সমাপ্ত

জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব জ্ঞানই মোক্ষ

হলে, তার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় এবং তখনই বিদেহমুক্তি ঘটে। মোক্ষ কেবলমাত্র দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিমাত্র নয়, এক আনন্দঘন অবস্থা। কারণ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব জ্ঞানই মোক্ষ।

রামানুজের অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। রামানুজের মতে ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে। চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মের দুটি অংশ। ব্রহ্ম নির্বিশেষ বা নির্গুণ বলতে ব্রহ্মের গুণ নেই বা তাঁর কোন বিশেষণ নেই বোঝায় না। ব্রহ্ম নির্গুণ বলতে বোঝায় ব্রহ্ম গুণাতীত। ব্রহ্মের কোন অসদ্‌গুণ নেই। ব্রহ্ম নির্বিশেষ নয়, বিশেষণযুক্ত। ব্রহ্ম জগৎবিশিষ্ট, কাজেই ব্রহ্ম সবিশেষ এবং সগুণ। ব্রহ্ম অসংখ্য সদ্‌গুণের আধার। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সক্রিয় এবং জ্ঞান ও ঐশ্বর্যযুক্ত। রামানুজ ব্রহ্মের সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ স্বীকার করেন না, কেবলমাত্র স্বগতভেদ স্বীকার করেন। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা, কিন্তু চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মের দুই অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিৎ এবং অচিৎ উভয় অংশই নিত্য, চিৎ অংশ থেকে জড়জগতের এবং অচিৎ অংশ থেকে জীবজগতের উৎপত্তি। রামানুজের মতে এই জগৎ মিথ্যা বা অবভাস নয়, জীব এবং জগৎ উভয়েরই সত্তা আছে। রামানুজের মতে ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্তা। ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

চিৎ এবং অচিৎ-ব্রহ্মের দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ

রামানুজ সৎকার্যবাদের এবং পরিণামবাদের সমর্থক। সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে। সৃষ্টির পূর্বে এই জীব চিৎশক্তিরূপে এবং জড়-জগৎ অচিৎশক্তিরূপে ব্রহ্মেই নিহিত থাকে। উর্ণনাভ যেমন নিজের দেহের অভ্যন্তর থেকে তন্তু নির্গত করে জাল তৈরি করে, ব্রহ্মও তেমনি নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। পরিণামবাদ অনুসারে কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম। সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্যও মিথ্যা নয়। প্রলয়কালে যখন জগৎ ধ্বংস হয়ে যায় তখন চিৎ এবং অচিৎ অব্যক্তভাবে ঈশ্বরে অবস্থান করে, তখন ব্রহ্মকে বলা হয় **কারণ ব্রহ্ম।** আবার, সৃষ্টির পরে যখন ব্রহ্মের চিৎ অংশ এবং অচিৎ অংশ যথাক্রমে জীবজগৎ এবং জড়জগৎরূপে প্রকাশিত হয় তখন ব্রহ্মের এই অবস্থাকে বলা হয় **কার্য ব্রহ্ম।** অর্থাৎ, ব্রহ্ম হলেন কারণ ব্রহ্ম এবং জগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম হলেন কার্য ব্রহ্ম। নানা উপমার সাহায্যে, কখনও বা অংশ-অংশী বা দেহ-আত্মা বা রাজা-প্রজা প্রভৃতির সাহায্যে রামানুজ ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত জড়দ্রব্য ও জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধকে

রামানুজ সৎকার্যবাদের এবং পরিণামবাদের সমর্থক

কারণ ব্রহ্ম ও কার্য ব্রহ্ম

মায়া অবিদ্যা নয়

ব্যাখ্যা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। রামানুজের মতে মায়া অবিদ্যা বা জ্ঞানের অভাব নয়, মায়া হল এক ভাব পদার্থ। যে অচিন্ত্যনীয় বিস্ময়কর শক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করেন তাই হল মায়া। রামানুজের মতে সৃষ্টজগৎ ও ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য—উভয়েরই সত্যতা আছে, কোনটি মায়া বা ভ্রান্তি নয়।

রামানুজের মতে জীব দেহবিশিষ্ট আত্মা। দেহ বা আত্মা কোনটিই অসীম নয়, উভয়ই সসীম। আত্মা সর্বব্যাপী বলতে বোঝায় যে, আত্মা যেহেতু খুব সূক্ষ্ম, সেহেতু যে কোন অচেতন দ্রব্যের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। একটি প্রদীপ যেমন সমস্ত কক্ষটিকে আলোকিত করতে পারে, সেরূপ আত্মা যে দেহে অধিষ্ঠিত হয়, সেই দেহের সমগ্র অংশকেই চৈতন্যের আলোকে আলোকিত করে তোলে। আত্মা নিত্য ও অণুপরিমাণ। চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ নয় বা চৈতন্য আত্মার স্বরূপও নয়। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক নিত্য গুণ। সুষুপ্তি অবস্থায় এবং মোক্ষ কালেও আত্মা অহংরূপে প্রকাশিত হয়।

চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক নিত্য গুণ

রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও জীব একান্তভাবে অভিন্ন নয়। জীব ব্রহ্মের অংশ, কাজেই অংশের সঙ্গে অংশীর একান্ত অভেদ কল্পনা করা যেতে পারে না। আবার জীবকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলা চলে না। কারণ অংশের অংশী থেকে, গুণের দ্রব্য থেকে এবং চেতন দেহের আত্মা থেকে পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব নয়, কাজেই ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ। একই ব্রহ্মের দুটি ভিন্ন রূপের অভেদের কথাই রামানুজ স্বীকার করেছেন। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি'—এই শ্রুতিবাক্যের আসল তাৎপর্য হল দু'প্রকার গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ। 'তৎ' শব্দের দ্বারা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্ম এবং 'ত্বম্' শব্দের দ্বারা জীব শরীরধারী ব্রহ্মকে বুঝতে হবে। সুতরাং, এ হল বিশিষ্টের অদ্বৈত বা জীবরূপী ব্রহ্মের অভিন্নতা। এই কারণে রামানুজের দর্শনকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করা হয়।

ব্রহ্ম ও জীব একান্তভাবে অভিন্ন নয়, এ হল ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ

রামানুজের মতে কর্মফলভোগহেতু জীবের বন্ধদশা। নিজ নিজ কর্মানুযায়ী প্রতিটি জীবাত্মা একটি জড়দেহ ধারণ করে। আত্মার বন্ধদশা মানেই হল আত্মার দেহধারণ। অবিদ্যাপ্রসূত কর্মই বন্ধদশার কারণস্বরূপ। আত্মা তার নিত্য স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানতার জন্য দেহের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। একেই বলা হয় অহঙ্কার। অহঙ্কারবশতঃই আত্মা জাগতিক সুখের জন্য লালায়িত হয় এবং জাগতিক সুখভোগে নিমগ্ন হয়। এরই জন্য তাকে সকাম কর্ম সম্পাদন করতে হয় এবং তার ফলে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। বেদান্তপাঠের দ্বারা এই অবিদ্যা দূরীভূত হলে জীব উপলব্ধি করে যে, আত্মা দেহ

থেকে ভিন্ন এবং আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অংশ। কর্ম বা জ্ঞান উভয়ের সংযোগেই মোক্ষলাভ ঘটে। নিষ্কামভাবে বেদবিহিত নিত্যকর্মগুলি সম্পাদন করলে অতীতকর্মের সঞ্চিত ফল বিনষ্ট হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানলাভের ইচ্ছা জাগে। রামানুজের মতে কর্মমীমাংসা অধ্যয়ন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়ার প্রস্তুতি পর্ব। কর্মমীমাংসা অধ্যয়ন ও নিষ্কামভাবে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেই মুমুক্ষু ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে, কর্মের দ্বারাই শুধু মোক্ষলাভ ঘটে না। মোক্ষের জন্য জ্ঞানলাভও অপরিহার্য। সে কারণে তার বেদান্ত অধ্যয়নের ইচ্ছা জাগে। বেদান্তপাঠে তিনি অবহিত হন যে, ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কর্তা এবং জীবাত্মা ও দেহ অভিন্ন নয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি আরও উপলব্ধি করে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। ঈশ্বর যেহেতু করুণাময়, সেহেতু ভক্তকে তিনি তার বাঞ্ছিত ফলদান করেন।

আত্মার দেহধারণই বন্ধদশা

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষ আনয়ন করে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান মানে উপনিষদের আক্ষরিক জ্ঞান নয়। তাহলে যে-কেউ বেদান্তপাঠে মোক্ষলাভ করত। রামানুজের মতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাকে রামানুজ বলেছেন আর্ত-প্রপত্তি। এর অভাব ঘটলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায় না। ভক্ত যখন ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, নিরন্তর প্রেমময় ঈশ্বরের ধ্যান করে তখনই ভক্তের ঈশ্বর-সাক্ষাৎ ঘটে। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হলে ঈশ্বর-প্রসাদে ভক্তের মধ্যে পূর্ণ জ্ঞানের উদ্ভব হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তখন জীব সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। রামানুজের মতে জীবন্মুক্তি সম্ভব নয়, বিদেহমুক্তি সম্ভব। মোক্ষলাভের পরেও জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না। কারণ, সসীম জীবাত্মার পক্ষে অসীম ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা সম্ভব নয়। তবে মোক্ষ অবস্থায় জীবের চৈতন্য দোষমুক্ত হওয়াতে ব্রহ্মের সদৃশ হয়।

জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সংযোগ

এইভাবে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কর্ম ও জ্ঞানের, পরব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বরবাদের এবং জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কল্পনা এবং ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের কথা বলার জন্য রামানুজের দর্শন সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কবিচারের ওপর নির্ভর করে শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, মুক্তিকামী মানুষের কাছে তার আবেগ চির অক্ষুণ্ণ থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ন্যায়দর্শন

(The Nyāya Philosophy)

১। ভূমিকা (Introduction):

ন্যায়দর্শন আস্তিক বস্তুবাদী দর্শন। একে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু এ দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে এবং এ দর্শন বস্তুবাদী, যেহেতু এর মতে জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর স্বাধীন সত্তা আছে। কিন্তু ন্যায় দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করলেও স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'নীয়তে অনেন ইতি ন্যায়ঃ'। এই শাস্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বুদ্ধি মীমাংসায় উপনীত হয় বলে এই শাস্ত্রকে 'ন্যায়' বলা হয়। সংশয় নিরসন করে সিদ্ধান্ত স্থাপন করার উপায়কে 'ন্যায়' বলে। যুক্তিতর্কের সাহায্যে অপরকে কিছু বলতে গেলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, সেই পদ্ধতিকে 'ন্যায়' বলে। বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে বস্তুর যথাযথ স্বরূপ বা তত্ত্ব নিরূপণ করাকেও 'ন্যায়' বলে।

ন্যায়-দর্শন আস্তিক বস্তুবাদী দর্শন

মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অক্ষপাদ নামেও পরিচিত। তাঁর নামানুসারে তাঁর দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শনও বলা হয়। ন্যায়দর্শন প্রধানতঃ যথাযথ জ্ঞান-লাভের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। কি উপায়ে বা কোন্ কোন্ বিধি অনুসরণ করে যুক্তিতর্ক করলে আমরা যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারি—ন্যায়দর্শন প্রধানতঃ তারই আলোচনা করে। এই কারণে ন্যায়দর্শনকে 'তর্কশাস্ত্র' বা বাদবিদ্যাও বলা হয়। যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালীকে 'প্রমাণ' বলা হয়। ন্যায়দর্শন 'প্রমাণ' নিয়ে আলোচনা করে বলে, ন্যায়-দর্শনকে প্রমাণশাস্ত্রও বলা হয়ে থাকে। 'আন্বীক্ষিকী' ন্যায়দর্শনের আর একটি নাম। প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে যা জানা যায়, সে বিষয় পরে আলোচনা করার নাম হল অন্বীক্ষা।[1] ন্যায়শাস্ত্র প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানকে পুনরায় বিচার করে দেখে বলেই তাকে আন্বীক্ষিকী বলা হয়। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎসায়ন আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে 'সকল বিদ্যার প্রদীপ'[2] বলে অভিহিত করেছেন।

মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা

ন্যায়দর্শনের বিভিন্ন নাম

---

1. অন্বীক্ষা: অনু-অর্থে পশ্চাৎ এবং ঈক্ষা অর্থে দর্শন।
2. সেয়মান্বীক্ষিকী:
"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা'।—বাৎসায়ন, ন্যায়ভাষ্য।

যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করলেও যুক্তিতর্ক করাই ন্যায়শাস্ত্রের কেবলমাত্র কাজ নয়। ন্যায়শাস্ত্র তত্ত্ববিদ্যার বিভিন্ন সমস্যা—যেমন, জীব ও জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কেও আলোচনা করে। কিভাবে মানুষ তার জীবনের পরমার্থ (*Sumum Bonum*) বা মোক্ষ লাভ করতে পারে তাহল ভারতীয় দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ন্যায়শাস্ত্র তত্ত্ববিদ্যার বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও আলোচনা করে

এই মোক্ষ বা মুক্তি ন্যায়দর্শনেরও আলোচ্য বিষয়। কিন্তু মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করতে হলে তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য যথার্থ জ্ঞানের প্রণালী নিরূপণ করা দরকার। সে কারণে ন্যায়-শাস্ত্রে জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) আলোচনাও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে

সুতরাং, যদিও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মতে ন্যায়-শাস্ত্র জীবনদর্শন ও জগদ্দর্শন তবুও তর্কশাস্ত্রের ও জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাই ন্যায়-শাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে।

ন্যায়দর্শনের ওপর একাধিক রচনা বর্তমান। গৌতমের 'ন্যায়সূত্রই' ন্যায়দর্শনের প্রথম রচনা। পরবর্তী বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে বাৎসায়নের 'ন্যায়ভাষ্য,' উদ্দ্যোতকরের 'ন্যায়বার্তিক,' বাচস্পতি মিশ্রের 'ন্যায়-বার্তিক তাৎপর্য টীকা,' উদয়নের 'ন্যায়-বার্তিক তাৎপর্য পরিশুদ্ধি' এবং 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি,' জয়ন্তভট্টের 'ন্যায়-মঞ্জরী'র নাম উল্লেখযোগ্য।

ন্যায়ের দুটি শাখা—প্রাচীন ন্যায় এবং নব্য ন্যায়। উপরিউক্ত রচয়িতারা সকলেই প্রাচীন ন্যায়দর্শন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সব নৈয়ায়িকদের প্রধান কাজ ছিল—ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা করা এবং প্রতিপক্ষের সমালোচনা খণ্ডন করা। মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্বচিন্তামণি'কে কেন্দ্র করে নব্য ন্যায়ের উদ্ভব। গঙ্গেশের পুত্র বর্ধমান 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ' এবং 'ন্যায়-নিবন্ধ প্রকাশ' নামে দুটি ন্যায় ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও রুচিদত্ত মিশ্র তত্ত্বচিন্তামণির ওপর 'প্রকাশ' এবং ন্যায়কুসুমাঞ্জলির ওপর 'মকরন্দ' রচনা করেছিলেন। জয়দেব মিশ্রের 'আলোক,' মথুরানাথ তর্কবাগীশের 'রহস্য,' রঘুনাথ শিরোমণির 'দীধিতিপ্রকাশ,' জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'তর্কস্মৃতি ও মাথুরী' এবং গদাধর ভট্টাচার্যের 'গদাধরী' উল্লেখযোগ্য রচনা। বিশ্বনাথের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' ও 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নব্য-ন্যায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ন্যায়ের জনপ্রিয়তা অনেকাংশে কমে যায়।

নব্য নৈয়ায়িকগণ ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের সমন্বয়-সাধন করলেন এবং বৈশেষিকদের সাতটি পদার্থকে স্বীকার করে নিলেন।

ন্যায় দর্শনের আলোচনায় চারটি অংশ লক্ষ্য করা যেতে পারে ; যথা—
(১) জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা, (২) জড়জগৎ সম্পর্কে আলোচনা, (৩) জীবাত্মার স্বরূপ ও মোক্ষ সম্পর্কে আলোচনা এবং (৪) ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা।

২। পদার্থ (Padārthas) :

ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা। পদার্থ কাকে বলে ? 'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ'। পদ দ্বারা যে বিষয় নির্দিষ্ট হয় তাই পদার্থ।'[1]

ষোল প্রকার পদার্থ

মোক্ষলাভ জীবের লক্ষ্য এবং পদার্থ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জীবের মোক্ষলাভের পক্ষে প্রয়োজন। এই ষোলটি পদার্থ সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে—

প্রমাণ

(১) প্রমাণ : যিনি জ্ঞাতা তাকে বলা হয় প্রমাতা। প্রমাতা যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তাকে বলা হয় প্রমেয়। যে প্রণালী দ্বারা যথার্থ জ্ঞান বা 'প্রমা' জন্মে তাকে প্রমাণ বলা হয়। প্রমাণ চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ।

প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ—এই তিনটির কোন একটির অভাব হলে জ্ঞান সম্ভব হয় না।

প্রমেয়

(২) প্রমেয় : প্রমেয় হল জ্ঞানের বিষয়। ন্যায়দর্শন অনুসারে জ্ঞানের বিষয় মোট বারটি। যথা—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় বা অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি[2] (activity), দোষ[3], প্রেত্যভাব অর্থাৎ পুনর্জন্ম ও পুনঃপুনঃ মৃত্যু, ফল,[4] দুঃখ এবং মোক্ষ।

সংশয় বা সন্দেহ

(৩) সংশয় বা সন্দেহ : অনিশ্চিত জ্ঞানই হল সংশয়। একই সময়ে একটি বস্তুতে যখন বিপরীত ধর্ম বা গুণের উপস্থিতির কথা চিন্তা করা হয়, তখনই সংশয় দেখা দেয়। চার্বাকরা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। নৈয়ায়িকরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু একই সময়ে আত্মার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই স্বীকার করা চলে না ; সেহেতু সংশয় দেখা দেয়, আত্মা আছে কি নেই। দূরে একটি বস্তুকে দেখে মনে হয় ওটি রজ্জুও হতে পারে, সর্পও হতে পারে।

---

1. 'মানুষ যা কিছু জানতে পারে, যা কিছু প্রমাণ দ্বারা বুঝতে পারে, যার নাম নির্দেশ করতে পারে, অর্থাৎ যা কিছু মনুষ্যবুদ্ধির জ্ঞেয়, প্রমেয় এবং অভিধেয় তৎসমুদয়ই পদার্থ।

2. প্রবৃত্তি শুভ বা অশুভ হতে পারে। প্রবৃত্তি তিন প্রকার—বাচনিক, মানসিক এবং শারীরিক।

3. রাগ, দ্বেষ ও মোহ।

4. সুখ-দুঃখের অনুভূতি।

সুতরাং, বস্তুটির প্রকত স্বরূপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। সংশয় জ্ঞানের অভাবও নয়, ভ্রমও নয় ; সংশয় হল অযথার্থ জ্ঞান।

(৪) **প্রয়োজন :** যে উদ্দেশ্যে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাকেই প্রয়োজন বলে।

(৫) **দৃষ্টান্ত :** দৃষ্টান্ত হল এমন একটি উদাহরণ যার সম্পর্কে কোন মতভেদ থাকে না। দৃষ্টান্ত হল প্রমাণসিদ্ধ। বাৎস্যায়ন এবং জয়ন্তের সংজ্ঞা-মতে, দৃষ্টান্তকে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়েই স্বীকার করে নেয়। যেমন, 'যেখানে ধূম, সেখানেই অগ্নি, যথা—পাকঘর।'

দৃষ্টান্ত

(৬) **সিদ্ধান্ত :** যে বিষয়কে যুক্তিতর্ক ও প্রমাণের দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকেই সিদ্ধান্ত বলে। সিদ্ধান্ত হল কোন বিষয় সম্পর্কে স্বীকৃত সত্য ; যেমন—রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়।

সিদ্ধান্ত

(৭) **অবয়ব :** ন্যায় যে তর্কবাক্যের দ্বারা গঠিত হয়, তাদের অবয়ব বলা হয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পাঁচটি তর্ক-বাক্যকে ন্যায়ের অবয়ব বলা হয়।

অবয়ব

(৮) **তর্ক :** তর্ক হল এক প্রাকল্পিক যুক্তি (a hypothetical argument)। প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তের বিপরীতকে অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখান হয় তাকেই তর্ক বলা হয়। একটি জ্বলন্ত প্রদীপকে একটি আবরণ দিয়ে আবৃত করার জন্য প্রদীপটা নিভে গেল। সিদ্ধান্ত করা হল যে, বায়ুর অভাবেই প্রদীপ নিভে গেল। এই সিদ্ধান্ত যদি কেউ অস্বীকার করে, তখন তার বিরুদ্ধে এইভাবে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে 'যদি বাতাস না থাকে' তাহলে প্রদীপ জ্বলতে পারে না।' এই যুক্তিকেই বলা হয় তর্ক।

তর্ক

(৯) **নির্ণয় :** পরস্পরবিরোধী মতামত বিচার করে সিদ্ধান্ত করাই হল নির্ণয়। এ হল সেই যুক্তি যে যুক্তির সাহায্যে এক পক্ষের মতকে গ্রহণ করা হয় এবং অপর পক্ষের মতকে বর্জন করা হয়।

নির্ণয়

(১০) **বাদ :** বাদ হল সত্যতা নির্ধারণ করার জন্য উভয় পক্ষের নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা। জয়ের কথা চিন্তা না করে যখন সত্যতা নির্ধারণের জন্য কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাহল বাদ। যেমন, আত্মার অস্তিত্ব আছে আবার নেই, উভয় সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ধারন করার জন্য যে আলোচনা তাই হল বাদ।

বাদ

(১১) জল্প: জল্প হল কেবলমাত্র জয়লাভের উদ্দেশ্য বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। শাস্ত্ররীতি লঙ্ঘন করে যে বিচার করা হয় তাকেই জল্প বলে।

(১২) বিতণ্ডা: বিতণ্ডা হল বাজে তর্ক। অপরের মত খণ্ডনের জন্য বাজে তর্কের অবতারণা; অথচ যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজ মত প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না।

জল্প ও বিতণ্ডা উভয়ই নিন্দনীয় বিষয়।

(১৩) হেত্বাভাস: অনুমান সংক্রান্ত অনুপপত্তিগুলিকেই হেত্বাভাস বলে। যা আসলে হেতু নয়, অথচ হেতুরূপে প্রতিভাত হয় তাকেই হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস হল দোষযুক্ত হেতু।

হেত্বাভাস

(১৪) ছল: বাক্‌চাতুরী বা শ্লেষ প্রয়োগের দ্বারা প্রতিপক্ষের বাক্যের দোষ দেখান হল ছল। বাদী এক অর্থে একটি শব্দ ব্যবহার করে, প্রতিপক্ষ শব্দ দ্ব্যর্থবোধক হওয়ার জন্য শব্দটিকে অন্য অর্থে গ্রহণ করে। ছল তিন প্রকার: যথা—বাক্‌ছল, সামান্য-ছল ও উপচারছল।[1] দণ্ড কথাটিকে সময়ের অংশ—এই অর্থে গ্রহণ করে বাদী বলল যে, দণ্ড হল ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু দণ্ড শব্দটির আর একটি অর্থ হল শাস্তি—এই অর্থে যদি তাকে প্রতিবাদী গ্রহণ করে তাহলে বাক্‌ছল হবে।

ছল

(১৫) জাতি: ব্যাপ্তির ওপর ভিত্তি না করে কেবলমাত্র সাধর্ম (similarity) বা বৈধর্মের (dissimilarit y) ভিত্তিতে যখন কোন অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় তখন তাকে জাতি বলে। 'ঘটের মতো উৎপত্তিশীল বলে আকাশ অনিত্য'—বাদীর এই যুক্তি ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য যদি প্রতিবাদী এই যুক্তি উপস্থাপিত করে যে, 'আকাশ নিত্য, কারণ ঘটের যেমন আকৃতি আছে, আকাশের সেরূপ আকৃতি নেই', তাহলে একে বৈধর্মসম জাতি বলা হবে। প্রতিবাদীর যুক্তিটি কেবলমাত্র ঘটের সঙ্গে আকাশের বৈষম্য বা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। সাধর্মসম, বৈধর্মসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপ্রাপ্তিসম প্রভৃতি চব্বিশ রকমের জাতি আছে।

জাতি

---

1. যে অর্থ সম্ভবপর অন্য ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও, শুধুমাত্র সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সেই অর্থের সম্ভবপরতা কল্পনা করার নাম 'সামান্যছল'। বাদী বললেন, 'ব্রাহ্মণগণ পূজা করেন'। প্রতিবাদী কোন ব্রাহ্মণ শিশুকে নির্দেশ করে বললেন, 'এই ব্রাহ্মণ কি পূজা করেন?' শুধুমাত্র 'ব্রাহ্মণ' এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বাক্যে দোষ দেখানো হল। বাদী শব্দকে মুখ্য বা গৌণ অর্থে যদি ব্যবহার করেন এবং প্রতিবাদী যদি তাকে বিপরীত অর্থে গ্রহণ করেন তাহলে উপচারছল হয়। যেমন, বাদী ভাগিরথী তীরে গ্রাম আছে, এই অর্থে বললেন—'ভাগিরথীতে গ্রাম আছে।' প্রতিবাদী ছল করে উত্তর করলেন, 'ভাগিরথীজলে গ্রাম কোথায়?' বাদী গৌণ অর্থে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন প্রতিবাদী মুখ্য অর্থে তাকে গ্রহণ করলেন।

(১৬) **নিগ্রহস্থান ঃ** বিচারে পরাজয়ের কারণকেই নিগ্রহস্থান বলে। এই কারণ নানাভাবে উদ্ভূত হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিপক্ষের মতকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করতে না পারে বা প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিজমত খণ্ডিত হওয়ার ফলে তাকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, তবে সে কারণ হবে নিগ্রহস্থান। অজ্ঞানতা বা বিপরীত জ্ঞানই পরাজয়ের কারণ। প্রতিজ্ঞাহানি প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেত্বান্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অপার্থক প্রভৃতি চব্বিশ প্রকারের নিগ্রহস্থান আছে। 'আকাশ অনিত্য,' যেহেতু ঘটকে যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, আকাশকেও প্রত্যক্ষ করা যায়।'

নিগ্রহস্থান

এই অনুমানে ভ্রান্তি দেখাবার জন্য যদি প্রতিবাদী বলে, 'আকাশ নিত্য, যেহেতু জাতির (genus) মতো আকাশকেও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এবং জাতি হল্য নিত্য।' এক্ষেত্রে প্রতিবাদী ঘটের নিত্যতা স্বীকার করে নিল ; কারণ জাতি যদি নিত' হয়, ঘটও নিত্য হবে, এ হল প্রতিজ্ঞাহানির উদাহরণ।

৩। যুক্তিমূলক বস্তুবাদ (Logical Realism) ঃ

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী। বস্তুবাদ বলতে আমরা কি বুঝি? বস্তুবাদ অনুসারে এ জগতে বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাতার জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। ধরা যাক আমাদের সামনে আমরা একটি গাছ দেখছি। এই গাছটির অস্তিত্ব কি আমাদের জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে? অর্থাৎ, আমরা যদি গাছটিকে নাও জানি তবুও এই গাছটির অস্তিত্ব আছে—এমন কথা কি বলা যাবে না? ভাববাদীদের মতে জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর কোন সত্তা নেই। তাঁরা বলেন, জ্ঞানের বস্তু বা বিষয়, জ্ঞান বা জ্ঞাতার ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি-চেতনাই হোক বা বিশ্ব-চেতনাই হোক, চেতনানিরপেক্ষ বস্তুর কোন সত্তা নেই। বস্তুবাদীদের মতে বস্তুর অস্তিত্ব কি ব্যক্তি-চেতনা বা কি বিশ্ব-চেতনা—কোন চেতনার ওপরই নির্ভরশীল নয়। বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের জানা না-জানার ওপর নির্ভর করে না। যে গাছটিকে আমরা দেখেছি, সেই গাছটি যদি কারও জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহলেও তার অস্তিত্ব থাকবেই। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, বস্তুবাদীদের মতে বস্তুর মননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

বস্তুবাদ কাকে বলে

ন্যায়দর্শনও বস্তুবাদী দর্শন ; যেহেতু নৈয়ায়িকরা বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করে। তবে নৈয়ায়িকরা শব্দ বা শ্রুতি বা অনুভূতির ভিত্তিতেই বস্তুর এই জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্বের কথা মেনে নেয় না। নিছক বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা চেতনানিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যুক্তিতর্ক বিচারের মাধ্যমেই তারা

বস্তুর এই অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। সে কারণে নৈয়ায়িকদের বস্তুবাদ যুক্তিমূলক বস্তুবাদ। নৈয়ায়িকদের মতে মানুষের জীবনের পুরুষার্থ হল মোক্ষ। কিন্তু বস্তুর যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে না পারলে এই মোক্ষলাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমাদের পক্ষে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা কি সম্ভব? তাহলেই আলোচনা করা প্রয়োজন যে, জ্ঞান কাকে বলে? যথার্থ জ্ঞানের সঙ্গে অযথার্থ জ্ঞানের প্রভেদ কি, যার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান জন্মে সেই প্রমাণই বা কয় প্রকার? সংক্ষেপে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার পূর্বে জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) আলোচনা অপরিহার্য। সুতরাং, ন্যায়দর্শনের যে বস্তুবাদ তাহল যুক্তিমূলক বস্তুবাদ (Logical Realism)।

যুক্তিমূলক বস্তুবাদ

৪। জ্ঞানতত্ত্ব বা প্রমাণশাস্ত্র (Theory of Knowledge):

ন্যায়দর্শনে জ্ঞানকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—'প্রমা' বা যথার্থ জ্ঞান এবং 'অপ্রমা' বা অযথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানলাভের যে প্রণালী তাকে বলা হয় 'প্রমাণ'। নৈয়ায়িক-দের মতে প্রমাণ চার প্রকার; যথা—প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Comparison) ও শব্দ (Testimony)। প্রমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন—জ্ঞান কাকে বলে, জ্ঞান কয় প্রকার এবং যথার্থ জ্ঞানকে অযথার্থ জ্ঞান থেকে কিভাবে প্রভেদ করা যেতে পারে। নীচে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে—

প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ

(১) **জ্ঞানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ** (Definition and Classification of knowledge): জ্ঞান বা বুদ্ধি হল বিষয়ের উপলব্ধি। বিষয়ের প্রকাশ হল জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞানের মাধ্যমে বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। প্রদীপের আলোক যেমন কোন বস্তুকে আমাদের কাছে প্রকাশিত করে, তেমনি জ্ঞানেরও কাজ হল অর্থ প্রকাশ, অর্থাৎ বিষয়ের রূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত করা।

জ্ঞান কাকে বলে

জ্ঞানকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়—প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান এবং অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান। প্রমাকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। অপ্রমাকেও চার ভাগে ভাগ করা হয়—স্মৃতি (memory), সংশয় (doubt), ভ্রম বা বিপর্যয় (error) এবং তর্ক (hypothetical argument)।

প্রমা ও অপ্রমা

প্রমা হল বিষয়ের যথার্থ ও অসন্দিগ্ধ অনুভব। 'যথার্থানুভবঃ প্রমা'। আমি

আমার সামনে একটি বৃক্ষ দেখছি। এক্ষেত্রে বৃক্ষ সম্পর্কে আমার যে জ্ঞান তাকে আমি যথার্থ জ্ঞান বলব। কারণ, এখানে আমার বৃক্ষের জ্ঞান সম্পর্কে কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নেই। কোন বিষয়ের যে গুণ, সেই গুণ জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যথাযথ আছে, এরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। যখন আমরা কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি এবং জানি যে বস্তুতঃ ঘটের মধ্যে ঘটত্ব বর্তমান, তখন আমাদের জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান।

যথার্থ জ্ঞান কাকে বলে

কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যে যে গুণের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নেই, কোন বস্তুতে সেই গুণ, যখন আমরা জানি, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান। যখন আমরা রজ্জুতে সর্পের গুণ উপলব্ধি করি, যা প্রকৃতপক্ষে রজ্জুতে বর্তমান নেই, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান। স্মৃতি যথার্থ জ্ঞান নয়, কারণ স্মৃতি অনুভব জ্ঞান নয়। স্মৃতির ক্ষেত্রে বস্তুটি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় না, বস্তুটি কেবল মানসপটে জাগরিত হয়। পূর্বে অনুভূত হয়েছে এমন বিষয়ের জ্ঞানকে স্মৃতি বলে। পূর্ব-অনুভবের সংস্কার থেকে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। যেমন যখন কোন ব্যক্তি পূর্বদৃষ্ট কোন একটি বস্তুর কথা স্মরণ করে বলে 'সেই বস্তু', তখন বস্তুটির কোন অনুভব জ্ঞান হয় না। শুধুমাত্র পূর্বানুভবের সংস্কার-টুকু জেগে ওঠে এবং তার জন্য যে জ্ঞান হয় তা বিষয়ের অনুভব থেকে ভিন্নরূপ জ্ঞান। পূর্বানুভব যথার্থ হলে স্মৃতি যথার্থ হয়; না হলে স্মৃতি যথার্থ হয় না। যেমন পূর্বদৃষ্ট রজতের স্মৃতি যথার্থ কিন্তু পূর্বদৃষ্ট রজতশুক্তির স্মৃতি অযথার্থ। সংশয়কে যথার্থ জ্ঞান বলা যেতে পারে না। কারন সংশয় হল অনিশ্চিত জ্ঞান। একটি বস্তুর মধ্যে বিপরীত গুণের অবস্থিতির ধারণা সংশয়ের সৃষ্টি করে। যদিও ভ্রম নিঃসংশয় জ্ঞান তবু ভ্রম যথার্থ জ্ঞান নয়, কারণ ভ্রমে বিষয়ের যথার্থ অনুভব হয় না। সময় সময় আমরা রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষ করি এবং প্রত্যক্ষ করার সময় প্রত্যক্ষের বাস্তবতায় সংশয় করি না। তবু এই প্রত্যক্ষ ভ্রমাত্মক; কেননা, এই প্রত্যক্ষে বস্তুর যথার্থ অনুভব হয় না, কারণ রজ্জু প্রকৃতপক্ষে সর্প নয়।

তর্ক যথার্থ জ্ঞান নয়, যেহেতু তর্কে আমরা বিষয়ের কোন জ্ঞান লাভ করি না। প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই সিদ্ধান্তের বিপরীতকে অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখান হয়, তাকেই তর্ক বলা হয়। ধরা যাক, আমি বললাম, 'আত্মা অনিত্য নয়, নিত্য।' কোন ব্যক্তি আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলল যে আত্মা নিত্য নয়, অনিত্য। তখন আমি এই যুক্তি দিলাম যে, 'আত্মা যদি নিত্য না হয়, তাহলে কর্মের ফলভোগ সম্ভব হয় না, এবং দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ ঘটবে'। সুতরাং, এই

তর্ক কাকে বলে ?

যুক্তি পরোক্ষভাবে আত্মার নিত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু তর্ককে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমাণ বলা যেতে পারে না, যেহেতু এই যুক্তির দ্বারা আত্মার নিত্যতার জ্ঞান লাভ করা যায় না। শুধুমাত্র আমার আগের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নেওয়া হল। তর্ক সুনির্দিষ্ট জ্ঞান নয় এবং সে কারণে তর্কের দ্বারা বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায় না। তর্ক প্রমাণ নয়, প্রমাণের সহায়ক।

যথার্থ জ্ঞানকে অযথার্থ জ্ঞান থেকে কিভাবে পৃথক করা যায়? বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে যখন জ্ঞানের মিল থাকে, তখনই জ্ঞান যথার্থ হয়, তা না হলে জ্ঞান অযথার্থ হয়। গাছের পাতাটিকে আমি সবুজ বলে জানছি, যদি গাছের পাতাটির রঙ প্রকৃতই সবুজ হয়, তাহলে আমার জ্ঞান যথার্থ হবে। আর যদি গাছের পাতাটি সবুজ না হয়ে হলদে হয় তাহলে ঐ জ্ঞান অযথার্থ হবে। পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যখন সবুজ গাছের পাতাটিকেও হলদে দেখে, তখন তার জ্ঞান অযথার্থ। কারণ পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্যই সে সবুজ পাতাকে হলদে দেখছে। সুতরাং, নৈয়ায়িকদের মতে বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে যখন জ্ঞানের সঙ্গতি থাকে, অর্থাৎ জ্ঞান যখন বিষয়ের অনুরূপ হয়, তখনই জ্ঞান হয় সত্য। সুতরাং অনুরূপতাই (correspondence) সত্যতা, অনুরূপতার অভাবই (non-correspondenc) ভ্রান্তি।

যথার্থ জ্ঞান ও অযথার্থ জ্ঞানের পার্থক্য

কিন্তু প্রশ্ন হল, জ্ঞানের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করার মানদণ্ড কি? কিসের ওপর ভিত্তি করে বিচার করা যাবে যে, জ্ঞান যথার্থ হল কি, অযথার্থ হল? নৈয়ায়িকদের মতে 'প্রবৃত্তি সংবাদ' এবং 'প্রবৃত্তি বিসংবাদের' সাহায্যে যথাক্রমে জ্ঞানের সত্যতা, এবং মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করা যায়। প্রবৃত্তি সংবাদ অর্থে 'প্রবৃত্তি সামর্থ্য' বা ক্রিয়ার সফলতা অর্থাৎ যখন মনের ধারণাটি সফল কাজের সহায়ক হয়, আর 'প্রবৃত্তি বিসংবাদ' অর্থে ক্রিয়ার বিফলতা, অর্থাৎ যখন মনের ধারণাটি সফল কাজের সহায়ক হয় না। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: তৃষ্ণার্ত পথিক দূর হতে যে বস্তুকে জল বলে ধারণা করল, কাছে গিয়ে যদি সে দেখে সত্যই তা জল, তবে সে তা পান করে। এক্ষেত্রে তার জলের জ্ঞান যথার্থ; এখানে কার্যের সফলতাই তার জ্ঞানকে যথার্থ বলে প্রমাণ করেছে। কিন্তু কোন পথিক যখন মরীচিকাকে জল মনে করে কাছে গিয়ে দেখে তা জল নয় এবং তার দ্বারা তার তৃষ্ণা নিবারণ করা সম্ভব নয়, তখন তার জ্ঞান যে অযথার্থ সে বিষয়ে তার আর সন্দেহ থাকে না। সুতরাং, ন্যায়শাস্ত্র মতে বিষয়ের স্বরূপের সঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গতি এবং অসঙ্গতির ওপর জ্ঞানের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব নির্ভর করে এবং কার্যের সফলতা বা বিফলতার দ্বারা জ্ঞানের সত্যতা বা

প্রবৃত্তি সংবাদ ও প্রবৃত্তি বিসংবাদ

মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায়। নৈয়ায়িকদের মতবাদের সঙ্গে আধুনিক যুগের বস্তুবাদী প্রয়োগবাদের (Realistic pragmatism) সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুবাদীদের মতে জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান-বহির্ভূত বস্তুর যখন সঙ্গতি বা মিল থাকে, তখন জ্ঞান যথার্থ এবং যখন অসঙ্গতি থাকে তখন জ্ঞান অযথার্থ হয়; প্রয়োগবাদীদের মতে ক্রিয়ার সফলতা (Fruitful activity) এবং ক্রিয়ার অসফলতাই যথাক্রমে সত্যতা ও মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি।

নৈয়ায়িক মতবাদের সঙ্গে বস্তুবাদী প্রয়োগবাদের সাদৃশ্য

নৈয়ায়িকরা জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্য (Extrinsic validity) স্বীকার করে, জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য (Intrinsic validity) স্বীকার করে না। জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য অর্থে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন শর্তের ওপর নির্ভর নয়। নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করা। জ্ঞান নিজে নিজেই যথার্থ বা অযথার্থ হতে পারে না। জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ নয়, পরতঃ অর্থাৎ অন্য শর্তের ওপর নির্ভর। প্রবৃত্তি সামর্থ্যই জ্ঞানের মাপকাঠি, অর্থাৎ জ্ঞান যদি সফল প্রবৃত্তির কারক হয় তাহলেই জ্ঞান যথার্থ হবে, নতুবা নয়। যে শর্তের ওপর জ্ঞানের উদ্ভব নির্ভর করে সেই শর্তস্থিত কোন উৎকর্ষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে যথার্থ করে এবং অপরদিকে শর্তের মধ্যে প্রকৃত দোষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে অযথার্থ করে।[1]

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য ও পরতঃপ্রামাণ্য

ভ্রম (Error) : নৈয়ায়িকদের ভ্রম সম্পর্কীয় মতবাদ 'অন্যথাখ্যাতি' বা বিপরীত-খ্যাতি নামে পরিচিত। এই মতবাদ অনুসারে একটি বিষয়কে অন্যথা, অর্থাৎ অপর একটি বিষয় হিসেবে অনুভব করা হলেই ভ্রমের উৎপত্তি ঘটে। ভ্রমে বিষয়ের যথার্থ অনুভব ঘটে না। যে বিষয়ের মধ্যে যে গুণের উপস্থিতি নেই, সেই বিষয়ে সেই গুণ অনুভব করা হল 'ভ্রম'; যেমন, যখন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তখন রজ্জুতে আমরা সর্পের গুণ অনুভব করি। ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি, অনুষঙ্গ (association) এবং স্মৃতিজনিত সংস্কারের জন্যই একটি বস্তু অন্য বস্তু বলে ভ্রম হয়। ভ্রমে যখন প্রত্যক্ষ করছি, 'এই বস্তুটি একটি সর্প', তখন 'এই বস্তুটির' সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ঘটছে এবং 'এই বস্তুটির' প্রকৃত সত্তা রয়েছে, এরূপ বিশ্বাস জন্মে কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সামনে প্রকৃতপক্ষে কোন সর্পের অস্তিত্ব নেই। সর্পের সংস্কার অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

ভ্রম

---

1. "Validity (প্রামাণ্য) depends upon some positive excellence in the generating conditions of knowledge. Invalidity (অপ্রামাণ্য) depends upon some positive defect (দোষ) in the generating conditions of knowledge".
—Dr. J. N. Sinha : Introduction to Indian Philosophy ; Page 32.

পরোক্ষভাবে উপস্থিত হচ্ছে, কাজেই এক্ষেত্রে সর্পের জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ হচ্ছে। সুতরাং ভ্রমের বস্তুগত ভিত্তি আছে।

৫। **প্রত্যক্ষ (Perception) ঃ**

নৈয়ায়িকদের মতে প্রমা চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রমার করণকে প্রমাণ বলে অর্থাৎ যার দ্বারা প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাকে প্রমাণ বলে। কাজেই প্রমাণও চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি শব্দ দ্বারা প্রমাও বুঝায়, প্রমাণও বুঝায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নৈয়ায়িকদের মতে প্রত্যক্ষ যথার্থ জ্ঞানলাভের অন্যতম প্রণালী।

প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান

প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা ঃ গৌতমের সংজ্ঞানুযায়ী প্রত্যক্ষ হল বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান[1] অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ[2] থেকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব। ঘট সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের মূলে রয়েছে আমার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটের সন্নিকর্ষ এবং আমার সুনিশ্চিত ধারণা যে, যে বস্তুটিকে আমি প্রত্যক্ষ করছি সেটি একটি ঘট। দূরবর্তী বস্তুটি মানুষও হতে পারে, বা একটি বৃক্ষও হতে পারে—এইরূপ প্রত্যক্ষ সংশয়াত্মক ও অনির্দিষ্ট জ্ঞান, সেহেতু যথার্থ প্রত্যক্ষ নয়। রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষ সংশয়াত্মক না হলেও মিথ্যাজ্ঞান এবং সেহেতু যথার্থ প্রত্যক্ষ নয়।

বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান—প্রত্যক্ষের এই সংজ্ঞা ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরা মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু কোন কোন নৈয়ায়িক এবং বৈদান্তিক প্রত্যক্ষের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা স্বীকার করে নেননি। তাঁদের মতে গৌতম প্রদত্ত সংজ্ঞা সাধারণ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রযুজ্য হলেও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে প্রযুজ্য নয়। তাঁদের মতে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ছাড়াও প্রত্যক্ষ সম্ভব ; যেমন, ঈশ্বর সকল কিছুই প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু ঈশ্বরের কোন ইন্দ্রিয় নেই। যোগীদের প্রত্যক্ষ সকল ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের

---

1. "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং-জ্ঞানং অব্যাপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্'

—ন্যায়সূত্র ১।১।৪

(ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞানের যে অংশটুকু অব্যাপদেশ্য, অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত শব্দের জ্ঞান থেকে উৎপন্ন নয়, তা যদি অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ সুনিশ্চিত হয় তবে তাকে প্রত্যক্ষ বলে।)

2. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়টি যদি কোন দ্রব্য হয় তা হলে তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধ ঘটতে পারে। কিন্তু ওটি দ্রব্য না হয়ে 'গুণ', 'কর্ম' কিংবা 'জাতি' হলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ওর সংযোগ সম্বন্ধ হতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষকালে সবসময়ই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ ঘটে, এই কথা না বলে সব সময় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ ঘটে থাকে এই কথা বলাই সঙ্গত। সন্নিকর্ষ শব্দ দ্বারা সংযোগ সম্বন্ধের মতন অন্যান্য সম্বন্ধবিশেষকেও বোঝান হয়।

মাধ্যমে সাধিত হয় না। সে কারণে বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন যে, প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানের মাধ্যমে লব্ধ হয় না। সে জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যা অজ্ঞ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না। যে জ্ঞান অপর কোন জ্ঞানের করণত্বের ওপর নির্ভর করে না তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।[1] প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য জ্ঞান করণ (instrument) নয়। মানুষের প্রত্যক্ষ বা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ, উভয় প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। অনুমান, উপমান ও শব্দ অন্য জ্ঞানের ওপর নির্ভর, যেহেতু এই তিন প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য জ্ঞান করণরূপে ক্রিয়া করে। অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যপ্তিজ্ঞান, উপমানের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য জ্ঞান এবং শব্দ ও শ্রুতির ক্ষেত্রে শব্দের জ্ঞান হল করণ।

কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান

সুতরাং, এই সংজ্ঞানুযায়ী প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ প্রতীতি। এই মতবাদ নব্য নৈয়ায়িকদের মতবাদ। গঙ্গেশও প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারিত্বম্ লক্ষণম্'। প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান। যখন শুক্তি দেখে রজত বলে ভ্রম হয় তখন প্রকৃতপক্ষে রজতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সংযোগ ঘটে না। সুতরাং বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ নয়, সাক্ষাৎ জ্ঞানই (immediate knowledge) প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য। সে কারণে প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান।

৬। প্রত্যক্ষের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Perception) :

প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; যথা—(১) **লৌকিক** ও (২) **অলৌকিক**। লৌকিক প্রত্যক্ষও আবার দুপ্রকার: যথা—(১) **বাহ্য** এবং (২) **আন্তর বা মানস**। অলৌকিক প্রত্যক্ষ আবার তিন প্রকার; যথা—(১) **সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ**, (২) **জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ** এবং (৩) **যোগজ প্রত্যক্ষ**।

লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ

আবার প্রত্যক্ষকে আর একভাবে ভাগ করা হয়েছে; যথা—(১) **নির্বিকল্প** এবং (২) **সবিকল্প**।

এইবার এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক:

লৌকিক প্রত্যক্ষ (Ordinary Perception): প্রত্যক্ষ দু'প্রকার—লৌকিক ও অলৌকিক। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ তাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ ঘটে।

1. "জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্"—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী—বিশ্বনাথ।

লৌকিক প্রত্যক্ষ দু'প্রকার—বাহ্য (external) এবং আন্তর বা মানস (internal)।

লৌকিক প্রত্যক্ষ দু প্রকার—বাহ্য ও মানস

চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, নাসিকা ও ত্বক—এই পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন বিষয়ের সংযোগ ঘটে, তখনই তাকে বাহ্য প্রত্যক্ষ বলা হয়। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমরা বাইরের জগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ করি। মনের সঙ্গে যখন চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার সংযোগ ঘটে তখন তাকে মানস প্রত্যক্ষ বলা হয়ঃ মন হল অন্তরিন্দ্রিয়। এই অন্তরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আত্মা মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ-জ্ঞান লাভ করে। বাহ্য-প্রত্যক্ষ এবং মানস-প্রত্যক্ষ উভয় ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। সুতরাং লৌকিক প্রত্যক্ষ ছয় রকমঃ চাক্ষুষ (visual), শ্রোত্র (auditory), স্পার্শন (tactual), রাসন (gustatory), ঘ্রাণজ, (olfactory) এবং মানস (internal)।

লৌকিক প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার

মন ছাড়া কোন প্রত্যক্ষই সম্ভব নয়। কেবলমাত্র মানস-প্রত্যক্ষই যে মনের মাধ্যমে সাধিত হয় তা নয়, বাহ্য-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ না ঘটলে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না।

মন ছাড়া কোন প্রত্যক্ষই সম্ভব নয়

নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসক এবং জৈন—সকলের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় হল ছয়টি। পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয় এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয়। পাঁচটি বাহ্যইন্দ্রিয় হলঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। চক্ষুদ্বারা আমরা দেখি, কর্ণের দ্বারা শুনি, নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করি, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করি, এবং ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করি। এই পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয় এক একটি ভূতের দ্বারা গঠিত। চক্ষু তেজস্-এর দ্বারা গঠিত; তেজস্-এর ধর্ম হল বর্ণ, সে কারণে চক্ষু বর্ণ প্রত্যক্ষ করে। শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যোমের (ether) দ্বারা গঠিত, সে কারণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ প্রত্যক্ষ করা হয়, শব্দ আকাশের ধর্ম। ঘ্রাণেন্দ্রিয় হল ক্ষিতির দ্বারা গঠিত, এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আঘ্রাণ করা হয়, আঘ্রাণ করা ক্ষিতির ধর্ম। রসনেন্দ্রিয় অপের দ্বারা গঠিত, সে কারণে এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আস্বাদন করা হয়। অপের বা জলের ধর্মই হল আস্বাদন। স্পর্শেন্দ্রিয় মরুৎ-এর দ্বারা গঠিত, সে কারণে স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্পার্শন প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। স্পার্শন হল মরুৎ-এর ধর্ম। সুতরাং, বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক এবং সেই সব ভূত বা উপাদানের দ্বারাই গঠিত যেগুলির বিশেষ গুণ বা ধর্ম (specific quality) এই ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষ করে।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি ভূতের দ্বারা গঠিত

মন হল অন্তরিন্দ্রিয়। মন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের মতো ভূতের দ্বারা গঠিত নয়। মন আত্মার ধর্মগুলি (qualities of the soul), যেমন—ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন (willing), সুখ, দুঃখ

এবং জ্ঞান প্রত্যক্ষ করে। বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এক একটি ইন্দ্রিয় এক একটি গুণই প্রত্যক্ষ করতে পারে। যেমন, দর্শেনেন্দ্রিয় দর্শনই করতে পারে, আস্বাদন করতে পারে না। মনের ক্ষেত্রে এরকম কোন সীমা নেই। মন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের তদারক করে। সব রকম জ্ঞানকে যথাবিহিতভাবে সুবিন্যস্ত করার কাজ হল মনের।

মন অন্তরিন্দ্রিয়, কোন ভূতের দ্বারা গঠিত নয়

লৌকিক প্রত্যক্ষের বেলায় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যে লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় তা ছয় প্রকার। যথা—(১) সংযোগ : ঘট প্রত্যক্ষকালে চক্ষুর সঙ্গে ঘটের যে সন্নিকর্ষ হয় সেটি সংযোগ-সন্নিকর্ষের দৃষ্টান্ত। (২) সংযুক্ত সমবায় : ঘটের রূপ প্রত্যক্ষকালে চক্ষুর সঙ্গে ঘটের সংযোগ ঘটে এবং ঘটের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধযুক্ত ঘটরূপের সন্নিকর্ষ হয়ে থাকে। (৩) সংযুক্ত সমবেত সমবায় : ঘটের সঙ্গে তার কোন বিশেষ বর্ণের যে সম্পর্ক তা সমবায় সম্পর্ক এবং এই বিশেষ বর্ণের যে জাতিধর্ম, যা বর্ণে থাকে, তার সঙ্গে বর্ণেরও সমবায় সম্বন্ধ। সুতরাং, ঘটের বর্ণ যেমন, শুক্ল প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে যখন আমরা শুক্লত্বকে প্রত্যক্ষ করি তখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে শুক্লত্ব এই সামান্যের (universal) যে সন্নিকর্ষ ঘটে তাকে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়-সন্নিকর্ষ বলে। (৪) সমবায় : কর্ণ বিবরবর্তী আকাশই কর্ণেন্দ্রিয় এবং শব্দ আকাশেরই গুণ। শব্দ ও আকাশের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ। কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ প্রত্যক্ষকালে কর্ণের সঙ্গে শব্দের সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। (৫) সমবেত সমবায় : শব্দত্ব ধর্ম শব্দে থাকে। কর্ণদ্বারা শব্দত্ব প্রত্যক্ষের বেলায় যে সন্নিকর্ষ তা হল 'সমবেত সমবায়' সন্নিকর্ষ। (৬) বিশেষণ-বিশেষ্যভাব : অভাব (negation) প্রত্যক্ষকালে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যে সন্নিকর্ষ হয় তার নাম বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-সন্নিকর্ষ। ভূতলে ঘট প্রত্যক্ষ না করলে ভূতলে ঘটের অভাবের কথা বলা হয়। এরূপ ঘটাভাবের ক্ষেত্রে চক্ষুর সঙ্গে ঘটের কোন সংযোগ হতে পারে না, কিন্তু ঘটাভাবরূপ বিশেষণ যে বিশেষ্যকে আশ্রয় করে থাকে সেই ভূতলের সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ হয়ে থাকে। চক্ষুসংযুক্তভূতল, ঘটাভাবরূপ বিশেষণ যুক্ত হওয়ায় চক্ষুর সঙ্গে ঘটাভাবের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ হয়ে থাকে।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ (Extraordinary Perception) : অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সন্নিকর্ষ ঘটে। এই অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ।

(ক) সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ (Perception of a class) : যে প্রত্যক্ষে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি বস্তু বা ব্যক্তির লৌকিক প্রত্যক্ষ থেকে, সেই জাতির সামান্য

ধর্মের প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত সব বস্তু বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয় তাকে সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। সামান্য-ধর্ম কাকে বলে? যে গুণ বা ধর্ম কোন একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের মধ্যেই বর্তমান থাকে এবং যে ধর্ম বা গুণের উপস্থিতির জন্য এক জাতিকে অন্য জাতি থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় তাকেই সামান্য ধর্ম বলে। যেমন—'মানুষ' একটা জাতি, এই জাতির সামান্য ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব মানুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বর্তমান। অনুরূপভাবে সিংহের সামান্য-ধর্ম হল সিংহত্ব, বৃক্ষের সামান্য ধর্ম হল বৃক্ষত্ব, গোরুর গোত্ব ইত্যাদি। নৈয়ায়িকদের মতে কোন একটি মানুষকে প্রত্যক্ষ করার অর্থ তার মধ্যে 'মনুষ্যত্বকে' প্রত্যক্ষ করা নতুবা তাকে মানুষ বলে চিনতে পারা যায় না। কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করার সময় সেই ব্যক্তির 'সামান্য' বা জাতির অর্থাৎ মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে এবং মনুষ্যত্বরূপ জাতির সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে অতীত, বর্তমান এবং অনাগত সকল ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ঘটে থাকে। মনুষ্যত্বের মাধ্যমে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করাই হল সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ, কারণ মনুষ্যত্ব হল সামান্য (universal)।

সামান্যলক্ষণ

সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ অলৌকিক প্রত্যক্ষ, যেহেতু মনুষ্যত্ব—এই সামান্য-ধর্মকে লৌকিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা হয় না। কোন একটি বিশেষ মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু মনুষ্যত্ব তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

(খ) জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ (Acquired Perception)ঃ কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার বিষয়ের সন্নিকর্ষের সময় যদি উক্ত বিষয়সম্পর্কিত কোন পূর্বপ্রত্যক্ষীত জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়, তাহলে সেই প্রত্যক্ষকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। দূর থেকে সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ দেখে 'সুরভি চন্দনম্' এইরূপ যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় তা জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারাই হয়ে থাকে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, 'বরফ দেখতে ঠাণ্ডা' বা 'আমটা দেখতে কি মিষ্টি'। সাধারণতঃ বরফের ঠাণ্ডা ভাব এবং আমের মিষ্টত্ব যথাক্রমে স্পর্শন ও আস্বাদনের সাহায্যেই জানা সম্ভব। অথচ এখানে আমরা বলছি যে, এইগুলি আমরা চোখের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করছি। এই জাতীয় প্রত্যক্ষকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলা হয়। এই প্রত্যক্ষ অলৌকিক, যেহেতু এখানে যে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করে বস্তুর যে গুণটি প্রত্যক্ষ করছি, সেই ইন্দ্রিয় ঐ গুণ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। বস্তুতঃ, জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ পূর্ব প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল। পূর্বে আমরা যখন স্পর্শনের সাহায্যে জেনেছি যে বরফ ঠাণ্ডা, তখন তার সঙ্গে দর্শনগত প্রত্যক্ষও যুক্ত ছিল। এইভাবে দর্শনগত প্রত্যক্ষ ও স্পর্শনগত প্রত্যক্ষ

জ্ঞানলক্ষণ

পূর্বে একত্রে ঘটেছে। এখন দর্শনগত প্রত্যক্ষ স্পর্শনগত প্রত্যক্ষের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলছে।[1]

(গ) যোগজ প্রত্যক্ষ (Yogaja Perception) ঃ যেসব যোগী যোগাভ্যাসের দ্বারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন তাঁরা এই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য অতীত এবং ভবিষ্যৎ, দূরবর্তী এবং অতিসূক্ষ্ম বস্তুও প্রত্যক্ষ করতে পারেন, যেগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। একেই যোগজ প্রত্যক্ষ বলা হয়। যোগীগণ যোগজসন্নিকর্ষের প্রভাবে অতীন্দ্রিয় পদার্থও প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

যোগজ প্রত্যক্ষ

যোগজ প্রত্যক্ষ দুপ্রকার—যুক্ত (yukta) বা সিদ্ধ যোগীর প্রত্যক্ষ এবং যুঞ্জান বা যোগারোহী যোগীর প্রত্যক্ষ (Yunjana)। যুক্তযোগীদের ক্ষেত্রে অলৌকিক যৌগিক প্রত্যক্ষ সর্বকালীন এবং স্বাভাবিক। যুঞ্জান যোগী বা বিযুক্ত যোগী কোন বিষয়ের ধ্যান করলে সেই ধ্যানের সাহায্যে যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা সেই বিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করে থাকেন। এঁরা গভীর মনোযোগের সহায়তায় অলৌকিক প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এঁদের ক্ষেত্রে অলৌকিক প্রত্যক্ষ সর্বকালীন নয় এবং এই প্রত্যক্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কার্যকর হয় না।

৭। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যভিজ্ঞা (Indeterminate Perception, Determinate Perception and Recognition) ঃ

লৌকিক প্রত্যক্ষ—নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক

আর এক নীতি অনুসারে লৌকিক প্রত্যক্ষকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়—নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ (Indeterminate Perception) এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ (Determinate Perception)। বস্তুতঃ, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষের দুটি ভিন্ন স্তর।

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পরিচয়

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ (Indeterminate Perception) ঃ 'নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্'। যে প্রত্যক্ষে বস্তুর জ্ঞান হয়, কিন্তু বস্তুর প্রকার ও নাম সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয় না, তাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। এই ধরনের প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রকারতা ও বিশেষ্যতার অবগাহন হয় না।[2] অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধাকারে যে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ, তা হয় না। কোন ঘটের সঙ্গে যখন চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটে, তখন আমি অনুভব করি এটি একটি দ্রব্য,

1. মনোবিজ্ঞানী Wundt, Ward এবং Stout একে বলেছেন, 'বিজড়ন' (Complication)। Sully একে বলেছেন, 'অর্জিত প্রত্যক্ষণ, (Acquired Perception)।

2. 'প্রকারতাবিশেষ্যতানবগাহিপ্রত্যক্ষত্বং নির্বিকল্পকত্বম্'।

কোন রূপ বা কোন আকার। কিন্তু দ্রব্যটি যে বিশেষ্য এবং রূপ, আকার প্রভৃতি যে তার বিশেষণ, এই জ্ঞান হয় না। অথবা এটি ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট এইরূপ প্রত্যক্ষ হয় না। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকালে জ্ঞেয় পদার্থটি বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপে প্রতীত হয় না। সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বস্তুর সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এ জাতীয় প্রত্যক্ষে কোন বচনের সাহায্যে জ্ঞানকে ব্যক্ত করা হয় না বা যায় না। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হল সহজ উপলব্ধি (Simple apprehension) মাত্র। শব্দের দ্বারা ব্যপদেশ বা প্রকাশ করা যায় না বলে মহর্ষি গৌতম নির্বিকল্পক জ্ঞানকে 'অব্যপদেশ' জ্ঞান নামে অভিহিত করেছেন। নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশের মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হল সম্পর্ক-বিযুক্ত প্রত্যক্ষ ; কারণ এই জাতীয় প্রত্যক্ষ হল নাম, জাতি বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর অনুষঙ্গ বা সংযোগ থেকে মুক্ত।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষ (Determinate Perception)ঃ 'সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকং'—যে প্রত্যক্ষে কোন বস্তু 'এইরূপ' বা 'এই প্রকার' এরূপ জ্ঞান হয় তাকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। সবিকল্পক প্রত্যক্ষে বস্তুটির প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়। যেমন কোন ঘটের সঙ্গে আমার চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হবার দ্বিতীয় ক্ষণে আমি অনুভব করতে পারি যে ঘটটি বিশেষ এবং রূপ, আকার তার বিশেষণ বা এটি একটি ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট। সবিকল্পক প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুটির জাতিধর্ম, বিশেষ গুণ, নাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হই। 'বিকল্প' কথাটির অর্থ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব ; সবিকল্পক প্রত্যক্ষে এই বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকে, যা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে থাকে না। মহর্ষি গৌতম সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে ব্যবসায়াত্মক প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করেছেন।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষ

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষজ্ঞান ছাড়া সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না।[1] কারণ প্রথমে দ্রব্য ও গুণের পৃথক জ্ঞান থাকলে তবেই পরবর্তীকালে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধের আকারে জ্ঞান সম্ভব হতে পারে। একটি পদার্থকে ঘট বলে প্রত্যক্ষ করতে হলে পূর্ব থেকেই ঘটত্বরূপ বিশেষণ পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ঘটত্বরূপ বিশেষণ পদার্থের প্রত্যক্ষ ছাড়া 'ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের' প্রত্যক্ষ হতে পারে না।

বস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে এবং পূর্ব-প্রত্যক্ষের দ্বারা উৎপন্ন সংস্কার, যা অবচেতন মনে বিরাজ করে যখন তার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়।

---

1. কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই 'ইহা ঘট' 'ইহা পট' এরূপ স্পষ্ট জ্ঞান জন্মে না, প্রথম দৃষ্টিতে 'ইহা' এই মাত্রই জ্ঞান হয়ে থাকে। এর নাম নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। এর পর 'ইহা ঘট', 'ইহা পট', এরূপ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে।

সুতরাং, সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে বলা যেতে পারে উপস্থাপনমূলক-পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া (Presentative-Representative process)। বস্তুটি ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে, যার ফলে ইন্দ্রিয় সংযোগ ঘটছে, আবার এই সংযোগের ফলে অতীতলব্ধ অন্যান্য অভিজ্ঞতা যেগুলি বস্তুর সঙ্গে যুক্ত সেগুলি পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition): নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ছাড়াও ন্যায়শাস্ত্রে আরও একপ্রকার প্রত্যক্ষের কথা বলা হয়েছে, যাকে বলা হয় 'প্রত্যভিজ্ঞা'। প্রত্যভিজ্ঞা এক প্রকার সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। প্রত্যভিজ্ঞা হল বস্তুকে কেবল মাত্র জানা নয়, বস্তুকে পূর্ব পরিচিত বস্তু বলে চিনতে পারা। পূর্ব প্রত্যক্ষিত কোন বস্তুকে পুনরায় প্রত্যক্ষ করে 'এটি সেই', এইরূপ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। কোন একজন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করে যখন বলি, 'এই সেই ব্যক্তি যাকে এক মাস আগে দেখেছিলাম,' তখন এই প্রত্যক্ষকে বলা হবে প্রত্যভিজ্ঞা। যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করে আমাদের পরিচিত বন্ধু বলে চিনতে পারি, তখন সে অভিজ্ঞতাকে বলা হবে প্রত্যভিজ্ঞা। পূর্বে জেনেছি এই জ্ঞানই হল প্রত্যভিজ্ঞা। এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান—স্মৃতি নয়। কারণ অবচেতন মনের সংস্কারের দ্বারাই স্মৃতি উৎপন্ন হয়। স্মৃতির ক্ষেত্রে বস্তু সাক্ষাৎ ভাবে ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে এই জ্ঞান যেহেতু সম্প্রকারক জ্ঞান, সেহেতু সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।

প্রত্যভিজ্ঞা

নৈয়ায়িকদের লৌকিক প্রত্যক্ষের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ বৈশেষিক, সাংখ্য এবং মীমাংসকগণ স্বীকার করলেও বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন স্বীকার করে না। অলৌকিক প্রত্যক্ষ সব সময়ই সবিকল্পক, যেহেতু এ প্রত্যক্ষ সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিব্যক্ত।

৮। অনুমানের সংজ্ঞা (Definition of Inference):

কোন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অপর একটি অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার প্রক্রিয়াকেই অনুমান বলে। 'অনু' শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, আর 'মান' শব্দের অর্থ জ্ঞান। সুতরাং অনুমান কথাটির সাধারণ অর্থ হল সেই জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানকে অনুসরণ করে।[1] অনুমান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। এতে প্রথমতঃ হেতুজ্ঞান বা লিঙ্গদর্শন, তারপর লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ-জ্ঞান (এরই নাম ব্যপ্তিজ্ঞান) এবং শেষে অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গীর জ্ঞান হয়ে থাকে। এতে লিঙ্গদর্শনের পরে 'মান' বা 'জ্ঞান' হয়ে থাকে বলে এর নাম অনুমান। ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যাপ্য পদার্থ বা লিঙ্গের

জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করাই হল অনুমিতি

1. 'অনু' পূর্বক 'মা' ধাতুর উত্তর করণ অর্থে অনট্ প্রত্যয় করে অনুমান শব্দটি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। যা যথার্থ অনুমিতির করণ, তাই অনুমান।

জ্ঞান থেকে কোন ব্যাপক বা লিঙ্গীর জ্ঞানে পৌছবার প্রণালীকে অনুমান বলা হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—পর্বতটি বহ্নিমান, যেহেতু পর্বতটি ধূমবান এবং যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি। আমরা পর্বতে ধূমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করছি এবং এই অনুমানের ভিত্তি হল ধূম এবং বহ্নির নিয়ত সম্বন্ধ সম্পর্কে আমাদের পূর্বার্জিত জ্ঞান। সুতরাং অনুমান হল এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় আমরা কোন একটি চিহ্ন (অথবা হেতু বা লিঙ্গ)—যেমন ধূম প্রত্যক্ষ করে, তারই মাধ্যমে আর একটি বস্তু বহ্নি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি, যেহেতু সেই বস্তুটিতে হেতু অবস্থিত এবং হেতু ও সেই বস্তুটির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বর্তমান।

অনুমানের সংজ্ঞা

৯। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে প্রভেদ (Distinction between Perception and Inference):

প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ই প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী। প্রত্যক্ষ পূর্ববর্তী কোন জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু অনুমানকে পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করতে হয়। লিঙ্গ বা হেতুর জ্ঞানের জন্য এবং হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞানের জন্য অনুমানকে প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করতে হয়। বাৎসায়নের মতে প্রত্যক্ষের অভাবে কোন অনুমান সম্ভব হয় না। ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান তখনই আমরা লাভ করি যখন দুটি বস্তুর মধ্যে সংযোগ আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করি, যার ফলে একটিকে প্রত্যক্ষ করলে আমরা অপরটিকে অনুমান করে নিতে পারি। সুতরাং প্রত্যক্ষ হল অপরোক্ষ জ্ঞান, অনুমান হল পরোক্ষ জ্ঞান।

যোগজ প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্যান্য প্রত্যক্ষ সব একই রকমের, যেহেতু যে বিষয়টি দেওয়া আছে তার জ্ঞানই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকমের অনুমান করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ আমাদের সে-সব বস্তুরই জ্ঞান দেয় যেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সীমানার মধ্যে উপস্থিত থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষ বর্তমান বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ভিত্তিতে অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে আমরা জ্ঞানলাভ করি। আমাদের জ্ঞান বর্তমান ছাড়া অতীত ও ভবিষ্যতের দিকেও প্রসারিত হয়। প্রত্যক্ষে বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, কিন্তু আমরা সেই সব সম্পর্কেই অনুমান করি যেগুলিকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাকে অনুমানের সাহায্যে জানার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে অনুমান করি তাকে প্রত্যক্ষের সাহায্যে সমর্থন করার প্রয়োজন আছে। যাকে সুনিশ্চিতভাবে জানি বা যা একেবারেই অজানা, সে

সব ক্ষেত্রে অনুমান কার্য করে না। যেসব বিষয় সন্দেহজনক সেসব ক্ষেত্রে অনুমান কাজ করে।

১০। অনুমানের অবয়ব (The Constituents of Inference) :

প্রত্যেক অনুমানে তিনটি পদ এবং কমপক্ষে তিনটি তর্কবাক্য বা বচন থাকবেই। যে বচনগুলির দ্বারা অনুমান গঠিত হয় সেই বচনগুলিকে অনুমানের অবয়ব বলা হয়।

এই তিনটি পদকে বলা হয় সাধ্য (major term), পক্ষ (minor term) এবং হেতু (middle term)। হেতুর অপর নাম লিঙ্গ বা সাধন। হেতুর সাহায্যে যাকে লাভ করতে চাই তাই হল সাধ্য। যেখানে সাধ্যের অস্তিত্ব স্থির করা হয়, তার নাম পক্ষ। হেতু, সাধ্য এবং পক্ষের মধ্যে যোগসাধন করে। পর্বতে ধূম দেখে আমরা অনুমান করছি সেখানে বহ্নি আছে, যেহেতু যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি। এখানে পর্বত হল পক্ষ (minor term), কারণ পর্বতেই বহ্নির অস্তিত্ব স্থির করা হচ্ছে ; বহ্নি হল সাধ্য যেহেতু পর্বতে বহ্নির অস্তিত্বই আমরা প্রমাণ করতে চাই, অর্থাৎ বহ্নিই হল অনুমান দ্বারা নির্ণেয় বিষয়। ধূম হল হেতু বা মধ্যম পদ, কারন এই পদের মাধ্যমেই পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্পর্ক প্রমাণিত হচ্ছে। হেতু হল মধ্যম পদ, যেহেতু হেতুর মধ্যস্থতায় সাধ্যে ও পক্ষের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। অনুমিত বচনে পক্ষ হল উদ্দেশ্য, সাধ্য হল বিধেয়।

সাধ্য, পক্ষ ও হেতু

ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা যে-কোন নির্ভুল অনুমিতির পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন। ব্যাপ্তি হল হেতু বা লিঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্ক এবং পক্ষধর্মতা হল পক্ষে হেতুর অবস্থিতি। কেবলমাত্র সাধ্য বা কেবলমাত্র পক্ষের জ্ঞানই যথার্থ অনুমিতিকে সম্ভব করে তুলতে পারে না। হেতু বা লিঙ্গের জ্ঞান, অর্থাৎ হেতুর সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্ক এবং হেতুর পক্ষে (minor term) অবস্থান—এই উভয়ের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। এই জ্ঞানকে লিঙ্গ পরামর্শ বলা হয়।[1] ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞানের নাম পরামর্শ। এই পর্বতে এখন ধূম দেখা যাচ্ছে, যা অগ্নি দ্বারা ব্যাপ্য হয়ে থাকে। এক কথায় বলতে গেলে 'এই পর্বত বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান্'—এই জ্ঞানের নাম পরামর্শ। এই পরামর্শ থেকে উৎপন্ন 'এই পর্বত বহ্নিমান'—এরূপ জ্ঞানের নাম অনুমিতি।

অনুমানে তিনটি শব্দ এবং তিনটি বচন থাকবেই। প্রথম বচনে সাধ্য ও পক্ষের সম্বন্ধের কথা বলা হয় এবং সাধ্যকে পক্ষের বিধেয় করা হয়। যেমন—পর্বত বহ্নিমান ;

1. হেতুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য : পক্ষধর্মতা, স্বপক্ষত্ব, বিপক্ষত্ব, অবাধিতবিষয়ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষত্ব।

দ্বিতীয় বচনে পক্ষের সঙ্গে হেতুর সম্বন্ধের কথা বলা হয়, কারণ পর্বত ধূমবান ; আর তৃতীয় বচনে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের নিয়ত সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির কথা বলা হয়ে থাকে, যেখানে ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে। সুতরাং অনুমানে কমপক্ষে তিনটি বচন থাকবেই। এই তিনটি বচন নিরপেক্ষ (Categorical) হবে এবং এই বচন সদর্থক বা নঞর্থক উভয়ই হতে পারে।

অনুমানে তিনটি শব্দ এবং তিনটি বচন থাকবে

ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে উল্লিখিত অনুমানের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের (Syllogism) সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। অ্যারিস্টটলীয় তিন অবয়বযুক্ত ন্যায়েরও তিনটি বচন থাকে—প্রধান বচন বা সাধ্য বাক্য, অপ্রধান বচন বা পক্ষ বাক্য এবং সিদ্ধান্ত। তবে তিন অবয়বযুক্ত ভারতীয় ন্যায়ের ক্রম তিন অবয়বযুক্ত অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের ক্রমের বিপরীত। ভারতীয় ন্যায়ে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের সিদ্ধান্তকে প্রথমে রাখা হয় এবং প্রধান বচন বা সাধ্য বাক্যকে (major premise) সর্বশেষে রাখা হয়।

ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের তুলনা

ভারতীয় নৈয়ায়িকদের মতে অনুমান দুপ্রকার—স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান। যখন কোন ব্যক্তি নিজের জন্য অনুমান করে তখন তাকে বলা হয় স্বার্থানুমান, আর যখন অপরের জন্য অনুমান করা হয়, অর্থাৎ অপরের কাছে কোন সত্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় তখন তাকে বলা হয় পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে অনুমানটিকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে অনুমানকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করার প্রয়োজন আছে। যথাযথভাবে ব্যক্ত করার অর্থ হল অনুমানের বা ন্যায়ের ন্যায়শাস্ত্রসম্মত রূপটি প্রকাশ করা। অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের উল্লেখযোগ্য প্রভেদ আছে। অ্যারিস্টটলীয় ন্যায় তিন অবয়ববিশিষ্ট—প্রথমে সাধ্য বাক্য, তারপর পক্ষ বাক্য, তারপর সিদ্ধান্ত। ভারতীয় ন্যায় পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট। এই পাঁচটি অবয়ব হল—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। নীচে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাবে :

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান

ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের প্রভেদ

(১) পর্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)

(২) কারণ পর্বত ধূমবান (হেতু)

(৩) যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি ; যেমন, পাকশালা (উদাহরণ)

---

1. অবয়ব বলতে বস্তুর অংশকে বোঝায়, কিন্তু এখানে অবয়ব শব্দটি পারিভাষিক।

(৪) পর্বত ধূমবান (উপনয়)

(৫) সুতরাং পর্বত বহ্নিমান (নিগমন)

পূর্বোক্ত প্রথম বচনটি হল প্রতিজ্ঞা বা প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়টিকেই প্রমাণ করতে হবে। দ্বিতীয় বচনটি হল হেতু। হেতুই প্রতিজ্ঞার কারণটি নির্দেশ করে। তৃতীয় বচনটি হল উদাহরণ। এই তৃতীয় বচনে প্রতিজ্ঞা এবং হেতুর মধ্যে যে ব্যাপ্তি বা নিয়ত অব্যাভিচারী সম্বন্ধ সেটিকে প্রকাশ করা হয় এবং পরিচিত দৃষ্টান্তের দ্বারা এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে সমর্থন করা হয়। দৃষ্টান্ত হল প্রমাণসিদ্ধ এবং সর্বজনস্বীকৃত, সেহেতু দৃষ্টান্ত সম্পর্কে কোন মতভেদ থাকে না। চতুর্থ বচনটি হল—উপনয়। উপনয় হল সামান্য বচনটিকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। পঞ্চম বা সর্বশেষ বচনটি হল নিগমন। পূর্ববর্তী বচনগুলির ভিত্তিতে বা বচনগুলির দ্বারা সমর্থিত হয়ে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় সেটিই হল নিগমন।

ভারতীয় ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব

উক্ত অবয়বসমূহের সমষ্টিকে ন্যায় নামে অভিহিত করা হয়।

পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের তুলনা এবং ভারতীয় পাঁচ অবয়ববিশিষ্ট ন্যায়ের সুবিধা ঃ ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। উভয় ন্যায়েই তিনটি পদ আছে ঃ যথা— (১) সাধ্য (Major) ; (২) পক্ষ (Minor) এবং (৩) হেতু (Middle)। ভারতীয় ন্যায় যদিও পাঁচ অবয়ববিশিষ্ট, তবু এ ন্যায়ে তিন অবয়ববিশিষ্ট অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের মতন তিনটি বচনই রয়েছে। প্রতিজ্ঞা এবং হেতু দুবার উল্লিখিত হবে। উভয় ন্যায়ই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমানের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করে।

পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের সাদৃশ্য

উভয় ন্যায়ের মধ্যে কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও আছে। যারা উভয় ন্যায়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ভারতীয় ন্যায়ের বিকাশের মূলে অ্যারিস্টটলীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করে থাকেন, তাঁরা এদের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন না। প্রথমতঃ, ভারতীয় ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব, অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের তিনটি অবয়ব। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় তিন অবয়ববিশিষ্ট ন্যায়ের বচনের ক্রম অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের বচনের ক্রমের বিপরীত। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় ন্যায়ের মূল সূত্র হল ব্যাপ্তি বা সাধ্য ও হেতুর মধ্যে অব্যাভিচারী সম্বন্ধ। অ্যারিস্টটল-এর ন্যায়ের মূল সূত্র হল—"সব এবং কিছুই নয় সম্বন্ধে নিয়ম" (Dictum de Omni et nullo)[1]। চতুর্থতঃ, পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানের

1. "Whatever can be affirmed (or denied) of a class may be affirmed (or denied) of everything included in the class".

হেতুর সংজ্ঞা ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের হেতু বা লিঙ্গের সংজ্ঞার সঙ্গে অভিন্ন নয়। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানীদের মতে যে পদ উভয় আশ্রয়বাক্যে ব্যবহৃত হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হয় না, তাকেই হেতু বা মধ্যপদ বলে। আর ভারতীয় নৈয়ায়িকদের মতে লিঙ্গ বা হেতু হল একটি চিহ্ন, যার সাহায্যে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে এমন কোন সংবাদ জানা যায় যা প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা যায় না। পঞ্চমতঃ, অ্যারিস্টটল ন্যায়ের বিভিন্ন সংস্থান বা আকার (figure) এবং বিভিন্ন মূর্তি (mood) স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভারতীয় নৈয়ায়িকরা ন্যায়ের সংস্থান ও মূর্তি স্বীকার করেন না। ষষ্ঠতঃ, অ্যারিস্টটলীয় ন্যায় কেবলমাত্র আকারগত সত্যতাই (formal truth) প্রতিষ্ঠা করে, বস্তুগত যাথার্থ্য প্রমাণ করে না। কিন্তু ভারতীয় ন্যায় আকারগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতাই প্রমাণ করে। ভারতীয় ন্যায়ে অবরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমান উভয়ের সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের অসাদৃশ্য

এখানে প্রশ্ন হল, পাঁচটি **অবয়ববিশিষ্ট ভারতীয় ন্যায়ের সুবিধা কি?** এই ন্যায় আকারগত ও বস্তুগত উভয়বিধ সত্যতাই প্রমাণ করতে পারে। যে বচনটি উদাহরণ, অর্থাৎ ন্যায়ের তৃতীয় বচন, সে বচনটি ভারতীয় ন্যায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সূচনা করে। কেননা, এই বচনটিতেই আকারগত ও বস্তুগত সত্যের সমন্বয় দেখা যায়, যেহেতু বচনটির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ দৃষ্টান্ত অর্থাৎ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয়। ভারতীয় ন্যায়ের চতুর্থ বচনটিরও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে; এই বচনটিতে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের প্রধান বচন (major premise) এবং অপ্রধান বচনের (minor premise) সমন্বয় সাধিত হয় এবং উভয় বচনে যে একই মধ্যপদ বা হেতু ব্যবহার করা হয়, তা স্পষ্টভাবে দেখান হয়। এই বচনটি থেকে জানা যায় যে, একই হেতু যা সাধ্য পদের সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত, পক্ষপদেও অবস্থিত এবং বিষয়টি প্রমাণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। ন্যায়ের শেষ বচনটিও প্রথম বচন বা প্রতিজ্ঞার অর্থহীন পুনরাবৃত্তি নয়। যে বচনটি প্রথমে ছিল কেবলমাত্র একটি আনুমানিক ধারণা সেইটিই সিদ্ধান্ত এবং একটি সুনিশ্চিত প্রমাণিত সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। সুতরাং ভারতীয় ন্যায়ের যুক্তিগুলির সত্যতা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় এবং এই প্রকার যুক্তিবাক্যের দ্বারা সমর্থিত হয়ে আমরা এমন একটি অবশ্য স্বীকার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যার বস্তুগত সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না।

পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট ভারতীয় ন্যায়ের সুবিধা

১১। ব্যাপ্তি (Vyapti) ঃ

ব্যাপ্তি কাকে বলে (What is the nature of Vyapti)? 'হেতু' ও 'সাধ্য'-র মধ্যে যে নিয়ত সহচার বা সাহচর্য সম্বন্ধ তার নাম হল ব্যাপ্তি। যেমন 'যেখানেই ধুম, সেখানেই বহ্নি'। এই বচনে ধূম এবং বহ্নির মধ্যে যে সামান্য সম্বন্ধ (universal relation) স্থাপন করা হয়েছে তাই ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিই অনুমানের ভিত্তি বা অনুমান পদ্ধতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। অনুমান দুটি শর্তের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ হেতুর (ধূমের) পক্ষতে (পর্বতে) অবস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান; এবং দ্বিতীয়তঃ, হেতু (ধূম) ও সাধ্যের (বহ্নি) মধ্যে ব্যাপ্তি বা অব্যভিচারী সম্বন্ধ। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অব্যাভিচারী সম্বন্ধ বর্তমান থাকলেই আমরা 'পর্বত বহ্নিমান'—এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পারি।

হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহচার সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে

ব্যাপ্তির স্বরূপ কি? ঃ ব্যাপ্তি কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি, অর্থাৎ যা সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে রয়েছে বা ছড়িয়ে রয়েছে। যা সর্বত্র পরিব্যাপক্ষম তাকেই ব্যাপ্তি বলি। আরও একটু সহজ করে বলা যেতে পারে যে, একটি বিষয় আর একটি বিষয়ে ব্যাপ্ত; এর অর্থ হল যে একটি বিষয় আর একটি বিষয়কে নিয়ত অনুগমন করে বা তাতে উপস্থিত থাকে। যার দ্বারা ব্যাপ্ত হয় তাকে 'ব্যাপক' এবং যা ব্যাপ্ত হয় তাকে 'ব্যাপ্য' বলে। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাই হল ব্যাপ্তি। হেতুর তুলনায় সাধ্য সকল সময়েই বেশী জায়গা জুড়ে থাকে। বেশী জায়গা জুড়ে থাকা হল ব্যাপকতা আর অল্প জায়গা জুড়ে থাকা হল ব্যাপ্যতা। হেতু ব্যাপ্য এবং সাধ্য ব্যাপক। ধূম হল ব্যাপ্য এবং বহ্নি হল ব্যাপক, কারণ বহ্নিদ্বারা ধূম ব্যাপ্ত। বহ্নি ব্যাপক, যেহেতু বহ্নি নিয়ত ধূমকে অনুগমন করে। যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি থাকবেই। ধূম হল ব্যাপ্য। যেহেতু ধূম নিয়ত বহ্নিকে অনুগমন করে না, যেখানে বহ্নি সেখানে ধূম বর্তমান, এ কথা বলা চলে না। যেমন, আগুনে পুড়ে টকটকে লাল যে লৌহখণ্ড তার মধ্যে ধূম নেই। কাজেই ধূম অগ্নিতে ব্যাপ্ত, কিন্তু অগ্নি ধূমে ব্যাপ্ত নয়।

ব্যাপ্তির স্বরূপ

ব্যাপ্তি দু প্রকার—**সমব্যাপ্তি** এবং **বিষমব্যাপ্তি**। যখন ব্যাপ্য ও ব্যাপকের ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি সমান হয়, তখন তাকে সমব্যাপ্তি বলে। যেমন, সকল 'জ্ঞেয়' হয় 'অভিধেয়' (all knowable objects are nameable)। এখানে 'জ্ঞেয়' ও 'অভিধেয়' —উভয়ের ব্যাপকতা সমান। জ্ঞেয়র বিস্তৃতি যতদূর অভিধেয়ের বিস্তৃতিও ততদূর। জ্ঞেয়ত্ব ও অভিধেয়ত্ব সমব্যাপ্তিবিশিষ্ট। কাজেই আমরা একটি থেকে আর একটি

অনুমান করে নিতে পারি। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের বিস্তৃতি যদি সমান না হয় তাহলে তাদের সম্বন্ধকে বিষমব্যাপ্তি বা অসমব্যাপ্তি বলা হয়। ধূম ও বহ্নির বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা সমান নয় বলে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করা যায় না। এজন্য ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বিষমব্যাপ্তি বা অসমব্যাপ্তি বিশিষ্ট।

ব্যাপ্তি—সম ও বিষম

ব্যাপ্তি ভিন্ন অনুমান হয় না এবং সে কারণে ন্যায়ের একটি বচনকে সার্বিক বা সামান্য হতেই হবে। ব্যাপ্তি সম্বন্ধ সাধারণতঃ সাহচর্য বা সহ-অবস্থান (co-existence) নির্দেশ করে। যেমন—যেখানেই ধূমের অস্তিত্ব, সেখানেই বহ্নির অস্তিত্ব। তবে যে কোন সহ-অবস্থান সম্বন্ধ ব্যাপ্তি নির্দেশ করে না। যদিও বহ্নির সঙ্গে ধূমের সহ-অবস্থান অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায় তবু তাদের মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নেই। এরূপ ক্ষেত্রে সহ-অবস্থানের বিষয়টি অন্য শর্ত বা উপাধির ওপর নির্ভর। যদি বহ্নি আর্দ্রেন্ধন জন্য অর্থাৎ ভিজা কাঠের জন্য হয় তাহলে তাতে ধূম অবশ্যই থাকে। এক্ষেত্রে বহ্নির সঙ্গে ধূমের সম্বন্ধ 'আর্দ্রেন্ধনজনিত' এই উপাধিবিশিষ্ট। সাধারণ বহ্নির সঙ্গে ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ না থাকার কারণ এই যে, বহ্নি উপাধিযুক্ত না হলে ধূম দ্বারা ব্যাপ্ত হতে পারে না।

সুতরাং, ব্যাপ্তি হল অনৌপাধিক (unconditional) বা উপাধিবর্জিত সম্বন্ধ। ব্যাপ্তি হল হেতু এবং সাধ্যের সেই সাহচর্য বা সহ-অবস্থানের সম্বন্ধ—যে সম্বন্ধ অন্য শর্তের বা উপাধির ওপর নির্ভর নয়। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের, হেতু এবং সাধ্যের সহচার সম্বন্ধটি সকল রকম উপাধিবর্জিত হলেই, সেই সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা হয়। সুতরাং, ব্যাপ্তি হল হেতু ও সাধ্যের নিত্য অনৌপাধিক সম্বন্ধ। ব্যাপ্তি[1] সম্বন্ধ, নিয়ত, অনৌপাধিক, অব্যাভিচারী ও অবশ্য-স্বীকার্য।

ব্যাপ্তি কিভাবে জানা যায়? (How is Vyapti known ?) : ব্যাপ্তি কিভাবে জানা যায়? ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ তাকে জানার উপায় কী? 'সব ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান'—এই সামান্য বচন (universal proposition) আমরা কিভাবে পেতে পারি? বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক এই প্রশ্নের বিভিন্ন রকম উত্তর দিয়েছেন। চার্বাক দার্শনিকরা অনুমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে ব্যাপ্তি 'তদুৎপত্তি নীতি' (The Principle of Causality) এবং তাদাত্ম্য নীতির (The Principle of Essential

ব্যাপ্তি কিভাবে জানা যায় : বৌদ্ধদের মত

1. ব্যাপ্তি দুই প্রকার : অন্বয় বা সদর্থক এবং ব্যতিরেক বা নঞর্থক। অন্বয়ব্যাপ্তি বা সামান্য সদর্থক বচনে হেতু হল ব্যাপ্য বা উদ্দেশ্য এবং সাধ্য হল ব্যাপক বা বিধেয়। যেমন, 'যা কিছু ধূমবান তাই বহ্নিমান'। ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বা সামান্য নঞর্থক বচনে ব্যাপকের বিরুদ্ধপদ বা বিধেয়ের বিরুদ্ধপদ হল উদ্দেশ্য এবং ব্যাপ্যের বিরুদ্ধপদ, বা উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধপদ হল ব্যাপক বা বিধেয়। যেমন, 'যা অ-বহ্নিমান হয় অ-ধূমবান'।

Identity) ওপর নির্ভর।[1] অর্থাৎ দুটি পদার্থের মধ্যে যদি কার্যকারণ[2] সম্বন্ধ থাকে কিংবা দুটি পদার্থের মধ্যে যদি তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকে তাহলে তাদের ব্যাপ্তি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দুটি বস্তুর মধ্যে একটি যদি কারণ পদার্থ হয় এবং অপরটি যদি কার্য পদার্থ হয় তাহলে তাদের সার্বত্রিক সম্বন্ধ স্বীকার করতেই হয়। দুটি বস্তুর মধ্যে যদি এক অভিন্ন সারধর্ম থাকে তাহলে সেই দুই বস্তুর তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হয়ে থাকে। শিংশপার সঙ্গে বৃক্ষের তাদাত্ম্য আছে, কেননা বৃক্ষের সারধর্ম বৃক্ষত্ব শিংশপা বৃক্ষেও আছে। যেখানে এই তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকে সেখানে ব্যাপ্তি নির্ণয় করা সহজ হয়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে সদৃশ দৃষ্টান্তের ভাব ও বিসদৃশ দৃষ্টান্তের অভাব থাকলেই ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ স্থলে অবাধিত সহচার দর্শন হয়, ব্যাভিচার দর্শন হয় না যেমন, কোন ব্যক্তির শুধুমাত্র কৃষ্ণবর্ণের কাক প্রত্যক্ষ করা এবং কোন শ্বেতবর্ণের কাক প্রত্যক্ষ না করা। পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রে একে বলা হয়েছে অপূর্ণ-গণনামূলক আরোহ অনুমান[3] (Inference by Simple Enumeration)।

নৈয়ায়িকরা বৌদ্ধ মত গ্রহণ করেন না। বেদান্ত মতের সঙ্গেও তাঁদের মতের পার্থক্য আছে। নৈয়ায়িকদের মতে অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যাভিচারাগ্রহ, উপাধিনিরাস, তর্ক ও সামান্য-লক্ষণ-প্রত্যক্ষ—এই ছয়টি বিষয়ের দ্বারা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাপ্তি সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের মত

নৈয়ায়িকদের মতে প্রথমতঃ, আমরা দুটি বিষয়ের একত্র উপস্থিতির অন্বয় বা সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করি, অর্থাৎ 'যেখানেই ধূম', 'সেখানেই বহ্নি'। দ্বিতীয়তঃ, আমরা ঐ দুটি বিষয়ের একত্র অনুপস্থিতির ব্যতিরেক প্রত্যক্ষ করি, অর্থাৎ 'যেখানে বহ্নি নেই, সেখানে ধূম নেই'। তৃতীয়তঃ, আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, কোন ব্যাভিচারাগ্রহ বা বিপরীত দৃষ্টান্ত (Contrary instance) নেই। অর্থাৎ এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখি না যেখানে ধূম আছে, অথচ বহ্নি নেই। এই সকল বিষয় থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বর্তমান। কিন্তু এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ যে অনৌপাধিক (unconditional),

---

1. বৌদ্ধ দার্শনিকবৃন্দ 'কার্যকারণ সম্বন্ধ' এবং 'তাদাত্ম্য সম্বন্ধ'কেই সামান্য বচনের জ্ঞানের ভিত্তি বলে গণ্য করেন। কারণ তাঁদের মতানুসারে এই দুটি নীতি মানুষের চিন্তার এবং কার্যের অভিজ্ঞতা-পূর্ব এবং অনিবার্য নীতি।

2. বৌদ্ধমতে কার্যকারণ সম্বন্ধের পাঁচটি লক্ষণ আছে, এদের পঞ্চকারণী বলে। এই মতানুসারে প্রথমে কারণ ও কার্যের কোনটিই প্রত্যক্ষ হয় না। দ্বিতীয় স্তরে কারণের উপলব্ধি হয়, তৃতীয় স্তরে কারণ দেখার অব্যবহিত পরেই কার্য প্রত্যক্ষ হয়। চতুর্থ স্তরে কারণ অদৃশ্য হয় এবং পঞ্চম স্তরে কারণ অদৃশ্য হওয়ার অব্যবহিত পরেই কার্যও অদৃশ্য হয়ে যায়।

3. এ ধরনের আরোহ অনুমানের মূল কথা হল অবাধ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সামান্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা। যেমন—সব কাক হয় কালো বা সব রাজহাঁস হয় সাদা।

অর্থাৎ এর মূলে যে অন্য কোন কারণ নেই কিভাবে জানা যাবে? সুতরাং উপাধিনিরাস করার প্ররোজন আছে। এর জন্য প্রয়োজন 'ভূয়োদর্শন' বা বার বার প্রত্যক্ষ করা। বার বার প্রত্যক্ষ করে সুনিশ্চিত হতে হবে যে, ব্যাপ্তিসম্বন্ধ অনৌপাধিক বা উপাধিমুক্ত[1] অর্থাৎ অন্য কোন শর্তনির্ভর নয়।

কিন্তু এই ব্যাপ্তিজ্ঞান যে যথার্থ, অর্থাৎ, যে দুটি বিষয়ের মধ্যে এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধের কথা চিন্তা করা হয়েছে, সে সম্বন্ধ যে সকল সময়ই কার্যকর হবে তার প্রমাণ কি? নৈয়ায়িকদের মতে তর্কের সাহায্যে এই ব্যাপ্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করা যেতে পারে।

তর্কের সাহায্যে ব্যাপ্তির যাথার্থ্য প্রমাণ

'সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান' যদি এই বচনটি সত্য না হয় তাহলে এর বিরুদ্ধ বচন 'কোন কোন ধূমবান বস্তু বহ্নিমান নয়' অবশ্যই সত্য হবে। কিন্তু এ জাতীয় সিদ্ধান্ত করার অর্থ হল কারণ ছাড়াও কার্য উদ্ভূত হতে পারে—এই নীতিকে স্বীকার করে নেওয়া, যেহেতু বহ্নি ছাড়া ধূমের অন্য কোন কারণ আমাদের জানা নেই। সুতরাং, এই তর্কের সাহায্যে মূল সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ 'সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান' অবশ্য সত্য বলে প্রমাণিত হল।

নৈয়ায়িকদের মতে যদিও অবাধিত সহচার দর্শন দ্বারা ব্যাপ্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তর্কের দ্বারা তাকে সমর্থিত করা হয়, তবু একমাত্র সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণের সাহায্যেই এই ব্যাপ্তিজ্ঞান যথার্থ হয়। কয়েক ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য প্রত্যক্ষ করে অনুমান করা হয় যে সব ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান। কিন্তু অনেকবার ধূমের সঙ্গে বহ্নির সাহচর্য দেখা গেছে বলে কি প্রত্যেকবারই ধূম ও বহ্নির সাহচর্য দেখা যাবে?

সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণের সাহায্যেই ব্যাপ্তিজ্ঞান যথার্থ হয়

একারণে সকল ধূমের কোনরূপ জ্ঞান এবং তার সঙ্গে বহ্নিত্বের সম্বন্ধজ্ঞান আবশ্যক। নৈয়ায়িকদের মতে সামান্য লক্ষণ-প্রত্যক্ষণের সাহায্যেই এই জ্ঞানলাভ করা যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধূমের সঙ্গে বহ্নির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা ধূমের যে জাতি-ধর্ম বা সামান্য ধর্ম—ধূমত্বকে (Smokeness) এবং বহ্নির সামান্যধর্ম—বহ্নিত্বকে ও ধূমত্বের সঙ্গে বহ্নিত্বের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি। ধূমত্ব ও বহ্নিত্বের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হলে সব ধূমের

---

1. উপাধির লক্ষণ কি? 'সাধ্য সমব্যাপ্তি' ও 'অব্যাপ্ত সাধন'—এই দুটি উপাধির লক্ষণ। যে বস্তুটি হেতু বা সাধন দ্বারা ব্যাপ্ত নয় এবং সাধ্যের সঙ্গে যার সমব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে তাকে উপাধি বলে। বহ্নি দেখে যেখানে ধূম অনুমান করা হয়, সেখানে বহ্নি হল হেতু বা 'সাধন' ও ধূম 'সাধ্য' এবং আর্দ্রেন্ধন বা ভিজা কাঠ হল উপাধি। উপাধির বিস্তৃতি সাধ্যের বিস্তৃতির সমান (সাধ্য সমব্যাপ্তি), কিন্তু সাধন বা হেতুর সঙ্গে উপাধির সমব্যাপ্তি নেই (অব্যাপ্ত সাধন)। যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে আর্দ্রেন্ধন আছে, কিন্তু যেখানে যেখানে বহ্নি আছে সেখানে আর্দ্রেন্ধন আছে এমন কথা বলা যায় না। বহ্নির সঙ্গে আর্দ্রেন্ধনের সমব্যাপ্তি নেই।

ও সব বহ্নির এবং তাদের সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। ধূমত্ব প্রত্যক্ষ না করলে কোন বিশেষ ধূমকে ধূম বা বহ্নিত্ব প্রত্যক্ষ না করলে কোন বিশেষ বহ্নিকে বহ্নি বলে জানতে পারতাম না। কিন্তু ধূমত্ব ও বহ্নিত্ব প্রত্যক্ষ করার অর্থ হল সব ধূমকে ও সব বহ্নিকে অলৌকিক-ভাবে প্রত্যক্ষ করা। সুতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা জানি যে, সব ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান।

১২। অনুমানের শ্রেণীবিভাগ (The Classification of Inference) ঃ

পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানে অনুমানের নানারকম শ্রেণীবিভাগ দেখতে পাই। যেমন— অবরোহ অনুমান (Deductive Inference) এবং আরোহ অনুমান (Inductive Inference)। আবার এই অবরোহ অনুমানকেই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—অমাধ্যম অনুমান (Immediate Inference) এবং মাধ্যম অনুমান (Mediate Inference)। কিন্তু ভারতীয় নৈয়ায়িকদের অনুমানের শ্রেণীবিভাগ ভিন্নতর। ভারতীয় অনুমান পদ্ধতি অবরোহ ও আরোহ অনুমানের মিলিত প্রণালী এবং 'অনুমানের' ভিন্ন ধরনের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। নীচে এই শ্রেণীবিভাগের কথা আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

ভারতীয় অনুমান অবরোহ ও আরোহের মিলিত প্রণালী

(১) স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান ঃ অনুমান যে উদ্দেশ্যসাধন করে তারই ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

যখন ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অনুমান করা হয় তখন তাকে স্বার্থানুমান বলা হয়। যেহেতু এক্ষেত্রে পরের উপলব্ধি বা জ্ঞানের জন্য অনুমান করা হচ্ছে না, সেহেতু অনুমানটিকে যথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন হয় না।

স্বার্থানুমান

যখন অপরের কাছে কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনুমান করা হয়, তখন তাকে পরার্থানুমান বলে। পরের কাছে প্রমাণ করার জন্য অনুমানকে যথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ পাঁচটি অবয়ব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে, কোনটি উহ্য থাকলে চলবে না।

পরার্থানুমান

(২) 'পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট ঃ হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ তার প্রকৃতি বা স্বরূপের ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। পূর্ববৎ ও শেষবৎ অনুমানের পার্থক্য কার্যকারণ নীতিকে অবলম্বন করে করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ কারণ থেকে যখন অপ্রত্যক্ষ কার্যের কথা অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় পূর্ববৎ অনুমান। পূর্ব দৃষ্টান্ত বা পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অনুমান করা হয়। যেমন, আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখে আমরা অনুমান করি যে, বৃষ্টি হবে। এখানে মেঘ হল কারণ, বৃষ্টি হল কার্য।

পূর্ববৎ অনুমান

আবার কার্য যেখানে প্রত্যক্ষ এবং তার থেকে যখন অপ্রত্যক্ষ কারণের কথা অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় শেষবৎ অনুমান। নদীর পরিপূর্ণতা ও স্রোতের প্রখরতা দেখে আমরা অতীত বৃষ্টির অনুমান করি।

শেষবৎ অনুমান

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক থাকে কিন্তু কোন কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না। এই অনুমানে হেতু সাধ্যের কারণ বা কার্য বলে প্রত্যক্ষ হয় না কিন্তু সাধারণভাবে অন্যত্র তাদের সম্বন্ধ দেখে হেতু দ্বারা সাধ্যের অনুমান করা হয়। চন্দ্রের গতি প্রত্যক্ষগোচর নয়, তবু চন্দ্রের গতি অনুমান করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এক স্থানে দৃষ্ট বস্তুর অন্য স্থানে দর্শন তার গতি ছাড়া সম্ভব হয় না। চন্দ্র এক সময়ে এক স্থানে দৃষ্ট হয়, পরে অন্য স্থানে দৃষ্ট হয়, সুতরাং চন্দ্রের গতি যত্রতত্র বলে অনুমান করা যায়। এই অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট। অনুরূপভাবে শিংযুক্ত কোন প্রাণী দেখে তার দ্বিখণ্ডিত খুর আছে এরূপ অনুমান করা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দৃষ্টান্ত। এই জাতীয় অনুমানে কার্যকারণ সম্বন্ধের ওপর ভিত্তি না করে, পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়।

(৩) কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী: হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে উপরিউক্ত অনুমানের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

কেবলমাত্র অন্বয়ী দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে (অর্থাৎ যেখানে হেতু সেখানেই সাধ্য) যখন অনুমান করা হয় তখন সেই অনুমানকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলা হয়। কেবলান্বয়ী অনুমানে কোন নঞর্থক বা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এই অনুমানে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তি থাকে। উদাহরণ স্বরূপ—

কেবলান্বয়ী অনুমান

সব জ্ঞেয় পদার্থই অভিধেয়।

ঘট একটি জ্ঞেয় পদার্থ।

∴ ঘট একটি অভিধেয় পদার্থ।

এই অনুমানে সাধ্য বাক্যটি একটি সামান্য বচন, যে বচনে 'অভিধেয়' এই বিষয়টি

সব জ্ঞেয় পদার্থ সম্পর্কেই স্বীকার করা হয়েছে। যা জ্ঞেয় নয় তা অভিধেয় নয়, এরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, কারণ সব বস্তুই জ্ঞেয় ও অভিধেয়।

কেবলমাত্র ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে (অর্থাৎ যেখানে হেতুর অভাবের সঙ্গে সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্তি বর্তমান) যখন অনুমান করা হয় তখন সেই অনুমানকে কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান বলা হয়। এই অনুমানে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের কেবল-ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি দেখা যায়। পক্ষ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে এদের অন্বয় দেখা যায় না। উদাহরণ—

কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান

যা অন্য সব মহাভূত থেকে ভিন্ন নয়, তা গন্ধবৎ নয়।

ক্ষিতি গন্ধবৎ।

∴ ক্ষিতি অন্য সব মহাভূত থেকে ভিন্ন।

এক্ষেত্রে 'যা যা গন্ধবৎ তাই তাই অপর মহাভূত থেকে ভিন্ন', এরূপ অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভব নয়, কারণ এক ক্ষিতি ব্যতীত অন্য কিছুতে এই ব্যাপ্তির উদাহরণ নেই। ক্ষিতিই একমাত্র মহাভূত যার গুণ গন্ধ।

হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেকী—এই উভয় প্রকার দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে যখন অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান। এই প্রকার অনুমানে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের অন্বয় ও ব্যতিরেক—এই উভয়প্রকার ব্যাপ্তি দেখা যায়। উদাহরণ—

অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান

অন্বয়ী	ব্যতিরেকী
সব ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান।	কোন অ-বহ্নিমান বস্তুই নয় ধূমবান।
পর্বত ধূমবান।	পর্বত হয় ধূমবান।
∴ পর্বত বহ্নিমান।	∴ পর্বত হয় বহ্নিমান।

১৩। হেত্বাভাস (Fallacies of Inference) ঃ

সদোষ হেতুকেই হেত্বাভাস[1] বলে। যা কোন অনুমানের যথার্থ হেতু না হয়েও হেতু বলে প্রতীয়মান হয়, তাই হেত্বাভাস। ব্যাপক অর্থে হেতুর যে কোন দোষের নামই হেত্বাভাস। নৈয়ায়িকরা পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস স্বীকার করেন—(১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) সৎপ্রতিপক্ষ, (৪) অসিদ্ধ এবং (৫) বাধিত।

দোষযুক্ত হেতুকেই হেত্বাভাস বলে

1. 'In Indian Logic, a material fallacy is technically called hetvabhasa, a word which literally means a hetu or reason which appears as but really, is not a valid reason."—Chatterjee and Dutta: An Introductions to Indian Philosophy.

(১) **সব্যভিচার হেত্বাভাস :** অনুমানের নিয়ম হল যে, হেতু সাধ্যের দ্বারা ব্যাপ্য হবে অর্থাৎ যেখানে হেতু উপস্থিত সেখানে সাধ্যও উপস্থিত থাকবে। যেমন, যেখানেই ধূম, সেখানেই বহ্নি। কিন্তু এই নিয়ম যদি লঙ্ঘন করা হয় তাহলে সব্যভিচার হেত্বাভাস (fallacy of irregular middle) ঘটে। যেমন,

সব্যভিচার হেত্বাভাস

সকল জ্ঞেয় বস্তুই হয় বহ্নিমান।

পর্বত হল একটি জ্ঞেয় বস্তু।

∴ পর্বত হল বহ্নিমান।

উপরিউক্ত অনুমানের সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতা স্বীকার করা যেতে পারে না, কারণ উপরিউক্ত উদাহরণে হেতু 'জ্ঞেয় বস্তু', বহ্নিমান পাকঘর ও অ-বহ্নিমান হ্রদ উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। সব জ্ঞেয় বস্তুই বহ্নিমান নয়। হ্রদ একটি জ্ঞেয় বস্তু, কিন্তু হ্রদ বহ্নিমান নয়। যর্থার্থ অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতার সমান হতে পারে বা তার থেকে কম হতে পারে, কিন্তু কখনও বেশী হতে পারে না। উপরিউক্ত উদাহরণে জ্ঞেয় বস্তুর ব্যাপকতা বহ্নিমান বস্তুর ব্যাপকতা থেকে অধিক যেহেতু অনেক জ্ঞেয় বস্তু আছে যা অবহ্নিমান বস্তু (non-fiery object)। এই হেত্বাভাসকে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসও বলা হয়; কারণ হেতু সাধ্যের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সব্যভিচার হেত্বাভাস তিন প্রকার : (১) সাধারণ, (২) অসাধারণ ও (৩) অনুপসংহারী।

সব্যভিচার হেত্বাভাস তিনপ্রকার

যে অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতার তুলনায় অধিক, তাকে সাধারণ সব্যভিচারী হেত্বাভাস বলা হয়। যে হেতু কেবল স্বপক্ষে না থেকে বিপক্ষেও থাকে তার নাম সাধারণ হেতু। সাধারণ হেতু কেবল সাধ্যেরই সহচর নয়, সাধ্যাভাবেরও সহচর। উপরিউক্ত উদাহরণটি এরূপ একটি হেত্বাভাসের উদাহরণ। অপর একটি উদাহরন—'সকল দ্বিপদ প্রাণী হয় চিন্তাশীল', 'হংস হয় দ্বিপদ প্রাণী', 'হংস হয় চিন্তাশীল'। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের বস্তুগত সত্যতা নেই, কারণ হেতু 'দ্বিপদ' চিন্তাশীল ও অ-চিন্তাশীল উভয় প্রকার প্রাণীর সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত।

সাধারণ

যে অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা এতই কম বা সঙ্কীর্ণ যে, হেতু কেবলমাত্র পক্ষে একটি বিশেষ ধর্মরূপে উপস্থিত থাকে, কিন্তু সাধ্যে উপস্থিত থাকে না, তাকে অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস বলা হয়। অসাধারণ হেতুকে স্বপক্ষ বা বিপক্ষের কোনটিতেই দেখা যায় না। যেমন,

অসাধারণ

যা কিছুতে শব্দত্ব আছে, তা হল নিত্য।
শব্দতেই শব্দত্ব আছে।
∴ শব্দ হল নিত্য।

এই অনুমান সিদ্ধ নয়, যেহেতু 'হেতু' শব্দত্ব কেবলমাত্র শব্দেই বিদ্যমান, অন্য কিছুতে বিদ্যমান নয়। শব্দত্ব, নিত্য বস্তু 'আত্মা' বা অনিত্য বস্তু 'ঘট' প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং শব্দত্ব এবং নিত্যতার মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্থাপন করা চলে না।

অনুপসংহার সব্যভিচারী হেত্বাভাস

যে অনুমানে হেতু এমন 'সর্বব্যাপক' যে স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কোনরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা হেতুকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, সেই অনুমানকে অনুপসংহার সব্যভিচারী হেত্বাভাস বলা হয়। যেমন,

যা কিছু জ্ঞেয়, তাই অনিত্য।
সব বস্তুই হয় জ্ঞেয়।
∴ সব বস্তুই হয় অনিত্য।

এখানে যেহেতু পক্ষ হল 'সব বস্তু' কাজেই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে না, যা সব বস্তুর অন্তর্গত নয়। সুতরাং, হেতুকে কোনরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যাচ্ছে না।

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস : যে অনুমানে হেতু বিরুদ্ধ অর্থাৎ হেতু সাধ্যের অস্তিত্বের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না, তাকে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস (Fallacy of Contradictory middle) বলে। হেতুর কাজ পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা (to prove the existence of the major in the minor), কিন্তু এই অনুমানে হেতু পক্ষে, সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ না করে তার অভাবই প্রমাণ করে, কারণ হেতুর সাধ্যের অভাবের সঙ্গেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে ; যেমন— শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপন্নশীল। এই উদাহরণে হেতু 'উৎপন্নশীল' সব সময়ই অনিত্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত, নিত্য বস্তুর সঙ্গে নয়। সুতরাং যা কিছু উৎপন্নশীল, তাই নিত্য, এই উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব নয়। হেতু 'উৎপন্নশীল' শব্দের নিত্যতা প্রমাণ না করে তার অনিত্যতা প্রমাণ করে। কারণ যা উৎপন্নশীল তাই অনিত্য। কাজেই বিরুদ্ধ হেতু (contradictory middle) যে সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা দরকার, সেই সিদ্ধান্ত প্রমাণ না করে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে। বিরুদ্ধ হেতুর স্বপক্ষে কোন দৃষ্টান্ত নেই। কিন্তু এর বিপক্ষে বহু দৃষ্টান্ত আছে।

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস

সব্যভিচার ও বিরুদ্ধ হেতুর পার্থক্য এই যে, প্রথমটি সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে না, দ্বিতীয়টি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বচনটি প্রমাণ করে।

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস: সংপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস (Fallacy of inferentially contradicted middle) তখনই দেখা যায় যখন কোন একটি অনুমানের হেতু যে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তারই বিরোধী আর একটি হেতু অপর একটি অনুমানে সেই সাধ্যেরই অভাব প্রমাণ করে। যেমন, প্রথম অনুমানে বলা হল, শব্দ নিত্য, কারণ শব্দের শব্দত্ব আছে (audible)। আবার আর একটি অনুমানে এই সিদ্ধান্ত অযথার্থ প্রমাণ করা হল এরূপ অনুমান করে, শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপন্নশীল এবং যা কিছু উৎপন্নশীল তাই অনিত্য। বিরুদ্ধ এবং সৎপ্রতিপক্ষ হেতুর পার্থক্য এই যে, বিরুদ্ধ হেতু যে সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে হবে তার বিরুদ্ধ বচন প্রমাণ করে; আর সংপ্রতিপক্ষ হেতুর ক্ষেত্রে সাধ্যের বিরুদ্ধ বচন অপর একটি অনুমানে অন্য আর একটি হেতু প্রমাণ করে। সংপ্রতিপক্ষ শব্দের অর্থ যার প্রতিপক্ষ আছে।

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস

অসিদ্ধ হেত্বাভাস: যে অনুমানে হেতু সিদ্ধ নয়, অসিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে, সেই অনুমানকে অসিদ্ধ হেত্বাভাস (fallacy of unproved middle) বলা হয়। যেমন, আকাশকুসুম সুন্দর, যেহেতু স্বভাবিক কুসুমের মতো তার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু আকাশকুসুম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, সুতরাং এই অনুমানটি অসিদ্ধ।

অসিদ্ধ হেত্বাভাস

অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিন প্রকার: (১) আশ্রয়াসিদ্ধ হেতু, (২) স্বরূপাসিদ্ধ হেতু এবং (৩) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেতু।

আশ্রয়াসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু, যে হেতুর পক্ষে (minor) কোন আশ্রয় নেই, কারণ পক্ষই (minor) হল হেতুর আশ্রয়। পূর্বোক্ত উদাহরণটি আশ্রয়াসিদ্ধ হেতুর উদাহরণ।

স্বরূপাসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু যার পক্ষে (minor) অবস্থান সম্ভব নয়। যথার্থ হেতুর সকল সময়ই পক্ষধর্মতা থাকবে, কিন্তু হেতুর স্বভাব যদি এমনই হয় যে তা পক্ষে (minor) থাকতে পারে না, তাহলে অনুমান অসিদ্ধ হয়। যেমন, শব্দ হল রূপের মতো একটি গুণ, যেহেতু শব্দ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষযোগ্য। কিন্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষযোগ্যত্ব শব্দে থাকতে পারে না, সুতরাং এরূপ হেতু স্বরূপতেই অসিদ্ধ।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু, সাধ্যের সঙ্গে যার ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি শর্তনিরপেক্ষ বা অনৌপাধিক নয়, অন্য শর্ত নির্ভর। যেমন, 'পর্বত ধূমবান' যেহেতু পর্বত বহ্নিমান। এই অনুমানে সামান্য বচনটিতে, যেখানেই

বহ্নি সেখানেই ধূম, অর্থাৎ বহ্নির সঙ্গে ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ অন্য উপাধি বা শর্তের ওপর নির্ভর। সেই শর্ত হল যদি বহ্নি আর্দ্র ইন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর্দ্র ইন্ধনের অনুপস্থিতিতেই কেবলমাত্র আমরা ধূমহীন বহ্নি দেখতে পাই।

বাধিত বা হেত্বাভাস: বাধিত হেতু (non-inferentially contradicted middle) হল সেই হেতু যা অন্য প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। এই হেতু পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায় কিন্তু অন্য প্রমাণের দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অভাবের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ: যখন অনুমান করা হয় যে, বহ্নি শীতল যেহেতু বহ্নি হল একটি দ্রব্য, তখন এই অনুমানকে বাধিত হেত্বাভাস বলা হয়। কারণ হেতু 'দ্রব্য', যা পক্ষে অর্থাৎ বহ্নিতে শীতলতার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায় তা প্রমাণ করতে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষের দ্বারা সাধ্যের অভাব অর্থাৎ উষ্ণতা প্রমাণিত হয়।

বাধিত হেত্বাভাস

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসে একটি অনুমান অপর একটি অনুমানের দ্বারা অযথার্থ প্রমাণিত হয়। কিন্তু বাধিত হেত্বাভাসে একটি অনুমান প্রত্যক্ষের দ্বারা বা অনুমান নিরপেক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অযথার্থ প্রমাণিত হয়।

১৪। কার্যকারণ সম্বন্ধ (Causal Realation):

কার্যকারণ নিয়মের অর্থ হল—সকল কার্যই কারণ থেকে উদ্ভূত। প্রত্যেকটি ঘটনার একটা সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। কারণ কাকে বলে? কার্য কাকে বলে? যখন কোন বস্তু বা ঘটনা অপর কোন বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে প্রথমটির অস্তিত্বের ওপর দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব নির্ভর করে বা প্রথমটি ঘটলে দ্বিতীয়টি ঘটে, তখন তাদের সম্বন্ধকে কার্যকারণ সম্বন্ধ বলে। প্রথমটি কারণ, দ্বিতীয়টি কার্য। কারণকে সেজন্য এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, **কারণ—কার্যের অব্যবহিত, শর্তান্তরহীন, অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা**। কারণ কার্যের 'পূর্ববর্তী' ঘটনা। যখন দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়, তখন পূর্ববর্তী বা অগ্রগামী ঘটনাটি কারণ এবং পরবর্তী বা অনুবর্তী ঘটনাটি কার্য। যদিও কারণ পূর্ববর্তী ঘটনা তবুও কার্যের যে-কোন পূর্ববর্তী ঘটনাকেই কারণ বলা যাবে না। কারণ কার্যের 'অপরিবর্তনীয়' পূর্ববর্তী ঘটনা। যে ঘটনা সর্বদাই কার্যের পূর্বে বর্তমান থাকে তাকেই 'অপরিবর্তনীয়' ঘটনা বলে। কারণ ও কার্যের মধ্যে নিয়ত (Universal) সম্বন্ধ থাকবে। আবার কার্যের যে-কোন অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ বলা যেতে পারে না। তাহলে

কারণ কার্যের অব্যবহিত, শর্তান্তরহীন, অপরিবর্তনীয়, পূর্ববর্তী ঘটনা

দিনকে রাত্রির কারণ এবং রাত্রিকে দিনের কারণ বলা যেত। কারণ কেবলমাত্র কার্যের অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা নয়, কারণ কার্যের 'শর্তান্তরহীন' অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা। উপরন্তু কারণ হল 'অব্যবহিত' পূর্ববর্তী ঘটনা। কারণ ও কার্যের মধ্যে যদি দীর্ঘ ব্যবধান ঘটে, তাহলে সে সময়ের মধ্যে অন্য কোন ঘটনা ঘটতে পারে যা কার্যটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

সুতরাং, **কারণ হল কার্যের অপরিবর্তনীয় শর্তান্তরহীন অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা** (invariable, unconditional immediate antecedent) :

নৈয়ায়িকেরা বহুকারণবাদ স্বীকার করেন না। বহুকারণবাদ অনুসারে একই কার্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু নৈয়ায়িকদের মতে একই কারণের একটিমাত্র কার্য থাকতে পারে এবং একই কার্যের একটিমাত্র কারণ থাকতে পারে। তাঁদের মতে একটি বিশেষ কারণের একটি বিশেষ কার্যই থাকতে পারে, অনুরূপভাবে একটি বিশেষ কার্যের একটি বিশেষ কারণ থাকতে পারে।

নৈয়ায়িকরা বহুকারণবাদ স্বীকার করেন না।

বাচস্পতি এবং জয়ন্তের মতে কারণকে কারণ-সামগ্রী (an aggregate of operative conditions) রূপেই বিচার করা দরকার। অর্থাৎ, কারণ হল কতকগুলি শর্তের সমষ্টি।

নৈয়ায়িকদের মতে কারণ হল তিন প্রকার : (১) **সমবায়ী কারণ**, (২) **অসমবায়ী কারণ**, এবং (৩) **নিমিত্ত কারণ**।

সমবায়ী কারণ : কার্য উৎপন্ন হয়ে যাতে সমবেত থাকে তাকে সমবায়ী কারণ বলে। বস্ত্র হল কার্য, সূত্র হল তার সমবায়ী কারণ। বস্ত্র উৎপন্ন হয়ে সূত্রে সমবেত থাকে। বস্ত্রের সঙ্গে সূত্রের সম্পর্ক হল সমবায় (inherence) সম্পর্ক। সূত্র ছাড়া বস্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যদিও বস্ত্র ছাড়া সূত্রের অস্তিত্ব সম্ভব। অসমবায়ী কারণ হল সূত্রের সংযোগ যার দ্বারা বস্ত্রখণ্ড নির্মিত হয়। সূত্র হল বস্ত্রের সমবায়ী কারণ ; সূত্রের সংযোগ, যা সূত্রকে আশ্রয় করে থাকে, তাহল বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ। সমবায়ী কারণ হল কোন দ্রব্য, অসমবায়ী কারণ হল কোন গুণ বা ক্রিয়া। নিমিত্ত কারণ হল কর্তা যার প্রচেষ্টায় উপাদানের সাহায্যে কার্য উৎপন্ন হয়। তাঁতিই হল বস্ত্রের নিমিত্ত কারণ।

কারণ তিন প্রকার— সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ

অসৎকার্যবাদ : কার্যকারণ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে—সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ। কার্য সম্পর্কে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। কার্য

উৎপত্তির পূর্বে কার্য কি কারণে নিহিত থাকে বা কার্য কারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কোন্ নতুন সৃষ্টি? সাংখ্যকারদের মতে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে। এই মতবাদ সৎকার্যবাদ নামে পরিচিত। নৈয়ায়িকদের মতে কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্য বিদ্যমান থাকে না, কার্য সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। এই মতবাদ অসৎকার্যবাদ নামে পরিচিত। নৈয়ায়িকগণের মতে 'প্রাগভাব প্রতিযোগি কার্যম্'। কার্য হল কোন দ্রব্য, গুণ বা ক্রিয়া, যা সৃষ্ট হবার পূর্বে কারণে বিদ্যমান ছিল না। উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অস্তিত্ব থাকে না, কার্যের অভাবই থাকে। কার্য সৃষ্ট হওয়ার অর্থই তার প্রাগভাব (non-existence) বা পূর্ববর্তী অভাব বিনষ্ট হওয়া। কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে না, কার্য সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি বা আরম্ভ। এই কারণে এই মতবাদকে আরম্ভবাদও বলা হয়।

ন্যায় দর্শন অসৎকার্য-বাদের সমর্থক

অদ্বৈত বৈদান্তিকদের মতে কার্য হল কারণের বিবর্ত (a mere appearance) এবং সাংখ্যকার ও বৈদান্তিকদের মতে কারণ ও কার্য উভয়ের সত্তা আছে এবং কারণ ও কার্য ভিন্ন; কার্য যদি কারণ থেকে ভিন্ন না হত তাহলে আমরা কারণ থেকে কার্যকে পৃথক করতে পারতাম না। আমরা বস্ত্রের সূত্র বা তন্তুর মধ্যে কোন বস্ত্র দেখতে পাই না, কারণের সাহায্যে বস্ত্র নতুনভাবে সৃষ্ট হয়।

অদ্বৈতবেদান্ত মত

মীমাংসকদের মতে কারণের মধ্যে এমন এক অদৃষ্ট শক্তি নিহিত থাকে যা কার্য উৎপন্ন করে। নৈয়ায়িকরা কারণের মধ্যে কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

মীমাংসকদের মত

নৈয়ায়িকরা সাধারন কারন ও বিশিষ্ট কারণ—এই দুপ্রকার কারণ স্বীকার করে। দেশ, কাল, ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা, ধর্ম এবং অধর্ম (merit and demerit) পূর্বজন্ম প্রভৃতি সাধারন কারণ, যার অনুপস্থিতিতে কোন কার্যই ঘটতে পারে না। কিন্তু সাধারণতঃ কোন ঘটনার কারণ বলতে আমরা বিশিষ্ট কারণই বুঝে থাকি, এই বিশিষ্ট কারণকে অসাধারণ কারণও বলা যেতে পারে। ঘট নির্মাণের জন্য কুম্ভকারের দণ্ডটি হল করণ (instrument)। এই করণটি হল অসাধারণ কারণ।

নৈয়ায়িকদের মত

১৫। উপমান (Comparison):

নৈয়ায়িকরা উপমানকে যথার্থ জ্ঞানলাভের একটি বিশিষ্ট উপায় বা প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। 'প্রসিদ্ধ সাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনম্ উপমানম্'। প্রসিদ্ধ বস্তুর সাদৃশ্য

দ্বারা অপ্রসিদ্ধ বস্তুজ্ঞানের নাম উপমান। পূর্বপরিচিতি কোন একটি বস্তুর সঙ্গে নতুন ও অপরিচিত কোন বস্তুর সধর্ম বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যখন নতুন বস্তুটি সম্পর্কে আমরা জ্ঞানলাভ করি, তখন জ্ঞানলাভের এই প্রণালীকে উপমান বলা হয়। উপমার সাহায্যে জ্ঞানলাভ করার প্রণালী হল উপমান এবং এই প্রণালীর দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাকে উপমিতি বলা হয়। 'সংজ্ঞা সংজ্ঞী সম্বন্ধজ্ঞানম্ উপমিতি'। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তার জ্ঞানই হল উপমিতি। কোন বস্তুর বিশদ বিবরণই হল সংজ্ঞা এবং সেই সংজ্ঞা দ্বারা যে বস্তু নির্দিষ্ট হয় তাকেই সংজ্ঞী বলা হয়। উক্ত সম্বন্ধজ্ঞানের করণ হল সাদৃশ্য জ্ঞান।

উপমানের সংজ্ঞা

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: কোন ব্যক্তি হয়ত পূর্বে 'গবয়পশু' (নীলগাই) প্রত্যক্ষ করেনি। কোন একজন আরণ্যক তাকে বলল 'গো সদৃশ গবয়' অর্থাৎ গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদৃশ্য আছে। ব্যক্তিটি অরণ্যে গিয়ে একটি নতুন প্রাণী প্রত্যক্ষ করল এবং লক্ষ্য করল যে, প্রাণীটির সঙ্গে গরুর সাদৃশ্য আছে। তখন সে নতুন প্রাণীটিকে গবয় বলে চিনতে পারল। আরণ্যকের সংজ্ঞার সাহায্যেই সে নতুন প্রাণীটিকে অর্থাৎ সংজ্ঞীকে চিনতে পেরেছে। সে পূর্বে গরু প্রত্যক্ষ করেছে, কোন গবয় প্রত্যক্ষ করেনি কিন্তু গরুর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে 'গবয়' সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছে। উপমানের সাহায্যেই এই নতুন জ্ঞান সে লাভ করল। সুতরাং, উপমানে দুটি বিষয় আছে—(১) পূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয়নি এমন একটি নতুন অপরিচিত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা এবং (২) পূর্ব পরিচিত একটি বস্তুর সঙ্গে এই নতুন অপরিচিত বস্তুটির সাদৃশ্যের জ্ঞান।

সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর সম্বন্ধ জ্ঞানই উপমিতি

উপমান হল নামের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধের জ্ঞান

সুতরাং, উপমান হল একটি শব্দ এবং সেই শব্দ একই অর্থে যে বস্তুশ্রেণীর ওপর প্রযোজ্য হয় তার সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধের জ্ঞান (the knowledge of the denotative relation between a word and a certain class of objects)। উপমান বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য জ্ঞান নয়, একটি নামের সঙ্গে তার বস্তুর সম্বন্ধের জ্ঞান (the knowledge of the relation between a name and its object)। কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা কোন একটি শব্দের বিশেষ বিবরণ লাভ করি এবং তারই ভিত্তিতে সেই বিশেষ বিবরণটি প্রযোজ্য হয় এমন একটি নতুন বস্তু যাকে আমরা পূর্বে প্রত্যক্ষ করিনি, তার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্যমূলক অনুমান (Analogy) এবং ভারতীয় নৈয়ায়িকদের উপমান এক নয়। যদিও উভয়

ক্ষেত্রে সাদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তিতেই নতুন জ্ঞান লাভ করা যায়, তবুও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্যমূলক অনুমানের একটা উদাহরণ নেওয়া যাক: মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা অনুমান করি যে, যেহেতু পৃথিবীতে জীবের বাস আছে, সেহেতু মঙ্গল গ্রহেও জীবের বাস আছে। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্যমূলক অনুমানে বস্তুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা হয়, কিন্তু নৈয়ায়িকদের উপমান হল সংজ্ঞার সঙ্গে সংজ্ঞীর সম্বন্ধের জ্ঞান।

নৈয়ায়িকরা উপমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করলেও ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ উপমানকে প্রমাণরূপে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। চার্বাকদের মতে উপমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু উপমানের সাহায্যে শব্দের বাচ্যার্থ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায় না। চার্বাকদের কাছে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বৌদ্ধগণ উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার না করে তাকে প্রত্যক্ষ ও শব্দেরই অন্তর্গত বলে ধারণা করেন। বৈশেষিক এবং সাংখ্য দার্শনিকরা উপমানকে অনুমানরূপেই ব্যাখ্যা করেন। জৈন দার্শনিকদের মতে উপমান প্রত্যভিজ্ঞার অন্তর্গত। মীমাংসকরা উপমানকে যথার্থ প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, তবে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। মীমাংসকদের মতে উপমানের সাহায্যে জ্ঞান আমরা তখনই লাভ করি যখন পূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এমন কোন বস্তুর সঙ্গে বর্তমানে প্রত্যক্ষ করা হল এমন একটি বস্তুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা অনুমান করি যে, পূর্বদৃষ্ট বস্তুটি বর্তমান বস্তুর মতন। পূর্বদৃষ্ট গরুর সঙ্গে বর্তমান গবয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা জানলাম যে, গরু গবয় সদৃশ।

কোন কোন নৈয়ায়িকদের মতে সাদৃশ্যজ্ঞান থেকে যেমন উপমিতি হয়, বৈসাদৃশ্য-জ্ঞান থেকেও উপমিতি হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে উট দেখতে বিশ্রী, এর শরীর দীর্ঘ, ঘাড় খুব লম্বা, পিঠ উঁচু; তাহলে তার বিবরণের মাধ্যমে অন্য পশুর সঙ্গে উটের পার্থক্যের বিষয় জানা গেল। এই বৈসাদৃশ্য জ্ঞানের সাহায্যে কোন ব্যক্তি পূর্বে প্রত্যক্ষ না করা সত্ত্বেও উটকে চিনে নিতে পারবে। এই ধরনের উপমিতিকে বৈধর্ম্যোপমিতি বলা হয়।

১৬। শব্দ (Testimony):

নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল চতুর্থ প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়। 'শব্দ' বলতে সাধরেণতঃ আমরা বুঝি বাচনিক জ্ঞান। শব্দ হল শব্দের ও বাক্যের দ্বারা সূচিত বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু সব বাচনিক জ্ঞানই যথার্থ নয়। নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শব্দের প্রকৃত অর্থ যিনি অবহিত, যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং

আপ্তের বচনই শব্দ-প্রমাণ

বিশ্বাসযোগ্য, তিনিই শব্দতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনিই আপ্ত।[1] তিনি নিজে সত্য জানেন এবং অপরের কাছে সত্যই প্রকাশ করেন। 'আপ্তবাক্যং শব্দঃ' বা 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'। আপ্তের বচনই শব্দ-প্রমাণ। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হলেন সত্যবাদী, তাঁর বাক্য প্রামাণিক, সেহেতু গ্রহণযোগ্য। প্রত্যক্ষ, উপমান ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায় না, শব্দ-প্রমাণের সাহায্যেই সে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হয়। শব্দ প্রমাণ একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর, সে হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনের অর্থ উপলব্ধি করা।

শব্দ-প্রমাণ—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ

বাৎসায়নের মতে শব্দ-প্রমাণ দুপ্রকার—**দৃষ্টার্থ** এবং **অদৃষ্টার্থ**। দৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ জাগতিক বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, মুনি ঋষি বা শাস্ত্রের যে বচন সেগুলি হল দৃষ্টার্থ শব্দ-প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ ঃ ধান্যশস্য বা বৃষ্টিপাত সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য কৃষকের বচন, আদালতে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য বা শাস্ত্র যা বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেয়, এ সকলগুলিই দৃষ্টার্থ শব্দ-প্রমাণ। অণু-পরমাণু, খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের বচন, মুনি, ঋষি এবং শাস্ত্রের অতীন্দ্রিয় বস্তু, যেমন—আত্মা, পরমাত্মা, পাপ, পুণ্য, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি সম্পর্কে যে বচন সেগুলি হল অদৃষ্টার্থ।

শব্দ—লৌকিক এবং বৈদিক

নব্য নৈয়ায়িকরা শব্দকে দুভাগে ভাগ করেন ; যথা—(১) **লৌকিক** এবং (২) **বৈদিক**। বৈদিক বচন হল বেদের বচন। বেদের বচন ঈশ্বরের বচন বা সেই বচন যেগুলি ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিরা ব্যক্ত করেছেন ; সেহেতু এইগুলি প্রামাণিক এবং অভ্রান্ত। লৌকিক বচন হল সাধারণ মানুষের বচন, সেহেতু এ বচন সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। তবে যে-কোন লৌকিক বচনই শব্দপ্রমাণ নয়। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনই শব্দ-প্রমাণ। আপ্তবাক্য সকল সময়ই কোন ব্যক্তির বচন—সে ব্যক্তি-সত্তা মানবীয় হতে পারে, দৈবও হতে পারে।

প্রত্যেক পদ এক একটি পদার্থের শব্দসঙ্কেত।[2] প্রত্যেক পদেরই পদার্থ বোঝবার

---

1. 'যাঁরা ভ্রম-প্রমোদ-বিপ্রলিপ্সামুক্ত, শব্দপ্রতিপাদ্য অর্থ বিষয়ে যাঁরা অভ্রান্ত, যাঁদের প্রবঞ্চনার দূষিত অভিসন্ধি নেই, যাঁরা নিজের অনুভব অন্যকে বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছা করেন তাঁরাই আপ্ত।'

2. এই সঙ্কেত দু প্রকার। আজানিক ও আধুনিক। সুদীর্ঘ কাল থেকে গো শব্দ গরুর অর্থেই প্রচলিত। এই দেখে মনে হয় যে ঈশ্বরের এরূপ ইচ্ছা যে গো শব্দ গরুর নিত্য সংকেত রূপে ব্যবহৃত হোক। কাজেই কোন পদের কোন এক বিশেষ অর্থ লোকের বোধগম্য হোক, ঈশ্বরের এই ইচ্ছাই আজানিক বা নিত্যসঙ্কেত। শব্দের উত্তর প্রত্যয়াদি যোগ করে শাস্ত্রকারেরা বিশেষ বিশেষ পদার্থ বোঝাবার জন্য যে শব্দসঙ্কেত সৃষ্টি করেছেন তাদের নাম আধুনিক সঙ্কেত।

শক্তি আছে, এই শক্তির নাম পদশক্তি। ঈশ্বরেচ্ছাই পদশক্তির কারণ। অর্থবোধক পদসমূহকে বাক্য বলে। বাক্যের অর্থবোধ চারটি হেতুর ওপর নির্ভর—(১) আসত্তি বা বাক্যস্থ পদসমূহের অব্যবহিত উপস্থিতি। বাক্যস্থ এক পদের সঙ্গে অপর এক পদের একান্ত ব্যবধান থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। 'ঘট' শব্দ উচ্চারণের দীর্ঘকাল পরে 'আনয়ন কর' বলা হলে অর্থবোধ হবে না; (২) যোগ্যতা বা বাক্যস্থ পদসমূহের সম্বন্ধের বাধার অভাব। 'জলদ্বারা সেচন কর' কথাটি বোধগম্য কেননা জলের সঙ্গে সেচনের সম্বন্ধের কোন বাধা নেই। সুতরাং এই বাক্যের যোগ্যতা আছে। কিন্তু 'অগ্নিদ্বারা সেচন কর', এই বাক্যে যোগ্যতার অভাব রয়েছে, কেননা অগ্নি ও সেচন-ক্রিয়ার সম্বন্ধের বাধা আছে। (৩) আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত পদসমূহের পরস্পরকে জানার বিষয় হবার যোগ্যতা. যেমন—'আন' বললে 'কি আনব' তা জানতে ইচ্ছা হয়; (৪) তাৎপর্য বা বক্তার অভিলষিত অর্থের জ্ঞান। যেমন, সৈন্ধব অর্থে 'লবণ' ও সিন্ধুদেশীয় 'ঘোটক' উভয়ই বোঝায়। 'সৈন্ধব নিয়ে এস' বললে লবণ আনার কথাও ভাবা যেতে পারে আবার সিন্ধুদেশের ঘোটক আনার কথাও ভাবা যেতে পরে। এক্ষেত্রে বাক্যের তাৎপর্যের, অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বাক্যার্থ নির্ণয় করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ন্যায়তত্ত্ববিদ্যা

(Nyaya Metaphysics)

১। জগৎ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের মতবাদ (The Nyaya Theory of Physical World) ঃ

নৈয়ায়িকদের মতে জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ—এই চারটি উপাদানে জগৎ সৃষ্ট

নৈয়ায়িকরা জগতের সত্তা স্বীকার করেন এবং তাঁদের মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর ছাড়াও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। জাগতিক বস্তুর সত্তা আছে, তারা নিছক মনের ধারণা নয়। অর্থাৎ সব জাগতিক বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তা আছে, বা এদের অস্তিত্ব জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। নৈয়ায়িকরা সরল বস্তুবাদী দার্শনিক (Naive Realists)। তাঁদের মতে বস্তুর দুপ্রকার গুণ আছে—'মুখ্য' গুণ ও 'গৌণ' গুণ।[1] বস্তু ক্ষণিক নয়, বস্তুর স্থায়িত্ব আছে। বস্তু কেবলমাত্র গুণের সমষ্টি নয়, এর গুণাতিরিক্ত সত্তা বা দ্রব্যত্ব আছে। নৈয়ায়িকরা বারটি প্রমেয় স্বীকার করেন। যেমন—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় বা অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ এবং মোক্ষ। এ ছাড়া নৈয়ায়িকরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাবের কথাও স্বীকার করেন। এইসব প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় ভৌতিক জগতে দৃষ্ট হয় না। যেগুলি ভৌতিক বা ভূত দ্বারা গঠিত সেগুলিই দৃষ্ট হয়। আত্মা ও মন যেহেতু ভৌতিক নয়, সেহেতু জাগতিক দ্রব্য থেকে পৃথক হলেও দেশ এবং কালের বস্তুগত সত্তা আছে। কাল অখণ্ড এবং অনন্ত, কালেই পরিবর্তন ঘটে। দেশও অখণ্ড ও অনন্ত, বস্তু দেশেই অবস্থান করে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ এবং মরুৎ—এই চারটি উপাদানের দ্বারা এই পৃথিবী গঠিত। এই উপাদানগুলির অন্তিম অংশ হল চার প্রকারের পরমাণু যেগুলি অপরিবর্তনীয়, নিত্য এবং অবিভাজ্য। ঈশ্বর এসব পরমাণু সৃষ্টি করেননি। তিনি এই পরমাণুর সাহায্যে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এসব পরমাণু ও ঈশ্বর সহ-অবস্থানকারী। জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও এসব পরমাণুর অস্তিত্ব ছিল। জগতের সকল বস্তু যৌগিক এবং এসব পরমাণুর দ্বারা গঠিত। যৌগিক বস্তু, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, গুণ সবই এ জগতের অন্তর্ভুক্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু,

1. Primary Quality and Secondary Quality.

ইন্দ্রিয়, জীবদেহ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ সবই এই সব যৌগিক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বর এ জগতের নিমিত্ত কারণ।

যদিও এই জগৎ কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তবুও এ জগৎ উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এ জগৎ কর্মবাদ নীতির অধীন এবং কার্যকারণ নীতি এই কর্মবাদের অধীনস্থ। কর্মবাদ ও জড়জগতের মধ্যে ঈশ্বরই সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। নৈয়ায়িকরা দ্বৈতবাদী। নৈয়ায়িকরা জড়জগত এবং আত্মা উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

জগৎ উদ্দেশ্যবিহীন নয়

২। আত্মা (The Individual Self)

'আত্মা' শব্দটির জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েরই সূচক। এখানে আত্মা বলতে জীবাত্মাকেই বোঝান হচ্ছে। জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে একাধিক মতবাদ থাকলেও, চারটি মতবাদ বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। জড়বাদী চার্বাকদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধদের মতে আত্মা হল পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা বা প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ। অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্য যা জ্ঞাতাও নয়, জ্ঞেয়ও নয়। রামানুজের মতে আত্মা হল সক্রিয় ও সগুণ সচেতন দ্রব্য। আত্মা হল চৈতন্যময় 'অহং'—আত্মা হল জ্ঞাতা। শেষোক্ত মতবাদ দুটিকে ভাববাদী বলা যেতে পারে।

আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন রূপ

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা হল একটি অভৌতিক দ্রব্য। এক একটি বিশেষ আত্মা এক একটি দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। আত্মা হল শাশ্বত এবং বিভু বা সর্বব্যাপী। দেশ ও কালের দ্বারা আত্মা সীমিত হয় না। বুদ্ধি, সুখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন (willing) প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলিকে আমরা মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানতে পারি। এগুলি হল ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং এগুলি আত্মার সঙ্গে অভিন্ন নয়। এগুলি হল কতকগুলি গুণ। যেহেতু দ্রব্য ছাড়া কোন গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না; সেহেতু গুণগুলিরও আধার বা আশ্রয়রূপে কোন দ্রব্য আছে। এই দ্রব্য হল আত্মা। এই গুণগুলি কোন জড়-দ্রব্যের গুণ হতে পারে না। যেহেতু জড়বস্তুর গুণগুলির মতো এই গুণগুলিকে বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেহেতু আত্মা জড়বস্তু নয়। আত্মা এক অভৌতিক দ্রব্য।

আত্মা হল দ্রব্য

চার্বাকদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। দেহ আত্মা হতে পারে না, কারণ দেহ চৈতন্যহীন এবং বুদ্ধিহীন। দেহ পরিবর্তনশীল। দেহ

জন্মমৃত্যুর অধীন; আত্মা চৈতন্যময় এবং নিত্য। আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই। মৃতদেহে এবং সমাধি অবস্থায় দেহে কোন চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকে না। চৈতন্য দেহে ধর্ম হতে পারে না, যেহেতু দেহ হল অচেতন এবং দেহই চেতনার বস্তু। দেহ হল আত্মার করণ (instrument), যার মাধ্যমে আত্মা নিজ উদ্দেশ্যসাধন করে। দেহ যদি আত্মা হয়, তাহলে জীবের কর্মফলভোগকে ব্যাখ্যা করা যায় না। দেহের বিনাশের পর কে কর্মফল ভোগ করবে? তাছাড়া, দেহ যদি আত্মা হয়, সব জড়বস্তুই তাহলে চৈতন্যযুক্ত হবে, যেহেতু জড়বস্তু এবং দেহ একই উপাদানে গঠিত।

দেহ আত্মা নয়

আত্মা ইন্দ্রিয়ও হতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক, কিন্তু চেতনা ভৌতিক নয়। ইন্দ্রিয়গুলি চেতনার উপকরণস্বরূপ। এই উপকরণগুলির সহায়তায় আত্মা বহির্জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লব্ধ বিভিন্ন সংস্কারগুলি আত্মার দ্বারা সংশ্লেষিত ও সুবিন্যস্ত হয়। একাজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হয় না। কল্পনা, স্মৃতি, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ইন্দ্রিয়নির্ভর নয়, সেহেতু ইন্দ্রিয় এই সব মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

আত্মা ইন্দ্রিয় হতে পারে না

মনও আত্মা হতে পারে না। নৈয়ায়িকদের মতে মন কর্তা নয়। মন হল অন্তরিন্দ্রিয় যার সাহায্যে আত্মা বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। মন হল সূক্ষ্ম এবং পারমাণবিক। পরমাণু দৃশ্যগোচর নয়। বুদ্ধি, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যদি মনের গুণ হত, তাহলে অদৃশ্য বস্তুর গুণ হওয়ার জন্য সেগুলি দৃষ্টিগোচর হত না। কিন্তু মানসিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা সকলেই সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হলেই আত্মাতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। সুতরাং আত্মা হল জ্ঞাতা, মন এই জ্ঞানলাভের উপায়।

আত্মা মন হতে পারে না

বৌদ্ধদের মতে আত্মা হল 'বিজ্ঞানসন্তান' (stream of momentary recognitions) বা পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ। কিন্তু এ অভিমত স্বীকার করলে স্মৃতি (recollection) এবং প্রত্যভিজ্ঞাকে (recognitions) ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। অপরিবর্তিত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করা চলে না। মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি বিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পক্ষে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানসিক অবস্থাকে জানা সম্ভব নয়।

আত্মা ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ নয়

অদ্বৈত বেদান্তমতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য। কিন্তু ন্যায় দর্শন মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র সম্পর্কবিযুক্ত কোন বিশুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কোন একটি আধারকে আশ্রয় করেই চৈতন্যের অস্তিত্ব সম্ভব। আত্মা চৈতন্য নয়, একটি দ্রব্য চৈতন্য যার গুণ।

আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য নয়

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, আত্মা শুধুমাত্র চৈতন্য বা জ্ঞান নয়, আত্মা হল দ্রব্য এবং এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা থাকে। আত্মা হল কর্তা, জ্ঞাতা এবং ভোক্তা।

আত্মা হল কর্তা, জ্ঞাতা বা ভোক্তা

নৈয়ায়িকদের মতে চৈতন্য যদিও আত্মার গুণ, চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়, বরং আগন্তুক গুণ মাত্র। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন আত্মায় চেতনা বা বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ আত্মা তখনই সগুণ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আত্মা জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তারূপে সব কিছু জানে, সকল কর্ম সম্পাদন করে এবং সকল কিছু ভোগ করে। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন দ্রব্য এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে।

চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়

আত্মা বুদ্ধি বা জ্ঞান নয়। আত্মা স্থায়ী, বুদ্ধি অস্থায়ী। বুদ্ধি বা জ্ঞান আত্মার কর্ম নয়, আত্মার গুণ। আত্মা নিরবয়ব (Partless) এবং নিত্য। কারণ আত্মার কোন বিকাশ নেই। আত্মা এক নয়, বহু। যদি আত্মা এক হত তাহলে সকলেরই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা হত এবং এক ব্যক্তির মোক্ষলাভে অপর ব্যক্তিরও মোক্ষ লাভ হত। সুতরাং প্রতিটি দেহকে আশ্রয় করে এক একটি আত্মা বিরাজ করছে। একই আত্মা সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—নৈয়ায়িকরা বৈদান্তিকদের এই মত গ্রহণ করেন না। আত্মা বিভু বা সর্বব্যাপী। আত্মার কোন অবান্তর মহত্ত্ব বা সীমিত পরিসর (limited dimension) নেই, কারণ যা সীমিত, তা-ই অংশযুক্ত এবং যা কিছু অংশযুক্ত তা-ই বিনাশশীল। আত্মা পরমাণু হতে পারে না, কারণ পরমাণু ইন্দ্রিয়াতীত কিন্তু আমরা আত্মার গুণ, মোক্ষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করতে পারি।

আত্মা নিত্য ও বিভু

৩। আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ (Proofs for the Existence of Soul) :

প্রশ্ন হল, দেহ থেকে স্বতন্ত্র কোন আত্মার অস্তিত্ব কিভাবে প্রমাণ করা যায়?

কোন কোন প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে আত্মার অস্তিত্ব সাক্ষাৎভাবে জানা যায় না।

তাঁদের মতে শ্রুতির সাহায্যে আত্মার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তাছাড়া ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অস্তিত্ব থেকে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে। ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি ক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করা চলে না, কিন্তু যদি কোন স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করা হয় তবে এগুলিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না। আমরা কোন বস্তু লাভ করার ইচ্ছা করি যেহেতু বস্তুটি সুখদায়ক, বস্তুটি আমাদের কোন অভাববোধ দূর করতে সমর্থ। কিন্তু বস্তুটি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তাকে সুখদায়ক মনে করতে পারি না। সুতরাং কোন বস্তু পাবার জন্য তখনই আমরা ইচ্ছা করি যখন অতীতে যে সকল বস্তু আমাদের সুখ দান করেছে সে সকল বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য আমরা উপলব্ধি করি। সুতরাং কোন স্থায়ী আত্মা আছে, যে পূর্বে কাম্যবস্তু লাভ করে সুখ উপলব্ধি করেছে এবং বর্তমান বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য উপলব্ধি করেছে। সুখ-দুঃখের অনুভূতিই স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন বস্তু লাভ করে আমরা স্মরণ করি যে, পূর্বের মতো এ বস্তুও আমাদের আনন্দ দেবে এবং কোন বিপজ্জনক অবস্থার উদ্ভব হলে আমরা মনে করি যে, পূর্বের মতো আমরা দুঃখ পাব। সুতরাং সুখদুঃখের অনুভূতি অতীত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর। অসংখ্য পরিবর্তনের মাঝে যে আমি এক, এবং অতীতে 'যে আমি' জেনেছি বর্তমানে 'সে আমিই' যে জানছি—এ প্রতীতি না থাকলে অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কিভাবে সম্ভব? অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতিই প্রমাণ করে যে স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব আছে। ব্যক্তিগত অভেদের (personal indentity) বিষয়টিকে যদি স্বীকার করা না হয় তবে অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা কোন কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যায় না। স্থায়ী আত্মার অস্তিত্বই ব্যক্তিগত অভেদের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। জ্ঞানও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন বিষয় প্রথমে জানার ইচ্ছা করে পরে সে সম্বন্ধে চিন্তা করলে তার জ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং এ কারণেও এক অপরিণামী বা স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কেউ বস্তুটি জানার ইচ্ছা করল। অপর কেউ সেই বস্তুটি সম্বন্ধে চিন্তা করল। এরূপ হলে কারও বস্তু সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হবে না। এইভাবে অনুমানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়।

আত্মার অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যে জানা যায়

আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ

নব্য নৈয়ায়িকদের কারও কারও মতে আত্মার অস্তিত্ব মানস-প্রত্যক্ষের সাহায্যে সোজাসুজি জানা যায়। এই মানস-প্রত্যক্ষ দুরকমভাবে হতে পারে। যখন মনের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার (pure self) সংযোগ ঘটে, তখন এই শুদ্ধ আত্মসচেতনতার (pure self consciousness) মাধ্যমে আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মে। আবার কোন

কোন নৈয়ায়িকের মতে শুদ্ধ আত্মা প্রত্যক্ষের বস্তু নয়। বুদ্ধি, অনুভূতি, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণের মাধ্যমেই আত্মাকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। কাজেই আত্মা কোন গুণ বা ক্রিয়াবিশিষ্ট বলে প্রত্যক্ষীভূত হয়। যেমন, আমরা বলি—'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী', 'আমিই জ্ঞাতা' ইত্যাদি। অবশ্য কোন ব্যক্তির নিজ আত্মারই প্রত্যক্ষ হয়, অপর ব্যক্তির আত্মার অস্তিত্ব অনুমানগম্য। অপর ব্যক্তির উদ্দেশ্যসাধক শারীরিক কর্ম দেখে তার প্রযোজক রূপে আত্মার অনুমান করা হয়, কারণ যে কর্ম বুদ্ধির পরিচায়ক সেই কর্ম অচেতন শরীরের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে না।

নব্য নৈয়ায়িকদের মতে আত্মার অস্তিত্ব মানস-প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা যায়

এ ছাড়া চৈতন্যের অস্তিত্বও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেহেতু চৈতন্য শরীরের, ইন্দ্রিয়ের বা মনের ধর্ম নয়, যেহেতু চৈতন্য প্রাণ নয়, কোন জড়বস্তুর গুণ নয় বা চৈতন্য 'বিজ্ঞানসন্তান' নয়, সেহেতু চৈতন্য আত্মারূপ দ্রব্যকেই আশ্রয় করে বিরাজ করে। সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব আছে।

শ্রুতিও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। শ্রুতিতে আত্মার কথা উল্লেখ আছে এবং যেহেতু শ্রুতি প্রামাণ্য, সেহেতু আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

৪। অপবর্গ বা মোক্ষ (Liberation):

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মতো, নৈয়ায়িকরাও অপবর্গ বা মোক্ষলাভকেই জীবের পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেন। অপবর্গ বা মোক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গৌতম বলেছেন যে, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই (absolute freedom from pain) হল অপবর্গ। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, চৈতন্যহীন দ্রব্য। মন ও দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা সূচনা করে। যতক্ষণ আত্মা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ এই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অপ্রিয় বস্তুর সংযোগের ফলে জীবকে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করতে হয়। শরীর ধারণ করার জন্যই জীবকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। শরীরধারণ বা জন্মগ্রহণই সকল দুঃখের মূল।

মোক্ষলাভই জীবের পুরুষার্থ

শরীরধারণ করার জন্যই জীবের দুঃখভোগ

প্রশ্ন হল, জীবের জন্মগ্রহণ করার কারণ কি? ধর্মাচরণের ফলস্বরূপ সুখভোগ করার জন্য এবং অধর্মাচরণের ফলস্বরূপ দুঃখভোগের জন্যই জীবকে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং শরীর ধারণ করতে হয়। শুভ প্রবৃত্তি এবং অশুভ প্রবৃত্তি থেকেই যথাক্রমে ধর্ম এবং অধর্মের উৎপত্তি। কাম্যবস্তুর প্রতি আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রতি দ্বেষ—এই দুটি কারণ

শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তি থেকে ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি

থেকেই প্রবৃত্তির উৎপত্তি বা জন্ম। সুতরাং শুভাশুভ প্রবৃত্তির মূলে আসক্তি ও দ্বেষ বর্তমান। এই উভয়কেই দোষ নামেই অভিহিত করা হয়েছে। আসক্তি এবং দ্বেষের মূলে মিথ্যাজ্ঞান। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানই দোষের কারণ। এই মিথ্যাজ্ঞান থেকেই তিনপ্রকার দোষ জন্মে—রাগ, দ্বেষ এবং মোহ। কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান কি? আমরা সাধারণতঃ মন, ইন্দ্রিয়, শরীর প্রভৃতিকেই আমি-রূপে বা আত্মারূপে ধারণা করি। অথচ আত্মা মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর কোনটিরই সঙ্গে অভিন্ন নয়। এই ভ্রান্ত-জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞান জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ। মিথ্যাজ্ঞানের জন্য জীবের মধ্যে রাগ দ্বেষ, মোহ এই সব দোষের উৎপত্তি ঘটে। দোষের তাড়নায় জীব শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রবৃত্তি থেকে ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি হয় এবং এরই ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য জীবকে পুনঃপুনঃ সংসারে বদ্ধ হতে হয়। এরই জন্য জীবের পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ করতে হয়। শরীরধারণ করলেই জীবকে দুঃখ ভোগ করতে হবে। সে কারণে নৈয়ায়িকদের মতে সকল দুঃখের মূল যে মিথ্যাজ্ঞান, সে মিথ্যাজ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে বিনষ্ট করতে হবে। প্রমেয় বা জ্ঞানের বস্তুর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞান। আত্মার যথাযথ স্বরূপের জ্ঞানই মিথ্যা-জ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলেই জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না, ফলে দুঃখের উৎপত্তি হবে না।

মিথ্যাজ্ঞানই দোষ ও সকল দুঃখের মূলকারণ

মিথ্যাজ্ঞানকে তত্ত্ব-জ্ঞানের সাহায্যে দূর করতে হবে

সুতরাং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। দেহের সঙ্গে তার সকল সংযোগ নষ্ট হয়। অপবর্গ দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি নয়, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। রোগমুক্তিতে বা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হলে দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি ঘটে মাত্র ; কিন্তু দুঃখের একান্ত নিবৃত্তির নামই মোক্ষ বা অপবর্গ। এই মোক্ষ অবস্থায় সুখানুভূতি থাকে কিনা, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। মহর্ষি গৌতম সুখানুভূতির অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি। গৌতমের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ। ভাষ্যকার বাৎসায়নের মতে মোক্ষতে সুখের অনুভূতি থাকে না। বিশুদ্ধ সুখ বলে কিছু নেই, সব সুখের মধ্যেই দুঃখের মিশ্রণ আছে। দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ বিনষ্ট হলে সুখ-দুঃখ বলে কিছুই থাকে না। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন দ্রব্য। মোক্ষ অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। কাজেই কোন প্রকার চেতনার অনুপস্থিতিতে সুখানুভূতির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিই মোক্ষ

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষ লাভের উপায়ঃ শ্রবণের অর্থ হল আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে শাস্ত্রবাক্যের উপদেশ শ্রবণ করা। মননের অর্থ হল এই উপদেশ নিজের মনে চিন্তা করা এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সেই জ্ঞানকে মনে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। নিদিধ্যাসন হল যোগাভ্যাসের দ্বারা আত্মার স্বরূপ ধ্যান করা। ধ্যানের মাধ্যমে আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান গভীর ও নিবিড়ভাবে উপলব্ধ হবে। নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে এবং অবিদ্যা দূর হয়। এইভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে জীব আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়। তখন জীব আর মন, শরীর বা ইন্দ্রিয়কে আমি-রূপে উপলব্ধি করে না। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ার জন্য মিথ্যাজ্ঞান থেকে উদ্ভূত যে দোষ—রাগ, দ্বেষ ও মোহের উৎপত্তি হয় না। প্রবৃত্তিরূপ কারণের অভাবে জীবের জন্মগ্রহণ হয় না। জন্মরূপ কার্যের উৎপত্তি না হওয়ার জন্য আত্মার সঙ্গে দেহের সব সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। আত্মার স্বরূপে অবস্থান এবং তার ফলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ বা অপবর্গ। মোক্ষ কোন ভীতিজনক অবস্থা নয়, এ হল পরম শান্তির অবস্থা।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, মোক্ষ লাভের উপায়

নৈয়ায়িকদের মতে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রেই, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীই হোক বা গৃহস্থই হোক, মোক্ষলাভের অধিকারী।

৫। ন্যায়-ঈশ্বরতত্ত্ব (The Nyaya Theology) :

ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম যে ষোলটি পদার্থের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই। সে কারণে নৈয়ায়িকরা নিরীশ্বরবাদী এমন একটি ধারণা মনে জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। মহর্ষি গৌতম ঈশ্বর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেননি সত্য, কিন্তু ন্যায়সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে তিনটি সূত্রে ঈশ্বরের কথা বলেছেন। সিদ্ধান্তসূত্রে মহর্ষি বলেছেন যে, ঈশ্বরই জীবের কর্ম এবং কর্মফল নিয়ন্ত্রণ করেন।

নৈয়ায়িকরা নিরীশ্বরবাদী নয়

পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ—বাৎসায়ন, উদ্যোতকার, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন, জয়ন্ত ভট্ট, গঙ্গেশ প্রমুখ দার্শনিকগণ ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ঈশ্বর-তত্ত্বের সঙ্গে মোক্ষ বা অপবর্গের সম্বন্ধ নির্দেশ করেন। এই সকল নৈয়ায়িকদের মতে প্রমেয় বিষয়ের যথার্থজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হলেই জীব মুক্তিলাভ করতে পারে। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরের করুণা লাভ করলেই এই মোক্ষলাভ সম্ভব। ঈশ্বরের

করুণা ভিন্ন প্রমেয় বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান এবং মোক্ষলাভ করা কোন জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়।

সুতরাং, দুটি প্রশ্নের আলোচনার প্রয়োজন আছে—ঈশ্বরের স্বরূপ কি? ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে?

(i) **ঈশ্বরের স্বরূপ ঃ** প্রমেয় পদার্থের অন্যতম পদার্থ হল আত্মা। এই আত্মার দ্বারা জীবাত্মা ও পরামাত্মা উভয়ই সূচিত হয়। যদিও ন্যায়দর্শনে জীবাত্মার স্বরূপই আলোচিত হয়েছে তথাপি এই আত্মা শব্দ পরমাত্মা শব্দেরও বাচক। সুতরাং, আত্মা দুপ্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর।

পরমাত্মাই ঈশ্বর

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন এবং ধ্বংস করেন। শূন্য থেকে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেননি। তিনি পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, মন এবং আত্মার সাহায্যেই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আত্মা, মন, দেশ, কাল, আকাশ—এগুলি নিত্য ও শাশ্বত। সৃষ্টির পূর্বেই এগুলির অস্তিত্ব ছিল এবং চিরকালই এগুলির অস্তিত্ব থাকবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও চিরকাল ধরে বিরাজ করছে। তাহলে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন—এ কথার অর্থ কি? ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির অর্থ ঈশ্বর এই সব শাশ্বত ও নিত্য বস্তুগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ। ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। পরমাণুর সংযোগসাধনেই বস্তুর সৃষ্টি, পরমাণুর বিচ্ছেদ সাধনেই এই জগতের ধ্বংস। কিন্তু পরমাণুগুলি যেহেতু শাশ্বত ও অবিনশ্বর, সেহেতু ধ্বংসের পরেও এই পরমাণুগুলির অস্তিত্ব থাকবে।

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ

ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ

জীব কর্ম অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করে। কর্ম অনুযায়ীই সে পাপপুণ্যের অধিকারী হয়। জীবের এই পাপ-পুণ্য যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে তার নামই অদৃষ্ট। ঈশ্বর এই অদৃষ্টের (পাপ-পুণ্যের) অধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরই জীবের কর্মফলদাতা।[1] যদিও জীব নিজের ইচ্ছায় কর্মসম্পাদন করে তবু কর্মের ফল ভোগ করা জীবের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। কারণ কর্ম থেকে পুণ্য (merit) এবং পাপ (demerit) রূপ যে অদৃষ্টশক্তির আবির্ভাব ঘটে, সে অদৃষ্টশক্তি অচেতন। এর নিজের কোন চিন্তা বা বিচারশক্তি, নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্রণের

ঈশ্বর অদৃষ্টশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন

1. "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মফলস্য দর্শনাৎ"—ন্যায়সূত্র ৪।১

ক্ষমতাও নেই। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই এই অদৃষ্টশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। ঈশ্বরই জীবের পাপ-পুণ্যের বিচার করে ফলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন।

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ (Efficient cause), তিনি উপাদান কারণ (Material cause) নন। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এই জগতের স্থিতি, তাঁর ইচ্ছাতেই এই জগতের প্রলয়, বিনাশ বা ধ্বংস। ঈশ্বর এক, অসীম ও শাশ্বত। দেশ, কাল, আত্মা এবং মনের সমন্বয়সাধনের ফলে যে জগতের সৃষ্টি, সে জগতের দ্বারা ঈশ্বরের অসীমত্ব খণ্ডিত হয় না। ঈশ্বরের সঙ্গে এই জগতের সম্বন্ধ আত্মার সঙ্গে জীবদেহের সম্বন্ধের সমতুল্য। যদিও জীবের কর্মফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করার জন্য ঈশ্বরকে জীবের অদৃষ্টশক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়, তবু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, যেহেতু সকল কিছুর যথাযথ স্বরূপ সম্পর্কে তিনি অবহিত। ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী এবং এই অনন্ত জ্ঞান তাঁর অবিচ্ছেদ্য গুণ।

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ

ঈশ্বর সকল জীবের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেন। জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সে স্বাধীনতা শর্তহীন নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ পিতা-পুত্রের সম্পর্ক—'যথা পিতা অপত্যানাং তথা পিতৃভূত ঈশ্বরো ভূতানাম্'। পিতা যেভাবে পুত্রের ক্ষমতা, সামর্থ্য, তার অর্জিত বিদ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে পুত্রকে পরিচালিত করেন, ঈশ্বরও অনুরূপভাবে তাঁর সৃষ্ট জীবকে অতীত আচরণ ও চরিত্র অনুযায়ী পরিচালিত করেন। মানুষ তার কাজের নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর হলেন প্রযোজক কর্তা। সুতরাং ঈশ্বব জীবের কর্মফলদাতা এবং আমাদের নৈতিক জীবনের সুখ-দুঃখের নিয়ন্ত্রণকর্তা। জীবের সুকর্ম বা কুকর্ম অনুসারে তিনি জীবকে সুফলরূপ সুখ ও কুফলরূপ দুঃখ দেন। জীবগণ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রেরণা অনুসারে কর্ম করে।

(ii) **ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি** (Poofs for the Existence of God): নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একাধিক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক যুক্তির সঙ্গে এই যুক্তি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

(ক) আদি কারণবিষয়ক যুক্তি (The Causal Argument):

এ জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ, যেমন—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি পরমাণুর সংযোগের ফলেই উদ্ভূত। এগুলি হল কার্য, যেহেতু এগুলি অংশের সমষ্টি বা সাবয়ব এবং দ্বিতীয়তঃ এগুলির অবান্তরমহত্ব বা সীমিত পরিসর (limited

dimension) আছে। এদের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কারণ দুই প্রকার—নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ বা সমবায়ী কারণ। যেমন—ঘট হল কার্য, এর উপাদান কারণ হল মাটি এবং নিমিত্ত কারণ বা কর্তা হল কুম্ভকার। অনুরূপভাবে জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উপাদান কারণ যদি হয় ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ প্রভৃতির পরমাণু, এদের নিমিত্ত কারণ বা কর্তা কে? এ সব বস্তুগুলির উপাদান কারণগুলি নিজে নিজেই সংযুক্ত হতে পারে না। যদি কোন কর্তা এই সব উপাদান কারণগুলির মধ্যে সংযোগসাধন না করে, তাহলে এই সব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে আমরা যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, সূক্ষ্ম কলাকৌশল লক্ষ্য করি, তা কখনও সম্ভব হত না। সুতরাং এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, এমন কোন কর্তা আছে যার জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতি আছে। অর্থাৎ, এই উপাদান কারণগুলি কোন্ উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে সে সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান আছে এবং উদ্দেশ্যসাধনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে। সে কর্তা অবশ্যই সর্বজ্ঞ হবেন। কারণ, যিনি সর্বজ্ঞ তাঁর পক্ষেই উপাদান বা পরমাণুগুলি সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান থাকা সম্ভব। সুতরাং এই সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কর্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন।

যাবতীয় যৌগিক পদার্থের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর

(খ) নৈতিক যুক্তি (The Moral Argument) :

এই জগতের বিভিন্ন মানুষের অবস্থার মধ্যে আমরা তারতম্য লক্ষ্য করি। কোন ব্যক্তি জ্ঞানী, কোন ব্যক্তি মূর্খ, কেউ বা সুখী, কেউ বা দুখী, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র—মানুষের অবস্থার এই তারতম্যের কারণ কি? মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে। 'যেমন কর্মসম্পাদন তেমন ফলভোগ'—এই নৈতিক কর্মবাদই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নীতি অলঙ্ঘনীয়। কোন ব্যক্তির পক্ষেই এই নীতিকে লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। কার্যকারণ নীতি অনুসারে প্রতিটি কার্যেরই একটি কারণ আছে এবং এই নিয়ম নৈতিক জগতে কর্মবাদের রূপ পরিগ্রহণ করেছে।

জীবের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সম্পাদনের ফলে পুণ্য এবং পাপরূপ অদৃষ্টশক্তির আবির্ভাব ঘটে। জীবের সঞ্চিত পাপ-পুণ্যকেই অদৃষ্ট বলা যেতে পারে। এই অদৃষ্টের জন্যই জীবের সুখভোগ এবং দুঃখভোগ। কিন্তু এই অদৃষ্টশক্তি অচেতন, তার পক্ষে কর্মফল অনুযায়ী কার কতটুকু প্রাপ্য, বিচার করা সম্ভব নয়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এমন কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান কর্তা আছেন যিনি এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং জীবের কর্ম অনুযায়ী তার পাপ-পুণ্যের বিচার করে তার ফলভোগের ব্যবস্থা করেন। এই কর্তা কে? ঈশ্বরই হলেন এই কর্তা বা অধিষ্ঠাতা।

ঈশ্বর অদৃষ্টশক্তির নিয়ন্ত্রণকর্তা

(গ) বেদের কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (The Argument from the Authoritativeness of the Vedas) :

বেদ প্রামাণ্য গ্রন্থ ও বেদের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়। সাধারণতঃ বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু বেদের রচয়িতা কোন জীবাত্মা নয়, কোন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আত্মাই বেদের কর্তা। সাধারণ মানুষের ভ্রম-প্রমাদ থাকার জন্য তারা বেদের রচয়িতা হতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর যদি বেদ রচনা করেন তবেই বেদ অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য হতে পারে। এ ছাড়াও বেদে বহু অলৌকিক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সব অলৌকিক বিষয় কোন সাধারণ জীবের প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। সুতরাং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কোন পরমাত্মাই বেদের কর্তা। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ, সেহেতু তিনি ত্রিকালজ্ঞ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং যাবতীয় অলৌকিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর আছে। এই সর্বজ্ঞ পরম আত্মাই হলেন ঈশ্বর।

ঈশ্বরই বেদের রচয়িতা

অবশ্য এমন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, মুনিঋষিগণও তো সর্বজ্ঞ, তাঁদের পক্ষে বেদের কর্তা হওয়ায় বাধা কোথায়? কিন্তু একাধিক ব্যক্তিকে যদি বেদের রচয়িতা বলে কল্পনা করা হয়, তাহলে বেদের রচয়িতারূপে বহু ব্যক্তিকে স্বীকার করে নিতে হয়, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া, যেখানে একজন মাত্র কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করলেই কাজ চলে, সেখানে একাধিক কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার অর্থহীন কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং ঈশ্বরই একমাত্র বেদের কর্তা। বেদ প্রামাণ্য, কারণ বেদ ঈশ্বরেরই বাক্য।

(ঘ) শ্রুতির যুক্তি (The Testimony of Sruti) :

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে আর একটি প্রমাণ হল শ্রুতির যুক্তি। বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ আছে। কৌষীতকি উপনিষদের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, 'তিনি সকল আত্মার নিয়ামক এবং জগতের স্রষ্টিকর্তা।' বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে, 'তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ামক, সকলের শাসনকর্তা এবং সকল জীবের স্বামী।' এই উপনিষদেরই অন্যত্র বলা হয়েছে, যে, 'তিনি সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত এবং সকলকে পথ প্রদর্শন করেন'। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এক জায়গায় উল্লেখ আছে, 'তিনিই পরমপুরুষ, তিনিই সর্বজ্ঞ'। মাণ্ডুকোপনিষদে উক্ত আছে, 'তিনি সকলের প্রভু, সর্বজ্ঞ, আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রা, এ জগতের আদি কারণ, এর সৃষ্টি এবং প্রলয়কর্তা। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের আর এক জায়গায় উল্লেখ আছে, তিনি কর্মের নিয়ন্ত্রা এবং সকল জীবের আশ্রয়। তিনি জীবাত্মাকে পাপপুণ্যের ফল প্রদান করেন।'

বেদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে

সুতরাং বেদে ঈশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কর্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু বেদ প্রামাণ্য এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। **অবশ্য এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, শাস্ত্রবাক্য যে প্রামাণ্য তার প্রমাণ** কি এবং যেহেতু শাস্ত্র-বাক্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টির উল্লেখ আছে, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতেই হবে তার কি অর্থ আছে? বিচার করার ক্ষমতা নেই এমন কোন সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিলেও, যিনি দার্শনিক, বিচার-বিশ্লেষণ করে বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানলাভ করাই যাঁর উদ্দেশ্য, তিনি কেবলমাত্র শাস্ত্রবাক্যকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে নিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেবেন কেন? তাছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রকৃত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না; কারণ সব যুক্তিগুলিই ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি পূর্বে স্বীকার করে নিয়ে তারপর ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। তাছাড়া, ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা ও ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব—এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না

আসল কথা হল, যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কোন কিছুর অস্তিত্ব অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। বিচার বা তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না।

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যাদের হয় নি তাদেরই আপ্তবচনের ওপর নির্ভর করতে হয়

যিনি প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর পক্ষে বিচারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হননি তাঁদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আপ্তবচনের ওপর নির্ভর করাই শ্রেয়। যেহেতু শাস্ত্রে ঋষিদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের বা উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ আছে, সেহেতু শাস্ত্রগুলিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা উচিত। বৈজ্ঞানিকদের প্রদত্ত বিজ্ঞানের বিবরণগুলি যেমন আমরা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করি, অনুরূপভাবে শ্রুতিবাক্য ও আপ্তবাক্য এবং বেদ ও উপনিষদে ঈশ্বরের যে অস্তিত্বের কথা উল্লেখ আছে তাও বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য।

৬। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে নৈয়ায়িকদের যুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ (Anti-theistic objections) ঃ

নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তি দিয়েছেন, সাংখ্যকার, মীমাংসকগণ ও জৈনগণ তার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ এনেছেন এবং নৈয়ায়িকরা এই সব অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন।

(ক) নৈয়ায়িকদের ঈশ্বরসম্পর্কীয় যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল যে, ঈশ্বর যদি এ জগতের সৃষ্টিকর্তা হন তবে ঈশ্বরের অবশ্যই দেহ থাকা প্রয়োজন। দেহ বা শরীর ভিন্ন কোন কর্ম করা সম্ভব নয়। কুম্ভকার শারীরিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই ঘট নির্মাণ করেন।

ঈশ্বর যদি সৃষ্টিকর্তা হন তাহলে তাঁর দেহ থাকা প্রয়োজন

নৈয়ায়িকরা এই অভিযোগের উত্তরে বলেন যে, সাধারণ জীবের পক্ষে কর্ম করার জন্য দেহের প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশের জন্য দেহের কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, যে পরমাণুগুলির সংযোগসাধন করে ঈশ্বর এ জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই পরমাণুগুলিই ঈশ্বরের দেহের কাজ করতে পারে। কারণ ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার দ্বারা পরমাণুগুলিকে গতিশীল করে তুলতে পারেন।

ঈশ্বরের পক্ষে দেহের প্রয়োজন হয় না

নৈয়ায়িকদের অপর যুক্তি হল যে, শ্রুতির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি প্রমাণিত হয় তাহলে এই অভিযোগ অর্থহীন হয়ে পড়ে, আর ঈশ্বরের অস্তিত্বই যদি প্রমাণিত না হয় তাহলে ঈশ্বর শরীর ছাড়াও কিভাবে কর্ম করেন, সে প্রশ্ন একেবারেই ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে।

(খ) নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল যে, তাদের শেষ দুটি যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট। নৈয়ায়িকদের তৃতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, যেহেতু বেদ প্রামাণ্য, সে কারণে বেদের রচয়িতা কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর। চতুর্থ যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, বেদের মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় জানতে পারি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাহায্যে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, আবার অপরদিকে বেদের প্রামাণ্যের সহায়তায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

নৈয়ায়িকদের মতে তাদের যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট নয়। **অস্তিত্বের দিক থেকে বিচার করলে** ঈশ্বরের স্থান প্রথম, বেদের স্থান তার পরে; যেহেতু ঈশ্বর বেদ রচনা করেছেন। কিন্তু **জ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে** বেদের স্থান প্রথম এবং ঈশ্বরের স্থান পরে, কারণ বেদের মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবগত হই। যদিও ঈশ্বর বেদ-রচয়িতা, তবুও বেদের জ্ঞানের জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ বেদের জ্ঞান যে-কোন উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব নয়, ঈশ্বরের জ্ঞানের জন্য জীবাত্মাকে বেদের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং নৈয়ায়িকদের যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট নয়।

নৈয়ায়িকদের যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট নয়

(গ) নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল যে, ঈশ্বর যদি জগতের স্থষ্টিকর্তা হন তাহলে জগৎ স্থষ্টির পেছনে ঈশ্বরের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে। কারণ উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কোন কাজ করে না, কিন্তু ঈশ্বরের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। প্রথমতঃ, ঈশ্বর নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন কাজ করতে পারেন না, কারণ ঈশ্বরের কোন অপূর্ণ বাসনা নেই। দ্বিতীয়তঃ, পরের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঈশ্বর কাজ করতে পারেন না, কারণ যে কেবল পরের জন্য কাজ করে সে বুদ্ধিহীন।

যেহেতু ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না সেহেতু ঈশ্বর জগতের স্থষ্টিকর্তা নন

এমন কি এ ধারণাও করা যায় না যে, ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণাবশতঃ এ জগৎ স্থষ্টি করেছেন। কারণ নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টাই হল করুণা। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের কথা না ভেবে কেবলমাত্র অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারে না। তাছাড়া, ঈশ্বর যদি করুণাবশতঃ জগৎ স্থষ্টি করতেন, তাহলে জগতে এত দুঃখ দেখা যেত না, মানুষও এত অসুখী হত না। এই অভিযোগের উত্তরে নৈয়ায়িকরা বলেন যে, ঈশ্বর করুণাবশতঃই এ জগৎ স্থষ্টি করেছেন। তবু সব রকম দুঃখ-ক্লেশমুক্ত একটা সুখময় জগৎ তিনি স্থষ্টি করতে পারেন না, যেহেতু জীবের শুভ এবং অশুভ তার নিজের কর্মের ফল এবং ঈশ্বরকে জীবের পাপ পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ জগৎ স্থষ্টি করতে হয়। জীবাত্মার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং ঈশ্বর নিজের ইচ্ছাকে সীমিত করে জীবকে স্বাধীনভাবে কর্ম করার সুযোগ দিয়েছেন। জীবই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিজের সুখ-দুঃখ স্থষ্টি করে, এর জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা যায় না।

ঈশ্বর করুণাবশতঃ এ জগত স্থষ্টি করেছেন

উপসংহার (Conclusion) :

নৈয়ায়িকদের জ্ঞান-তত্ত্বের আলোচনা ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ। প্রমা ও প্রমাণ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের বিস্তারিত আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে দেয় যে, ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন নয় এবং অতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ওপর ভারতীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া, যদিও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের মত নৈয়ায়িকদের মতে জীবের মোক্ষলাভই তার একমাত্র উদ্দেশ্য তবু তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার পূর্বে তাঁরা জ্ঞান বা ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তত্ত্ববিদ্যার পূর্বে আলোচনা করা দরকার কিভাবে এই জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে ও সত্যজ্ঞান লাভের জন্য কোন্ কোন্ প্রণালী উপযুক্ত এবং অনুপযুক্ত। প্রণালী অনুসরণ করার জন্যই বা কি প্রকার ভ্রান্তি দেখা

নৈয়ায়িকদের দার্শনিক আলোচনার মূল্য

দিতে পারে ও কিভাবে সেগুলিকে দূর করা যেতে পারে তাও আলোচনা করা প্রয়োজন। নৈয়ায়িকরা এইভাবে জ্ঞানের আলোচনাকে তাদের দর্শনে প্রাধান্য দিয়েছেন।

কিন্তু নৈয়ায়িকদের ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার যতখানি বৈশিষ্ট্য ও মূল্য আছে, তাঁদের তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার সে পরিমাণ মূল্য নেই। বস্তুতঃ, তাঁদের তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়।

নৈয়ায়িকদের দার্শনিক আলোচনার ত্রুটি

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী এবং বহুবাদী। নৈয়ায়িকরা পরমাণু, জীবাত্মা, মন, ঈশ্বর সকলেরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেছেন। জীবাত্মা, স্বরূপতঃ অচেতন, নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ। ঈশ্বর সচেতন, সক্রিয় এবং সগুণ। ঈশ্বর জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। পরমাণু অচেতন এবং নিষ্ক্রিয়, ঈশ্বরই পরমাণুতে গতি দান করেন। কিন্তু জীবাত্মা, মন, ঈশ্বর সবই নিত্য। এই সব সত্তা ব্যাহ্যসম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। জড়জগৎ, জীবজগৎ এবং ঈশ্বরের মধ্যে কোন নিবিড় বা আন্তর সম্বন্ধ (internal relation) নেই। নৈয়ায়িকরা অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদী (deists)। অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগৎ ও জীবের মধ্যে ব্যাপ্ত নন; তিনি সম্পূর্ণরূপে জীব ও জগতের বাইরে অবস্থান করেন। নৈয়ায়িকদের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক পিতা-পুত্র সম্পর্কের মতো। এই উপমা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার বাহ্যসম্পর্ককেই বড় করে তোলে। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের ও জীবাত্মার কোন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ না থাকায় এবং প্রত্যেকেরই স্বাধীন সত্তা থাকায় ও স্বরূপগত প্রভেদ থাকায় ন্যায়দর্শনে কোন সুসংহত ও সুবিন্যস্ত তত্ত্ববিদ্যা পাই না। সুতরাং ন্যায়দর্শনের তত্ত্বালোচনা সাংখ্য বা বেদান্ত দর্শনের তত্ত্বালোচনার মতো অতখানি উচ্চস্তরের নয়।

নৈয়ায়িকরা অতিবর্তী ঈশ্বরবাদী

ন্যায়-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নয়, গৌণ, কেননা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলেই জীব মোক্ষ-লাভ করতে পারে। ন্যায়-দর্শনে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার নয়, আত্ম-সাক্ষাৎকার বা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই মোক্ষলাভের পন্থা। গৌতমের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান মোক্ষলাভের কারণ নয়। তাছাড়া, ন্যায়ের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, সমবায়ী কারণ নয়। কিন্তু জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের এরূপ সম্বন্ধ কল্পনা করার অর্থ ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষের স্তরে টেনে নিয়ে আসা। অবশ্য এ জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক জীবের সঙ্গে তার দেহের সম্বন্ধের সমতুল্য, এ জাতীয় একটা সঙ্কেত ন্যায়-দর্শনে আছে বটে, তবে তাকে একটা বিস্তারিত দার্শনিক মতবাদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের স্থান গৌণ

জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের ধারণাও অসঙ্গতিপূর্ণ। তাঁদের মতে জীবাত্মা একটা দ্রব্য যা স্বরূপতঃ অচেতন এবং নির্গুণ। দেহের সঙ্গে সংযোগের ফলেই আত্মাতে চেতনার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের সাহায্যেই আমরা জানতে পারি যে, আত্মা এক চৈতন্যময় সত্তা, চৈতন্য আত্মার গুণ নয়, আত্মার সারধর্ম। তা না হলে আত্মার সঙ্গে জড়বস্তুর প্রভেদ নির্ধারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া মোক্ষাবস্থায় জীবের মধ্যে যদি কোন চেতনা না থাকে তাহলে জীবের সঙ্গে একটা জড়বস্তু, যেমন, এক টুকরো পাথরের কি প্রভেদ? মোক্ষাবস্থা যদি চেতনাহীন অবস্থা হয় তাহলে এই অবস্থা লাভ করার জন্যই বা জীবের মধ্যে আকুলতা দেখা দেবে কেন?

জীবাত্মার ধারণা অসঙ্গতিপূর্ণ

নৈয়ায়িকদের 'পদার্থের' শ্রেণীবিভাগও অসঙ্গতিপূর্ণ। কোন্ বিশিষ্ট নীতি অনুসরণ করে নৈয়ায়িকরা পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা বোঝা কষ্টকর। যে নীতি অনুসারে দ্রব্যকে পদার্থ বলে বিচার করা যেতে পারে, সেই নীতি অনুসারে জল্প, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতিকে পদার্থ-রূপে বিচার করা কিভাবে সম্ভব?

পদার্থের শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ

নৈয়ায়িকদের মতে নৈতিক নিয়ম ঈশ্বরের আদেশ। নৈতিক নিয়ম যদি জীবের বিবেকের আদেশ না হয় এবং জীবের বৃহত্তর সত্তার দ্বারা তার ক্ষুদ্রতর সত্তার ওপর প্রযুক্ত না হয় তাহলে নৈতিক ভাল-মন্দ শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে। অতএব নৈয়ায়িকদের নৈতিক নিয়মের ধারণাও যুক্তিযুক্ত নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈশেষিক দর্শন

(Vaisesika Philosophy)

১। ভূমিকা (Introduction) :

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ঋষি কণাদ। এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন, যেহেতু এই দর্শনে 'বিশেষ' নামে একটি পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে। প্রবাদ আছে— ঋষি কণাদ কেবলমাত্র তণ্ডুলকণার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে এবং তাঁর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, তাঁরই আজ্ঞায় মহর্ষি এই দর্শন রচনা করেছেন। এই কারণেই তাঁর উপাধি হল কণাদ এবং তাঁর প্রবর্তিত দর্শনের নাম কণাদ দর্শন। কোন কোন দার্শনিক তাঁকে 'কণভূক্' নামেও অভিহিত করেছেন। এই মহান ঋষির প্রকৃত নাম হল উলুক এবং এই কারণেই তাঁর রচিত দর্শনশাস্ত্র 'ঔলুক্য দর্শন' নামেও পরিচিত। তাঁর গোত্র কাশ্যপ ছিল বলে তাঁকে 'কাশ্যপ' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

বিশেষ নামক পদার্থ থেকেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি

কণাদের বৈশেষিক-সূত্র বৈশেষিক দর্শনের প্রথম সুসংহত রচনা। এই সূত্র দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদকে আহ্নিক বলে। বৈশেষিক সূত্রে মোট তিনশত সত্তরটি সূত্র আছে। অনেকে মনে করেন যে কণাদের বৈশেষিক সূত্র গৌতমের ন্যায়সূত্রের পূর্বে রচিত হয়েছে এবং এই সূত্র ব্রহ্মসূত্রের সমসাময়িক। প্রশস্তপাদমুনির 'পদার্থধর্ম সংগ্রহ' বৈশেষিক দর্শনের ওপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। অনেকে এই গ্রন্থকে ভাষ্য বলে মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থখানি ভাষ্য নয়। এই গ্রন্থে তিনি সূত্রের ক্রমকে যথারীতি অনুসরণ করেননি। তাছাড়া, চব্বিশটি গুণের কথা, সৃষ্টিবাদ এবং ঈশ্বরই যে জগৎকর্তা—এই বৈশেষিক মতবাদ তাঁরই গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেখা যায়। এই সব কারণে গ্রন্থখানিকে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করেন যে, লঙ্কাধিপতি রাবণই বৈশেষিক-সূত্রের আদি ভাষ্যকার। উদয়নের 'কিরণাবলী', শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী' এবং ব্যোমশিবের 'ব্যোমবতী' পদার্থধর্মসংগ্রহের ওপর উল্লেখযোগ্য তিনটি টীকা (commentary)। উদয়নের কিরণাবলী টীকার ওপরে

কণাদের বৈশেষিক সূত্র বৈশেষিক দর্শনের প্রথম রচনা

বৈশেষিক দর্শনের ওপর বিভিন্ন রচনা

মৈথিল পণ্ডিত বর্ধমান 'কিরণাবলী প্রকাশ' নামে একটি টিপ্পনী গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে বৈশেষিক দর্শনের উপর যে সব রচনা দেখা যায়, সেসব রচনা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ওপর রচিত হয়। শিবাদিত্যের 'সপ্ত-পদার্থী', বল্লভাচার্যের 'ন্যায়লীলাবতী', বিশ্বনাথের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' এবং এই গ্রন্থের ওপর 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' নামে টীকা বৈশেষিক দর্শনের ওপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রঘুনাথ ন্যায়লীলাবতীর ওপর 'দীধিতি' নামক একটি টীকা রচনা করেছেন।

ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে সম্বন্ধ : ন্যায়-দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র বলা হয়। উভয় দর্শনের মতবাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়ের মতেই মোক্ষই জীবের পরম পুরুষার্থ। উভয় দর্শনই মনে করেন যে, অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞানই সকল দুঃখের মূল কারণ। মোক্ষ হল দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান বা বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যেই মোক্ষলাভ করা সম্ভব। এ ছাড়াও জীবাত্মা, পরমাত্মা, জড়জগৎ, পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ এবং মরুৎ প্রভৃতি উপাদান সম্পর্কেও উভয়ের মতবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। উভয় দর্শনই বস্তুবাদী (realist) এবং বহুবাদী (pluralist)।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য

কিন্তু দুটি বিষয়ে উভয় দর্শনের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। ন্যায়-দর্শনে চারটি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে ; যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন কেবলমাত্র দুটি প্রমাণ স্বীকার করে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। বৈশেষিক দর্শনের মতে উপমান এবং শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ, ন্যায়-দর্শন ষোলটি পদার্থ স্বীকার করে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন কেবলমাত্র সাতটি পদার্থ স্বীকার করে ; যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। কারও কারও মতে মহর্ষি কণাদ ছয়টি পদার্থ স্বীকার করেছেন। কারণ তাঁর সূত্রে 'অভাব'কে পদার্থরূপে উল্লেখ করা হয়নি। 'অভাব' সম্পর্কে আলোচনা তিনি পরে করেছেন। ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎসায়ন এবং সাংখ্যসূত্রকার কপিলের মতে কণাদ ষট্ পদার্থবাদী। কিন্তু অনেকের মতে কণাদ অভাবকেও পদার্থ বলে স্বীকার করেছেন এবং সেহেতু তাঁকে সপ্তপদার্থবাদী বলেই মনে করা উচিত। যেহেতু কণাদ 'অভাব' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, সে কারণে পরবর্তী বৈশেষিকগণ অভাবকেও অন্যতম পদার্থ বলে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বৈশেষিকদের মতে পদার্থ ছয়প্রকার নয়—সাত প্রকার। তবে ন্যায়-দর্শনে ও বৈশেষিক

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে অসাদৃশ্য

দর্শনে 'পদার্থ' শব্দটিকে এক অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। ন্যায়দর্শনে পদার্থ হল আলোচনার বিষয় (topic); কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ হল জ্ঞানের বিষয় (object of knowledge)।[1]

২। বৈশেষিক জ্ঞানতত্ত্ব (Vaisesika Epistemology):

বৈশেষিক দর্শনে দুটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান সম্পর্কে বৈশেষিক মতবাদ নৈয়ায়িকদের মতবাদের সমতুল্য। যৌগিক পদার্থকেই প্রত্যক্ষ করা যায়, পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বৈশেষিকদের মতে উপমান এবং শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত। প্রমাণরূপে এগুলির কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। শ্রুতিপ্রমাণ অনুমানেরই নামান্তর। যেহেতু বক্তা প্রামাণিক, সেহেতু আমরা শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করি। শাস্ত্র প্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা রচিত, সে কারণে আমরা অনুমান করি যে, শাস্ত্রে যেসব বিষয় উক্ত আছে, সেগুলি প্রামাণ্য। এ ছাড়াও শব্দ হল অনুমান, যেহেতু শব্দের এবং অর্থের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ বর্তমান এবং শব্দ হল চিহ্নস্বরূপ যার মাধ্যমে শব্দের অর্থ অনুমান করে নেওয়া হয়। উপমান প্রকৃতপক্ষে শব্দপ্রমাণ এবং সে কারণে উপমান অনুমানেরই অন্তর্গত। কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবরণের ওপর ভিত্তি করেই আমরা জানতে পারি যে গবয়-পশু (নীল গাই) গরুর মতন। এক্ষেত্রে যে সাদৃশ্য জ্ঞান থেকে অপরিচিত পশুটির পরিচয়রূপ অনুভূতি আমাদের হচ্ছে, তার মূলে আছে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবরণ। সুতরাং, উপমান হল শব্দপ্রমাণ এবং সে কারণে অনুমানের অন্তর্গত। উপমানকে কোন স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করা যায় না।

বৈশেষিকদের মতে প্রমাণ দুটি—প্রত্যক্ষ ও অনুমান

উপমান ও শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত

জ্ঞান দুপ্রকার—স্মৃতি (Recollection) এবং অনুভব (Apprehension)। অনুভব প্রমা বা যথার্থ হতে পারে এবং অপ্রমা বা অযথার্থ হতে পারে। যথার্থ অনুভব হয় প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমিতি। প্রত্যক্ষ বাহ্য এবং আন্তর উভয় প্রকার হতে পারে। যে বস্তু বা বিষয়ের প্রত্যক্ষ হবে, তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হলে আত্মাতে প্রত্যক্ষ হয়। অবশ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকা প্রয়োজন। অযথার্থ অনুভব দুপ্রকার, যথা, সংশয় (doubt) এবং বিপর্যয় (illusion)। অনুমান দুপ্রকার হতে পারে, যথা—স্বার্থানুমান এবং

জ্ঞান দুপ্রকার—স্মৃতি এবং অনুভব

1. "The sixteen padarthas of the Nyaya are not an analysis of existing things, but are a list of the central topics of the logical science. But the categories of the Vaisesika attempt a complete analysis of the objects of knowledge." —S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol, II, Page 180

পরার্থানুমান। অনুমানকে অন্য তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যেমন—কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী।[1]

৩। বৈশেষিক তত্ত্ববিদ্যা (Vaisesika Ontology):

পদার্থ (Categories) ঃ পদার্থ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পদের বা শব্দের অর্থ—অর্থাৎ পদস্য অর্থঃ পদার্থ। পদের দ্বারা যে বিষয় সূচিত হয়, তাই হল পদার্থ। পদার্থ হল এমন একটি বিষয় যা অভিধেয়, অর্থাৎ যার নাম দেওয়া যেতে পারে এবং এবং যার সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে। সুতরাং যা জ্ঞানের বিষয় তাকেই পদার্থ বলা যেতে পারে। কেবল জড়জগতের বিভিন্ন বস্তু নয়, যেসব বিষয়ের সত্তা আছে, যেগুলি অভিধেয়, যেগুলি প্রমাণের দ্বারা জ্ঞেয়, সংক্ষেপে যা প্রমিতির বিষয় তাই পদার্থ। বৈশেষিকদের মতে পদার্থকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। ভাব বলতে বুঝি যা অস্তিত্বশীল বা যা আছে। যেমন—জড়বস্তু, মন, আত্মা ইত্যাদি। ভাব ভিন্ন পদার্থ হল অভাব পদার্থ। যেমন, ঘটে বস্ত্রখণ্ডের অভাব, মাটির তৈরি মূর্তি বিনষ্ট হলে মাটিতে মূর্তির অভাব। সত্তাবান ভাব পদার্থকে আশ্রয় করে আমরা অভাব পদার্থের জ্ঞান লাভ করি। ভাব পদার্থ হল ছয়টি—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়। পরবর্তী কালে বৈশেষিকরা অভাব পদার্থকে সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন।

যা প্রমিতির বিষয় তাই পদার্থ

পদার্থ—ভাব ও অভাব

নৈয়ায়িকদের 'পদার্থ' এবং বৈশেষিকদের 'পদার্থ'—এই উভয় পদার্থের ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। নৈয়ায়িকরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেও পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন, আবার বাদ, বিতণ্ডা, জল্প, ছল, এগুলিকেও পদার্থরূপে উল্লেখ করেছেন। নৈয়ায়িকদের পদার্থ হল ন্যায়-বিজ্ঞানের আলোচ্য ষোলটি বিষয়। বৈশেষিকদের সপ্ত পদার্থ হল সাতটি জ্ঞানের বিষয়।

নৈয়ায়িকদের ও বৈশেষিকদের পদার্থের মধ্যে পার্থক্য

দ্রব্য (Substance) ঃ যে পদার্থ গুণ এবং ক্রিয়ার আশ্রয় অথচ গুণ এবং ক্রিয়া উভয় থেকেই স্বতন্ত্র তাকেই দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্য ছাড়া গুণ ও ক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বস্তুবাদী বৌদ্ধদের মতে দ্রব্য হল গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি। কিন্তু বৈশেষিকদের মতে দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া সমষ্টি নয়। দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র বস্তু। দ্রব্য গুণ ও কর্মের আধার বা আশ্রয়রূপে এক স্বতন্ত্র সত্তা। দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সমবায় সম্বন্ধ, দ্রব্যতেই গুণ থাকে। সুতরাং দ্রব্যের তিনটি লক্ষণ—ক্রিয়াবৎ, গুণবৎ,

গুণ ও ক্রিয়ার আধারকেই দ্রব্য বলে

1. ন্যায়-দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় এগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

সমবায়ীকারণ।[1] ক্রিয়াবৎ অর্থাৎ দ্রব্যেই ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে; গুণবৎ, অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রেই গুণ বিদ্যমান এবং তৃতীয়তঃ দ্রব্য সমবায়ীকারণ।

যেসব যৌগিক পদার্থ দ্রব্যের সাহায্যে নির্মিত হয়, দ্রব্য সেই সব যৌগিক পদার্থের সমবায়ীকারণ। বস্ত্র হল একটি যৌগিক পদার্থ, সূত্র বা তন্তুর সংযোগে এই বস্ত্র নির্মিত হয়। সুতরাং সূত্র—এই দ্রব্য হল বস্ত্রের সমবায়ী বা উপাদান কারণ, সূত্র সংযোগ হল বস্ত্রের অসমবায়ীকারণ।

[2]দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ (ether), কাল, দিক, আত্মা ও মন। দ্রব্য, দ্রব্যের বিভিন্ন গুণ ও দ্রব্যগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের সাহায্যে সমস্ত জগৎকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। চার্বাকদের মতে সব দ্রব্যই জড়বস্তু কিন্তু বৈশেষিক মতে তা নয়। এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে বলা হয় ভূত (physical element)। এদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ গুণ আছে, যাকে একটি বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। গন্ধ হল ক্ষিতির বিশেষ গুণ, ক্ষিতি ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যে গন্ধ থাকে না। জলে আমরা গন্ধ অনুভব করি; এ কারণে যে, জলের সঙ্গে ক্ষিতির কিছু অংশ মিশ্রিত হয়। ক্ষিতিমিশ্রিত জলেরই গন্ধ আছে, বিশুদ্ধ জলের কোন গন্ধ নেই। রস হল জলের, রূপ হল তেজের, স্পর্শ হল বায়ুর এবং শব্দ হল আকাশের বিশেষ গুণ। আমাদের পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা এই বিশেষ গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করি। এক একটি ইন্দ্রিয় এক একটি গুণকে প্রত্যক্ষ করে। যে ইন্দ্রিয় যে-ভূতের বিশেষ গুণ প্রত্যক্ষ করে সেই ইন্দ্রিয় সেই ভূত থেকে উৎপন্ন। যেমন, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্ষিতি থেকে উৎপন্ন; রসনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় যথাক্রমে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ থেকে উৎপন্ন।

দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন

ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু—এই দ্রব্যগুলি দুপ্রকার—নিত্য[3] (eternal) এবং অনিত্য (non-eternal)। যৌগিক পদার্থের মূল উপকরণগুলি নিত্য। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু সেগুলি নিত্য। কারণ পরমাণু অংশহীন এবং সে কারণে পরমাণুকে উৎপন্ন বা বিনষ্ট করা যায় না। এই সব পরমাণুর সংযোগে যে সব যৌগিক বস্তু উৎপন্ন হয়,

ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু দুপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য

1. "ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়ীকারণমিতি দ্রব্য লক্ষণম্—বৈশেষিক সূত্র ১।১।১৫
(দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্বেসতি সত্ত্বাৎ-ভাষা পরিচ্ছেদ)

2. "পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি"—বৈশেষিক সূত্র।

3. নিত্য পদার্থ কাকে বলে? যাকে অপরের ওপর আশ্রয় বা নির্ভর করতে হয় না, তাই নিত্য। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে 'নিত্য' কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার উৎপত্তি বা বিনাশ নেই, তাহল নিত্য। এখানে নিত্য মানে অনাদি বা অনন্ত নয়।

সেগুলি অনিত্য, কারণ তাদের বিযুক্ত করা সম্ভব এবং সেহেতু তারা বিনাশশীল। যৌগিক পদার্থের সত্তা অপরের ওপর নির্ভর। যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। পরমাণুগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অতীন্দ্রিয় অনুমানের দ্বারা এদের অস্তিত্ব জানা যায়।

৪। বৈশেষিক পরমাণুবাদ (Vaisesika Atomism) ঃ

বৈশেষিক পরমাণুবাদ এক হিসেবে প্রাচীনতম পরমাণুবাদ। বৈশেষিকদের মতে আকাশ, কাল, দিক এবং আত্মা—এই চারটি দ্রব্য নিত্য এবং বিভু বা সর্বব্যাপী। মন নিত্য দ্রব্য, কিন্তু মন পরমাণুবিশেষ ঃ ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ু—এই চারটি দ্রব্যের পরমাণু নিত্য। এ ছাড়া জগতের সব দ্রব্যই অনিত্য। এই জগতের যাবতীয় উৎপত্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হল পরমাণু। এ জগতে আমরা যেসব বস্তু দেখি, সেগুলি যৌগিক বা অবয়ববিশিষ্ট। এই সব বস্তু অংশযুক্ত, বিভিন্ন অংশের সংযোগের ফলেই এই সব যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং অংশগুলিকে বিযুক্ত করলেই এগুলি বিনষ্ট হয়। যা কিছু উৎপন্ন হয় তাই কার্য; এবং যেহেতু কার্যমাত্রেরই কারণ আছে, সেহেতু এই সব যৌগিক পদার্থেরও কারণ আছে। কারণ দুপ্রকার—উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। এই সব যৌগিক পদার্থের উপাদান কারণ হল পরমাণু।

যাবতীয় উৎপত্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হল পরমাণু

বৈশেষিকদের মতে যে কোন অবয়ববিশিষ্ট বা অংশযুক্ত বস্তুকে যদি ক্রমাগত বিভাগ করা যায় তাহলে আমরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, তারপর আরও ক্ষুদ্র এইভাবে এমন এক অবিভাজ্য সূক্ষ্ম অংশে এসে উপনীত হই যে, তারপর তাকে আর ভাগ করা চলে না। এই পরমাণুগুলি সৎ, নিত্য, অনুমেয়, অবিভাজ্য এবং অকারণ। পরমাণুগুলির সত্তা আছে; এ কারণে পরমাণুগুলি সৎ। এগুলি নিত্য, এগুলির কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। পরমাণু দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অংশ। এগুলি নিরবয়ব, যেহেতু এগুলি আর বিভাজ্য নয়। পরমাণু যাবতীয় যৌগিক পদার্থ, যেমন—ঘট, পট ইত্যাদির কারণ। কিন্তু যৌগিক পদার্থ পরমাণুর কারণ নয়, এজন্য পরমাণু হল অকারণ।

পরমাণুগুলি সৎ, নিত্য, অনুমেয়, অবিভাজ্য এবং অকারণ

এই পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনুমানের সাহায্যেই আমরা এগুলির অস্তিত্ব জ্ঞাত হই। এই অনুমান প্রক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ এই জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ হল সাবয়ব অর্থাৎ অংশের সমষ্টি। যা কিছু উৎপন্নশীল তার অংশ থাকবেই, কারণ, কোন বস্তু সৃষ্টি করার অর্থই হল কতকগুলি অংশকে বিশেষ

কোন পদ্ধতিতে সংযুক্ত করা। এখন এই অংশগুলিকে যদি আমরা ক্ষুদ্রতর অংশতে বিভক্ত করি এবং সেগুলিকে আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করি তাহলে আমরা এমন একটি অবস্থায় এসে উপস্থিত হব যখন আর অংশগুলিকে বিভক্ত করা সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় এসে আমরা কতকগুলি অবিভাজ্য নিরবয়ব অতি ক্ষুদ্র কণিকা পাব, যেগুলি সব যৌগিক পদার্থের মূল উপকরণ। এগুলিকেই পরমাণু (atoms) বলা হয়।

অনুমানের সাহায্যেই পরমাণুর অস্তিত্ব জানা যায়

এই পরমাণুগুলি নিত্য; পরমাণুগুলি ঈশ্বরের সঙ্গে সহ-অবস্থানকারী। প্রশ্ন হল, এই পরমাণুগুলিকে নিত্য মনে করার কারণ কি? এ পরমাণুগুলি নিত্য, যেহেতু এগুলির কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। পরমাণুর কোন উৎপত্তি নেই, যেহেতু কোন কিছু সৃষ্টি করার অর্থই হল কতকগুলি অংশকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা। পরমাণুর কোন বিনাশ নেই, যেহেতু কোন কিছুকে বিনষ্ট করার অর্থ হল যুক্ত-অংশগুলিকে বিযুক্ত করা। পরমাণুর কোন অংশ নেই, সেহেতু পরমাণুর যুক্ত অংশকে বিযুক্ত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং যেহেতু পরমাণুকে সৃষ্টিও করা যায় না এবং বিনষ্টও করা যায় না, সেহেতু পরমাণু হল নিত্য।

পরমাণু নিত্য যেহেতু এর কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই

পরমাণু হল জড়বস্তুর উপাদান বা সমবায়ী কারণ (constitutive cause)। পরমাণু থেকেই যাবতীয় জড়বস্তুর সৃষ্টি। ঈশ্বর পরমাণুগুলির নিমিত্ত কারণ। পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় ও গতিহীন। ঈশ্বরই পরমাণুতে গতি সঞ্চার করে পরমাণুগুলিকে গতিশীল করে তোলে।

পরমাণু সংখ্যায় বহু এবং পরস্পর ভিন্ন—প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যার জন্য যে কোন একটি পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে পৃথক। ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ু—এই চারটি দ্রব্যের অসংখ্য পরমাণু আছে। এই পরমাণুগুলির সংযোগের ফলে জলীয় বায়বীয় প্রভৃতি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। আকাশের মাধ্যমেই পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরমাণুগুলির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য না থাকলেও গুণগত পার্থক্য আছে।

পরমাণু সংখ্যায় বহু এবং পরস্পর ভিন্ন

বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্য দর্শনের পরমাণুবাদঃ উভয় মতবাদের সাদৃশ্য এই যে, উভয় দর্শনই স্বীকার করে যে, পরমাণু থেকেই জড়জগতের সৃষ্টি এবং পরমাণুগুলি অবিভাজ্য। এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু এগুলির সত্তা আছে। উভয়ের মতে পরমাণু সংখ্যায় অসংখ্য।

বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্য পরমাণুবাদের মধ্যে সাদৃশ্য

উভয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে।

বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্ত্য পরমাণু-বাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য

প্রথমতঃ, গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রাইটস (*Democritus*) এবং লিউকিপাস (*Leucipuss*)-এর মতে পরমাণুগুলির কোন গুণগত পার্থক্য নেই, কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য আছে। কোনটি ছোট, কোনটি বড়, কোনটির ওজন বেশী, কোনটির ওজন কম, কোনটি সূক্ষ্ম, কোনটি সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু কণাদ পরমাণুর গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন। বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন গুণ আছে। যেমন—ক্ষিতির পরমাণুর গন্ধ আছে, বায়ুর পরমাণুর স্পর্শ, জলের পরমাণুর রস এবং তেজের পরমাণুর রূপ আছে।

দ্বিতীয়তঃ, ডিমোক্রাইটস এবং এপিকিউরাস (*Epicurus*)-এর মতে পরমাণুগুলি স্বভাবতঃই সক্রিয়। কণাদের মতে পরমাণুগুলি স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয় এবং জীবাত্মার মধ্যে যে ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি, সেই অদৃষ্টশক্তিই পরমাণুগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। পরবর্তী বৈশেষিকগণের মতে ঈশ্বরই পরমাণুগুলিকে সক্রিয় করে তোলেন।

তৃতীয়তঃ, ডিমোক্রাইটস আত্মা এবং পরমাণুর প্রভেদ স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে আত্মা হল সূক্ষ্ম পরমাণুবিশেষ। কণাদ-এর মতে আত্মা পরমাণু থেকে পৃথক। আত্মা এবং পরমাণু উভয়েরই এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যে, আত্মাকে পরমাণুতে বা পরমাণুকে আত্মায় পরিণত করা যায় না। আত্মা এবং পরমাণু উভয়েরই সমকালিক অস্তিত্ব আছে।

চতুর্থতঃ, ডিমোক্রোইটস জড়বাদী এবং যান্ত্রিকবাদী। তাঁর পরমাণুবাদ এই জড়বাদেরই একটি রূপ। ডিমোক্রাইটসের মতে পরিমাণ থেকেই গুণের আবির্ভাব। জড় পরমাণুগুলির সংমিশ্রণ থেকেই চেতনা ও প্রাণশক্তির উদ্ভব। বৈশেষিক মতে পরিমাণ থেকে গুণের আবির্ভাব হয় না। প্রত্যেক পরমাণুর এমন এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য অন্য পরমাণু থেকে সে পৃথক।

এছাড়া, ডিমোক্রাইটস ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে পরমাণুগুলির আকস্মিক সংমিশ্রণ থেকেই জড়জগতের সৃষ্টি। জগতের কোন নিমিত্ত কারণ নেই, সেহেতু জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। জড় পরমাণুদের পরিচালিত করার জন্য এবং তাদের সুবিন্যস্ত করার জন্য কোন বুদ্ধি বা চেতনার অস্তিত্ব ডিমোক্রাইটস স্বীকার করেন না। উদ্দেশ্যহীন অন্ধ যান্ত্রিক নিয়মেই এ জগৎ পরিচালিত হয়। জগৎ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন পরিচালক নেই।

বৈশেষিক দর্শন জড়বাদী দর্শন নয়। বস্তুতঃ, বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ তাদের অধ্যাত্ম দর্শনের একটি রূপ মাত্র। বৈশেষিকরা জগতের উদ্দেশ্যহীনতা স্বীকার করেন

না। জীবের কর্মফলানুযায়ী যে অদৃষ্টশক্তি উৎপন্ন হয়, জগৎকর্তা ঈশ্বর, সেই শক্তি অনুসারে পরমাণুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

ডিমোক্রাইটাস যেহেতু জড়বাদী, সেহেতু কোন নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী নয়। কিন্তু বৈশেষিকরা জগতের নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী।

সুতরাং বৈশেষিক পরমাণুবাদ এবং পাশ্চাত্য পরমাণুবাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

জৈন পরমাণুবাদের সঙ্গেও বৈশেষিক পরমাণুবাদের পার্থক্য আছে। জৈন দর্শন এবং বৈশেষিক দর্শন উভয়েই স্বীকার করে যে, পরমাণু অবিভাজ্য, নিত্য এবং জড়ভূতের অন্তিম উপাদান। কিন্তু উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বৈশেষিকদের মতে ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণুগুলির ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে; যেমন—ক্ষিতির গন্ধ, বায়ুর স্পর্শ, জলের রস ইত্যাদি। সুতরাং পরমাণুগুলি সমজাতীয় নয়। কিন্তু জৈনদের মতে পরমাণুগুলি সমজাতীয়। নানারকম সংমিশ্রণের ফলেই এগুলি বিজাতীয় হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন ভূতে, যেমন—ক্ষিতি, জল, তেজঃ ইত্যাদিতে পরিণত হয়।

৫। আকাশ (Ether):

আকাশ হল পঞ্চভূতের শেষ ভূত। আকাশ হল নিত্য, সর্বব্যাপী এবং অতীন্দ্রিয়। শব্দগুণ যাকে নিত্য আশ্রয় করে থাকে, তাই হল আকাশ। আকাশ হল এক, বহু আকাশের কোন অস্তিত্ব নেই। ঘটের মধ্যে, গর্তের মধ্যে, গৃহের মধ্যে, আমাদের যে আকাশের প্রতীতি হয় সে আকাশ ক্ষুদ্র ও সসীম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকাশ একই। উপাধি (limiting condition) সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক আকাশ বহু বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু আকাশ অসীম ও অনন্ত। আকাশের কোন অংশ নেই, সে কারণে আকাশের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। আকাশ নিত্য; ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ুর মতো আকাশের কোন পরমাণু নেই। আকাশ বিভু বা সর্বব্যাপী। আকাশের মহত্ব বা পরিমাণত্ব (dimension) সীমিত নয়। যেসব ভৌতিক বস্তুর অবান্তর মহত্ব (limited dimension) এবং গতি আছে, সেসব বস্তুর সঙ্গে আকাশ সংযুক্ত। আকাশ সমস্ত মূর্ত পদার্থের সংযোগের আশ্রয়। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে হলে সেই বস্তুর দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ—মহত্ব, দ্বিতীয়তঃ—উদ্ভূতরূপত্ব, অর্থাৎ বস্তুর সীমিত পরিসর এবং রূপ থাকা প্রয়োজন। আকাশের সীমিত পরিসর

শব্দগুণ আকাশকে আশ্রয় করে থাকে

আকাশ নিত্য—এর উৎপত্তি বা বিনাশ নেই

আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না

বা রূপ নেই। শব্দের সাহায্যেই আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। শব্দ আকাশের গুণ ও আকাশকে আশ্রয় করে থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা শব্দকে প্রত্যক্ষ করি। শব্দ ক্ষিতি, জল, তেজঃ এবং বায়ুর গুণ হতে পারে না কারণ, এই সব ভৌতিক দ্রব্যের গুণগুলি আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি না। এমন কি সেই সব জায়গায় যেখানে উপরিউক্ত দ্রব্যগুলির কোন অস্তিত্ব নেই সেখানেও শব্দ শোনা যায়। শব্দ দিক্, কাল, আত্মা এবং মনের গুণ হতে পারে না, যেহেতু শব্দ ছাড়াও এগুলির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং এমন কোন দ্রব্য আছে যাকে শব্দ আশ্রয় করে থাকে ; সেই দ্রব্য হল আকাশ। আকাশের কোন সামান্য-ধর্ম নেই ; রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ আকাশে নেই। আকাশ সমস্ত দিক পূর্ণ করে থাকে, যদিও আকাশ দিক নয়।

৬। দিক্ (Space) :

দিক্ হল এক, অখণ্ড, সর্বব্যাপী এবং নিত্য। দিক্ এক, বহু নয় ; কিন্তু উপাধি সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক দিক্ বহু দিক্ বলে প্রতিভাত হয়। দিক্ উপাধি সংযুক্ত হওয়াতে শূন্য স্থান এবং পূর্ণ স্থানের ধারণা হয়।

দূর, নিকট প্রভৃতি ধারণা থেকে দিক্ অনুমান করা হয়

দিক্ প্রত্যক্ষের অগোচর। 'দূর', 'নিকট', 'পূর্ব', 'পশ্চিম' প্রভৃতির ধারণা বা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দিকের অস্তিত্ব অনুমান করি। দিক্ থাকার জন্যই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। দিক কোন জড়পদার্থ নয়, বরং জড় পদার্থই দিকে অবস্থান করে। দিক নিত্য ও শাশ্বত। যেহেতু দিক অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য সেহেতু দিকের কোন পরমাণু নেই এবং দিকের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই।

৭। কাল (Time) :

কাল এক, উপাধি সংযুক্ত হওয়ার জন্য বহু বলে মনে হয়

দিকের মতো কালও এক অনন্ত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য। কাল এক, কিন্তু উপাধি সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক কালকে বহু বলে মনে হয়। ক্ষণ, মুহূর্ত, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর প্রভৃতি অখণ্ড কালের কল্পিত বিভাগ। কাল নিত্য, এর কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। কালকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কালের যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানা নেই, তবে কালেতেই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। সুতরাং, অনুমানের সাহায্যেই আমরা কালের অস্তিত্ব জানতে পারি। কাল হল জগতের আশ্রয়। সমস্ত পরিবর্তন কালেই ঘটে। সমস্ত অনিত্য পদার্থের

উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ হল কাল। কাল সমস্ত মূর্ত পদার্থের সংযোগের আশ্রয়, তাছাড়া, জগতের সমস্ত অনিত্য বস্তুর পরিবর্তনের কারণও হল কাল। তবে বৌদ্ধগণ যেমন মনে করেন যে, কাল এবং পরিবর্তন অভিন্ন, তা নয়, কাল অনন্ত এবং অসীম। এর আদিও নেই, অন্তও নেই। যেহেতু কাল অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য সেহেতু কাল জড়পদার্থ নয়। কাল উৎপন্ন বস্তুমাত্রেরই নিমিত্ত কারণস্থানীয়।

অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ হল কাল

দিক্ বা দেশ বস্তুর সহ-অবস্থান নির্দেশ করে, আর কাল নির্দেশ করে বস্তুর পরিবর্তন বা ধারাবাহিকতা। কালের জন্যই বস্তুর গতি, দিকের জন্যই বস্তুর অবস্থান বা সহ-অবস্থান। কালের সম্বন্ধ হল নিত্য, দিকের সম্বন্ধ হল অনিত্য। আমরা অতীত থেকে ভবিষ্যতে যেতে পারি, ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে যেতে পারি না। কিন্তু আমরা উত্তর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে, উভয় দিকেই যেতে পারি।

দিক ও কালের প্রভেদ

৮। আত্মা (Soul) :

বৈশেষিকদের আত্মা সম্পর্কে ধারণা নৈয়ায়িকদের ধারণার অনুরূপ। যে আধারে জ্ঞান সমবেত তার নাম আত্মা। আত্মা হল এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য ; আত্মা হল জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা দুপ্রকার—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। পরমাত্মাই ঈশ্বর। পরমাত্মা জীবাত্মা থেকে পৃথক ও এই আত্মা শিবস্বরূপ, শুদ্ধাত্মা। পরমাত্মাই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি সংহারকর্তা। তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, কারণ তিনি রূপশূন্য। তাঁর অস্তিত্ব অনুমান ও শব্দ প্রমাণগম্য। প্রত্যেক জীবে একটি করে আত্মার অধিষ্ঠান, সুতরাং আত্মা বিভু হলেও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা নিত্য, আত্মার কোন বিনাশ নেই। জীবের দেহের যখন বিনাশ ঘটে, জীবাত্মা অন্য দেহ ধারণ করে (আত্মত্ব জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই এক ধর্ম ; সেই ধর্মকে গ্রহণ করেই, আত্মাকেও এক বলে গ্রহণ করা হয়েছে)।

আত্মা শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য

জীবাত্মা শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন

বেদান্তবাদীরা বলেন, আত্মা এক। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনমতে জীবাত্মা বহু, কেননা যদি জীবাত্মা এক হত, তাহলে একের সুখে সকলেই সুখ বোধ করত, একের দুঃখে সকলেই দুঃখ বোধ করত। জীবাত্মা এক হলে এই সংসারে জীবের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে তারতম্য দেখা যায় তাকে ব্যাখ্যা করা যেত না। এক ব্যক্তি যখন সুখী, অন্য ব্যক্তি তখন দুঃখী, এ বৈষম্য আছেই এবং এ বৈষম্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই বৈষম্য ব্যাখ্যার জন্যও আত্মার অনেকত্ব স্বীকার করতে হয়।

আত্মাকে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যেই আত্মার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি জীবাত্মার গুণ। এই গুণগুলিকে আমরা মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে সোজাসুজি জানতে পারি। প্রশ্ন হল—এই গুণগুলির আধার কি? যে স্থায়ী দ্রব্যকে আশ্রয় করে এই গুণগুলি বিদ্যমান থাকে, সেই দ্রব্য হল আত্মা। আত্মা হল নিত্য এবং চিরন্তন, এর কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল, কিন্তু এত পরিবর্তনের মাঝেও আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। সে কারণেই জীবের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও আমরা তাকে একই জীব বলে চিনতে পারি। আত্মার সাহায্যেই ব্যক্তি-অভেদ (personal identity) ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

অনুমানের সাহায্যেই আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়

নৈয়ায়িকদের মতো বৈশেষিকরাও মনে করেন যে, আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, কিন্তু দেহের সংস্পর্শে এসেই আত্মা চেতনা লাভ করে। দেহহীন আত্মার কোন চেতনা সম্ভব নয়। জড়ের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য এই যে, আত্মায় চৈতন্যের আবির্ভাব হতে পারে, কিন্তু জড়ে তা সম্ভব নয়। যেহেতু আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, সে কারণে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুন নয়, আগন্তুক গুণ। চেতনা হল এমন গুণ যা দেহস্থিত আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে; কিন্তু এই চেতনা দেহ, ইন্দ্রিয় বা মনের নিজস্ব গুন নয়। আত্মার সঙ্গে দেহের সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা সূচিত করে। জীব আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পেরে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকেই আত্মা বলে ভুল করে; এই জ্ঞানই হল মিথ্যা জ্ঞান। আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যেই মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং জীব মোক্ষলাভ করে। মোক্ষাবস্থা আত্মার এক চৈতন্যহীন অবস্থা।

আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন

প্রত্যেক জীবাত্মারই এমন একটি বিশেষ ধর্ম আছে যা তাকে অন্য আত্মা থেকে পৃথক করে। যেহেতু বৈশেষিকরা বহুবাদী, সেহেতু প্রতিটি আত্মাকেই নিত্য বলে স্বীকার করে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে এক পরমাত্মা বিভিন্ন জীবাত্মার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে বা সব জীবাত্মা এক পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত। নৈয়ায়িকরা এই মত স্বীকার করেন না।[1]

প্রত্যেক জীবাত্মারই একটি বিশেষ ধর্ম আছে

---

1. আত্মার প্রমাণ সম্বন্ধে ন্যায়-দর্শনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৯। মন (Mind) ঃ

মনও আত্মার মত একটি নিত্য দ্রব্য। মন হল অন্তরিন্দ্রিয় এবং এই অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আত্মা সুখ, দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতি গুণগুলি প্রত্যক্ষ করে। বাহ্য-প্রত্যক্ষ এবং আন্তর-প্রত্যক্ষ, কোন প্রত্যক্ষই মন ছাড়া সম্ভব নয়। যদি আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য-বস্তুর সংযোগ না ঘটে তবে আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং বাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব সত্ত্বেও বাহ্য প্রত্যক্ষণ সম্ভব হবে না। মন ছাড়া আন্তর-প্রত্যক্ষণ সম্ভব হবে না, যেহেতু মনের মাধ্যমেই আত্মা নিজের গুণগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে।

মন এক নিত্য দ্রব্য,

মন পরমাণুবিশেষ, সে কারণে মন অতি ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম পদার্থ। মনকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না, তবে কতকগুলি বিষয়ের ভিত্তিতে আমরা মনের অস্তিত্ব অনুমান করি। নিম্নলিখিত কারণে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় ঃ

মন পরমাণুবিশেষ

প্রথমতঃ, বাহ্য-বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য যেমন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, তেমনি আত্মা, জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি আভ্যন্তীরণ বিষয়গুলিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। এই অন্তরিন্দ্রিয় হল মন। দ্বিতীয়তঃ, যদিও বিভিন্ন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিভিন্ন বাহ্য-বস্তুর একই সময়ে সংযোগ ঘটে, তবু একই সময়ে সবগুলির প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একই সময়ে আমার সামনে একটি টেবিল আছে, পাশের ঘরে একটি গান হচ্ছে ও আমার গায়ে একটি জামা আছে। আমি একই সময়ে এর একটিমাত্র বিষয়কে প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং যার প্রতি আমি মনোযোগী হই কেবল সে বিষয়ই প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করতে হলে আমরা একে একে সেগুলি প্রত্যক্ষ করি। মন এই প্রত্যক্ষণের ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং, যে বস্তু প্রত্যক্ষ করছি তার ওপরে মনকে নিবিষ্ট না করলে, অর্থাৎ মনোযোগী না হলে কোন ইন্দ্রিয়ের পক্ষে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। সুতরাং মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়।

মনের অস্তিত্বের প্রমাণ

আমাদের অভিজ্ঞতার ধারাহিকতা প্রমাণ করে যে, মন পরমাণু বিশেষ, এর কোন অংশ নেই। মন যদি অংশযুক্ত কোন সত্তা হত তাহলে মনের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে একই সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটতে পারত এবং তার ফলে একই সময়ে মনে অনেকগুলি জ্ঞানের উৎপত্তি হত। কিন্তু যেহেতু তা হয় না, সেহেতু মন যে পরমাণুবিশেষ তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

মন যে পরমাণুবিশেষ তার প্রমাণ

মন নিত্য, এর উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। প্রতি জীবের দেহকে আশ্রয় করে একটিমাত্র মনের অস্তিত্ব আছে। যদি প্রত্যেক শরীরে অনেক মন থাকত তাহলে একই সময়ে বিবিধ বিষয় জানা হত, কিন্তু তা হয় না। অন্যান্য দ্রব্যের ক্রিয়া করার শক্তি না থাকলেও মনের ক্রিয়া করার শক্তি আছে। মন গতিশীল এবং ক্ষিপ্রগামী। মনের এই ক্ষিপ্রগামিতার জন্যই আমরা মনে করি যে, একই সময়ে একাধিক বস্তুর উদ্দীপনা আমরা লাভ করেছি। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দীপনাগুলি যে ক্রমিক, অর্থাৎ পরপর আসে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। অনেকগুলি পদ্মপাতাকে যদি পরপর রেখে শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়, তাহলে মনে হয় যে, একই সময়ে সবগুলি পাতাকে বুঝি বিদ্ধ করা হয়। কিন্তু আসলে কাজটি ক্রমশঃ সম্পন্ন হয়। একাধিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন যুক্ত হলে মনে হয় সব ইন্দ্রিয়ের কাজ বুঝি একই সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে। মনে করি একই সময়ে বই পড়ছি, গান শুনছি; আসলে একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন আর একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়।

মন গতিশীল এবং ক্ষিপ্রগামী

১০। গুণ (Quality):

[1]গুণ সব সময় দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। গুণের কোন গুণ বা ক্রিয়া নেই। দ্রব্য ছাড়া গুণের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, দ্রব্যই হল গুণের আধার। যেমন— 'মিষ্টত্ব,' 'তিক্ততা' 'সুখ', 'দুঃখ' প্রভৃতি। মিষ্ট বস্তুকে আশ্রয় করেই মিষ্টত্ব বা শুক্ল দ্রব্যকে আশ্রয় করে শুক্লত্ব বিরাজ করে। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আত্মারূপ দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে। দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। দ্রব্য যৌগিক পদার্থের সমবায়ীকারণ। গুণের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই এবং গুণ কোন কিছুর সমবায়ীকারণ হতে পারে না। গুণ হল কোন যৌগিক পদার্থের অসমবায়ীকারণ, যা পদার্থের রূপ বা প্রকৃতি নির্ধারণ করে, কিন্তু তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না। যেমন, শুক্ল বস্ত্রখণ্ডের তন্তু হল দ্রব্য এবং তার সমবায়ীকারণ; কিন্তু শুক্লত্বের ওপর বস্ত্রখণ্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করে না, যদিও শুক্লত্বের সাহায্যে আমরা বস্তুটি কোন্ রঙের জানতে পারি। দ্রব্যে গুণ থাকে, কিন্তু গুণের কোন গুণ থাকে না, সে কারণে গুণকে অগুণবান বলা হয়েছে। লাল রঙ কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, অন্য কোন রঙকে আশ্রয় করে থাকে না। গুণ গতিহীন এবং নিষ্ক্রিয়, গুণ সংযোগ ও বিভাগের কারণ নয়। কর্মই সংযোগ এবং বিভাগের কারণ। গুণ কর্ম থেকে পৃথক;

গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে

1. "দ্রব্যাশ্রয়্যগুণবান সংযোগ বিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্"—বৈশেষিক সূত্র।—যা দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান এবং সংযোগ বা বিভাগের প্রতি-নিরপেক্ষ কারণ নয়, তাকেই গুণলক্ষণ বলে।

গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকলেও গুণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ (an independent category)।

বৈশেষিকদের মতে গুণ চব্বিশ প্রকার।[1] রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব (remoteness), অপরত্ব (nearness), বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ (aversion), প্রযত্ন (effort), গুরুত্ব (heaviness), দ্রবত্ব (fluidity), স্নেহ (viscidity) সংস্কার, (tendency), ধর্ম (merit) অধর্ম (demerit) এবং শব্দ। কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে প্রথম সতেরোটি গুণের উল্লেখ করেছেন, পরে ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ শেষোক্ত সাতটি গুণ পূর্বোক্ত সতেরোটি গুণের সঙ্গে যোগ করেছেন। পরবর্তী কালে অন্যান্য বৈশেষিক দার্শনিকরা মোট চব্বিশটি গুণকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এক একটি গুণের আবার বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে। যেমন —রস ছয় প্রকার। কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর প্রভৃতি। গন্ধ দু প্রকার— সুরভি ও অসুরভি। স্পর্শ তিন প্রকার—উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত।

গুণ চব্বিশ প্রকার

গুণগুলির মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যথাক্রমে তেজ, জল, ক্ষিতি, আকাশ ও বায়ু এই পঞ্চ ভূতের গুণ। এই গুণগুলি এক একটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়। যেমন—চক্ষুর দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, জিহ্বার দ্বারা রস, নাসিকার সাহায্যে গন্ধ এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শের প্রত্যক্ষণ হয়।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ—পঞ্চ ভূতের গুণ

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সংস্কার, ধর্ম, ও অধর্ম প্রভৃতি গুণগুলি জীবাত্মাকে আশ্রয় করে থাকে। বুদ্ধি দুপ্রকার—অনুভূতি এবং স্মৃতি। অনুভূতি দুপ্রকার— প্রত্যক্ষ এবং অনুমিতি। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে। জীব শুভ কর্ম করলে ধর্মের উৎপত্তি ঘটে, সেই ধর্ম থেকে সুখ উৎপন্ন হয়। জীব অশুভ কর্ম করলে অধর্মের উৎপত্তি হয়, সেই অধর্ম থেকে দুঃখের উৎপত্তি। যে গুণ থেকে প্রবৃত্তির জন্ম তাকেই ইচ্ছা বলে। যে গুণের জন্য নিবৃত্তি ঘটে তাকেই দ্বেষ বলে। যে বিষয় থেকে জীবের দুঃখ পাবার আশঙ্কা থাকে, তার প্রতি জীবের দ্বেষ জন্মায়। প্রযত্ন বা চেষ্টা (effort) তিন প্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবনযোনি (vital function)। প্রবৃত্তি হল কোন কিছুর প্রতি স্পৃহা, নিবৃত্তি হল কোন কিছুর থেকে বিরতি, আর জীবনযোনি হল জীবনপোষক ক্রিয়া।

বুদ্ধি, সুখ প্রভৃতি গুণগুলি জীবাত্মাকে আশ্রয় করে থাকে

---

1. "রূপ-রস-গন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথকত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ"—বৈশেষিক সূত্র।

গুরুত্ব (heaviness) হল বস্তুর সেই গুণ যার জন্য বস্তু নিচের দিকে পতিত হয়। দ্রবত্ব (fluidity) হল সেই গুণ যার জন্য কোন কোন বস্তু যেমন জল, দুধ প্রভৃতি বয়ে যায়। স্নেহ বা সংশক্তিশীলতা (viscidity) হল সেই গুণ যার জন্য চূর্ণ বস্তুগুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। এই গুণ কেবল জলেই থাকে। তৈলাদিতে যে স্নেহের প্রতীতি জন্মে তা বস্তুতঃ তৈলাদির জলীয়াংশপ্রসূত।

গুরুত্ব এবং দ্রবত্ব

সংখ্যা (Number) হল বস্তুর সেই গুণ যার জন্য আমরা বস্তু গণনা করতে পারি। প্রত্যেক দ্রব্যেই সংখ্যা থাকে। সংখ্যা এক থেকে পরার্ধ (অর্থাৎ এক সহস্র কোটি) পর্যন্ত সংখ্যার বোধক। একত্ব, নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুপ্রকার, নিত্য পদার্থের একত্ব নিত্য এবং অনিত্য পদার্থের একত্ব অনিত্য। দুই থেকে পরার্ধ পর্যন্ত শেষ সংখ্যা নিত্য নয়।

পরিমাণ (Magnitude) হল সেই গুণ যার সাহায্যে বস্তু ছোট কিংবা বড় নির্ধারণ করা হয়। পরিমাণ চার প্রকার—অণু, হ্রস্ব, মহৎ এবং দীর্ঘ।

পৃথকত্ব হল সেই গুণ যার সাহায্যে একটি দ্রব্যকে আর একটি দ্রব্য থেকে পৃথক করা যায়। যেমন—বাড়ী থেকে গাড়ী পৃথক।

যে দুই বা ততোধিক বস্তু স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে, তাদের মিলনকে সংযোগ (Conjunction) বলে। যেমন—খাতা ও কলম। কার্য এবং কারণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাকে সংযোগ বলা চলে না, যেহেতু কার্য এবং কারণের পরস্পর সম্বন্ধনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। সংযোগ তিন প্রকার—(১) যখন দুটি বস্তুর মধ্যে একটি গতিশীল হওয়ার জন্য সংযোগ ঘটে; যেমন—পাখী আর গাছ। পাখীটি উড়ে গিয়ে গাছে বসার জন্য এই সংযোগ ঘটে। (২) উভয় বস্তুই গতিশীল হওয়ার জন্য যখন সংযোগ ঘটে; যেমন—দুজন কুস্তিগীর মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য যখন উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটে। (৩) যখন যে কোন দুটি বস্তু তৃতীয় কোন বস্তুর মাধ্যমে যুক্ত হয়, যেমন—লাঠি দিয়ে কোন ব্যক্তি কোন টেবিলকে স্পর্শ করলে, লাঠির মাধ্যমে লোকটির সঙ্গে টেবিলের সংযোগ ঘটে। বিভাগ (Disjunction) সংযোগের বিপরীত গুণ। দুটি যুক্ত বস্তুর বিচ্ছিন্নতারূপ গুণই হল বিভাগ। যে গুণ সংযোগের বিনাশসাধন করে তার নাম বিভাগ। সংযোগের মতো বিভাগও তিন প্রকার। পাখিটি গাছ থেকে উড়ে চলে গেলে পাখী ও গাছের বিভাগ হয়। কুস্তিগীর দুজন যখন মল্লযুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তাদের পূর্ব সংযোগ নষ্ট হয়ে উভয়ের মধ্যে বিভাগ হয়। যখন কোন

সংযোগ ও বিভাগ

বিভাগও তিন প্রকার

ব্যক্তি যে লাঠি দিয়ে সে টেবিল ছুঁয়ে ছিল সেটি ছেড়ে দেয় তখন তার সঙ্গে টেবিলের বিভাগ হয়।

পরত্ব (Remoteness) এবং অপরত্ব (Nearness) হল সেই গুণ যার সাহায্যে আমরা 'দূর বা জ্যেষ্ঠ' এবং 'নিকট বা কনিষ্ঠ' এই ধারণাগুলি ব্যবহার করে থাকি। পরত্ব এবং অপরত্ব দুপ্রকার—দেশগত এবং কালগত। দেশগত, যেমন—এই বস্তুটি কাছে, ঐ বস্তুটি দূরে। কালগত, যেমন—এই বালকটি জ্যেষ্ঠ, ঐ বালকটি কনিষ্ঠ; বা এটি নতুন, ওটি পুরাতন ইত্যাদি।

পরত্ব ও অপরত্ব দু'প্রকার—দেশগত ও কালগত

সংস্কার (tendency) তিন প্রকার—বেগ (velocity), স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) ও ভাবনা (mental impressions)। বেগ যে কোন বস্তুকে গতিশীল করে রাখে। ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনে বেগ থাকে। স্থিতিস্থাপকতা হল সেই গুণ যার জন্য কোন বস্তুকে প্রসারিত বা সংনমিত করার পরও বস্তুটি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। স্থিতিস্থাপকতার জন্যই ধনুক থেকে বাণটি নিক্ষিপ্ত হলে ছিলাটি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ভাবনা হল অবচেতন মনে সঞ্চিত সংস্কার যার জন্য আমরা পূর্বানুভূত বস্তুকে স্মরণ করতে পারি।

ধর্ম এবং অধর্ম বলতে আমরা যথাক্রমে পুণ্য এবং পাপকেই বুঝে থাকি। শাস্ত্রবিহিত' কাজ করার ফলে ধর্ম এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাজ করার ফলে অধর্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম সুখের কারণ, অধর্ম দুঃখের কারন।

বৈশেষিকদের মতে গুণ হল দ্রব্যের মৌলিক এবং নিষ্ক্রিয় গুণ। পূর্বে যেসব গুণের কথা উল্লেখ করা হল তার মধ্যে কতকগুলি গুণ নিত্য এবং কতকগুলি অনিত্য। সে গুণগুলিই নিত্য, যেগুলি নিত্য বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। যেমন—নিত্যদ্রব্যের একত্ব সংখ্যা নিত্য এবং অন্যান্য সমস্ত সংখ্যাই অনিত্য, যেহেতু তারা অনিত্য বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। নিত্য দ্রব্যের পরিমাণ নিত্য এবং অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য।

বৈশেষিক দর্শনে কেন চব্বিশটি গুণ স্বীকার করা হল? তার কমও নয়, তার বেশীও নয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, গুণের শ্রেণীবিভাগ করার সময় একটি বিষয়ের দিকে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, গুণগুলি যেন যৌগিক না হয়ে সরল হয় এবং গুণগুলির একটিকে যেন অপর একটিতে রূপান্তরিত করা না যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন একটি যৌগিক বর্ণ যেমন কমলা বর্ণকে লাল এবং পীতবর্ণে বিভক্ত করা যেতে পারে বা একটি যৌগিক শব্দকে কতকগুলি শব্দের সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত

দেখান যেতে পারে। কিন্তু, আমাদের পক্ষে কোন বর্ণকে শব্দে বা অন্য কোন গুণে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। এই কারণেই বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতিকে পৃথক পৃথক গুণ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই গুণ সরল না যৌগিক, বা কোন গুণকে অন্য গুণে রূপান্তরিত করা যায় কি না যায়— এরই ভিত্তিতে বৈশেষিক গুণের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে।

১১। কর্ম (Action) ঃ

কর্ম হল ভৌতিক গতিক্রিয়া (Physical movement)। গুণ যেমন কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে, কর্মও অনুরূপভাবে কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। কর্ম দ্রব্য ও গুণ থেকে স্বতন্ত্র। কর্ম ও গুণের মধ্যে প্রভেদ আছে। গুণ হল স্থিতিশীল ও নিষ্ক্রিয়, কর্ম হল গতিশীল ও সক্রিয়। গুণ নিষ্ক্রিয়, সেহেতু কোন বস্তুর গুণ সে বস্তু থেকে আরও একটি বস্তুতে আমাদের নিয়ে যায় না, কিন্তু কর্ম হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে একটি বস্তু আর একটি বস্তুর কাছে বা তার থেকে দূরে যেতে পারে। গুণ হল স্থায়ী, কর্ম হল ক্ষণিক। কর্ম মাত্র পাঁচটি মুহূর্ত স্থায়ী হয়।

কর্ম হল ভৌতিক গতিক্রিয়া

কণাদ কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যা কোন একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, অথচ গুণ নয় এবং সংযোগ ও বিভাগের যা প্রত্যক্ষ কারণ তাকেই কর্ম বলে।[1] যেমন—একটি গোলকের গতি গোলককে আশ্রয় করে থাকে অথচ তা গোলকের কোন গুণ নয়। গোলকটি বাড়ীর ছাদে ছিল, গতির ফলে সেখান থেকে সেটি মাটিতে এসে পড়ল, অর্থাৎ মাটির সঙ্গে তার সংযোগ হল। কর্ম বা গতি হল সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়ীকারণ। সংযোগ, বিভাগ ও বেগের সামান্য কারণ হল কর্ম। কর্ম দ্রব্যের কারণ নয়। যেমন, মৃত্তিকার সংযোগে ঘট উৎপন্ন হয়, তাদের সংযোগ বিনাশে ঘট বিনষ্ট হয়। কিন্তু কর্ম সংযোগ ও বিভাগের কারণ হলেও ঘটের কারণ নয়। সব কর্মই সীমিত ও মূর্ত দ্রব্যকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। যেমন—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং মন। কিন্তু আকাশ, দিক, কাল এবং আত্মা হল বিভু বা সর্বপরিব্যাপ্ত, ফলে তাদের স্থান পরিবর্তন হয় না। সুতরাং তাদের গতি বা কর্মের প্রশ্ন ওঠে না।

কর্মের সংজ্ঞা

আকাশ, দিক, কাল এবং আত্মার কোন কর্ম নেই

কর্ম পাঁচ প্রকার ; যথা—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।[2] বস্তুকে

1, 'একদ্রব্যগুণং সংযোগ বিভাগেনঘনাপক্ষ কারণমিতি কর্ম্ম লক্ষণং" ।—বৈশেষিক সূত্র

2. উৎক্ষেপণমেব ক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্মণি ।—বৈশেষিক সূত্র

ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করাকে উৎক্ষেপণ বলা হয়। ঊর্ধ্বদেশের সঙ্গে বস্তুর সংযোগের কারণ হল উৎক্ষেপণ। যেমন, উপর দিকে একটি ঢিল ছুঁড়ে দেওয়া। নিম্নে বস্তুকে নিক্ষেপ করাকে অবক্ষেপণ বলে। নিম্নদেশের সঙ্গে বস্তুর সংযোগের কারণ হল অবক্ষেপণ। কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশের সংকোচ সাধনকেই আকুঞ্চন বলে। যেমন—হাতের আঙুল সংকুচিত করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করা। প্রসারণ আকুঞ্চনের বিপরীত প্রক্রিয়া। যে কর্মের ফলে বস্তুর বিভিন্ন অংশের নিবিড় সংযোগ নষ্ট হয়ে যায় তাকেই প্রসারণ বলে। যেমন—মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলগুলিকে হাত খুলে দিয়ে মেলে দেওয়া। পূর্বোক্ত কর্ম ছাড়া আর সব কর্মই হল গমন—গমন হল বস্তুর স্থান পরিবর্তন। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন (evacuation) ঊর্ধ্বজ্বলন, তির্যগ্ গমন প্রভৃতি গমনের প্রকারভেদ। কঠিন বস্তুর নিঃসরণের নাম রেচন, জলীয় বস্তুর নিঃসরণের নাম স্যন্দন। দীপ শিখার ঊর্ধ্বজ্বলন এবং বায়ুর তির্যগ্‌গতি অতি পরিচিত ব্যাপার।

কর্ম পাঁচ প্রকার

কর্ম প্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্তু সবরকম কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মন প্রত্যক্ষ দ্রব্য নয়, সেহেতু মনের কর্ম লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় প্রভৃতি দ্রব্যের কর্মকেই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং দ্রব্য প্রত্যক্ষ হলে তার কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়, দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ হলে তার কর্ম প্রত্যক্ষ করা যায় না। কর্ম অনিত্য। যেহেতু কর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে সেহেতু কর্ম অনিত্য।

কর্ম প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও সব রকম কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না

১২। সামান্য (Generality) ঃ

একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের একই নামে অভিহিত করি। এই হেতু তাদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে, তবু আমরা সকলকেই মানুষ নামে অভিহিত করি কেন? তার কারণ মনুষ্যত্ব, এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান, যার জন্য সব মানুষই মনুষ্য পদবাচ্য। এই বৈশিষ্ট্য শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই একই শ্রেণীভুক্ত পরস্পর পৃথক বস্তুর সম্পর্কে সমতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই 'সামান্য' বলা হয়। পাশ্চাত্য দর্শনে যাকে আমরা 'universal' বলি, 'সামান্য' তারই অনুরূপ।

যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সমভাবে বর্তমান থাকে তাকে সামান্য বলে

'সামান্য' বা জাতিধর্ম সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। বৌদ্ধগণের মতে সামান্যের কোন অস্তিত্ব নেই। কেবলমাত্র স্ব-লক্ষণেরই (individual) অস্তিত্ব

আছে। অভিজ্ঞতায় যে সব বিশিষ্ট বস্তু (particular objects) প্রত্যক্ষ করি, সেগুলি ছাড়া, তার অতিরিক্ত কোন সামান্যের অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব লক্ষণ আছে এবং সেহেতু প্রত্যেক পদার্থ অন্য পদার্থ থেকে ভিন্ন। বৌদ্ধদের মতে একই নামে অভিহিত করা হয় বলেই, বিভিন্ন বস্তু পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তাদের সমতাজ্ঞানের ভাব আমাদের মনে জাগরিত হয়। সামান্য হল নাম, আসলে সামান্যের কোন বস্তু বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্তা নেই। এই নাম নঞর্থক লক্ষণার্থসূচক। কোন শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন বস্তুকে একই নামে অভিহিত করার অর্থ হল সেই বস্তুগুলিকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করা। সব গরুকেই আমরা গরু নামে অভিহিত করি। তার কারণ এই নয় যে, সব গরুতে কোন সমতা আছে। এর কারণ, সব গরুই অন্যপ্রাণী ; যেমন, কুকুর—ছাগল, বাঘ প্রভৃতি থেকে পৃথক। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ নামবাদী (nominalist)।

জৈন এবং অদ্বৈত বেদান্ত মতে সামান্য হল একটি সাধারণ বা সার্বভৌম ধারণা (a general idea or concept)। সার্বভৌম ধারণা বলতে বুঝি একই শ্রেণীর বস্তুর মধ্যে অবস্থিত যে সাধারণ ও অনিবার্য গুণ। পৃথক পৃথক মানুষেরই সত্তা আছে, মনুষ্যত্বের কোন সত্তা নেই। কিন্তু সব মানুষের মধ্যে দুটি সাধারণ ও অনিবার্য গুণ আছে, জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। সামান্য ধারণা এই গুণ দুটি নির্দেশ করে মাত্র।

সুতরাং সামান্য (universal) স্ব-লক্ষণ (individual) থেকে ভিন্ন নয়, বরং অস্তিত্বের দিক থেকে স্ব-লক্ষণের সঙ্গে অভিন্ন। সামান্যের সঙ্গে স্ব-লক্ষণের তাদাত্ম্য (indentity) সম্বন্ধ। আমাদের মনে যেমন সামান্যের অস্তিত্ব রয়েছে তেমনি অভিজ্ঞতার প্রতিটি বিশেষ বস্তু (particular objects)-তেও রয়েছে। যেহেতু সামান্য এক শ্রেণীর বিশেষ বস্তুর সাধারণ লক্ষণ, সেহেতু সামান্য বাইরে থেকে সেই বিশেষ বস্তুগুলির মধ্যে উপস্থিত হয় না। জৈন ও অদ্বৈত বেদান্তীগণ প্রত্যয়বাদী (conceptualist)।

ন্যায় বৈশেষিকরা বস্তুবাদী (realist), সেহেতু সামান্য সম্পর্কে তাঁদের মতবাদ বস্তুবাদীদের মতবাদের অনুরূপ। তাঁদের মতে সামান্য হল নিত্য পদার্থ (eternal entities)। দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে ঃ যেমন, মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আছে কিন্তু সামান্য (এক্ষেত্রে দ্রব্যত্ব এবং মনুষ্যত্ব) হল নিত্য, এর কোন বিনাশ নেই। সামান্য অনেকানুগত। একই শ্রেণীর ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একই সামান্য বর্তমান। যদিও সামান্য বহু ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান, তবু সামান্যের ব্যক্তি বা বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা আছে। একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে এই সামান্য বিদ্যমান থাকে বলে আমরা

সামান্য সম্পর্কে ন্যায়-বৈশেষিক মতবাদ

তাদের এক শ্রেণীভুক্ত করতে পারি।[1] বিভিন্ন বস্তুর সমতাজ্ঞানের মূলেও এই সামান্য বর্তমান।

সামান্যের সঙ্গে বস্তুর সমবায় সম্বন্ধ। প্রত্যেক শ্রেণীর একটি করেই সামান্য আছে। সামান্যের কোন সামান্য থাকতে পারে না। মনুষ্যত্বের কোন মনুষ্যত্ব নেই, দ্রব্যত্বের কোন দ্রব্যত্ব নেই। সামান্যের যদি সামান্য থাকে, তাহলে তার আবার সামান্য থাকবে। এইভাবে অনবস্থা দোষের (Fallacy of Infinite Regress) উদ্ভব ঘটে। একই শ্রেণীর যদি একাধিক সামান্য থাকে তাহলে এই সামান্য পরস্পর বিপরীত বা বিরুদ্ধ প্রকৃতির হওয়ার জন্য শ্রেণীবিভাগ সম্ভব হবে না।

সামান্যের সঙ্গে বস্তুর সমবায় সম্বন্ধ

সামান্যের আর এক নাম জাতি। মনুষ্যত্ব হল জাতি, অন্ধত্ব হল উপাধি। জাতি ও উপাধির মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতি নিত্য, উপাধি অনিত্য। জাতি হল স্বাভাবিক, উপাধি হল কৃত্রিম। অন্ধত্বকে জাতি বা শ্রেণীরূপে গণ্য করলে অন্ধ ব্যক্তি, অন্ধ গরু, অন্ধ ঘোড়া সব একই শ্রেণীভুক্ত হবে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই তিন পদার্থের জাতি থাকে, অন্য পদার্থের জাতি নেই। এই তিন পদার্থের যে জাতি আছে, তার নাম সত্তা (Beinghood)।

সামান্য ও উপাধির পার্থক্য

সামান্যের শ্রেণীবিভাগঃ ব্যাপকতা অনুসারে সামান্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—(১) পর, (২) অপর এবং (৩) পরাপর। 'পর' হল সবচেয়ে অধিক ব্যাপক, 'অপর' হল সবচেয়ে কম ব্যাপক এবং 'পরাপর' হল এই উভয়ের মধ্যবর্তী।

যে জাতি সবচেয়ে ব্যাপক, যাকে অন্য কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তাকেই পর-সামান্য (*Summum Genus*) বলে। সত্তা হল পরসামান্য, কারণ এ সবচেয়ে অধিক ব্যাপক। অন্যান্য সামান্য এই সামান্যে থাকবেই ; সত্তা হল খাঁটি সামান্য।

সবচেয়ে কম ব্যাপক যে জাতি, যার অন্তর্ভুক্ত আর জাতি হয় না, তাকে অপর সামান্য বলে। যেমন—ঘটত্ব (Jarness)। এর চেয়ে কম ব্যাপক কোন শ্রেণী হতে পারে না।

দ্রব্যত্ব (Substantiality)—এই সামান্য, পর ও অপর সামান্যের মধ্যবর্তী—সেজন্য একে বলা হয় পরাপর সামান্য। দ্রব্যত্ব 'ঘটত্ব', 'ক্ষিতিত্ব', 'অপত্ব' প্রভৃতি সামান্যের চেয়ে ব্যাপকতর, কিন্তু 'সত্তা' এই সামান্যের চেয়ে কম ব্যাপক।

---

1. কোন কোন আধুনিক বস্তুবাদী পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক, যেমন—বার্ট্রাণ্ড রাসেল সামান্য ধর্মের কোন সত্তা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে সামান্যের সত্তা (existence) নেই, তার অবস্থিতি (subsistence) আছে। সত্তার দেশ ও কালে অবস্থিতি থাকে। কিন্তু সামান্যের অবস্থিতি দ্রব্যে, গুণে ও কর্মে। এই দার্শনিকদের মতে সামান্য এমন একটা কালাতীত নিত্য বিষয় (eternal timeless entity) যা বহু ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

১৩। বিশেষ (Particularity) :

'বিশেষ' কথাটি থেকেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি। বিশেষ হল সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। অংশহীন নিত্য দ্রব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল বিশেষ।

অংশহীন নিত্যদ্রব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল বিশেষ

পদার্থকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—নিত্য ও অনিত্য। যার উৎপত্তি বা বিনাশ নেই, তাকেই নিত্য পদার্থ বলা হয়। এর বিপরীতধর্মী পদার্থকেই অনিত্য পদার্থ বলা হয়। অনিত্য পদার্থের যেমন—ঘট, পট প্রভৃতির কোন বিশেষ নেই। বিভিন্ন পরমাণুর সংযোগে যেসব যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলি নিজ নিজ অবয়বের জন্যই পরস্পর ভিন্ন বলে স্বীকৃত

অনিত্য পদার্থের বিশেষ নেই

হয়। তাছাড়া, যেহেতু অংশের সংযোগে এগুলি গঠিত, অংশের পার্থক্যের সাহায্যেই এগুলিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু যেসব পদার্থ অংশহীন এবং নিত্য তাদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যাবে কিভাবে ?

নিত্য পদার্থেই বিশেষের অধিষ্ঠান। আকাশ, দিক, কাল, মন, আত্মা এবং ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ুর যে পরমাণু—এগুলি নিত্য ; কারণ, এগুলির কোন অংশ নেই। এগুলির প্রত্যেকেরই একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে এদের প্রত্যেককে পৃথক অস্তিত্ববিশিষ্ট বলে জানা যায়। যেমন—একটি আত্মা অন্য আত্মা থেকে পৃথক, একটি মন অন্য মন থেকে পৃথক। যদি এই পার্থক্য না থাকত তাহলে পৃথিবীতে একটি আত্মা বা মনকে অপর আত্মা বা মন থেকে পৃথক করা যেত না। প্রত্যেকটি

নিত্য পদার্থে বিশেষের অধিষ্ঠান

আত্মার মধ্যে এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যার জন্য সে আত্মা অন্য আত্মা থেকে পৃথক। এই বিশেষ বৃত্তি থাকার জন্য আমরা একাধিক নিত্য দ্রব্যের কথা বলতে পারছি নতুবা আত্মা, মন, দিক, কাল এগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব হত না। তেমনি একটি জলের পরমাণু আর একটি জলের পরমাণু থেকে পৃথক। গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রাইটিসের মতে পরমাণুগুলির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য আছে কিন্তু প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই। বৈশেষিকদের মতে প্রতিটি পরমাণুর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে একটি পরমাণু অপর একটি পরমাণু থেকে পৃথক। পরমাণুগুলি অংশহীন। সুতরাং কোন অবয়ব না থাকার জন্য এগুলিকে সাধারণভাবে পৃথক বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। 'বিশেষ' পদার্থ থাকার জন্যই জলের একটি পরমাণুকে জলের আর এক পরমাণু থেকে পৃথক করা যায়।

প্রতিটি পরমাণুতে এক একটি বিশেষ আছে। ক্ষিতির পরমাণুগুলি সবই যদি একই প্রকার হয় তাহলে এই একই প্রকৃতিবিশিষ্ট পরমাণু থেকে বিবিধ প্রকার পার্থিব

বস্তু উৎপন্ন হচ্ছে কেন? এক জাতীয় বস্তু উৎপন্ন হয় না কেন? একই গাছের বিভিন্ন ফল, এক প্রকার পরমাণু থেকেই যদি তাদের উৎপত্তি হয়, তাহলে সব ফল ঠিক এক নয় কেন? প্রতিটি ফলের রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে, এর কারণ কি? মহর্ষি কণাদের মতে প্রত্যেকটি পরমাণুতে একটি বিশেষ থাকে। সেই বিশেষ প্রতিটি পরমাণুকে অন্য পরমাণু থেকে পৃথক করে।

প্রতিটি পরমাণুতে এক একটি বিশেষ আছে

নিত্য দ্রব্যের মধ্যে অধিষ্ঠান বলে, বিশেষও নিত্য (eternal) পদার্থ। নিত্য দ্রব্যের সংখ্যা অসংখ্য; সে কারণে বিশেষের সংখ্যাও অসংখ্য। অসংখ্য আত্মা আছে, প্রতিটি আত্মায় একটি করে বিশেষ আছে। বিশেষ সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সামান্য বহু দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, বিশেষ কেবলমাত্র একটি নিত্য দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে।

বিশেষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। পরমাণু যেমন অতীন্দ্রিয় বস্তু, বিশেষও তেমনি অতীন্দ্রিয় বস্তু। নিত্য পদার্থের সঙ্গে বিশেষের সমবায় সম্বন্ধ। বিশেষের কোন বিশেষ নেই। যদি বিশেষের বিশেষ কল্পনা করা হয় তাহলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। বিশেষ যদিও একটি নিত্য দ্রব্যকে অন্য নিত্য দ্রব্য থেকে পৃথক করে, নিজেদের পরস্পর থেকে পৃথক করার জন্য বিশেষের কোন বিশেষের প্রয়োজন হয় না।

বিশেষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না

সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত এবং মীমাংসা বিশেষকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করে না। নব্য নৈয়ায়িকদের মতে যেহেতু একটি নিরবয়ব দ্রব্য অপর একটি নিরবয়ব দ্রব্য থেকে স্বভাবতঃই ভিন্ন, সেহেতু 'বিশেষে'র অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই।

১৪। সমবায় (Inherence):

দুটি পদার্থ যখন এমন এক অবিচ্ছেদ্য ও নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হয় যে, পদার্থ দুটির মধ্যে একটি আর একটিতে থাকে, তখন ঐ সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। যেমন—সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ।

ন্যায়-বৈশেষিকরা দু'প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করেন—সংযোগ (conjunction) ও সমবায় (inherence)। যে দুটি বস্তু সাধারণতঃ পৃথকভাবে থাকে, তাদের মধ্যে যে অনিত্য সম্বন্ধ তাকেই সংযোগ সম্বন্ধ বলে। ঘরের ছাদের ওপর থেকে পাখিটা উড়ে এসে যখন গাছের ওপর বসল, তখন গাছের সঙ্গে পাখির সংযোগ হল। এই সংযোগ নিত্য বা স্থায়ী নয়, কেননা পাখিটি গাছের ওপর থেকে উড়ে চলে গেলে উভয়ের মধ্যে সংযোগ আবার বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এ সম্বন্ধ হল সাময়িক (temporary)। যতক্ষণ দুটি বস্তুর মধ্যে

সম্বন্ধ দু'প্রকার—সংযোগ ও সমবায়

সংযোগ চলতে থাকে ততক্ষণ এই সংযোগ বস্তুর গুণরূপে বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। বস্তুর সত্তা (existence) সংযোগের ওপর নির্ভর করে না। গাছ ও পাখির মধ্যে যে সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপিত হল, সেই সম্বন্ধের ওপর গাছ ও পাখির সত্তা নির্ভর করে না। এই সম্বন্ধ হবার পূর্বেও উভয়ের অস্তিত্ব ছিল। দুটি বস্তুর একটিকে যদি আর একটি থেকে পৃথক করা যায় এবং তাতে যদি তাদের অস্তিত্বের হানি না হয়, তাহলে তাদের বলা হয় যুতসিদ্ধ। আর যদি দুটি বস্তুর একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করা না যায়, অর্থাৎ পৃথক করতে গেলে তাদের অস্তিত্বের হানি ঘটে তাহলে তাদের বলা হয় অযুতসিদ্ধ। যুতসিদ্ধ বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধকে সংযোগ বলা হয় এবং অযুতসিদ্ধ বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়; সুতরাং সংযোগ হল বাহ্য-সম্বন্ধ, যে দুটি বস্তু সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে তার আগন্তুক গুণ হিসেবেই এই সম্বন্ধের অস্তিত্ব।

বস্তুর সত্তা সংযোগের ওপর নির্ভর করে না

সংযোগ সম্বন্ধ হল অনিত্য ও বাহ্য-সম্বন্ধ। কিন্তু সমবায় হল দুটি বিষয়ের মধ্যে নিত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ; যে দুটি বিষয়ের একটি আর একটিতে থাকে, যেমন—সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ, অবয়বের সঙ্গে অবয়বীর সম্বন্ধ, দ্রব্যের সঙ্গে গুণের ও কর্মের সম্বন্ধ, উপাদান কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ, যেমন সূত্রের সঙ্গে বস্ত্রের সম্বন্ধ, জাতির সঙ্গে ব্যক্তির বা বস্তুর সম্বন্ধ। সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ—কেননা এই সম্বন্ধ নিত্য। একটা ঘটকে যতক্ষণ ভেঙে ফেলা না হয় ততক্ষণ সেটি অংশের মধ্যে থাকবেই। কাজেই সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ কোন বাহ্য কারণের দ্বারা উৎপন্ন নয়। সে কারণেই তাদের বলা হয় অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধযুক্ত (অযুতসিদ্ধ)। দ্রব্যের সঙ্গে গুণের, দ্রব্যের সঙ্গে কর্মের, জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধও কোন বাহ্য কারণের দ্বারা উৎপন্ন নয়। এগুলি নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত, তাই এদের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। রাধাকৃষ্ণনের মতে সংযোগ হল বাহ্য-সম্বন্ধ আর সমবায় হল আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ।

সংযোগ অনিত্য ও অস্থায়ী; সমবায় নিত্য ও স্থায়ী সম্বন্ধ

সমবায় সম্বন্ধকে কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা যেতে পারে না। আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বস্তু দুটি পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সমগ্রের সঙ্গে অংশের বা সূত্রের সঙ্গে বস্ত্রের সম্বন্ধ পারস্পরিক নির্ভরতার সম্বন্ধ নয়—সমগ্র অংশের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু অংশ সব সময় সমগ্রের ওপর নির্ভর করে না। গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না, কিন্তু দ্রব্য গুণ ছাড়া থাকতে পারে। জাতি ছাড়া ব্যক্তি থাকতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তি ছাড়া জাতি থাকতে পারে। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধকে নিত্য সম্বন্ধ এবং অনিবার্য সম্বন্ধ বলা যেতে

সমবায় সম্বন্ধকে আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা চলে না

পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা যেতে পারে না। দার্শনিক হিরিয়ানা সমবায় সম্বন্ধকে বাহ্য-সম্বন্ধরূপেই গণ্য করার পক্ষপাতী। দার্শনিক শঙ্কর বৈশেষিকদের সমবায় পদার্থের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর মতে সমবায় তাদাত্ম্যের সঙ্গে অভিন্ন।

১৫। অভাব (Non-existence) :

ইতিপূর্বে আমরা যে ছয়টি পদার্থের আলোচনা করেছি সেগুলি হল ভাবপদার্থ (Positive categories)। অভাব হল নঞর্থক পদার্থ (Negative categories)। 'অভাব' মানে যার অস্তিত্ব নেই। অভাব পদার্থকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। পুষ্পহীন বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে বৃক্ষে পত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিত হই, পুষ্পের অভাব সম্পর্কেও তেমনি নিশ্চিত হই। এই কারণে বৈশেষিকরা অভাবকে সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার করেন। মহর্ষি কণাদ অবশ্য তাঁর বৈশেষিক সূত্রে অভাবকে পদার্থ-রূপে উল্লেখ করেননি। কিন্তু বৈশেষিক সূত্রে অভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকার জন্য পরবর্তী বৈশেষিকগণ, বিশেষ করে ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ অভাবকে সপ্তম পদার্থরূপে উল্লেখ করেছেন।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ : অভাব দু'প্রকারের—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব বলতে কোন কিছুতে অন্য কোন কিছুর অভাব বোঝায়। অন্যোন্যাভাব বলতে বোঝায় যে, একটি বস্তু আর একটি বস্তু নয়। যে সাধারণ বচনের মাধ্যমে সংসর্গাভাবকে ব্যক্ত করা যেতে পারে তাহল, 'ক খ-এর মধ্যে নেই।' অন্যোন্যাভাবকে ঐভাবে ব্যক্ত করতে হলে বলতে হবে 'ক-খ নয়'।

সংসর্গাভাব তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাব : উৎপন্ন হবার পূর্বে বস্তুর যে অভাব থাকে এবং উৎপন্ন হলে যা থাকে না তাকে প্রাগভাব বলে। প্রাগভাবের উৎপত্তি নেই, ধ্বংস আছে। যখন বলা হয়, 'এই মৃত্তিকার দ্বারা ঘটটি তৈরি হবে', তখন মৃত্তিকাতে ঘটের অভাব রয়েছে বুঝতে হবে। ঘট তৈরি হবার পূর্ব পর্যন্ত মৃত্তিকাতে ঘটের অভাবকে বলা হবে প্রাগভাব। এর অর্থ হল মৃত্তিকা এবং যে ঘটটি ঐ মৃত্তিকার দ্বারা এখনও তৈরি হয়নি, এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের অভাব। ঘটটি তৈরি করার পূর্ব পর্যন্ত, ঘটের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই তৈরি হবার পূর্বে এর অভাবের কোন আদি বা শুরু নেই। কিন্তু যখনই ঘটটি তৈরি হল তখন এর প্রাগভাব লোপ পেল, অর্থাৎ এর প্রাগভাবের অন্ত হল। সে কারণে বলা হয় প্রাগভাব অনাদি কিন্তু সান্ত। অর্থাৎ প্রাগভাবের আদি বা শুরু নেই, কিন্তু এর অন্ত বা শেষ আছে। প্রাগভাব ছাড়া মূর্ত ধ্বংসশীল বস্তুর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব

প্রাগভাব

নয়। কোন বস্তু উৎপন্ন হয়েছে বললে বুঝতে হবে বস্তুটি উৎপন্ন হবার পূর্বে বস্তুটির প্রাগভাব ছিল।

ধ্বংসাভাব ঃ কোন বস্তু উৎপন্ন হবার পর ধ্বংস বা বিনষ্ট হলে বস্তুটির যে অভাব তাকে ধ্বংসাভাব বলে। কুম্ভকারের দ্বারা উৎপন্ন ঘট ভেঙে গেলে ঘটের ধ্বংসাভাব হল, কারণ ঘটের ভাঙা টুকরাগুলিতে আর ঘটের অস্তিত্ব নেই। পূর্ব থেকে যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, ধ্বংস হওয়ার জন্য সে বস্তুর অস্তিত্বের অভাবই হল ধ্বংসাভাব।

ধ্বংসাভাব

ধ্বংসভাবের উৎপত্তি আছে, কিন্তু বিনাশ নেই। অর্থাৎ এর আদি আছে, অন্ত নেই। কারণ যে ঘট ধ্বংস হয়ে গেছে তার ধ্বংসাভাব চিরকাল চলতে থাকবে, কারণ নতুন একটি ঘট তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু যে ঘটটি ধ্বংস হয়ে গেছে ঠিক সেই ঘটটিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

ধ্বংসাভাব স্বীকার না করলে বস্তুর বিনাশকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ভাব পদার্থের ক্ষেত্রে নিয়ম হল যার উৎপত্তি আছে, তারই বিনাশ আছে, কিন্তু অভাব পদার্থের ক্ষেত্রে নিয়ম হল যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ নেই। ধ্বংসের দ্বারা যে ঘটের অভাব উৎপন্ন হল, সেই অভাবকে তো কোন মতেই ধ্বংস করা যায় না; কেননা, তাহলে সেই একই ভাঙা ঘটকে আবার অস্তিত্বশীল করে তুলতে হয়, যা সম্ভব নয়।

অত্যন্তাভাব ঃ যখন দুটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের অভাব সকল সময়েই বর্তমান থাকে, তখন এই সম্বন্ধের অভাবকেই অত্যন্তাভাব বলে। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—

অত্যান্তভাব

এই তিন কালেই দুটি বস্তুর সম্বন্ধের অভাবই অত্যন্তাভাব। বায়ুতে রূপের অভাব, ঘটে চেতনার অভাব হল অত্যন্তাভাব। যেহেতু এই অভাব ত্রৈকালিক, সেহেতু এই অভাবের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। সুতরাং অত্যন্তাভাব হল অনাদি এবং অনন্ত। অত্যন্তাভাব স্বীকার না করলে যে কোন বস্তু যে কোন স্থানে সব সময় বিরাজ করত।

অন্যোন্যাভাব ঃ দুটি বস্তুর সম্বন্ধের অভাব হল সংসর্গাভাব, দুটি বস্তুর পারস্পারিক

দুটি বস্তুর পারস্পরিক ভেদ হল অন্যোন্যাভাব

ভেদ হল অন্যোন্যাভাব। যেমন—ঘট বস্ত্র নয়। ঘটের সঙ্গে বস্ত্রের ভেদকেই অন্যোন্যাভাব বলা হয়। ঘট বস্ত্র থেকে পৃথক, সুতরাং ঘটে বস্ত্রের অভাব, বস্ত্রে ঘটের অভাব। যেহেতু একটি বস্তু আর একটি বস্তু থেকে পৃথক, একটির রূপ আর একটিতে থাকতে পারে না।

সংসর্গাভাব হল সংযোগের অভাব বা সম্বন্ধের অভাব। অন্যোন্যাভাব হল দুটি বস্তুর পারস্পরিক অভাব, অথবা দুটি বস্তুর তাদাত্ম্যের (identity) অভাব।

১৬। জগতের সৃষ্টি এবং লয় (The Creation and Destruction of the world) :

বৈশেষিকরা পরমাণুবাদের সাহায্যেই এই জড়জগতের সৃষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন ; পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু হল মূল উপাদান। যা স্থূল তা মূল উপাদান হতে পারে না। এই জড়জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ ক্ষিতি, জল, বায়ু এবং তেজের পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন এবং পরমাণুগুলি বিযুক্ত হলেই তাদের বিনাশ হয়। প্রশ্ন হল—কে পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করে? চেতনাহীন পরমাণু-গুলি আপনা আপনিই সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয়—এ ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নয়। নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমান কর্তা পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত এবং বিযুক্ত করেন। বৈশেষিকদের মতে এই বুদ্ধিমান কর্তা হলেন ঈশ্বর। বৈশেষিকরা পরমাণুগুলির সংযোজন এবং বিয়োজনের মূলে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে, বৈশেষিকরা পরমাণুবাদের সমর্থক হলেও ভারতীয় দার্শনিকদের জগতের প্রতি যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিতে এই জড়জগৎ জীবাত্মার মোক্ষলাভের জন্য এক উপযুক্ত নৈতিক ক্ষেত্র। বস্তুতঃ, এই জড়জগৎ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এক সর্বজ্ঞ, অনন্ত, শাশ্বত পরমপুরুষ, জীবের কর্মফল থেকে উদ্ভূত অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টশক্তি অনুযায়ী এই জগৎ নিয়ন্ত্রিত করেন।

পরমাণুর সংযোগ এবং বিযুক্তিতে যৌগিক বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ

কোন বুদ্ধিমান কর্তা পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন

ন্যায় বৈশেষিকদের জগতের উৎপত্তি এবং ধ্বংস-সম্পর্কীয় মতবাদ কেবলমাত্র অনিত্য যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৈশেষিকদের মতে আকাশ, দেশ, কাল, মন ও আত্মা নিত্য দ্রব্য এবং পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণুও নিত্য। এগুলির উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। কাজেই বৈশেষিকরা যে পরমাণুবাদের সাহায্যে এই জড়জগতের সৃষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন, সেটি পূর্বোক্ত নিত্য পদার্থগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বৈশেষিকদের মতে অন্যান্য অনিত্য যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রেই কেবল-মাত্র বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ প্রযোজ্য।

নিত্য পদার্থের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই

সান্ত অবয়ববিশিষ্ট জড়দ্রব্যগুলিই পরমাণুর সংযোগে গঠিত। এগুলির উৎপত্তি নিম্নলিখিতভাবে ঘটে থাকে। সৃষ্টির প্রথম স্তরে আমরা পাই দ্ব্যণুক। দুটি পরমাণু মিলিত হলে দ্ব্যণুক (dyad) হয়। এর পরের স্তরে আমরা পাই ত্র্যণুক (triad)।

তিনটি দ্ব্যণুকের মিলনে ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়। ত্র্যণুককে 'ত্রসরেণু'ও বলা হয়। 'ত্রস' কথাটির অর্থ গতিশীল, সুতরাং ত্রসরেণু হল গতিশীল অণু। পরমাণু ও দ্ব্যণুক প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যে জানা যায়। ত্র্যণুক বা ত্রসরেণুই দৃশ্য বা প্রত্যক্ষের বিষয়। ত্রসরেণুই স্থূলের আদি অবস্থা।

সৃষ্টির প্রথম স্তরে দ্ব্যণুক, তারপর ত্র্যণুক

দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক বা এদের সংমিশ্রণেই এই জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি। প্রশ্ন হল—এই পরমাণুগুলিকে কে গতিশীল করে তোলে? দ্বিতীয়তঃ, এই জগতে আমরা যে শৃঙ্খলা, বিন্যাস এবং সূক্ষ্ম কলাকৌশল লক্ষ্য করি তাকেই বা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? অর্থাৎ পরমাণুগুলিকে কে সুবিন্যস্ত করে? বৈশেষিকদের মতে এই জড়জগতের একদিকে দেখি যাবতীয় জড়বস্তু; অন্যদিকে দেখি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মাযুক্ত চেতনশীল জীব। আকাশ, কাল ও দিকে এদের অবস্থান এবং সেখানেই এদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঘটে। জীবাত্মা কর্মফলানুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করে। জগৎ নৈতিক কর্মবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং কর্মবাদই জীবকে নিয়ন্ত্রিত করে।

জগৎ নৈতিক কর্মবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

জগতের নৈতিক শৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতেই বৈশেষিক সম্প্রদায় জগতের সৃষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন। পরমপুরুষ সর্বজ্ঞ মহেশ্বরের ইচ্ছায় এই সৃষ্টিকার্য শুরু হয়। মহেশ্বর এক জগৎ সৃষ্টির কল্পনা করেন—যে জগতে জীব তাদের কর্মফলানুযায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ করবে। অবশ্য জগতের এই সৃষ্টি ও ধ্বংস হল অনাদি, এদের আরম্ভও নেই, শেষও নেই। কাজেই প্রথম জগৎ সৃষ্টির কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ, সৃষ্টির পর ধ্বংস এবং ধ্বংসের পর সৃষ্টি পর্যায়ক্রমে চলেছে। জীবের শুভ ও অশুভ কর্মানুষ্ঠানের ফলে পাপ ও পুণ্যের উদ্ভব। এই পাপ ও পুণ্যের সঞ্চয়ই হল অদৃষ্ট। যখন ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেন তখন নিত্য জীবাত্মার মধ্যে এই নৈতিক কর্মফলের অপ্রত্যক্ষ শক্তিগুলি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কার্য করতে থাকে।

মহেশ্বরের ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টিকার্য শুরু

জীবাত্মার সঙ্গে অদৃষ্টের বা নৈতিক গুণাগুণের সংযোগের ফলেই বায়ুর পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে। বায়ুর পরমাণুগুলি যখন সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুক গঠন করে, তখন এই দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুকের সংযোগেই বায়ুরূপ মহাভূতের উৎপত্তি হয়। এই মহাভূত আকাশে অবস্থিত থাকে এবং সর্বক্ষণ অনুকম্পিত বা আন্দোলিত হতে থাকে। অনুরূপভাবে জল, ক্ষিতি এবং তেজের পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে যথাক্রমে জল, ক্ষিতি এবং তেজঃ—এই তিন মহাভূত উৎপন্ন হয়। এর পর কেবলমাত্র ঈশ্বরের

প্রথমে বায়ুর পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে

অভিধ্যানের (Thought) ফলেই তেজঃ এবং ক্ষিতির পরমাণু থেকে একটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ঘটে। মহেশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মা বা জগৎ-আত্মার দ্বারা প্রাণময় করে তোলেন। ব্রহ্মা হলেন—জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত। মহেশ্বর এই ব্রহ্মার ওপরই জগতের সবিস্তার সৃষ্টি-কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ব্রহ্মার কাজ পাপ ও পুণ্য, সুখ ও দুঃখের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই জগতের যাবতীয় সব কিছুকে সৃষ্টি করা।

তারপর জল, ক্ষিতি ও তেজের পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে

সৃষ্ট জগৎ বেশ কিছুদিন চলতে থাকে। তারপর সকল জীবকে দুঃখ ও ক্লেশভোগ থেকে মুক্ত করার জন্য মহেশ্বর এই জগৎ ধ্বংস করার সংকল্প করেন। মহেশ্বরের জগৎ ধ্বংস করার ইচ্ছা থেকেই জগতের ধ্বংস শুরু হয়ে যায়। অন্যান্য আত্মার মতো ব্রহ্মা যখন তাঁর শরীর পরিত্যাগ করেন, তখনই মহেশ্বরের মধ্যে জগৎ ধ্বংস করার ইচ্ছার আবির্ভাব হয়। এর ফলে জীবাত্মার সৃষ্টিমূলক অদৃষ্ট তার ধ্বংসমূলক অদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং জীবের কর্মময় জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যেসব জীবাত্মার মধ্যে এই ধ্বংসমূলক অদৃষ্ট কাজ করতে থাকে, সেই জীবাত্মার দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে। দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হলে কেবলমাত্র পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়ে থাকে। এইভাবে ক্ষিতি, জল, তেজঃ এবং বায়ু প্রভৃতির পরমাণু-গুলি পর্যায়ক্রমে গতিশীল হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ফলে মহাভূতগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। চারটি মহাভূত, সমস্ত দেহ এবং ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে গেলে কেবলমাত্র ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক, মন ও আত্মা—এই নিত্য দ্রব্যগুলি এবং পাপ, পুণ্য ও অতীত সংস্কার বা ভাবনাগুলি কেবলমাত্র থেকে যায়।

ঈশ্বরের জগৎ ধ্বংস করার ইচ্ছা থেকেই জগতের ধ্বংস শুরু হয়

চারটি মহাভূত, দেহ ও ইন্দ্রিয় সব বিনষ্ট হয়ে যায়

লক্ষ্য করার বিষয় যে, সৃষ্টির বেলায় প্রথমে বায়ুর পরমাণুর দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থের আবির্ভাব, তারপর ক্রমশঃ জল, ক্ষিতি ও তেজের পরমাণুর দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থগুলির আবির্ভাব হয়, কিন্তু ধ্বংসের বেলায় প্রথমে ক্ষিতিজ যৌগিক পদার্থ, তারপর জল, তেজঃ এবং বায়ুর দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থগুলি ধ্বংস হতে থাকে।

১৭। ঈশ্বর বা পরমাত্মাঃ

কণাদ তার বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ করেননি। বৈশেষিক সূত্রে যেখানে তিনি বেদের প্রামাণ্যের উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন,

তাঁর বা তাঁদের বচনের জন্যই বেদ প্রামাণ্য।[1] কিন্তু তাঁর বা তাঁদের বলতে কণাদ হয়ত মুনি-ঋষিদের কথাই বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী ভাষ্যকার শঙ্করমিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিরা বেদকে ঈশ্বরের রচনা বলেই উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর ভ্রান্তি, অসাবধানতা এবং অপরকে প্রতারণা করার ইচ্ছা থেকে মুক্ত। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, অনন্ত, শাশ্বত পুরুষ। বেদ তাঁরই রচনা। প্রশস্তপাদ তাঁর পদার্থসংগ্রহের প্রথম এবং শেষ সূত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন। মহেশ্বর কিভাবে জগৎ সৃষ্টি এবং ধ্বংস করেন তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিয়েছেন। শ্রীধর এবং উদয়ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক যুক্তি উপস্থিত করেছেন। কণাদের মতে অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টই পরমাণুর এবং আত্মার গতিশীলতা, জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং জীবাত্মার সুখ ও দুঃখ ভোগ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। দার্শনিক শঙ্কর বৈশেষিক মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে উল্লেখ করেননি। তিনিও জগতের সৃষ্টি-প্রসঙ্গে পরমাণুকে গতিশীল করার জন্য অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, অদৃষ্ট চেতনা ও বুদ্ধিশূন্য। কোন বুদ্ধিমান কর্তা যদি অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত না করে তাহলে অদৃষ্টের ক্রিয়াকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

ঈশ্বরের স্পষ্ট উল্লেখ নেই

শঙ্করমিশ্র, প্রশস্তপাদ প্রভৃতি ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন

কণাদের মতে অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্ট জীবাত্মার সুখ-দুঃখভোগ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ

পরবর্তী যেসব দার্শনিক ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের রচনায় ঈশ্বর সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন। এই সব লেখক জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রভেদের উল্লেখ করেছেন। জীবাত্মা বহু, কিন্তু পরমাত্মা এক; ঈশ্বর বিভু বা সর্বব্যাপী, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। যেহেতু ঈশ্বরের কোন মিথ্যাজ্ঞান নেই, সেহেতু ঈশ্বরের কোন রাগ বা দ্বেষ নেই। যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, সেহেতু ঈশ্বরের কোন সংস্কার নেই।

জীবাত্মা বহু, পরমাত্মা এক

ঈশ্বর হলেন জগতের নিমিত্ত কারণ, পরমাণু হল জগতের উপাদান কারণ। বৈশেষিকরা দ্বৈতবাদী, তাঁরা ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়েরই সহ-অবস্থানের কথা স্বীকার করেন।

উপসংহার: ন্যায়-দর্শনের মত বৈশেষিক দর্শনও বস্তুবাদী দর্শন। বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরবাদ এবং বস্তুবাদের সমন্বয় দেখা যায়। বৈশেষিকদের মতে জড়-পরমাণুর সংযোগেই এই জগতের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি। কিন্তু ঈশ্বরই জীবাত্মার অদৃষ্ট

1. "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"।—বৈশেষিক সূত্র

অনুযায়ী এই জগৎ সৃষ্টি করেন ও ধ্বংস করেন। কিন্তু বৈশেষিকদের জীবাত্মা সম্পর্কে ধারণা এবং অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অসংগতিপূর্ণ। কারণ নৈয়ায়িকদের মত বৈশেষিকরাও মনে করেন যে, আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন পদার্থ এবং চেতন আত্মার একটি আগন্তুক ধর্ম। মোক্ষ অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। কিন্তু আত্মাকে যদি চৈতন্যময় ও বুদ্ধিময় সত্তারূপে কল্পনা করা না যায় তাহলে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।

বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরবাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়

বৈশেষিকদের অতিবর্তী ঈশ্বরবাদও (Deism) সন্তোষজনক নয়। ঈশ্বরকে যদি জীবাত্মা ও জগতের সম্পূর্ণ অতিবর্তী বলে মনে করা যায় তাহলে জীবাত্মা এবং জগতের অস্তিত্ব ঈশ্বরকে সীমিত করবে। দ্বিতীয়তঃ, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ জীবের ধর্মচেতনার পক্ষে অনুকূল ধারণা নয়। ধর্ম-চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে জীব ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে লীন করে দিতে চায়, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়, কিন্তু বৈশেষিক মতবাদে তার কোন সুযোগ নেই।

বৈশেষিকদের অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ সন্তোষজনক নয়

পদার্থের শ্রেণীবিভাগ, পরমাণুবাদ এবং সৃষ্টিতত্ত্ব বৈশেষিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য। বৈশেষিক দর্শন ভাবপদার্থ এবং অভাবপদার্থ—এই উভয়বিধ পদার্থ স্বীকার করে। ভাবপদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থের ; যেমন—দ্রব্য, গুণ এবং কর্মের দেশ ও কালে অবস্থান আছে। কিন্তু সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ের কোন দৈশিক বা কালিক অবস্থান নেই। পদার্থের বিভাগের পরিকল্পনায় বৈশেষিক সম্প্রদায় সাধারণ মতবাদকেই অনুসরণ করেছেন। পদার্থের এই বিভাগ ঠিক দার্শনিক বিভাগ হয়নি। আত্মা এবং অনাত্মার বিভাগ যেমন সাংখ্য দর্শনে করা হয়েছে, বা চৈতন্য ও জড়ের (পুরুষ ও প্রকৃতি) বিভাগ যেমন সাংখ্য দর্শনে করা হয়েছে, দার্শনিক বিভাগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে বিভাগগুলি অধিকতর মৌলিক বিভাগ (fundamental distinction)।

পদার্থের বিভাগ ঠিক দার্শনিক বিভাগ নয়

বৈশেষিকরা দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সমবায় সম্বন্ধের কথা বলেছেন। কিন্তু বৈশেষিক মতে গুণ-ভিন্ন দ্রব্যের সতন্ত্র সত্তা আছে। তাহলে দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সমবায় সম্বন্ধ কিভাবে হতে পারে ? যে দুটি বস্তুর মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকবে সে দুটি বস্তু পরস্পর নির্ভরশীল হবে, কিন্তু দ্রব্য ও গুণ পরস্পর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সমবায় সম্বন্ধ আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ না হয়ে বাহ্য সম্বন্ধে পরিণত হয়েছে।

বৈশেষিকদের বিশেষ পদার্থ সম্পর্কে ধারণাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিশেষের স্বরূপ বৈশেষিক দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি। তাছাড়া, একটি জীবাত্মার সঙ্গে আর একটি জীবাত্মার পার্থক্য, বৈশেষিক দর্শনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। জীবাত্মা নিজের বিশেষত্ব কখনও হারায় না। এমন কি মোক্ষ অবস্থায়ও প্রতিটি জীবাত্মা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

বিশেষের স্বরূপ বৈশেষিক দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি

বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মতবাদের তুলনায় উন্নততর মতবাদ। সাধারণ মতবাদ অনুযায়ী এ জগৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু—এই চার ভূত বা উপাদানের সংযোগে গঠিত। কিন্তু বৈশেষিকদের মতে এই চারটি ভূতের পরমাণুর সংযোগেই এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। তাছাড়া জড়বাদীদের মতানুসারে জড়বস্তু, মন, চেতনা—সবই জড় পরমাণুর দ্বারা গঠিত, কিন্তু বৈশেষিক সম্প্রদায় মনে করেন মন, চেতনা প্রভৃতি জড়বস্তু থেকে উৎপন্ন নয়। বৈশেষিক দর্শন পরমাণুবাদের সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির সমন্বয় সাধন করেছে। ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টিকর্তা এবং নৈতিক নিয়ন্ত্রণকর্তা। কিন্তু ঈশ্বরের পাশাপাশি পরমাণু, মন ও আত্মার নিত্যতা স্বীকার করার জন্য ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সীমায়িত হয়ে পড়েছে। কোন বিশ্বচেতনা বা পরমব্রহ্ম থেকেই সকল কিছুর উদ্ভব বা উৎপত্তি—এমন কোন নীতি না থাকার জন্য বৈশেষিকদের ঈশ্বরতত্ত্ব ও জগৎ-সৃষ্টিতত্ত্ব বেদান্ত দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি।

জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মতবাদের তুলনায় বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ উন্নততর

বৈশেষিক ঈশ্বরতত্ত্ব ও জগৎ-সৃষ্টিতত্ত্ব বেদান্ত দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি

———

সপ্তম অধ্যায়

বেদান্ত দর্শন

(The Vedanta Philosophy)

১। ভূমিকা (Introduction):

(i) বেদান্তের উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতি: বেদান্ত কাকে বলে? বেদান্ত শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'বেদের অন্ত বা শেষ'। উপনিষদই বেদান্ত। 'বেদান্তো নাম উপনিষৎ'। উপনিষদই মুখ্যতঃ বেদান্ত। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র, যা বেদান্ত দর্শন নামে অভিহিত, উপনিষদের অর্থবোধের সহায়ক হেতু গৌণভাবে বেদান্ত। উপনিষদকে বেদান্ত বলার কারণ কী? বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করেই উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, উপনিষদ বেদের সর্বশেষ অংশ। বেদের চারটি অংশের মধ্যে প্রথমে সংহিতা, তারপর ব্রাহ্মণ, তারপর আরণ্যক এবং সর্বশেষে উপনিষদ। সংহিতা অংশে বেদের মন্ত্রগুলি সংকলিত হয়েছে। সংহিতা চারটি—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। ব্রাহ্মণ অংশে আছে সংহিতোক্ত যাগযজ্ঞের বিবরণ ও ব্যাখ্যা, আরণ্যকে 'যজ্ঞ সম্পর্কে রূপক কল্পনা ও প্রতীক উপাসনার আদেশ' এবং উপনিষদে দার্শনিক আলোচনা বা ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্র পাঠক্রম অনুসারেও প্রথমে বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা, তারপর ব্রাহ্মণ, তারপর আরণ্যক এবং সর্বশেষে উপনিষদের স্থান। প্রাচীন হিন্দু সমাজ কর্তৃক প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্মে মানুষের জীবন চারটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। প্রথমতঃ, ব্রহ্মচর্য বা ছাত্র জীবন, তারপর গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবন, তারপর বানপ্রস্থ বা কর্ম হতে অবসরপ্রাপ্তি এবং সর্বশেষে সন্ন্যাস বা ভোগ বিরতির জীবন। ব্রহ্মচর্য অবস্থায় বেদের মন্ত্রভাগ বা সংহিতা পাঠের নির্দেশ ছিল। গার্হস্থ্য জীবনে ব্রাহ্মণ পাঠ এবং ব্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করতে হত। বানপ্রস্থ কালে আরণ্যকই হল পঠনীয় শাস্ত্র এবং সর্বশেষ আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমে উপনিষদ পাঠের নির্দেশ ছিল। সুতরাং পাঠক্রম অনুসারে উপনিষদেরই সর্বশেষ স্থান। তৃতীয়তঃ, উপনিষদকে বেদান্ত বলার কারণ, বৈদিক চিন্তাধারার সর্বোচ্চ ও পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে উপনিষদে।

উপনিষদই বেদান্ত

বিভিন্ন অর্থে বেদান্তকে বেদের অন্ত বলা হয়

উপ-নি-সদ্ ধাতু ক্বিপ প্রত্যয় করে উপনিষৎ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'উপ' এই উপসর্গটির দ্বারা সমীপবর্তিতা বোঝায়। সদ্ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি বা বিনাশ। সুতরাং

গুরুর সমীপে উপাসনা বা উপবিষ্ট হয়ে শিষ্য যে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করত, তাই উপনিষদ। উপনিষদের গূঢ় রহস্য সকলের কাছে উদ্ঘাটিত করা হত না। শুশ্রূষু হয়ে গুরুর সন্নিকট হলেই শিষ্যকে এই জ্ঞান দেওয়া হত। আবার 'যা মানুষকে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের সমীপবর্তী করে' তাকেও উপনিষদ বলা হয়। এটি উপনিষদ শব্দের মুখ্যার্থ। যে গ্রন্থপাঠে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় তাকেও উপনিষদ বলা হয়; এটি উপনিষদ শব্দের গৌণার্থ। উপনিষদ পাঠে মোহের নাশ ঘটে। বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপনিষদেই প্রকাশিত। সে কারণে উপনিষদকে বেদোপনিষদ্ নামে অভিহিত করা হয়।

গুরুর সমীপবর্তী হয়ে শিষ্য এই উপনিষদ পাঠ করত

উপনিষদ সংখ্যায় অনেক। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের নাম উল্লেখ আছে। বর্তমানে ১১২ খানি উপনিষদের নাম জানা গেছে। এই সব উপনিষদে যে সব দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য লক্ষ্য করা গেলেও অনেক বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। উপনিষদ উদ্ভূত এই সব মতভেদগুলির মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন মতবাদগুলিকে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিচার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেছিলেন। ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়, সে কারণে বেদান্ত দর্শনকে ব্রহ্মসূত্র নামেও অভিহিত করা হয়।

উপনিষদের বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য করার জন্য বাদরয়াণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন

ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত সূত্র, শারীরিক সূত্র, শারীরিক মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা নামেও পরিচিত। বেদের কর্মকাণ্ডের ওপর পূর্ব মীমাংসা দর্শন ও জ্ঞানকাণ্ডের ওপর উত্তর-মীমাংসা দর্শন বা বেদান্ত দর্শন প্রতিষ্ঠিত। কারও কারও মতে ব্রহ্মসূত্র প্রণেতা বাদরায়ণ এবং মহাভারত, পুরাণ ও ভাগবত রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, বেদব্যাস একই ব্যক্তি। কিন্তু কেউ কেউ এই অভিমতে সন্দেহ পোষণ করেন। মহাভারত অন্তর্গত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় "ব্রহ্ম সূত্র পদৈঃ" বলে যে শ্লোকের উল্লেখ আছে তা বেদান্তকেই বোঝাচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। মহাভারতের রচনাকাল যদি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর বলে ধারণা করা যায় তাহলে ব্রহ্মসূত্রও ঐ সময়ে বিরচিত এরূপ মনে করা যেতে পারে। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন, বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র মহাভারতের পূর্বে রচিত হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রে মোট ৫৫৫টি সূত্র আছে। ব্রহ্মসূত্রের চারটি অধ্যায়—সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল। প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতিবাক্যগুলির ব্রহ্মে সমন্বয় দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরোধী মতগুলি খণ্ডন করে যুক্তি ও শাস্ত্রের সঙ্গে বেদান্ত মতের অবিরোধ স্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে

ব্রহ্মসূত্রের রচনাকাল

সগুণ জীব ও নির্গুণ ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এবং ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায় বা সাধন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার ফলেই তারতম্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রতিটি অধ্যায়ে চারটি করে পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে, অর্থাৎ মোট ষোলটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রত্যেক পাদে কতকগুলি অধিকরণ আছে। কতকগুলি সূত্র মিলে এক একটি অধিকরণ। বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি পৃথক পৃথক এক একটি অধিকরণে আলোচিত ও মীমাংসিত হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্র চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত

ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত, সে কারণে তার অর্থবোধ সহজসাধ্য নয়। এই কারণে ব্রহ্মসূত্রের ওপর বিভিন্ন ভাষ্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সব ভাষ্যকারদের মধ্যে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শঙ্করাচার্যের 'শারীরিক ভাষ্য,' রামানুজের 'শ্রীভাষ্য', মধ্বাচার্যের 'পূর্ণ প্রজ্ঞাভাষ্য' এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য' যথাক্রমে অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদের নিকট প্রিয় গ্রন্থ, তবে শঙ্কর ও রামানুজের মতবাদই সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেরও আবার ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি রচিত হয়েছে। আনন্দগিরির শারীরিক ভাষ্যের টীকা, বাচস্পতি মিশ্রের 'ভামতী' নামে শঙ্কর ভাষ্যের টীকা, সুদর্শনের 'শ্রুতি প্রকাশিকা' নামে শ্রীভাষ্যের টীকা, বিজ্ঞানভিক্ষুর 'বেদান্ত ভাষ্য' প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা চলে। বেদান্ত দর্শনের ওপর অনেকে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। ফলে বিরাট বেদান্ত সাহিত্য গড়ে উঠেছে।

ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র হল 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' এবং দ্বিতীয় সূত্র হল 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ যার থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় তিনিই ব্রহ্ম। এ থেকে বোঝা যায় ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। জীবাত্মা ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন তা প্রমাণ করাই বেদান্ত দর্শনের লক্ষ্য। বেদান্ত মতে 'সর্বখল্বিদং ব্রহ্ম'—সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বৈদান্তিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদের প্রচারক। তাঁর মতে জীব ও ব্রহ্ম দুটি ভিন্ন তত্ত্ব। শঙ্করাচার্য ও রামানুজ উভয়ে বাদরায়ণকে অনুসরণ করে অদ্বৈতবাদের প্রচার করেছেন। অদ্বৈতবাদ এক ছাড়া দুই-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অভেদই সত্য, ভেদ মিথ্যা। শঙ্করাচার্য ও রামানুজ উভয়েই অদ্বৈতবাদ

ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়

ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মত

প্রচার করলেও শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ কেবলাদ্বৈতবাদ এবং রামানুজের অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। তবে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি ছাড়াও বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তিতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

উপনিষদকেই সাধারণতঃ বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি বলে মনে করা হয়। কিন্তু উপনিষদই একমাত্র ভিত্তি নয়। উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র ও তার ভাষ্য বিবৃতি এই তিনটিই বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। এদের একত্রে 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়।

প্রস্থানত্রয়

'প্রস্থান' শব্দের অর্থ 'আকর গ্রন্থ'। যে সব গ্রন্থে বেদান্ত দর্শনের আলোচ্য বিষয় প্রকৃষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে, সেগুলিকেই 'প্রস্থান' বলে। উপনিষদকে বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান বলা হয়, কারণ উপনিষদ বাক্য থেকেই বেদান্তের অর্থ শ্রুত হয়ে থাকে। উপনিষদের শ্রুত অর্থ ব্রহ্মসূত্র ও তার ভাষ্য টীকা প্রভৃতিকে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিচার করা হয় বলে ব্রহ্মসূত্রকে বেদান্তের তর্কপ্রস্থান বলে। যুক্তিতর্কের সাহায্যে যে অর্থ বিচার করা হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে তা বার বার স্মৃতিতে জাগরিত হয়ে চিত্তে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান বলে। উপরিউক্ত প্রস্থানত্রয়ই বেদান্তের ভিত্তি।

আর একটি প্রশ্ন,—সকলেই কি বেদান্ত বিদ্যালাভের অধিকারী? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সকলেই বেদান্তবিদ্যালাভের অধিকারী নয়। শঙ্করাচার্যের মতে সাধন

সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তিই বেদান্তবিদ্যা লাভের অধিকারী

চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই বেদান্ত বিদ্যালাভের অধিকারী।[1] এই চতুর্বিধ সাধন হল—(১) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ অর্থাৎ কোন বস্তু অনিত্য ও অসার ও কোন বস্তু নিত্য ও সার তার জ্ঞান। ব্রহ্মই নিত্য, ব্রহ্ম ভিন্ন যাবতীয় পদার্থই অনিত্য বা অবিনশ্বর, এই জ্ঞানের নামই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ। (২) ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকে কর্মফল লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষার অভাব। (৩) শমদমাদি-সাধনসম্পৎ অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা অবলম্বনে চিত্তের শুচিতা সাধন। শম এবং দম হল যথাক্রমে অন্তরীন্দ্রিয়ের এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম, উপরতি হল বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। তিতিক্ষা অর্থে সহিষ্ণুতা, সমাধান অর্থে চিত্তের একাগ্রতা এবং শ্রদ্ধা অর্থে গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস। (৪) মুমুক্ষুত্বঞ্চ বা

1. "সাধনানি-নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেহামুত্রফলভোগবিরাগশমদমাদি সম্পত্তিমুমুক্ষুত্বানি।" ১৫ ॥

—সদানন্দ যোগী, বেদান্তসার।

মোক্ষলাভের ইচ্ছা। উপরিউক্ত গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রমাতা এবং তিনিই বেদান্ত-বিদ্যালাভের যথার্থ অধিকারী।[1]

(ii) [2]**বেদ ও উপনিষদে বেদান্তের ক্রমবিকাশ :** উপনিষদে যে বৈদান্তিক চিন্তাধারার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, ঋগ্‌বেদ সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তার বীজ নিহিত আছে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে একাধিক দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রধান। মন্ত্রে দেবতাদের স্বরূপ, স্বভাব ও কার্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত এই সব দেবতাদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে জড় প্রকৃতির বিভিন্ন জড়বস্তু ; যেমন—ঝড়, ঝঞ্ঝা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্যা, দাবাগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা রূপে এক একটি দেবতার কল্পনা করা হয়েছে। মন্ত্রে এদের প্রশংসা করা হয়েছে যাতে এই সব দেবতাদের পরিতুষ্ট করে এঁদের অনুগ্রহ লাভ করা যায়। এই সব বর্ণনা দেখে অনেকে মনে করেছেন যে, বৈদিক ঋষিগণ জড় প্রকৃতির উপাসক। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়, কারণ বৈদিক ঋষিগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তরালে এক সর্বব্যাপী নিয়ম ও শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। একেই বেদে 'ঋত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ঋত একটি সর্বব্যাপী নৈতিক নিয়ম। এই ঋত কেবল বহির্জগতের নিয়ম নয়, অন্তর্জগতেরও নিয়ম। এই নিয়ম জীবজগৎকে চালিত করে এবং ধর্ম ও নীতির সংরক্ষণে সহায়তা করে। 'ঋত' শব্দ দ্বারা গ্রথিত একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, সব বস্তুই ঋত-এই অবিনাশী সত্তার বিকাশ। এই মন্ত্রটি 'হংসবতী ঋক্' নামে প্রসিদ্ধ।

ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে দেবতার স্তুতি

বেদে বহু দেবতার বর্ণনা লক্ষ্য করে অনেকে বেদকে বহু-ঈশ্বরবাদী (Polytheistic) বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এরূপ বর্ণনা যুক্তিযুক্ত নয়। অদ্বৈত-বাদের মূল ঋগ্‌বেদেই নিহিত। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতাকে একই সত্তার প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি মন্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—

অদ্বৈতবাদের মূল ঋগ্বেদে

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণ মগ্নি মাহু-
রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।

1. ঋগ্‌বেদ ১।২।৮, ৪।৪০।৫, ৪।২৩।৮-১০, ১০।৬৫।৭, ১০।১৭।২

2. উৎসাহী পাঠক শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী প্রণীত "অদ্বৈতবাদের মূল ঋগ্বেদে" (পৃঃ ১৮৯—২৩৯) এবং ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী প্রণীত বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ গ্রন্থের (প্রথম খণ্ড) 'অদ্বৈতবাদের মূল ঋগ্বেদে" অধ্যায়টি (পৃঃ ৫১—৭১) পাঠ করে দেখতে পারেন।

একং 'সৎ' বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমঃ মাতরিশ্বান মাহুঃ।"[1]

অর্থাৎ যাঁরা তত্ত্বদর্শী, তাঁরা একই সদ্বস্তুকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ অগ্নি ও সুন্দর পক্ষযুক্ত গরুত্মান নামে অভিহিত করেন। আবার সেই সদ্বস্তুকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা (বায়ু) নামেও অভিহিত করা হয়।

আর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে[2] "একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি" অর্থাৎ একই সদ্বস্তুকে তত্ত্বদর্শিগণ বহুনামে কল্পনা করে থাকেন। আর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—

[3]"যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ
সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি।"

অর্থাৎ ঋত্বিকগণ একই বস্তুকে বহু নামে কল্পনা করে নিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন। জগতের সব কিছুর মূলে এক চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব। এই হল অদ্বৈতবাদের মূল কথা। ঋগ্বেদে যে সব দেবতার কথা বলা হয়েছে; যেমন অগ্নি, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি সকলেই একই চৈতন্য সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

ঋগ্বেদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ অতি সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়েছে। সব দেবতাই যে এক অবিনাশী মহাশক্তির বিকাশ তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঋগ্বেদের একটি স্তোত্রে। [4]এই স্তোত্রে বলা হয়েছে, "হে বরুণ, সমুদ্র জলে বিরাট-বা বাগ্নিরূপে তোমার যে তেজ-শক্তি অবস্থান করছে, সেই তেজশক্তিই অন্তরীক্ষে সূর্যমণ্ডলের মধ্যে ক্রিয়া করছে। ঐ তেজই জীবের জঠরে জড়বাগ্নিরূপে, জীব হৃদয়ে আয়ুশক্তিরূপে বিদ্যমান; আবার ঐ তেজই বিদ্যুদগ্নিরূপে মেঘ মণ্ডলে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শোয্যাগ্নিরূপে বিরাজমান। একই শক্তি নানাভাবে আপন স্বরূপের মধুধারা বর্ষণ করছে। ঋগ্বেদের দেবতাগণ যে "একই সত্তার বিবিধ বিকাশ, বিবিধ রূপ, বিবিধ আকার,' একথা ঋগ্বেদের একাধিক মন্ত্রে ব্যক্ত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫ম সংখ্যক সূক্তে বলা হয়েছে যে, দেবতারা একই সত্তার, একই সামর্থ্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। "মহৎ দেবানা মধুরত্বমেকং।" ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মধ্যে মহৎ অসুরত্ব বা সামর্থ্য একই। দেবতাদের মূলে এক মৌলিক সামর্থ্য বর্তমান।

---

1 ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬ 2. ঋগ্বেদ, ১০।১১৪।৫ 3. ঋগ্বেদ, ৮।৫৮।১

4. ধামন্তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতম্
অন্তঃসমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি।
অপামনীকে সমিথে য আভৃত-
স্তমশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্মিম্।"—ঋগ্বেদ, ৪।৫৮।১১

ঋগ্বেদের দেবতাতত্ত্ব আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, যে মন্ত্রে যখনই যে দেবতার স্তব করা হয়েছে তখন তাকে পরম দেবতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই অপর দেবতা আশ্রিত। যেমন, অগ্নি দেবতাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, [1]"হে অগ্নি, অপর সব অমর দেবতাবর্গ তোমাতেই অবস্থিত।" [2]"হে অগ্নি! তোমার ঐশ্বর্যেই দেবতাদের ঐশ্বর্য। [3]মরুৎ নামক দেবতাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, মরুতের ক্রোড় আশ্রয় করেই দেবতারা নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে। [4]বরুণ দেবতার বর্ণনায় বলা হয়েছে, "রথচক্রের নাভিতে যেমন অর বা শলাকাগুলি গ্রথিত থাকে' বরুণদেবের মধ্যেও সেরূপ এই বিশ্ব গ্রথিত রয়েছে।" [5]সোম দেবতাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, "হে সোম! তেত্রিশ সংখ্যক দেবতা, সকলেই তোমাতে অবস্থিত।" যখন যে দেবতাকে স্তব করা হচ্ছে তখন তাকে পরম দেবতা বলে অভিহিত করা এই বিষয়টি লক্ষ্য করে ম্যাক্সমূলার (*Maxmuller*) বলেন যে, আসলে বেদের যে দেবতাতত্ত্ব তাকে বহু-ঈশ্বরবাদ (Polytheism) বলে আখ্যাত না করে, এক পরমসত্তায় বহু দেবতাষ মিলন (henotheism) বলে অভিহিত করাই শ্রেয়ঃ। ঋগ্বেদের বিভিন্ন দেবতা যে এক পরমসত্তার বিকাশ তা ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্র থেকে বেশ সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। ঋগ্বেদের দেবতাদের দুটি রূপের বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। অগ্নি, সোম, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক দেবতারই দুটি রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুটি রূপের মধ্যে একটি হল স্থূল দৃশ্যরূপ আর একটি সূক্ষ্ম গূঢ় রূপ। প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই যে এক কারণ সত্তা বা ব্রহ্ম সত্তা অনুস্যূত রয়েছে দেবতাদের সূক্ষ্ম বা গূঢ় রূপের বর্ণনাতেই তা পরিস্ফুট হয়েছে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, দেবতাদের মৌলিক একত্বের বিষয়টি ঋগ্বেদে **সুস্পষ্টভাবেই উল্লিখিত** হয়েছে। সকল দেবতার সত্তা এক পরম সত্তায় অধিষ্ঠিত, সেই পরম সত্তা ভিন্ন দেবতাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই—"যো দেবানা মধিদেব একঃ" (১০।২১।৭)।

মন্ত্রে যখন যে দেবতার স্তব করা হয়েছে তখন তাকে পরম দেবতা বলে অভিহিত করা হয়েছে

ম্যাক্সমূলারের মতে বেদের দেবতাতত্ত্ব বহু-ঈশ্বরবাদ নয়, এক পরম সত্তায় বহু দেবতার মিলন

ঋগ্বেদের দেবতার দুটি রূপ—স্থূলরূপ ও সূক্ষ্মরূপ

ঋগ্বেদে যেমন সব দেবতাকে এক মহান সত্তার প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি সমস্ত বিশ্ব জগৎ যে এক পরম সত্তায় বিধৃত সে কথাও বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের [6]পুরুষ সূক্তে এক পরমপুরুষের বর্ণনা পাওয়া যায় যিনি বিশ্বব্যাপী হয়েও বিশ্বাতিগ অর্থাৎ

---

1. (১।১৪১।৯) 2. (৫।৩।৪) 3. (৮.৯৪।২) 4. (৮।৪১।৬) 5. (৯।৯২।৪)
6. পুরুষসূক্ত, ১০।৯০।১-৪

বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন। চেতন অচেতন বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে সেই পরম পুরুষের অংশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বজগৎ এই পরমপুরুষে বিধৃত। বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এই পরমপুরুষের সহস্র নয়ন ও সহস্র চরণ। তিনি বিশ্বব্যাপী হয়েও বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন অর্থাৎ তিনি সমস্ত ভূমি আবরণ করেও দশ অঙ্গুলি অধিক হয়েছেন। নিখিল বিশ্ব তাঁর এক-চতুর্থাংশ মাত্র, তাঁর এক অংশে তিনি জীবজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, অপর তিন-চতুর্থাংশ অমৃতলোকে বিরাজমান। বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সব কিছুই সেই পুরুষের আত্মস্বরূপ। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তে বিশ্বের সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনায় এক নির্বিশেষ পরম সত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সত্তা সৎ নন, আবার অসৎ নন তিনি অনির্বচনীয়। তিনি সদাসত্তের অতীতাবস্থা।[1] নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'তৎকালে পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, স্বর্গও ছিল না, ভোক্তাও ছিল না, ভোগ্যও ছিল না, আবরণও ছিল না; তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্ব ছিল না, প্রাণীও ছিল না, দিনরাত্রি ছিল না, তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।"

সমস্ত বিশ্বজগৎ এক পরমসত্তায় বিধৃত

এক নির্বিশেষ পরম সত্তার উল্লেখ

যদিও বেদে উপনিষদের চিন্তাধারার বীজ নিহিত আছে তবু বেদে কোন সুবিন্যস্ত দার্শনিক চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায় না। উপনিষদেই দার্শনিক চিন্তাধারার সূচনা লক্ষ্য করা যায়। যে পরমতত্ত্ব বা এক সর্বব্যাপী সত্তার ধারণা বৈদিক ঋষিদের কাছে ধরা পড়েছে, তাই যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আলোচিত হয়ে উপনিষদে একটা সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত দার্শনিক মতবাদরূপে গড়ে উঠেছে। এই পরম সত্তাকেই উপনিষদে কখনও ব্রহ্ম, কখনও আত্মা, কখনও ভগবান[2] বা কখনও কেবলমাত্র সৎ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেনোপনিষদে[3] প্রশ্ন করা হয়েছে, "কার ইচ্ছায় আদিষ্ট হয়ে আমাদের মন ক্রিয়াশীল হয়? শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে প্রাণ সে প্রাণ, কার নির্দেশে নিজের কার্য সমাপন করছে? মানুষ কার ইচ্ছায় নিয়োজিত হয়ে বাক্য উচ্চারণ করছে এবং কোন্ দেবতা আমাদের চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করছেন? কোনোপনিষদেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। "তিনি আমাদের শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। চক্ষু যেখানে যায় না; বাক্য যাকে প্রকাশ করতে পারে না, মন যেখানে

উপনিষদে দার্শনিক চিন্তাধারার সূচনা

পরম সত্তাকে উপনিষদে ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান এবং কেবল সৎ বলে অভিহিত করা হয়েছে

1. ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।১-২
2. "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দ্যতে"—ভাগবদ।
3. কেনোপনিষদ ১।১ সূত্র।
4. কোনোপনিষদ ১।২ সূত্র।

উপনীত হয় না যাকে স্থূল বস্তুর মত দেখা যায় না বা জানা যায় না—তাঁর স্বরূপ আমরা কিভাবে বর্ণনা করব? তিনি জানা ও অজানার বাইরে।" বিভিন্ন উপনিষদে এই পরম সত্তা বা ব্রহ্মের বিভিন্ন বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি স্থূল নন, অণু নন, হ্রস্ব নন্, দীর্ঘ নন; লোহিত নন; স্নেহ নন, ছায়া নন, তমঃ নন, বায়ু নন; আকাশ নন, রস নন, শব্দ নন; গন্ধ নন, চক্ষু নন, শ্রোত্র নন; সঙ্গ নন, বাক্য নন, মন নন, তেজ নন; প্রাণ নন, মুখ নন, মাত্রা নন, অন্তর নন, বাহির নন। অতএব তিনি নির্বিশেষ। [1]মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে, তাঁর প্রজ্ঞা বহির্মুখও নয়, অন্তর্মুখও নয়, উভয়মুখও নয়। তিনি প্রজ্ঞানঘন নন, প্রজ্ঞও নন। তিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দেশের অতীত, একমাত্র আত্মারূপেই সিদ্ধ। প্রপঞ্চাতীত (নিরুপাধি), শান্ত, শিব, অদ্বৈত, তাঁকেই আত্মা বলে জানবে। নিরালম্বোপনিষদে বলা হয়েছে, যিনি নিরুপাধি, আদি-অন্তবিহীন, শুদ্ধ, শান্ত, নির্গুণ, অবয়বহীন, সদা আনন্দস্বরূপ, যাঁর নিত্য জ্ঞানাদির কোন খণ্ডন নেই এবং যিনি অদ্বিতীয় সেই চৈতন্য-স্বরূপকেই ব্রহ্ম বলে জানবে। [2]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, "সেই অশব্দ, অস্পর্শ অরূপ অব্যয়, অরস, অগন্ধ, অক্ষয় (নিত্য) অনাদি অনন্ত মহতের পরাৎপর, ধ্রুব বস্তুকে জানলে জীব মৃত্যুমুখ থেকে মুক্ত হয়।" ব্রহ্ম শাশ্বত, ধ্রুব, অক্ষর, অব্যয় ও কূটস্থ। ব্রহ্ম সৎ নন, অসৎও নন, এক ও অদ্বিতীয় শিব (ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ—শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৮)। ব্রহ্ম নিরুপাধি অর্থাৎ তিনি দেশ, কাল ও নিমিত্ত বা কার্যকারণ সম্পর্কের অধীন নন। ব্রহ্ম দেশাতীত। [3]ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে "তিনি অধোদেশে, তিনি ঊর্ধ্বদেশে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনিই এই সব।"

বিভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্মের বর্ণনা

ব্রহ্ম কালাতীত। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ-ব্রহ্ম এই ত্রিকালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন (পরঃ ত্রিকালাৎ, শ্বেত ৬.৫)। তাছাড়া ব্রহ্ম যখন আদি অন্তহীন, সনাতন, তখন ব্রহ্মকে কালাতীত বলতেই হয় (অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং—কঠ ৩।১৫, গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্—কঠ ৫।৫)। ব্রহ্ম যেমন দেশাতীত এবং কালাতীত, তেমনি তিনি নিমিত্তাতীত। ব্রহ্ম যেহেতু নিরুপাধি সেহেতু অজ্ঞেয়। ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, কারণ বিষয়ী

1. মাণ্ডুক্য, ৭ সূত্র।
2. কঠ, ৩।১৫ সূত্র।
3. ছান্দোগ্য ৭।২৫।১ সূত্র।

কখন বিষয় হতে পারেন না।[1] ব্রহ্ম দ্বারাই সব কিছু জ্ঞাত হয় কাজেই ব্রহ্মকে কিরূপে জানা সম্ভব? ব্রহ্ম বিষয়ী হয়ে যে বিষয় হতে পারে না, সে সম্পর্কে[2] বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, "তিনি (ব্রহ্ম) অদৃষ্ট হলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হয়েও শ্রোতা, অমত হয়েও মন্তা এবং অবিজ্ঞাত হয়েও বিজ্ঞাতা। তিনি ছাড়া অন্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বা বিজ্ঞাতা নেই।" ব্রহ্ম চক্ষু, বাক্য, ইন্দ্রিয় বা কর্ম কোন কিছুর গ্রাহ্য নন। তিনি, সৎ, অসৎ, চিৎ, জড়, সুখ-দুঃখ হ্রস্ব, দীর্ঘ, দ্রষ্টা, দৃশ্য. কোন কিছুই নন। ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্বিকল্প, নিরুপাধি, নির্গুণ। ব্রহ্ম নির্বিশেষ, সে কারণে শ্রুতিতে 'নেতি', 'নেতি',—'ব্রহ্ম ইহা নন,' 'ব্রহ্ম উহা নন,' এইভাবে ব্রহ্মের বর্ণনার চেষ্টা করা হয়েছে।[3] ব্রহ্ম নির্বিশেষ হলেও ব্রহ্মকে উপনিষদে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্ম সৎ স্বরূপ। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ব্রহ্মের তুলনায় জগতের আর সব কিছু মিথ্যা। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, "তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্"। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বা চিন্ময়। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, একখণ্ড লবণ যেমন বাইরে ভেতরে লবণ ছাড়া কিছুই নয়, তেমনি, বিজ্ঞানময় আত্মা অন্তরে বাহিরে বিজ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়। ব্রহ্ম কেবল সৎ স্বরূপ বা চিৎস্বরূপ নন, তিনি আনন্দস্বরূপও। (বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম—বৃহদাঃ ৩।৯.২৮)। ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ কি ? ব্রহ্মানন্দ জাগতিক বিষয় ভোগের আনন্দের সমতুল্য নয়, ব্রহ্মানন্দ অপরিমেয় ও অসীম।[4] প্রশ্ন হল, নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মকে যদি সচ্চিদানন্দস্বরূপে বর্ণনা করা হয় তাহলে ব্রহ্ম কি সগুণ হয়ে পড়েন না? এর উত্তরে বলা হয় যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি পদ যথাক্রমে ব্রহ্ম যে মিথ্যা নয়, জড় নয়, দুঃখ স্বরূপ নয়, এই অভাবাত্মক ভাব ব্যক্ত করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মর বিশেষণ নয়, তাঁর স্বরূপ বাচক।'

ব্রহ্ম আদি-অন্তহীন সনাতন

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ

উপনিষদে যেমন নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনা আছে তেমনি সগুণ ব্রহ্মের বর্ণনাও আছে। নির্গুণ ব্রহ্মকে উপনিষদে 'তৎ' শব্দের দ্বারা এবং সগুণ ব্রহ্মকে সঃ শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নির্বিশেষ ভাবের জন্য ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার, যেমন, 'অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্' এবং সবিশেষ ভাবের জন্য পুংলিঙ্গের ব্যবহার যেমন 'সর্বকর্মা সর্বকামঃ

1. বৃহ—২।৪।১ সূত্র।
2. বৃহ—৩।৮।১১ সূত্র।
3. তৈত্তিরীয় উপনিষদ—২।১ সূত্র।
4. তৈত্তিরীয় উপনিষদ—২।৯।১ সূত্র।

সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ লক্ষ্য করা যায়। তবে সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ত্ব নয়। উভয়ই এক, উভয়ের মধ্যে কেবল ভাবের প্রভেদ; মায়াবশে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হন।

উপনিষদে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের বর্ণনা

উর্ণনাভ যেমন জাল রচনা ক'রে সেই জালে নিজেকে আবৃত করে, সেরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম মায়াজালে আপনাকে আবৃত করে সগুণ ও সবিশেষ হন।[1] বস্তুতঃ এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,' 'ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ (নৃঃ তাঃ ৭), 'আত্মৈবেদং সর্বম্' (ছাঃ ৭।২৫।১)। সব জাগতিক পদার্থ একই ব্রহ্মের রূপ, কেবল রূপ ও নাম ভিন্ন। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয়।' 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।'[2] সুদীপ্ত অগ্নি থেকে যেমন সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় সেরূপ ব্রহ্ম থেকে অসংখ্য জীব উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে যায়। অভিন্ন মহাকাশ ও ঘটাকাশের মধ্যে যে প্রভেদ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সেই প্রভেদ, কাজেই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে উপাধি ভেদ, বস্তুতঃ কোন ভেদ নেই। মায়োপহিত চৈতন্যই জীব। উপরিউক্ত

ব্রহ্মকেই উপনিষদে আত্মারূপে অভিহিত করা হয়েছে

আলোচনা থেকে এই প্রতীতি হয় যে, উপনিষদে যাঁকে ব্রহ্মরূপে অভিহিত করা হয়েছে তাঁকেই আত্মারূপে অভিহিত করা হয়েছে। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন বা বুদ্ধি কোনটির সঙ্গেই অভিন্ন নয়; আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। উপনিষদে আত্মজ্ঞান বা আত্মবিদ্যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা পরাবিদ্যা এবং অন্যান্য জ্ঞানকে অপরাবিদ্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে।[3] এইজন্য [4]বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, 'আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান হলে সবই বিদিত হয়।' আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়। যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্বর্গলাভ ঘটতে পারে, কিন্তু মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। আত্মা ব্রহ্ম, আত্মা আনন্দস্বরূপ।

ব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম সত্যই জগৎ স্রষ্টা

ব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তির বিভিন্ন ব্যাখ্যা

এবং সৃষ্ট জগৎ সত্য। ব্রহ্ম বীজ, জগৎ ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ, (একং বীজং বহুধা যঃ করোতি—শ্বেতাশ্বতর)। আবার কোথাও কোথাও বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম প্রকৃত পক্ষে কোন জগৎ সৃষ্টি করেন নি। জগৎ মায়িক অবভাসমাত্র। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ অসৎ, মিথ্যা। সুবর্ণকুণ্ডল বলয় যেমন বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন কিন্তু আসলে সুবর্ণ ছাড়া কিছুই নয়, তেমনি ব্রহ্মই সৎ, ব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্তিত[5] এক খণ্ড মৃত্তিকাকে

1. শ্বেতা (৬।১০) 2. বৃহদা (২।১।২০) 3. (বৃহ ২।৪।৫) 4. ছান্দোগ্য (৬।১০।৪)
5. অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে —ঈশোপনিষদ

জানলে সব মৃন্ময় বস্তু জানা হয় কেননা, সব মৃন্ময় বস্তু মৃত্তিকারই বিকার। কাজেই প্রশ্ন ব্রহ্ম কি সত্যই জগৎস্রষ্টা না জগৎ মায়া? এক নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মেরই কি কেবলমাত্র অস্তিত্ব আছে, না ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ?

ব্রহ্ম কি সত্যই জগৎস্রষ্টা না সৃষ্ট-জগৎ মায়া?

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে এই সকল মতবাদের যাথার্থ্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে বিভিন্ন ভাষ্যকার বেদান্তসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন। এই সব ভাষ্যের মধ্যে দুটি ভাষ্য বা মত বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। একটি শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ও অপরটি রামানুজের ভাষ্য। উভয় মত একই বেদান্তসূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। শঙ্করাচার্যের মতে সৃষ্টি মিথ্যা, ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা নন। রামানুজের মতে সৃষ্টি সত্য, ব্রহ্মই জগৎস্রষ্টা। শঙ্করাচার্যের মতবাদ 'বিশুদ্ধাদ্বৈত' বা 'অদ্বৈতবাদ' এবং রামানুজের মতবাদ 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। উভয়েই প্রমাণ প্রয়োগে শ্রুতির ওপরই নির্ভর করেছেন।

শঙ্করাচার্যের মতে সৃষ্টি মিথ্যা; রামানুজের মতে সৃষ্টি সত্য

২। শঙ্করের অদ্বৈতবাদঃ

(ক) ভূমিকাঃ বেদান্তের বিশুদ্ধাদ্বৈত বা অদ্বৈত মতের প্রবর্তক রূপে শঙ্করাচার্যের নামই বিশেষভাবে সকলের নিকট পরিচিত। অদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন মতবাদ এবং এ সম্পর্কে যে সব গ্রন্থাদি লিখিত হয়েছে তার মধ্যে গৌড়পাদ রচিত মাণ্ডুক্যকারিকা সবচেয়ে প্রাচীন এবং শঙ্করাচার্যের যুগের পূর্ববর্তী রচনা। মাণ্ডুক্য উপনিষদকে কেন্দ্র করেই মাণ্ডুক্যকারিকা রচিত। মহাভারতের উত্তরগীতার ওপর ভিত্তি করে গৌড়পাদ উত্তরগীতাভাষ্য নামে অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে কথিত আছে। তবে অনেকে মনে করেন যে, মাণ্ডুক্যকারিকার রচয়িতা গৌড়পাদ এবং উত্তরগীতার রচয়িতা গৌরপাদ একই ব্যক্তি নন। মাণ্ডুক্যকারিকায় গৌড়পাদের অদ্বৈতবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির চারটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে মাণ্ডুক্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জগতের মিথ্যাত্ব, তৃতীয় পরিচ্ছেদে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে মায়ার জন্যই যে জগৎ সত্য মনে হয়—এই বিষয়বস্তুই যথাক্রমে আলোচিত হয়েছে। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে গোবিন্দাচার্যকে গুরু মনে করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শঙ্করের গুরু গোবিন্দাচার্যের গুরু ছিলেন আচার্য গৌড়পাদ। সে কারণে শঙ্করাচার্য তাঁর প্রতিও

গৌড়পাদ রচিত মাণ্ডুক্যকারিকায় অদ্বৈতবাদের সর্ব প্রাচীন নিদর্শন

মাণ্ডুক্যকারিকার চারটি পরিচ্ছেদ

গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকার ওপর তিনি একটি ভাষ্যও রচনা করেন।

শঙ্করাচার্য মাত্র বত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮২০ খ্রীস্টাব্দ, এই সময়েই শঙ্করাচার্যের জীবনকাল বলে অনেকে মনে করেন। কথিত আছে, দক্ষিণ ভারতে কেরল দেশে নম্বুরী ব্রাহ্মণ বংশে বৈশাখী শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতার নাম বিশিষ্টা। কথিত আছে, মাত্র আট বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ঐ বয়সেই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নানা দেশ পরিভ্রমণ করে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। শঙ্করাচার্য অতুলনীয় দার্শনিক প্রতিভা, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অপরিমেয় কর্মক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সমসাময়িক বহু পণ্ডিতকে তিনি বাক্ যুদ্ধে পরাজিত করেন। কথিত আছে, মণ্ডনমিশ্র তাঁর সঙ্গে তর্কে পরাজিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের ওপর তাঁর দর্শন প্রতিষ্ঠিত হলেও উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার সময় তিনি কোন ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হননি। সূক্ষ্ম যুক্তির সাহায্যে তিনি তাদের ওপর যে দার্শনিক সৌধ নির্মাণ করে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে সকলের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছে।

শঙ্করাচার্যের জীবনী

শঙ্করাচার্যের যখন আবির্ভাব ঘটেছিল তখন ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসছিল। দাক্ষিণাত্যে জৈন ধর্মের তখন বেশ প্রভাব ছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছিল। শৈব আদিয়ার ও বৈষ্ণব আলেয়ারগণ ভক্তি-ধর্ম প্রচার করছিলেন। পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজার প্রসার ঘটছিল। মীমাংসকগণ বৈদিক যাগ-যজ্ঞের মাহাত্ম্য প্রচার করছিলেন। কুমারিল ও মণ্ডনমিশ্র জ্ঞানকাণ্ড ও সন্ন্যাসের তুলনায় কর্মকাণ্ড ও গার্হস্থ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করছিলেন। এই সময় শঙ্কর উপনিষদের জ্ঞান-মার্গের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করে অদ্বৈতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। গীতার ভাষ্য রচনা করে জ্ঞানবাদের সঙ্গে ভক্তি ও কর্মবাদের সঙ্গতি বিধান করলেন।

শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করে কেউ কেউ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু শঙ্করের রচনায় এই বৌদ্ধ প্রত্যয়ের মূলে রয়েছে গৌড়পাদের রচনা, যার ওপর বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধরূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি

প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং বৌদ্ধ দর্শনের তিনি সমালোচনা করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনের সমালোচনা করে অতীতের ঈশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

শঙ্করাচার্য প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যই প্রধান। ব্রহ্মসূত্রের ওপর তাঁর ভাষ্য 'শারীরিক ভাষ্য' নামে পরিচিত। এ ছাড়া তিনি প্রধান প্রধান উপনিষদ এবং গীতার ওপর ভাষ্য রচনা করেন। তিনি ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয় এবং ঐতরেয় উপনিষদের ওপর ভাষ্য রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্রের এবং উপনিষদের ভাষ্যগুলির ওপর ভিত্তি করেই আমরা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের পরিচয় লাভ করি। এ ছাড়াও শঙ্করাচার্য আরও কয়েকটি গ্রন্থ।[1] রচনা করেছেন তবে সেগুলির দার্শনিক মূল্য উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির তুলনায় অনেক কম। শঙ্করাচার্য প্রণীত গ্রন্থগুলির ওপর পরবর্তী কালে অনেক ভাষ্য ও টীকা রচিত হয়। বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী' এ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ রচনা। অমলানন্দ 'কল্পতরু' নামে ভামতীর ওপর টীকা রচনা করেন। অপ্যয়দীক্ষিত 'কল্পতরু পরিমাল' নামে কল্পতরুর ওপর একটি টীকা রচনা করেন। গোবিন্দানন্দ শারীরিক ভাষ্যের ওপর 'রত্নপ্রভা' নামে একটি টীকা রচনা করেন। শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য পদ্মপাদের 'পঞ্চ পাদিকা' নামে শঙ্কর ভাষ্যের উপর একটি অতি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন। 'প্রকাশাত্মন্' পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার উপর 'পঞ্চপাদিকা বিবরণ' নামে একটি মনোরম টীকা রচনা করেন। অখণ্ডানন্দ এবং নরসিংহাশ্রম মুনি শেষোক্ত গ্রন্থের 'তত্ত্বদীপন' এবং' বিবরণ ভাব প্রকাশিকা' নামে দুখানি টীকা প্রণয়ন করেন। অমলানন্দ এবং বিদ্যাসাগরও 'পঞ্চপাদিকা দর্পন' ও 'পঞ্চপাদিকা টীকা' নামে পঞ্চপাদিকার ওপর টীকা রচনা করেছিলেন। বিষ্ণু ভট্টোপাধ্যায় 'ঋজু বিবরণ' নামে পঞ্চপাদিকার ওপর একটি রচনা প্রণয়ন করেন। বিদ্যারণ্য পঞ্চপাদিকা বিবরণের ওপর ভিত্তি করে 'বিবরণ প্রমেয়-সংগ্রহ নামে' একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বেদান্তের মুক্তি সম্বন্ধে বিদ্যারণ্যের 'জীবন্মুক্তি বিবেক' একটি খ্যাতনামা গ্রন্থ। বস্তুতঃ, পরবর্তী অদ্বৈত সম্প্রদায়ের মতগুলির মধ্যে 'ভামতী মত' ও 'বিবরণ মত' বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ এবং উভয়ের মতের মধ্যেও অনেক স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উভয়

শঙ্করাচার্য প্রণীত গ্রন্থাবলী

শঙ্করের রচনার ওপর প্রণীত ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি

1. তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম আপ্তবজ্রশুচি, আত্মবোধ, মোহমুদ্গার, দশশ্লোকী, অপরোক্ষানুভূতি, বিষ্ণুসহস্র নামের টীকা ও সনৎ সুজাতীয়ের ভাষ্য। এ ছাড়াও তাঁর রচিত কয়েকটি স্তোত্র আছে; যেমন, দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র, হরিমীড়ে স্তোত্র, আনন্দলহরী, সৌন্দর্যলহরী ও গঙ্গা স্তোত্র।

মতের বিশ্লেষণ করে চিৎসুখাচার্য শঙ্কর ভাষ্যের ওপর 'ভাষ্য-ভাব প্রকাশিকা' নামে একটি টীকা রচনা করেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও শঙ্কর ভাষ্যের ওপর আরও অনেক ব্যক্তি টীকা রচনা করেন। আনন্দবোধের 'ন্যায় মকরন্দ', বিদ্যারণ্যের 'পঞ্চদশী', শ্রীহর্ষের 'খণ্ডন খণ্ডখাদ্য', ধর্মরাজের 'বেদান্ত পরিভাষা', মধুসূদন সরস্বতীর 'অদ্বৈত সিদ্ধি', ব্রহ্মানন্দের 'লঘু চন্দ্রিকা', চিৎসুখাচার্যের 'চিৎসুখী' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

উপনিষদের মধ্যে যে অদ্বৈতবাদের বীজ নিহিত আছে তার ওপর ভিত্তি করেই শঙ্করাচার্য সুসংহত বিশুদ্ধাদ্বৈত বা অদ্বৈত মতের প্রবর্তন করেন। শঙ্কর প্রবর্তিত অদ্বৈত মতের মূল কথা—ব্রহ্ম সত্য. জগৎ মিথ্যা, এবং জীবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নির্বিশেষ বিশুদ্ধ চৈতন্য। ব্রহ্মের কোন রূপ ভেদ নেই। জীব ও জগৎ-এর ব্যবহারিক সত্যতা আছে কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে এগুলির যথার্থ সত্তা নেই। মায়াশক্তিপ্রভাবেই ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রকাশিত হন। মায়ার জন্যই এদের সত্য মনে হয়। তত্ত্ব দৃষ্টিতে মায়ার কোন অস্তিত্ব নেই। ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই মায়ার সৎ ও অসৎ রূপের কথা বলা হয়ে থাকে। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, ব্রহ্মের বিবর্ত। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। অবিদ্যাই বন্ধন। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জানা হলেই সব বন্ধন তিরোহিত হয়।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মূল কথা—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এবং জীবই ব্রহ্ম

বাদরায়ণকে অনুসরণ করে শঙ্কর বেদনিষ্ঠ ও বেদবিরোধী উভয় প্রকার দর্শন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি সম্পর্কীয় মতবাদগুলির সমালোচনা করেছেন। আমরা শঙ্করের অদ্বৈতমত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার পূর্বে তিনি কিভাবে ভিন্ন মতাবলম্বীদের মত খণ্ডন করেছেন তা আলোচনা করব:

(খ) সৃষ্টি সম্বন্ধে অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন: **(i) বৈশেষিক মতের খণ্ডন:** বৈশেষিক মতে জড় দ্রব্যের মূল উপাদন হল অণু। জড় জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ ক্ষিতি, জল, বায়ু ও তেজের পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন। দুটি পরমাণু মিলে হয় একটি দ্ব্যণুক (dyad), তিনটি দ্ব্যণুকের মিলনে ত্র্যণুক-এর (triad) উৎপত্তি হয়। পরমাণু ও দ্ব্যণুক প্রত্যক্ষ করা যায় না। ত্র্যণুক প্রত্যক্ষের বিষয়। পরমাণুগুলির সংযোগ ও বিয়োগের দ্বারাই জগৎ ও যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি, জীবের অদৃষ্টই পরমাণুগুলির সংযোগ ও বিয়োগের কারণ। জীবের অদৃষ্ট বায়ুর পরমাণুর ওপর ক্রিয়া করে। তার ফলে বায়ুর পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বায়ু দ্ব্যণুক উৎপন্ন করে। ক্রমে ত্র্যণুক ও চতুরণুক (quatrad) উৎপন্ন হলে বায়ু নামক মহাভূতের জন্ম হয়। এভাবেই অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেহ অর্থাৎ সমুদয় বিশ্ব জন্মগ্রহণ করে।

শঙ্করাচার্য জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে বৈশেষিক মতের সমালোচনা করেন। শঙ্করের মতে পরমাণুর সংযোগের কারণ হল ক্রিয়া। ক্রিয়া ছাড়া সংযোগ সম্ভব নয়। আবার ক্রিয়া হল কার্য; সুতরাং তারও কোন নিমিত্ত কারণ থাকবেই। নিমিত্ত কারণ ছাড়া কোন ক্রিয়া সম্ভব নয়। তাহলে ক্রিয়ার কারণ কি? প্রযত্ন (volition), অভিঘাত (impact) না অদৃষ্ট? সৃষ্টির পূর্বে জীবাত্মা অচেতন এবং শরীরবিহীন হওয়াতে জীবের প্রযতনগুণ থাকতে পারে না। [1]শরীরস্থ মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ না হলে আত্মায় প্রযতনগুন দেখা দিতে পারে না। কাজেই সৃষ্টির পূর্বে প্রথম ক্রিয়ার কারণ প্রযতন নয়। জীবের অদৃষ্টও সৃষ্টির পূর্বে ক্রিয়ার উৎপত্তির কারণ হতে পারে না। জীবের অদৃষ্ট অচেতন; সুতরাং অচেতন অদৃষ্টের পক্ষে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে ক্রিয়া উৎপাদন করা বা পরমাণুকে কর্মে প্রবৃত্ত করান সম্ভব নয়। সৃষ্টির পূর্বে আত্মাতে চৈতন্য গুণ উৎপন্ন না হওয়াই আত্মা অচেতন। বৈশেষিক মতে আত্মাই অদৃষ্টের অধিষ্ঠান। সুতরাং অদৃষ্টের সঙ্গে পরমাণুর কোন সম্বন্ধ না থাকাতে অদৃষ্ট পরমাণু সংযোগের কারণ হতে পারে না। যদি বলা হয় যে, আত্মা সর্বব্যাপী, সেহেতু অদৃষ্টের অধিষ্ঠান, তাহলে আত্মার সঙ্গে পরমাণুর সম্বন্ধ সততই বর্তমান বলতে হয়। তাহলে সৃষ্টিকার্যও সতত হবে। তাহলে সৃষ্টির সঙ্গে প্রলয়ের কোন পার্থক্য থাকে না।

তাছাড়া পরমাণুর সঙ্গে যখন পরমাণুর সংযোগ হয় তখন তা কি সর্বাংশে হয়—না আংশিক হয়? সর্বাংশে সংযোগ হলে যে পরমাণু যেমন তাই থাকবে, বড় বা স্থূল হতে পারে না, আর যদি পরমাণুর অংশের সঙ্গে অংশের সংযোগ হয় তাহলে পরমাণুর অংশ স্বীকার করতে হয়। তাহলে পরমাণু যে অংশহীন, পরমাণুর এই বৈশিষ্ট্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। যদি বলা হয় যে পরমাণুর কল্পিত অংশ আছে, তাহলে সংযোগও কল্পিত বা মিথ্যা হবে। অদৃষ্টের সাহায্যে যেমন সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাণুর সংযোজন ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা গেল না, তেমনই মহাপ্রলয়ের সময় পরমাণুর বিয়োগ ক্রিয়াও ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ জীবের অদৃষ্ট সুখ-দুঃখভোগের প্রযোজক, মহাপ্রলয়ের প্রযোজক নয়।

বৈশেষিকগণ সমবায় নামে পৃথক পদার্থ স্বীকার করেন। তাতেও পরমাণুবাদ ভঙ্গ হয়। তাঁদের মতে দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে দ্ব্যণুক হয়। দুটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত দ্ব্যণুকের সঙ্গে পরমাণু দুটির সম্বন্ধ বৈশেষিক মতে সমবায় সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ দ্ব্যণুকে কিভাবে অবস্থান করে? এর জন্য অন্য একটি সমবায় সম্বন্ধের প্রয়োজন, আবার এই দ্বিতীয় সমবায়ের জন্য অন্য সমবায় সম্বন্ধের প্রয়োজন। এই ভাবে অনন্ত সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা করলে অনবস্থার দোষের উদ্ভব হবে, অভীষ্ট সিদ্ধি

1. শঙ্করভাষ্য—২।২।১২ সূত্র।

হবে না। পরমাণুর স্বাভাব কেমন? পরমাণু হয় প্রবৃত্তি স্বভাব, না হয় নিবৃত্তি স্বভাব, কিংবা উভয় স্বভাব, কিংবা নিঃস্বভাব অর্থাৎ দুটিরই কোনটিই নয়। এই চার প্রকারের যে কোন এক প্রকারের স্বভাব বৈশেষিককে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু ঐ চার প্রকারের কোন প্রকারই উৎপন্ন হয় না। প্রবৃত্তি স্বভাব হলে তারা সব সময়ই ক্রিয়াশীল থাকবে, প্রলয় হবে না। নিবৃত্তি স্বভাব হলে সকল সময়ই নিষ্ক্রিয় থাকবে, কখনও সৃষ্টি হবে না। একাধারে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এই দুই বিরোধী স্বভাব এক বস্তুতে থাকতে পারে না। পরমাণু যদি নিঃস্বভাব হয় তাহলে তাদের ক্রিয়ার কারণ হবে পরমাণু বহির্ভূত কিছু। এই বাহ্য কারণ হয় দৃষ্ট (seen) কিংবা অদৃষ্ট (unseen) হবে। যদি দৃষ্ট হয় তাহলে সৃষ্টির পূর্বে তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না এবং যদি অদৃষ্ট হয় তাহলে পরমাণুর কাছে থাকার জন্য সৃষ্টিকার্যের বিরাম হবে না। আর যদি অদৃষ্টের পরমাণুর সান্নিধ্য অস্বীকার করা হয় সৃষ্টিকার্য অসম্ভব হবে। বৈশেষিক মতে পরমাণু সকল নিত্য। কিন্তু তাদের রূপরসাদি গুণ আছে। কিন্তু সর্বত্রই দেখা যায় যে, যে সব বস্তুর রূপরসাদি গুণ আছে, তারা অনিত্য। সুতরাং পরমাণু নিত্য হতে পারে না।

বৈশেষিক মতে পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এই চারটি গুণ। পৃথিবী অপেক্ষা অপ্ সূক্ষ্ম এবং তার তিনটি গুণ রূপ, রস ও স্পর্শ; অপ্ অপেক্ষা তেজ সূক্ষ্ম এবং তার গুণ রূপ ও স্পর্শ। বায়ু তার থেকেও সূক্ষ্ম। তার গুণ স্পর্শ। তাহলে পরমাণুদের উপচিত[1] অপচিত[2] গুণযুক্ত অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের ইতর বিশেষ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বৈশেষিক মতে সব পরমাণুই সূক্ষ্মতম। যদি বলা যায় ক্ষিতির কেবল গন্ধগুণ, অপের রস, তেজের রূপ এবং বায়ুর স্পর্শগুণ আছে তাহলে তা প্রত্যক্ষের বিরোধী হবে। কেননা ক্ষিতির স্পর্শ, রূপ ও রস গুণ প্রত্যক্ষিত হয়। আর যদি বলা যায় যে, পরমাণু-জাতির প্রত্যেক জাতিতেই চারটি গুণ আছে তাহলে জলে গন্ধের, তেজে গন্ধের ও রসের, বায়ুতে গন্ধের, রূপের ও রসের উপলব্ধি হয় না কেন? কাজেই পরমাণুবাদ যুক্তি বহির্ভূত। বৈশেষিক দর্শনের কোন মত বেদজ্ঞ ঋষিরা গ্রহণ করে নি। তাই এই মত গ্রাহ্য নয়। বৈশেষিকদের সিদ্ধান্ত কুযুক্তিমূলক, বেদবিরুদ্ধ ও শিষ্টগণের অগ্রাহ্য বলে পরিত্যাজ্য।

(ii) সাংখ্য মতের খণ্ডন: সাংখ্য মতে প্রকৃতি বিশ্বের অমূল মূল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতি অচেতন ও অবিবেকী। অচেতন প্রকৃতি চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত না হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে। শঙ্করাচার্যের মতে অচেতন

1. অধিক 2. কম।

প্রকৃতি চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত না হয়ে কখনও এই জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না। গৃহ, অট্টালিকা, শয্যা প্রভৃতি অচেতন বস্তু কোন বুদ্ধিমান শিল্পীর দ্বারা সৃষ্ট হয়। কোন অচেতন পদার্থ যেমন পাষাণ বা লৌহ তা রচনা করতে পারেনা, সেরূপ অচেতন প্রধান বা প্রকৃতির পক্ষে এই সুবিন্যস্ত, বিচিত্র ও রচনাপারিপাট্যযুক্ত বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মৃন্ময় দ্রব্যের রচয়িতারূপে যেমন চেতন কুম্ভকার দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রধান বা প্রকৃতির ও কোন চেতন অধিষ্ঠাতা আছে এরূপ অনুমান করতে হয়। সুখ, দুঃখ ও মোহ অন্তরের পদার্থ, তাদের পক্ষে বাহ্য বস্তু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। একই বাহ্য বস্তুতে কারও সুখ কারও দুঃখ বা কারও মোহ অনুভূত হয়। সুতরাং বাহ্য বস্তু সুখ, দুঃখ ও মোহের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না। অচেতন প্রধান বা প্রকৃতির মধ্যে রচনার জন্য প্রবৃত্তিও স্বাধীনভাবে হওয়া সম্ভব নয়। সৃষ্টির জন্য প্রবৃত্তির অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয়ে এই তিনটি গুণের পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাব এবং তারপরে কোন এক বিশেষ কার্য সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি। অচেতন প্রধানের মধ্যে এরূপ প্রবৃত্তি সম্ভব নয়। রথের সারথি ছাড়া অচেতন রথ নিজেই নিজেকে চালনা করতে পারেনা। অচেতন দ্রব্যের প্রবৃত্তি অনুমান করা যায় না।

সাংখ্যমতে গোবৎসের পুষ্টির জন্য যেভাবে গাভীর অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয় তেমনি অচেতন প্রকৃতি স্বভাববশতঃ পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়। শঙ্করাচার্যের মতে এই উপমার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়। গাভী ও গোবৎস উভয়ই চেতন প্রাণী। গাভীর স্তন থেকে দুগ্ধ অচেতনভাবে ক্ষরিত হয় না। সন্তানের জন্য স্নেহঘাতে ক্ষরিত হয়। কাজেই পুরুষের জন্য অচেতন প্রকৃতি কার্যে প্রবৃত্ত হয় একথা বলা চলে না। কেননা পুরুষ উদাসীন ও নিষ্ক্রিয়, সেহেতু কারও প্রবর্তক নন। তৃণ পল্লব জল নিমিত্ত কারণের সাহায্য ছাড়া আপন স্বভাবেই দুগ্ধে পরিণত হয়, সেরূপ প্রকৃতি আপন স্বভাবেই মহত্ত্বাদি আকারে পরিণত হয়, এ যুক্তিও স্বীকার করা চলে না। তৃণ প্রভৃতির দুগ্ধে পরিণাম, কারণ বিশেষের অধীন। তৃণ প্রভৃতি ধেনু কর্তৃক ভক্ষিত হলেই দুগ্ধে পরিণত হয়, ধেনু শরীর ছাড়া অন্য শরীরে এই পরিণাম ঘটে না। সুতরাং প্রকৃতির স্বতঃপরিণাম এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

যদি প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকার করেই নেওয়া হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি অন্য কারও অপেক্ষা না করে জগতে পরিণত হতে পারে, এ বিষয় স্বীকার করে নিলেও প্রয়োজনের অভাবে এ যুক্তি সিদ্ধ হয় না। যদি বলা হয় প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন তাহলে সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতি পুরুষার্থ সম্পন্ন করতে প্রবৃত্ত হয়, মহত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয় এ বচন অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর যদি বলা হয় যে, প্রধানের প্রয়োজন পুরুষের ভোগ,

তাহলে বলা হবে যে, পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়। কাজেই তার ভোগ অসিদ্ধ। যদি বলা হয় ভোগ নয় মোক্ষ, তাহলে বলা যাবে যে মোক্ষ ত তার নিত্যসিদ্ধ, প্রবৃত্তির পূর্বেও ছিল। কাজেই প্রধানের প্রবৃত্তির কোন সার্থকতা নেই।

পঙ্গু ও অন্ধ, চুম্বক ও লৌহের দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। পঙ্গুর বাকশক্তি আছে যার দ্বারা সে অন্ধকে চালিত করতে পারে। কিন্তু পুরুষের প্রবর্তকত্ব যেহেতু স্বীকার করা হয় না, পুরুষের পক্ষে প্রকৃতিকে চালনা করা সম্ভব নয়। প্রস্তর যেমন নিকটস্থ লৌহকে চালিত করে, সেইরূপ পুরুষ সন্নিধান বলে প্রকৃতিকে চালিত করে। এরূপ বলাও সঙ্গত নয়; কেননা তাহলে প্রকৃতি সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকত, প্রলয় হত না। কাজেই উপরিউক্ত উভয় দৃষ্টান্তই অযোগ্য দৃষ্টান্ত। আর তাছাড়া প্রধান অচেতন ও পুরুষ উদাসীন। সে কারণে উভয়ের সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব।

প্রধান যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হতে পারেনা, তার অন্য কারণ আছে। সাংখ্যমতে সত্ব, রজঃ ও তমঃ-র সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সাম্যাবস্থা ভঙ্গ না হলে সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু গুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ করে, গুণাতিরিক্ত এমন কোন বস্তু সাংখ্য মতে নেই। তারা প্রকৃতি রূপ অঙ্গীর অঙ্গ নয়, যে অঙ্গীর প্রভাবে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটবে, অর্থাৎ গুণ বিশেষের প্রাবল্য বা কারও দৌর্বল্য দেখা দেবে।

যদি বলা হয় যে, গুণ সকলের সাম্যাবস্থাতেও বৈষম্যের উপযোগিতা আছে অর্থাৎ ছোট বড় বা কম বেশী হবার যোগ্যতা আছে এবং সে কারণে জগৎ রচনা করতে পারে তাহলেও প্রশ্ন দেখা দেয়, বৈষম্যের উদ্ভবের কারণ কি? প্রকৃতি যেহেতু অচেতন, তখন কি কারণে গুণবিশেষের প্রাবল্য বা দুর্বলতা দেখা দেবে? তাছাড়াও সাংখ্যের মতে সামঞ্জস্য নেই। কারও মতে ইন্দ্রিয় সাতটি, কারও মতে একাদশ ইন্দ্রিয়। কারও মতে মহৎ থেকে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি, কারও মতে অহংকার থেকে। কোথাও অন্তঃকরণকে তিনটি, আর কোথাও একটি বলা হয়েছে। কাজেই সাংখ্যের পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ। শ্রুতিবিরুদ্ধ, স্মৃতি বিরুদ্ধ এবং স্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ হওয়ার জন্য সাংখ্যের দর্শন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

(iii) অসৎকার্যবাদের খণ্ডন: ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে উপাদান কারণে তার অস্তিত্ব থাকে না। কার্য উপাদান কারণের বিনাশ থেকে উৎপন্ন হয়। কার্য কারণ থেকে ভিন্ন নতুন বস্তু। কার্য হল অসৎ, উপাদান কারণ হল সৎ। সৎ কারণ থেকেই অসৎ কার্যের উৎপত্তি বা আরম্ভ হয়। এই কারণে এই মতবাদকে অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ বলে। সাংখ্যমতে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে উপাদান কারণে তার অস্তিত্ব থাকে। তবে তা কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে থাকে। যখন ব্যক্ত হয় তখন কার্য বলে গণ্য হয়। তিলের মধ্যে তৈল অব্যক্তভাবে থাকে।

তাঁদের মতে 'সৎ' থেকেই 'সৎ'-এ এর উৎপত্তি। এই মতকে সৎকার্যবাদ বলে। শঙ্করও সৎকার্যবাদী, তিনি নানারকম যুক্তির সাহায্যে অসৎকার্যবাদ খণ্ডন এবং সৎকার্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শঙ্কর বলেন, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে কার্য ও কারণের মধ্যে ভেদ নেই। আকাশাদি বহু পদার্থ-সমন্বিত জগৎ হল কার্য ও পরব্রহ্ম কারণ। জগৎকার্য যে ব্রহ্ম-কারণ থেকে ভিন্ন নয়, তা উপনিষদুক্ত আরম্ভনবাক্যে ও একাত্ম প্রতিপাদক বাক্যে জানা গেছে[1]। আরম্ভনবাক্য কি, তা বলতে গিয়ে শঙ্কর ছান্দোগ্য শ্রুতিতে, এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করেন। মৃত্তিকা জানলে সব মৃন্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়। মৃত্তিকা সত্য এবং মৃত্তিকার বিকার সকল মিথ্যা বা নামমাত্র জানা যায়। তেমনি কারণ ব্রহ্মই সত্য। জগৎরূপ কার্য বিকার মাত্র, নাম মাত্র।

[2]কার্য যে কারণ থেকে ভিন্ন নয় তার অন্য হেতু হল, কারণ থাকলেই কার্যের উপলব্ধি হয়, নতুবা হয় না। মৃত্তিকা না থাকলে ঘটের এবং তন্তু না থাকলে পটের উপলব্ধি হয় না। যেখানে কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই, সেখানে এটা হয় না। অশ্ব থাকলে গাভীর দর্শন হয় না। মৃত্তিকা ও ঘট, অশ্ব ও গাভীর মত ভিন্ন হলে মৃত্তিকার কারণত্ব থাকত না।

শ্রুতিতে উৎপত্তির পূর্বে জগৎ-কার্যের কারণে কারণাকারে থাকার কথা উল্লিখিত আছে। সে হেতুতেও কার্য ও কারণ ভিন্ন নয়। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"; "আত্মা বা ইদমেক একাগ্র আসীৎ" অর্থাৎ 'হে সোম্য, এসব আগে সৎ ছিল। 'আগে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এ সব এক আত্মা ছিল'—এই সব শ্রুতি বাক্যে কারণের সঙ্গে ইদম্ শব্দবাচ্য জগতের অভেদের কথা বলা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, কার্য কারণ থেকে ভিন্ন নয়। যা যাতে সেভাবে থাকে না, তা থেকে জন্মায় না। যেমন বালুকা থেকে তৈল জন্মায় না। অতএব কার্য যেমন উৎপত্তির পূর্বে কারণের সঙ্গে অভিন্ন, তেমনি, উৎপন্ন হবার পরেও অভিন্ন।

শ্রুতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অভাবের কথা বলা হয়েছে। তা দেখে উৎপত্তির পূর্বে কার্যমাত্রই অসৎ, একথা বলা চলে না। কেননা অভাবের কথা বলা হলেও অত্যান্তাভাব অর্থাৎ একেবারে না থাকার কথা বলা হয়নি। জগৎ তখন নামরূপে ব্যক্ত হয়নি, এ কথাই উক্ত হয়েছে।

কার্য যে উৎপত্তির পূর্বে থাকে ও কারণ থেকে ভিন্ন নয়, এই বিষয়টি যুক্তির দ্বারাও

1. "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১ সূত্র।
2. ব্রহ্মসূত্রে ২।১।১৫ সূত্র।

জানা যায়, শব্দান্তরের দ্বারাও জানা যায়।[1] যে যুক্তির দ্বারা জানা যায়, তাহল এই, দধি, ঘট ও রুচক প্রস্তুতের জন্য যথাক্রমে দুগ্ধ, মৃত্তিকা ও সুবর্ণ উপাদান কারণই গ্রহণ করা হয়, যে কোন দ্রব্য গ্রহণ করা চলে না। কার্য উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে না থাকলে, দুগ্ধ থেকেই দধি উৎপন্ন হয় কেন? আর মৃত্তিকা থেকেই বা হয় না কেন? যদি তার উত্তরে বলা হয় যে, দধি সম্পর্কীয় এক প্রকার ধর্ম বা শক্তি দুগ্ধে থাকে, মৃত্তিকাতে থাকে না, তাহলে তাঁর দ্বারা অসৎকার্যবাদের হানি হয় এবং সৎকার্যবাদ সিদ্ধ হয়। শক্তি কারণেরই স্বরূপ এবং কার্য শক্তিরই স্বরূপ।

অশ্ব ও মহিষ যেমন ভিন্ন, কার্য ও কারণও সেরূপ ভিন্ন। কেউ কেউ কার্য ও কারণের মধ্যে অভেদ প্রতীতি কারক সমবায় সম্বন্ধের কথা বলেন। তাঁদের সমবায়ি দ্রব্যের সঙ্গে সমবায়ের সম্বন্ধ ঘটাবার জন্য অন্য সম্বন্ধের আবশ্যক হবে এবং সেই সম্বন্ধ-সিদ্ধির জন্য অন্য সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। এর ফলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে।

উৎপত্তি এক প্রকার ক্রিয়া; যেহেতু ক্রিয়া, তখন অবশ্যই তার কর্তা আছে। ক্রিয়া অথচ কর্তা নেই, এরূপ হয় না। যদি বলা হয় যে, কারণ-দ্রব্যের সঙ্গে কার্যের সত্তা সম্বন্ধ হলে কার্যের উৎপত্তি হয়, তাহলে প্রশ্ন দেখা দেবে যার কোন স্বরূপ নেই, তার সঙ্গে সম্বন্ধরূপ ঘটনা কিভাবে হবে? যে দুটি পদার্থ বিদ্যমান তাদের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভব হয়। বিদ্যমানে ও অবিদ্যমানে অথবা দুটি অবিদ্যমানে পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। অভাব পদার্থ মিথ্যা বা তুচ্ছ। সুতরাং তার 'উৎপত্তির পূর্বে' এই মর্যাদা স্থান পেতে পারে না।[2] রাজা পূর্ণব্রহ্মার অভিষেকের পূর্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা হয়েছিল, এ বাক্য যেমন নিরর্থক, পূর্বোক্ত বাক্যও সেইরূপ। কারকব্যাপারের পূর্বে বন্ধ্যাপুত্র যেমন অসৎ, কার্যভাবও তেমনি অসৎ।

কার্য যদি পূর্ব থেকেই থাকে, তবে কর্তার প্রয়োজন কি। কার্যের জন্য যত্নবান হবারই বা কি প্রয়োজন। এর উত্তর হল কার্য থাকে বটে, তবে কার্যের আকারে থাকে না, সেহেতুই কর্তার ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। কারক ব্যাপার কার্যের আকার প্রাপ্ত করায়, সুতরাং তা অনর্থক নয়। আকারের বিশেষ থাকলেই যে বস্তু ভিন্ন হয়, তা নয়। কোনও ব্যক্তি একসময় সংকুচিত হস্ত পদ, অন্য সময় প্রসারিত হস্ত পদ—এই দুটি ভিন্ন আকারে পরিদৃষ্ট হলেও একই ব্যক্তি। মানুষের দেহ দিন দিন পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তাতে জন্ম ও উচ্ছেদ হয় না। দুগ্ধতে উচ্ছেদ ও দধিতে জন্ম দৃষ্ট হয়, সেকারণে উক্ত বস্তুদ্বয় ভিন্ন, একথা বলা চলে না, কেননা দুগ্ধই দধির আকারে

1. ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৮৪ সূত্র।
2. ব্রহ্মসূত্র ২।১।১২ সূত্র।

এবং মৃত্তিকাই ঘটের আকারে প্রত্যক্ষ হয়। বটবৃক্ষ বটবীজে সূক্ষ্মতা হেতু অদৃশ্য থাকে, পরে স্বজাতীয় অবয়বের (পরমাণুর) প্রবেশ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তখন তা অঙ্কুররূপে দৃষ্ট হয়। ঐ ভাবে দৃষ্টিগোচর হওয়ার নামই জন্ম এবং অবয়বের ক্ষয়বশতঃ দৃষ্টিপথের অতীত হওয়ার নাম উচ্ছেদ বা বিনাশ।

উৎপত্তির পূর্বে কার্য থাকে না, কোন আকারে থাকে না, একথা বলা হলে কর্তার ক্রিয়ার নিষ্ফলতা সূচিত হবে, কারণ, অভাব (যা নেই, তাই) কারও বিষয় হয় না। অযোগ্য বিষয়ে কোন কারক কৃতকার্য হয় না। শত শত খড়্গাদি অস্ত্র প্রয়োগ করলেও আকাশের ছেদ ভেদ সংঘটন হয় না।

শ্রুতিতে সৎ শব্দের উল্লেখ থাকাতেও উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অস্তিত্ব ও কারণের সঙ্গে তার ভিন্নতা জানা যায়। শ্রুতিতে বলা হয়েছে, "কেহ কেহ বলেন যে, এর সব আগে অসৎ ছিল। কিন্তু অসৎ থেকে কিভাবে সতের উৎপত্তি হতে পারে?" কাজেই এভাবে তার প্রতিবাদ করে 'সৎ-ই ছিল' শ্রুতি এরূপ অবধারণ করেছেন। শ্রুতিতে ইদং শব্দের দ্বারা সূচিত জগৎ-কার্যের সঙ্গে 'সৎ'-শব্দের দ্বারা বোধ্য ব্রহ্মকারণের অভেদ অভিহিত হওয়াতে কার্যের সত্তা ও কারণের সঙ্গে তার অভিন্নতা প্রতীত হয়। কার্য কারণ থেকে অভিন্ন। গুটান বস্ত্রকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায় না, কিন্তু সেটি প্রসারিত হলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে গুটান বস্ত্র ও প্রসারিত বস্ত্র ভিন্ন নয়, একই। সুতো অবস্থাতে বস্ত্রকে বোঝা যায় না, তন্তুবায়ের দ্বারা নির্মিত হলে বোঝা যায়, তখন তাতে বস্ত্রজ্ঞান জন্মায়। সুতরাং কার্য ও কারণ অভিন্ন। যাকে উৎপত্তি বলা হয় তা অবভাস মাত্র। যা সৎ তা অপরিনামী। ব্রহ্ম-ই সৎ, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত।

(IV) জৈনমত খণ্ডন ঃ জৈনমতে প্রত্যেক বস্তুর অসংখ্য ধর্ম (অনন্তধর্মকং বস্তু)। বস্তু সম্পর্কে অনপেক্ষভাবে কিছুই বলা যায় না। যা বলা যায় তা আপেক্ষিকভাবে সত্য, ঐকান্তিভাবে সত্য নয়। কাজেই প্রতিটি বক্তব্যের পূর্বে, 'স্যাৎ' শব্দ ব্যবহার করা উচিত। জৈনমতে 'নয়' (Judgment) সাত প্রকার। (১) স্যাৎ অস্তি, (২) স্যাৎ নাস্তি, (৩) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ, (৪) স্যাৎ অবক্তব্যং, (৫) স্যাৎ অস্তি চ অব্যক্তব্যং চ, (৬) স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যং চ, (৭) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যং চ। এই সাত নয়ের কোন একটি প্রয়োগ করে দ্রব্যের বর্ণনা দিতে হয়। ব্রহ্মসূত্রে এই মতের সমালোচনায় বলা হয়েছে, এক পদার্থে এককালে বহু বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ হয় না[1]। শঙ্কর মতে জৈনমত যুক্তি-বিরুদ্ধ, কেন না তা অসম্ভব। যেমন,

---

1, ব্রহ্মসূত্র ২।২।৩৩ সূত্র।

কোন বস্তু একই সময়ে শীতল ও উষ্ণ, দ্বিরূপ হয় না, তেমনি কোনও পদার্থে যুগপৎ সৎ ও অসৎ, এরূপ দুটি বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ সম্ভব হয় না। জৈনমত স্বীকার করলে স্যাদবাদও ভ্রান্ত হবে। অনপেক্ষকে (Absolute) স্বীকার না করলে আপেক্ষিককে (Relative) স্বীকার করা চলে না। কিন্তু জৈনরা অনপেক্ষকে অস্বীকার করেছেন। শঙ্কর মতে জৈনমত উন্মত্ত ব্যক্তির বাক্যের মত অগ্রাহ্যের বিষয়।

শঙ্করমতে জৈনমত স্বীকৃত জীবাত্মার মধ্যমপরিমাণতাও সংরক্ষিত হয়নি।[1] মধ্যম পরিমাণ ও শরীর পরিমাণ সমানার্থ। জৈনমতে আত্মার পরিমাণ শরীরের সমান। কিন্তু বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যে শরীরের পরিমাণ বিভিন্ন। সুতরাং আত্মার পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়, এই মত দোষযুক্ত। আত্মা যদি শরীর পরিমিত হয় তাহলে আত্মা হয়ে পড়ে অপূর্ণ, অব্যাপী অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন এবং সেকারণে অনিত্য। জৈন হয়ত একথা বলতে পারেন যে, বৃহৎ শরীর প্রাপ্তির সময় আত্মার বৃদ্ধি হয় এবং অল্পশরীর প্রাপ্তির সময় আত্মা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই মত স্বীকার করলে শঙ্করের মতে আত্মাকে বিকারশীল মনে করতে হয়। সে ক্ষেত্রে আত্মা অনিত্য হয়ে পড়ে। আত্মাকে অনিত্য বলা হলে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থা বিনষ্ট হবে। জৈনরা মুক্তাবস্থায় জীবপরিমাণকে নিত্য বলে। কাজেই মোক্ষের পূর্বেও আত্মার পরিমাণের কোন তারতম্য হতে পারে না। কাজেই শরীর অনুসারে আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে না।[2]

(৫) বৌদ্ধমত খণ্ডনঃ (a) সর্বাস্তিবাদমত খণ্ডনঃ শঙ্করাচার্য বৈভাষিক এবং সৌত্রান্তিক, এই দুই বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে সর্বাস্তিবাদী আখ্যাত করেছেন। যারা সর্বাস্তিবাদী তারা বলে ঘটপটাদি বাহ্য পদার্থও আছে, জ্ঞানাদি আন্তর পদার্থও আছে। উভয়ই সত্য। বাহ্য পদার্থ হয় ভূত কিংবা ভৌতিক, আন্তর পদার্থ হয় চিত্ত ও চৈত্ত।

শঙ্করাচার্য বলেন, সর্বাস্তিবাদীরা মনে করে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ ভূত; রূপাদি ও রূপাদি গ্রাহক চক্ষু প্রভৃতি ভৌতিক। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চার প্রকার পরমাণু পরস্পর সংঘাত প্রাপ্ত হয়ে পরিদৃশ্যমান ভৌতিক পদার্থ উৎপাদন করে। আর রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার, এই পঞ্চস্কন্ধ হল আন্তর। এরা সংহত হয়ে আন্তর ব্যবহার নির্বাহ করছে।

শঙ্করাচার্যের মতে এই ভূত-ভৌতিক রূপ সংঘাত এবং পঞ্চস্কন্ধরূপ সংঘাত কখনও সংঘটিত হতে পারে না; কেননা পরমাণুও অচেতন, স্কন্ধও অচেতন। অচেতন ক্ষণিক পরমাণু এবং অচেতন ক্ষণিক স্কন্ধের পক্ষে, কোন চেতন সত্তার অনুপস্থিতিতে সংহত

1. ব্রহ্মসূত্র ২।২।৩৪
2. ব্রহ্মসূত্র ২।২।৩৫

হওয়া সম্ভব নয়। বিরুদ্ধবাদীরা ভোগ করে, শাসন করে, নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোন চেতন সত্তা স্বীকার করে না। পরমাণু ও স্কন্ধসকল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংহত হয়, একথা বলা হলে অবিশ্রান্ত সৃষ্টিকার্য চলতে থাকবে, প্রলয় ও মোক্ষ সম্ভব হবে না। স্কন্ধ সকল যেহেতু ক্ষণিক, উৎপন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, মিলিত হবার কোন অবসরই পাবে না।

বৌদ্ধমতে অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন হয়। কাজেই এরা নিরন্তর আবর্তিত হওয়ার জন্য সংহত হতে পারে। কিন্তু শঙ্করাচার্য বলেন, এরা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন হয়, এটি স্বীকার করে নিলেও এদের সংহত হবার কোন কারণ নেই। কেননা অবিদ্যাদি পরস্পরের উৎপত্তির ব্যাপারে নিমিত্ত কারণ হতে পারে, কিন্তু সংঘাতের জনক হতে পারে না। অবিদ্যাদিরূপ কারণ আছে সত্য, কিন্তু তাদের মধ্যে পূর্ববর্তী ঠিক পরবর্তীর উৎপত্তির কারণ হতে পারে, সংঘাতের কারণ হতে পারে না। ক্ষণিক পরমাণুর পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বৈশেষিকদের নিত্য পরমাণুপুঞ্জের পক্ষেই যখন মিলিত হওয়া সম্ভব নয়, তখন কিভাবে ক্ষণিক, কর্তৃভোক্তৃরহিত ও আশ্রয়াশ্রয়িভাবশূন্য বৌদ্ধদের পরমাণু-পুঞ্জের পক্ষে তা সম্ভব?

বৌদ্ধরা মনে করে কারণের ধ্বংস হবার পর কার্যের উৎপত্তি হয়। বীজের ধ্বংস না হলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। দুগ্ধ বিনষ্ট হলে দধি উৎপন্ন হয়।[1] শঙ্করের মতে অভাব থেকে ভাব-এর উৎপত্তি হয় না। তাই যদি হত, তাহলে যে কোন বস্তু থেকে যে কোন বস্তুর উৎপত্তি ঘটত। শশকশৃঙ্গ থেকে কখনও কিছু উৎপন্ন হতে পারে না। কেননা শশকশৃঙ্গ মিথ্যা। কাজেই পরমাণু থেকে ভূত-ভৌতিক সকল উৎপন্ন হয়, একথা বলে বৌদ্ধগণ মানুষকে অযথা ব্যাকুল করে তুলেছে।

(b) বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মত খণ্ডন: বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মতে বাহ্য বস্তুর কোন সত্তা নেই, সব বাহ্য বস্তু স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত মনের ভাব বা ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যোগাচারবাদীরা যেসব যুক্তি দিয়েছেন শঙ্করাচার্য সেগুলি তাঁর ভাষ্যে উদ্ধৃত করেছেন।[2] (১) বাহ্য বস্তুর, মনে করা যাক কোন স্তম্ভের, অস্তিত্ব যদি থাকে হয় সেগুলি পরমাণু, নয় পরমাণুপুঞ্জ। কিন্তু বাহ্য বস্তু কোনটিই নয়। কেননা বস্তু পরমাণু, অথচ জ্ঞান হবে স্তম্ভ। তা কিভাবে হয়?

---

1. ব্রহ্মসূত্র ২।২।২৬ ও ২।২।২৮ সূত্র।
2. শঙ্কর ভাষ্য, ২।২।২৯ সূত্র।

পরমাণুপুঞ্জও স্তম্ভ নয়, কেননা পুঞ্জ পরমাণু থেকে ভিন্ন কি অভিন্ন তা নিরূপণ করা কঠিন। সেহেতু বাহ্য বস্তুর কোন সত্তা নেই। (২) যাঁরা বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন তাঁরা বস্তুর উপলব্ধির জন্য জ্ঞানের প্রকারভেদ স্বীকার করেন। যেমন—ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, স্তম্ভজ্ঞান ইত্যাদি। জ্ঞানের বিষয়াকার ছাড়া জ্ঞানের এই প্রকারভেদ স্বীকার করা চলে না। জ্ঞানের বিষয়াকার হওয়া স্বীকার করে নিলে বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। (৩) জ্ঞানের ও বিষয়ের সহোপলব্ধির নিয়ম আছে অর্থাৎ বিষয় ও জ্ঞানের একত্র অনুভব হয়। সুতরাং বিষয় ও জ্ঞানের অভেদ স্বীকার করতে হয়, কাজেই বিষয় চেতনা ছাড়া কিছুই নয়। (৪) বাহ্য বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই, অথচ তার জ্ঞান যে হয়, স্বপ্নদর্শন ইন্দ্রজাল, মরু মরীচিকায় জল দর্শন প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং জাগ্রত অবস্থায় স্তম্ভ জ্ঞানও যে অনুরূপ জ্ঞান, এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। (৫) বিচিত্র বাসনার জন্য বিচিত্র জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

শঙ্কর এই সব যুক্তি এভাবে খণ্ডন করেছেন: (১) জ্ঞানে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়, সুতরাং তার নাস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে না। ভোজনের দ্বারা উদরপূর্তি করার পর যদি বলা হয় যে, আমি ভোজন করিনি, তা যেরূপ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য বস্তুর সন্নিকর্ষের ফলে বাহ্য বস্তুর অনুভব হবার পর বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা তদ্রূপ। যোগাচারবাদীরা বলেন যে, মানসিক প্রত্যয়গুলি বাহ্য বস্তুর মতন অনুভূত হয়। শঙ্করাচার্যের মতে বাহ্য বস্তুর যদি বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকে তাহলে মানসিক প্রত্যয় বাহ্য বস্তুর মত প্রতীয়মান হতে পারে না। [1]বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যাপুত্রের মত প্রকাশিত হচ্ছে একথা কেউ বলে না। বাহ্য বস্তু প্রকৃতই বাহ্য বস্তুরূপে প্রকাশিত হয়, বাহ্য বস্তুর মতন প্রকাশিত হয় না। (২) বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব নয় একথা বলা চলে না। কারণ সব প্রমাণেই বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। (৩) জ্ঞান এবং জ্ঞেয়কে কেহ পৃথক দেখে না। কিন্তু তার দ্বারা জ্ঞান এবং জ্ঞেয়র অভেদত্ব প্রমাণিত হয় না। একত্রে উপলব্ধ হয় বলেই জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভিন্ন নয়, সাধ্য সাধক (উৎপাদ্য উৎপাদক) বলেই একত্রে উপলব্ধ হয়। ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের বেলায় ঘট পটই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, শুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন নয়। সুতরাং বস্তু ও বস্তুর জ্ঞান পৃথক। মানসিক প্রত্যয় অনুভূত হয়, সে কারণে তার অস্তিত্ব আছে একথা যদি বলা হয় তাহলে বাহ্য বস্তুও অনুভূত হয়, সেহেতু তার অস্তিত্বও স্বীকার করতে হয়। বিজ্ঞান বা চেতনা প্রদীপের মত স্বয়ংপ্রকাশ একথা বলা অগ্নি নিজেকে দগ্ধ করে একথা বলার সমতুল্য। শঙ্কর মতে জ্ঞান অনিত্য, কিন্তু তার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে ; কিন্তু সাক্ষী চৈতন্য

1. শঙ্কর ভাষ্য, ২।২।২৮

(Permanent self) স্বপ্রকাশ এবং অস্তিত্বের জন্য অন্য নিরপেক্ষ। (৪) স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু এবং জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্ট বস্তু এক নয়। কারণ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রদবস্থায় বাধিত হয়। কিন্তু জাগ্রত জ্ঞান সেরূপ বাধিত হয় না। (৫) বাহ্য বস্তু ছাড়াও বাসনা বৈচিত্র্য জ্ঞান বৈচিত্র্য উৎপন্ন করতে পারে, এর উত্তরে শঙ্কর বলেন যে, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলে বাসনার অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে না। বাহ্য বস্তুর উপলব্ধিই বাসনা জন্মায়।

(c) **বৌদ্ধদের ক্ষণিকবাদ খণ্ডন :** বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে ক্ষণস্থায়ী ভৌতিক পদার্থের সংঘাত (aggregate) থেকেই সব বস্তুর উৎপত্তি[1]। কিন্তু শঙ্করের মতে যা ক্ষণিক তার পক্ষে কার্য করা সম্ভব নয়। পূর্বক্ষণ এবং পরক্ষণের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ক্ষণিকবাদীদের মতে পরক্ষণ জন্মান মাত্রই পূর্বক্ষণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাজেই ধ্বংস হচ্ছে বা ধ্বংস হয়েছে এমন যে পূর্বক্ষণ, অভাব হেতু পরবর্তী ক্ষণের অনুৎপাদক হতে পারে না। যদি বলা যায় যে, পূর্বক্ষণ থাকাকালীন বা ভাবাবস্থায় উত্তর ক্ষণের উৎপাদক হয় তাহলে ক্ষণিকবাদ খণ্ডিত হয়। কেননা তাহলে পূর্বক্ষণকে দ্বিতীয়ক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে। কিন্তু ক্ষণিকবাদ অনুযায়ী কোন বস্তু এক ক্ষণের অধিক স্থায়ী হতে পারে না। যদি এমন কথা বলা যায় যে, পূর্বক্ষণের উৎপত্তিই পরক্ষণের উৎপাদক, তাহলেও সমস্যার সমাধান হয় না। কেননা, কেবলমাত্র পূর্বক্ষণের উৎপত্তিই কার্য বা পরক্ষণ উৎপাদন করতে পারে না যদি পূর্বক্ষণের সঙ্গে পরক্ষণের কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না হয়। এক্ষেত্রে কার্য কারণ উভয়ই ক্ষণস্থায়ী হওয়াতে উভয়ের মধ্যে সংযোগ সম্ভব নয়। কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ ছাড়া কার্য জন্মাতে পারে না। কার্যকারণের মধ্যে সম্বন্ধ ছাড়া যদি কার্য উৎপন্ন হত তাহলে যে কোন কারণ যে কোন কার্য উৎপাদন করতে পারত, কিন্তু তা যখন হয় না তখন স্বীকার করতেই হবে যে, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের প্রয়োজন আছে।

[2]শঙ্করাচার্য বলেন যে, সব বস্তুই যদি ক্ষণিক হয় তাহলে অনুভব কর্তা আত্মাকেও ক্ষণিক বলতে হয়, কিন্তু অনুভব কর্তা ক্ষণিক হতে পারে না তাহলে বস্তুর প্রত্যক্ষণ ও বস্তুর স্মরণ—এই দুই ক্রিয়ার কর্তা ভিন্ন নয়। তাই যদি হত তাহলে এক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করত এবং অন্য বক্তি স্মরণ করত কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব অভিজ্ঞতার কর্তা 'একই আমি'। অর্থাৎ আমার ব্যক্তি-অভিন্নতা (Personal identity) বোধই ক্ষণিকত্ব মতবাদকে খণ্ডন করে। অবশ্য বৌদ্ধরা একথা

1. "উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ।"—ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২০
2. "অনুস্মৃতেশ্চ"—ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৫

বলতে পারেন যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞান এক কর্তার নয়। বিভিন্ন কর্তার বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য হেতু ও বিভিন্ন জ্ঞান অবিচ্ছেদে উৎপন্ন হওয়াতে সেগুলি এক বলে প্রতীত হয়। শঙ্করাচার্যের মতে উপরিউক্ত মতবাদের বিপক্ষে একথা বলা যেতে পারে যে, 'এটি সেইটির সদৃশ'—এই জ্ঞানের জন্য একজন স্থায়ী বোদ্ধার প্রয়োজন, যিনি দুটি জ্ঞানকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে তাদের সাদৃশ্যটুকু বুঝে নিতে পারেন। কিন্তু ক্ষণিকবাদ অনুযায়ী কোন স্থায়ী বোদ্ধার অস্তিত্ব নেই। কোন স্থায়ী বোদ্ধার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে এই সাদৃশ্যের অনুসন্ধান সম্ভব নয়।

(d) ***ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ—এই মতবাদের খণ্ডন ঃ** কোন কোন দার্শনিকের মতে ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্ত কারণ। সেশ্বর সাংখ্য মতে ঈশ্বর প্রকৃতি পুরুষের অধিষ্ঠাতা, জগতের নিমিত্ত কারণ। শৈব মতে ঈশ্বর এ জগতের নিয়ন্তা ও নিমিত্ত কারণ। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণও ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণতা স্বীকার করেন।

শঙ্করাচার্যের মতে, ঈশ্বর যদি জগতের নিমিত্ত কারণ হয় তাহলে ঈশ্বরের রাগদ্বেষাদি আছে অনুমান করতে হয়, যেহেতু তিনি হীন, মধ্যম ও উত্তম প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। যদি বলা হয় জীবের কর্মানুযায়ী ঈশ্বরের প্রবৃত্তি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবের কর্ম সাধন, তাহলে, এ সিদ্ধান্ত পরস্পরাশ্রয় দোষদুষ্ট হবে। রাগ দ্বেষাদি ছাড়া কোন ব্যক্তি স্বার্থে বা পরার্থে প্রবৃত্ত হয় না। তাহলে ঈশ্বর যখন প্রযোজক তখন ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের হানি হয়। যোগ মতে ঈশ্বর পুরুষবিশেষ। কিন্তু পুরুষ উদাসীন। ঈশ্বর উদাসীন বা নিষ্ক্রিয় অথচ প্রযোজক, এ সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরোধী। সেশ্বর সাংখ্যমত অনুযায়ী ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র অথচ তাদের নিয়ন্তা, কিন্তু কোন রকম সম্বন্ধযুক্ত না হয়ে ঈশ্বরের পক্ষে প্রকৃতি ও পুরুষ-কে (জীবাত্মাকে) নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর এই তিন-ই সর্বব্যাপী ও নিরবয়ব হওয়াতে এদের সংযোগ সম্বন্ধ অসম্ভব। কেহ কারও আশ্রিত নয়, সে কারণে সমবায় সম্বন্ধও অসম্ভব। কার্য-কারণ সম্বন্ধ থেকে অনুমান করা করা যায় এমন কোন সম্বন্ধের বিষয়ও অনুমানগম্য নয়, কারণ ঈশ্বর জগতের কারণ তা এখনও নির্ণীত হয়নি। রাজা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত হওয়ার জন্য প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরের দেহ ইন্দ্রিয়াদি না থাকার জন্য প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের শরীর থাকতে পারে না। কারণ সৃষ্টির পূর্বে শরীর উৎপন্ন হতে পারে না। ঈশ্বরের যদি শরীর না থাকে তাহলে ঈশ্বরকে নিয়ন্তা বা প্রবর্তক বলা চলে না। শরীরযুক্ত চেতন কর্তাই প্রবর্তক হতে পারে।

* ব্রহ্মসূত্র, ২।২।৩৭ ; ২।২।৩৮

অশরীরীর প্রবর্তকতা দেখা যায় না। আবার ঈশ্বরের শরীর কল্পনা করলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের হানি ঘটে।

(গ) তত্ত্ববিদ্যা : (i) আত্মা : শঙ্করের মতে আত্মাই ব্রহ্ম। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতি বাক্যেই জীবাত্মার ও পরমাত্মার অভেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শঙ্করের মতে যা দেশ ও কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এবং যা সর্ববিভেদ বর্জিত তাকে সৎ বলে। শঙ্করের মতে আত্মাই একমাত্র সৎ বস্তু। অন্য সব কিছুই অসৎ। প্রত্যেক জীবই আত্মাকে 'অহং' বা আমি রূপে জানে। সব কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায়, কিন্তু নিজের অস্তিত্ব বা আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে গিয়েই তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। আত্মার অস্তিত্বে সংশয় করা চলে না, কারণ সংশয়ই আত্মার দ্বারা সিদ্ধ হয়। স্বীকৃতি, অস্বীকৃতি, সংশয়, সকল কিছুর ক্ষেত্রেই আত্মার অস্তিত্ব পূর্ব থেকে অনুমান করে নিতে হয়। আত্মা আগন্তুক নয়, কারও কার্য নয়; আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মার অস্তিত্ব অন্যের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। অন্যের অস্তিত্বই আত্মার দ্বারা সিদ্ধ হয়।[1] প্রমাণের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। প্রমাণাদি আত্মার অস্তিত্ব হেতু কার্যকরী হয়। আত্মা স্বপ্রকাশ, সর্বজ্ঞানসাক্ষী সর্বাভাসক; কাজেই সে আত্মা কখনও আছে, কখনও নেই, এরূপ প্রতিপাদন অসম্ভব। আগন্তুক (derivative) পদার্থ-ই নিষেধের যোগ্য, অর্থাৎ তার কখনও ভাব, কখনও অভাব প্রতিপাদন সম্ভব, যা অনাগন্তুক ও আত্মরূপ, তা কারও নিষেধ্য নয়। আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ও আত্মা একই পদার্থ। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ"। এই আত্মাই ব্রহ্ম, সকলেই তাকে অনুভব করতে পারে।

আত্মাই ব্রহ্ম

আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ

আত্মাকে সকলেই প্রত্যক্ষ করে কিন্তু ঐ প্রত্যক্ষে আত্মার যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ পায় না। সেই কারণেই আত্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয়। কেহ মনে করে, আত্মা চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ; কেহ মনে করে আত্মা চেতন ইন্দ্রিয় সমষ্টি। কারও মতে মনই আত্মা। আবার কারও মতে ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞান প্রবাহই আত্মা, আবার কারও মতে আত্মা কোন পদার্থ নয়, শূন্যতারই নাম আত্মা। কিন্তু উপরিউক্ত কোন বর্ণনাই শঙ্করের মতে আত্মার যথার্থ স্বরূপের বর্ণনা নয়। শঙ্করভাষ্যের ভূমিকায় অর্থাৎ 'অধ্যাস

আত্মার যথার্থ স্বরূপ বা জ্ঞানের জন্যই আত্ম বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয়

1. ব্র. সূঃ. শঙ্কর ভাষ্য ২'৩'৭

ভাষ্যে' শঙ্কর বলেছেন যে, 'আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা, আমি শ্রোতা,' এই ভাবে আমরা আত্মাকে বোঝার চেষ্টা করি। দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের ধর্মকে আত্মার ওপর আরোপ করি যা প্রকৃত আত্মার ধর্ম নয়। শঙ্কর বলেছেন যে, এ সবই অধ্যাসমূলক। অধ্যাস মানে ভ্রম। এক বস্তুর জ্ঞানই হল অধ্যাস। —অধ্যাসবশতঃ দুটি পৃথক বস্তুকে অভিন্ন মনে করা হয় বা একের ধর্ম অপরে আরোপ করা হয়। বস্তুতঃ, আত্মা, স্থূল, কৃশ, কর্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা কোনটিই নয়। এ আত্মার যথার্থ রূপ নয়, আত্মার ভ্রান্ত রূপ। আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় কোনটিই নয়। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ।

অধ্যাসবশতঃ দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করা হয়

আত্মা যে নির্বিশেষ চৈতন্য সুষুপ্তিতেই তার আভাষ পাওয়া যায়। সাধারণ অভিজ্ঞতার বা জ্ঞানের তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় মানুষ নিজেকে স্থূল শরীর এবং বহিঃ ও অন্তঃ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে। এ অবস্থায় বিষয়ী ও বিষয়ের পার্থক্য থাকে। উভয়ই পৃথকভাবে সত্য বলে মনে হয়। স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানের বিষয় জাগ্রদবস্থার জ্ঞানের বিষয়ের মত সত্য নয় বটে, তবে এই অবস্থায়ও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র পার্থক্য থাকে। কিন্তু সুষুপ্তিকালে শুধু আত্ম-চৈতন্য থাকে, কোন বিষয় বা বিষয়ের স্মৃতি থাকে না, যা জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সুষুপ্তিতেই জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। সাধক তূরীয় অবস্থায় এই স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন।

সুষুপ্তিতেই জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়

আত্মা চৈতন্যমাত্র স্বরূপ। আত্মার অন্তর্বাহ্য নেই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ বা আকার নেই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সার্বকালিক রূপ। যেরূপ লবণ-পিণ্ডের অন্তরে ও বাইরে লবণরস, রসান্তর নেই, সেরূপ আত্মা অন্তরে ও বাইরে চৈতন্যরূপী, তাতে চৈতন্যাতিরিক্ত রূপ নেই। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, আত্মা সকল জ্ঞানের প্রকাশক। আত্মা কখনও জ্ঞানক্রিয়ার বিষয় হয় না। তবে জ্ঞানের বিষয় না হলেও আত্মা আমাদের যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়ায় বর্তমান। সব জ্ঞানে আত্মা প্রকাশিত বলে কেউ আত্মার অস্তিত্বে সন্দিহান হয় না। আত্মা ভোক্তাও নয়, কর্তাও নয়। বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হওয়ার জন্যই আত্মাকে ভোক্তা বা কর্তা মনে হয়। আত্মা কর্মফল ভোগ করে না, আত্মা জন্ম-মৃত্যুর অধীন নয়। আত্মা কর্তা নয়, [1]আত্মা নিষ্ক্রিয়। চৈতন্যের যদি ক্রিয়া থাকত, তাহলে চৈতন্যের পরিবর্তন ঘটত, তাহলে চৈতন্য নিত্য হতে পারে না। আত্মা অপরিবর্তনীয়

আত্মা চৈতন্যমাত্র স্বরূপ

1, ব্রঃ সূঃ—শঙ্কর ভাষ্য ১।১।৪

এবং অনাদি। পরিবর্তন অভাব সূচনা করে। আত্মার কোন অভাব নেই, সেহেতু তার কোন পরিবর্তন নেই। আত্মা নির্বিশেষ, নিত্য, নিষ্ক্রিয়, অখণ্ড এবং অনাদি। [1]আত্মা সর্ব প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সকল জ্ঞানের সাক্ষীরূপে চৈতন্য বর্তমান থাকে, তাই জগতের পরিবর্তন বোধগম্য হয়। আত্মা নির্বিশেষ, কারণ আত্মাতে বিষয়ী, বিষয়, কারক, ক্রিয়া ফল এ সবের কোন ভেদাভেদ নেই। আত্মা নিত্য, অনাদি ও অখণ্ড।

আত্মা নির্বিশেষ, নিত্য, নিষ্ক্রিয়, অখণ্ড এবং অনাদি

আত্মা নিরুপাধি। আত্মা দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত। আত্মা অদ্বৈত। অবিদ্যার জন্যই আত্মাকে বহু মনে হয়। আত্মা গ্রাহক নয় বা গ্রাহ্য নয়। অবিদ্যার জন্যই বিষয় ও বিষয়ীর ভ্রান্তি জন্মায়। আত্মা নির্গুণ। জ্ঞান আত্মার আগন্তুক ধর্ম নয়। আত্মাই উপলব্ধি স্বরূপ। আত্মা নিত্য বা বোধস্বরূপ, আত্মা বোধক্রিয়াশক্তিমান নয়। আত্মা নিষ্প্রপঞ্চ, আত্মা চৈতন্যানন্দঘন। আত্মাই ব্রহ্ম। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন।

(ii) ব্রহ্ম ঃ শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক। তাঁর মতে ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে; আর কোন কিছুর সত্তা তিনি স্বীকার করেননি। নির্বিশেষ পরমাত্মা

নির্বিশেষ চৈতন্য বা শুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্ম

বা শুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্ম। বৃহ + মন্ = ব্রহ্ম। বৃহ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি, যার অন্য নাম মহত্ত্ব। মন্ প্রত্যয়ের অর্থ অতিশয়। যার থেকে বড় বা ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নেই, যিনি মহত্তম তিনিই ব্রহ্ম। আত্মার অস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ, আত্মার অস্তিত্বেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব।[2] "আত্মা চ ব্রহ্ম।" আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। [3]ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। সকল

ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত

প্রকার দোষমুক্ত হওয়াতে ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ। ব্রহ্ম জড়াত্মক নয়, সেহেতু নিত্যবুদ্ধ এবং ব্রহ্মের কোন সামান্য বা বিশেষ নেই, সেকারণে ব্রহ্ম সর্বধর্ম বিশেষ বর্জিত। ব্রহ্ম অনন্ত, অসীম। ব্রহ্ম দিক দেশকালাদি ভেদশূন্য। ব্রহ্মের বাইরে কোন কিছু নেই, সেকারণে ব্রহ্ম অসীম। ব্রহ্ম নিরুপাধি। ব্রহ্ম দেশ, কাল ও উপাধি, এই তিন উপাধিমুক্ত। ব্রহ্ম নির্গুণ। কোন পদার্থে গুণ

ব্রহ্ম নিরুপাধি, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নিত্য

আরোপ করার অর্থ তাকে সীমিত করা, অবিদ্যা হেতু নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ মনে হয়। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, কারণ ব্রহ্মের কোন অভাব নেই, সেহেতু কোন পরিবর্তনও নেই। ক্রিয়া পরিবর্তন ও অভাব সূচনা করে। ব্রহ্ম নিত্য, এই জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ, ব্রহ্ম থেকেই অভিব্যক্ত। জগতের অন্যান্য বস্তু

---

1. মাণ্ডুক্যকারিকা—শঙ্কর ভাষ্য ৪।৬০।৯২
2. —ব্রহ্ম সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য। ১।১।১
3. "অস্তি তাবৎ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম"—ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ১।১।১

পরিবর্তনশীল, বিকারী, পরিণামী কিন্তু সব পরিবর্তনের মধ্যেও ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন বা বিকার নেই।[1] ব্রহ্ম স্থির, নিত্য ও অচঞ্চল। যে পদার্থের যে স্বভাব নিশ্চিত আছে সেই স্বভাবের পরিবর্তন বা অবস্থান্তর হয় না। ব্রহ্ম নিজ স্বরূপে অবিকৃত থেকেও জগৎ রূপে পরিণত হয়ে আছেন।

ব্রহ্ম নিরবয়ব, ব্রহ্ম স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য। একই জাতির অন্তর্ভুক্ত দুটি বস্তুর মধ্যে যে ভেদ তাকে স্বজাতীয় ভেদ বলে। যেমন একটি অশ্বের সঙ্গে আর একটি অশ্বের ভেদ। ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদ নেই, কারণ ব্রহ্মের সদৃশ অন্য কোন বস্তু নেই যার থেকে ব্রহ্মের ভেদ নিরূপণ করা যেতে পারে। দুটি ভিন্ন জাতির যে ভেদ তাকে বলে বিজাতীয় ভেদ, একটি অশ্বের সঙ্গে একটি গরুর ভেদ বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্মের অসদৃশ কোন বস্তু নেই, যার থেকে ব্রহ্মকে পৃথক করা যেতে পারে। একটি অশ্বের দেহের বিভিন্ন অংশের ভেদকে স্বগত ভেদ বলে। ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, সেহেতু নিরবয়ব, কাজেই ব্রহ্মের স্বগত ভেদ নেই।

ব্রহ্ম স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য

ব্রহ্ম সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মের লক্ষণ নয়। শঙ্করের মতে যা সৎ তা কখনও অসৎ হতে পারে না এবং যা অসৎ তা সৎ হতে পারে না। আবার অসতের থেকে সতের বা [2]অভাবের থেকে ভাবের উৎপত্তি হতে পারে না। কাজেই সব কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও এক পরম সত্যের অস্তিত্বকে স্বীকার না করে উপায় নেই। এই পরম 'সৎ' পরিপূর্ণ ভাবে সত্য, এই সৎ হল শাশ্বত ও স্বয়ম্ভূ। এই সৎ অদ্বৈত। ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সৎ, অবিদ্যা হেতু অদ্বৈত ব্রহ্মই বহু বলে প্রতিভাত হয়, যা সৎ স্বরূপ তাই চিৎস্বরূপ, সৎই চিৎ, চিৎই সৎ। "অথ সত্তৈব বোধঃ, এব চ সত্তা, নানয়োঃ পরস্পরব্যাবৃত্তিরস্তীতি,।" সত্তাই বোধ, বোধই সত্তা, উভয়ের পরস্পর ভেদ নেই। ব্রহ্ম নিত্যতৃপ্ত, সেহেতু ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সুষুপ্তিতেই ব্রহ্মের এই আনন্দস্বরূপের কথা অবগত হওয়া যায়। 'বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম।' সেই পরম আনন্দের এক ভগ্নাংশকে আশ্রয় করে জগৎ অবস্থান করছে। 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'। 'ব্রহ্ম পরিপূর্ণ সৎ, অসীম চৈতন্য, পরম আনন্দ'। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের বিশেষণ নয়, ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন তাহলে তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ হবেন কি করে?

ব্রহ্ম সচ্চি ানন্দ স্বরূপ

জগৎ ব্রহ্মের বিকাশ

1. "ন হি যস্য যঃ স্বভাবো নিশ্চিতঃ স তং ব্যাভিচরতি কদাচিদপি" (বৃহ, ভাষ্য, ২।১।১৫)
2. 'নাভাব ভাব উপদ্যতে'—শঙ্কর। বৃ-উ—২।২।২৬

তার উত্তরে বলা হয় যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি পদ অভাবের সূচক, ব্রহ্ম সৎ মানে ব্রহ্ম অসৎ বা মিথ্যা নয়; ব্রহ্ম চিৎ মানে ব্রহ্ম জড় নয় এবং ব্রহ্ম আনন্দ অর্থে ব্রহ্ম দুঃখস্বরূপ নয়।

পরব্রহ্ম বা নিগুর্ণ ব্রহ্ম সর্বধর্ম বিশেষ বর্জিত। ব্রহ্ম সর্ব প্রপঞ্চ বিবর্জিত, ব্রহ্ম নির্বিশেষ। শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্বিশেষ, এই দুই প্রকার ব্রহ্মবোধক বাক্য আছে। তিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ ব্রহ্মের বোধক, আবার তিনি স্থূল নন্, সূক্ষ্ম নন্, হ্রস্ব নন্, দীর্ঘ নন্ ইত্যাদি বাক্য নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক। সে কারণে ব্রহ্মকে উভয়লিঙ্গ বলা চলে না; কেননা বস্তু এক, অথচ তা বিশেষ বিশেষ রূপাদিযুক্ত আবার রূপাদিবিহীন বা নির্বিশেষ, এ হতে পারে না, এ বিরুদ্ধ। স্বতঃ দ্বিরূপ না হলে স্থানাধি উপাধির দ্বারাও এক বস্তু দ্বিরূপ হতে পারে না। উপাধিযোগেও এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয় না। স্বচ্ছ স্ফটিক অলক্তাদি উপাধির যোগে অস্বচ্ছ হয় না। রক্ত স্ফটিক রূপে যে প্রতীতি হয়, সে প্রতীতি ভ্রম। কাজেই ব্রহ্ম নির্বিশেষ। 'তিনি অশব্দ, অরূপ, অস্পর্শ এই সব বেদান্ত বাক্যে নির্বিশেষ ব্রহ্মই উপদিষ্ট হয়েছেন।[1] ব্রহ্ম নির্বিশেষ, সে কারণেই "নেতি নেতি" দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম এই নয়,' 'ব্রহ্ম ঐ নয়', ইত্যাদি। নির্বিকল্প, নিরূপাধি, নিষ্কল (Partless), নির্গুণ ব্রহ্ম অদ্বৈত ও অনন্ত। ব্রহ্ম অনাদি, সনাতন। ব্রহ্ম নিত্য, শাশ্বত, কূটস্থ, অজর, অমর, অক্ষয়।

জগৎ প্রপঞ্চের মূলে ব্রহ্ম। জগৎ ব্রহ্মের মায়িক বিকাশ। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

(iii) নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম : [2]উপনিষদে ব্রহ্মের দুটি রূপের কথা বলা হয়েছে। একটি সর্বোপাধিবিবর্জিত এবং অপরটি তার বিপরীত নামরূপ বিকারভেদ উপাধি বিশিষ্ট। উপনিষদে প্রথমটিকে পরব্রহ্ম এবং দ্বিতীয়টিকে অপরব্রহ্ম রূপে অভিহিত করা হয়েছে। পরব্রহ্ম হল নির্বিশেষে নির্গুণ ব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম হল সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম। অপরব্রহ্ম সপ্রপঞ্চ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। বস্তুত পর ও অপরব্রহ্ম একই। নির্গুণে ও সগুণে, নির্বিশেষে ও সবিশেষে কেবল ভাবের প্রভেদ, বস্তুতঃ কোন ভেদ নেই। আলোচনার জন্য নির্গুণ ব্রহ্মকেই নামরূপ উপাধিযুক্ত করে আলোচনা করতে হয়। লৌকিক আলোচনার জন্যই যে এ

পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম

নির্গুণ ব্রহ্মে ও সগুণ ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই

1. "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি"—শঙ্কর। বৃ-উ ৩।২।১১
2. ব্রঃ সূঃ, শঙ্কর ভাষ্য ১।১।১১

পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তা উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিই এগুলিকে সত্য বলে মনে করে। শঙ্করের মতে মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, অনির্বচনীয়। তিনি নিখিল বিশ্বের সাক্ষী অর্থাৎ স্রষ্টা বা প্রকাশক, কিন্তু নিজে বিজ্ঞাত হন না। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, তিনি নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত। তিনি অসীম ও অনন্ত। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম আপনাকে মায়াজালে আবৃত করে সগুণ সোপাধি হন।[1] নির্বিশেষে ব্রহ্ম সবিশেষ হন, তখন তাকে মহেশ্বর বলা হয়। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।" সগুণ ব্রহ্মই মায়া উপাধি উপহিত। ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তিনি সক্রিয় ও অনন্ত শক্তি ও গুণসম্পন্ন। এই ঈশ্বরই ভক্তের উপাস্য দেবতা। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নির্বিকল্পক, একরূপ। ব্রহ্মের স্বতঃ কি পরতঃ কোন ভেদ নেই। কিন্তু উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মের সবিশেষ রূপ অর্থাৎ জীব ও ও ঈশ্বরের, উপাসক ও উপাস্যের ভেদ কল্পনা করা হয়। [2]ভেদের কথা বলা হয় উপাসনার জন্য কিন্তু তার তাৎপর্য অভেদে। একই ব্রহ্ম সোপাধিকরূপে উপাস্য এবং নিরুপাধিকরূপে জ্ঞেয়। মায়িক ঈশ্বরই ভক্তের ভগবান, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী। তিনি উপাস্য ও উপাসক এই ভেদাভেদের অতীত। অবিদ্যা দূরীভূত হলে এবং আত্মজ্ঞানের উদয় হলেই অদ্বৈত ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান জন্মে। শঙ্করের মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে যে ব্রহ্ম নির্গুণ, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তিনি সগুণ। ব্রহ্মজ্ঞান হলে মায়িক ঈশ্বরের আর কোন সত্তা থাকে না।

মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর

পারমার্থিক দৃষ্টিতে যে ব্রহ্ম নির্গুণ, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তিনি সগুণ

(iv) **জগৎ ঃ** শঙ্করের মতে ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন তাহলে ব্রহ্মকে কখনও জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকরূপে কল্পনা করা যেতে পারে না। আবার জগৎ যদি সত্য হয় তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জগৎ বিনষ্ট হতে পারে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে অসৎ বিনষ্ট হতে পারে কিন্তু সৎ-এর বিনাশ ঘটতে পারে না। শঙ্করের মতে যা সৎ তা কখনও অসৎ এবং যা অসৎ তা কখনও সৎ হতে পারে না। কোন বস্তুর পক্ষে একই সময়ে সৎ ও অসৎ হওয়া সম্ভব নয়। শঙ্করের মতে এই জগতের কোন সত্তা ও সত্যতা নেই। এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত মিথ্যা অবভাস মাত্র। ঈশ্বর মায়াশক্তি প্রভাবে জগৎ রূপে প্রকাশিত

জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত মিথ্যা

1. "ভেদস্তোপাসনার্থত্বাদভেদে তাৎপর্য্যাৎ"—ব্রঃ সূঃ, শঙ্কর ভাষ্য ৩।২.১২
2. "লীলয়া বাপি যুঞ্জন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ"—ভাগবত ৩.৭।২
(নির্গুণ ব্রহ্ম লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন)।

হন এবং অবিদ্যাবশতঃ মানুষ জগতের সত্তা আছে বলে ধারণা করে। আত্মজ্ঞানের উদয় হলেই ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য, ব্রহ্মেরই যে সত্তা আছে এবং জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের ও জগতের যে কোন যথার্থ সত্তা নেই, এই সত্যের উপলব্ধি ঘটে।

শঙ্করের মতে জগৎ মায়ার সৃষ্টি। এই মায়ার কথা বেদ এবং উপনিষদেও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে 'ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'[1] অর্থাৎ ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে যে, মায়া উপাধি অঙ্গীকার করেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সগুণ হন। সগুণ ব্রহ্মই মহেশ্বর, তিনি মায়া উপাধি উপহিত। ("ময়ি নন্তু মহেশ্বরম্"—শ্বেত ৪।১০)। এই মায়ার স্বরূপ কী? শঙ্করের মতে এই মায়া এক অনির্বচনীয় শক্তি। মায়া সৎ নয়, কেননা তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ নয়। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অবিদ্যার নাশ হয়। তখন জগতের আর কোন সত্তা থাকে না। মায়ারও কোন সত্তা থাকে না। আবার মায়া অসৎও নয়। কেননা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎ সাধারণ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষের বিষয়। যা সৎ নয় তাকেই অনির্বচনীয় আখ্যা দেওয়া হয়। পাছে কেউ মনে করেন যে ব্রহ্ম এবং মায়া এই দুই সত্তার স্বীকৃতিতে অদ্বৈতবাদের হানি ঘটেছে সেহেতু শঙ্কর বলেন যে, ঈশ্বর ও মায়া অভিন্ন। অগ্নির দাহিকা শক্তিকে যেমন অগ্নি থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনি ঈশ্বরের মায়া শক্তিকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করা যায় না।

জগৎ মায়ার সৃষ্টি। মায়ার উল্লেখ বেদ ও উপনিষদে দেখা যায়

শঙ্করের মতে অজ্ঞানতাবশতঃই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। দৈনন্দিন জীবনের অধ্যাস বা ভ্রম প্রত্যক্ষের (illusion) সাহায্যে শঙ্কর বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হলেই তাকে অধ্যাস বলে। অধ্যাস হল 'পূর্বদৃষ্ট কোন বস্তুর অপর বস্তুতে প্রতীতিরূপ মিথ্যা প্রত্যয়'। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। এই অধ্যাসকে বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় দেখা যায়। প্রথমতঃ, প্রতি অধ্যাসের ক্ষেত্রে একটি অধিষ্ঠান থাকে যার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাব ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই অধিষ্ঠানে অন্য এক মিথ্যা বস্তুর আরোপ। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম—এই অধ্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ, রজ্জুর যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ, রজ্জুতে মিথ্যা সর্পের আরোপ করা হয়।

ঈশ্বর ও মায়া অভিন্ন

এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞানই হল অধ্যাস

অবিদ্যার দুটি শক্তি—একটি আবরণ শক্তি ও অপরটি বিক্ষেপ শক্তি। অবিদ্যা আবরণ শক্তির দ্বারা প্রথমে অধিষ্ঠানকে আবৃত করে এবং তারপর বিক্ষেপ শক্তির

1. ঋগ্বেদ, ৬।৪৭।১৮

সাহায্যে মিথ্যা বস্তুর সৃষ্টি করে। শঙ্করের মতে অবিদ্যাবশতঃই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। অবিদ্যা তার আবরণ শক্তির দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মকে বা আত্মাকে আবরণ করে এবং তারপর ব্রহ্মে জগৎ বিক্ষেপ করে জগৎ প্রপঞ্চ বোধ করায়। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালশক্তি যেমন অজ্ঞ দর্শককে প্রতারিত করে, ঐন্দ্রজালিক নিজে যেমন তার দ্বারা প্রতারিত হন না, তেমনি ঈশ্বরের মায়া শক্তি অজ্ঞ ব্যক্তিকেই প্রতারিত করে, ব্রহ্ম তার দ্বারা প্রতারিত হন না। ব্রহ্মকে জগৎ জ্ঞান, অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান, সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান, এ সবই অধ্যাসমূলক। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অধ্যাস বিনষ্ট হয়। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে, ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে। ঈশ্বরের বা ঈশ্বরের মায়াশক্তির কোন অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্মে মায়া জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করার শক্তিরূপে বিদ্যমান; তার দ্বারা ব্রহ্ম প্রতারিত হন না। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে মায়া হল অবিদ্যা।

অবিদ্যার দুটি শক্তি— আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি

সৎকার্যবাদ অনুসারে কোন কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তা উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে। সৎকার্যবাদের দুটি রূপ—পরিণামবাদ ও বিবর্তনবাদ। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ ও কার্য উভয়ই সৎ, কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। যেমন, ঘট মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম। পরিণাম-বাদীদের মতে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং সৃষ্টির মাধ্যমে অব্যক্ত জগৎ ব্রহ্মে কার্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। বিবর্তবাদ অনুসারে কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম নয়, কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম ঘটে তখন রজ্জু প্রকৃতপক্ষে সর্পে পরিণত হয় না, সর্পরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। সৎ ব্রহ্ম মায়া শক্তির প্রভাবেই মিথ্যা জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। রামানুজের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। রামানুজ পরিণামবাদী, কিন্তু শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, পরিণাম নয়।

জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত

প্রশ্ন হল, শঙ্কর কি অর্থে জগৎকে মিথ্যা বলেন? শঙ্করের সত্তা ত্রৈবিধ্য-বাদের (Theory of Threefold Existence) সাহায্যে এই বক্তব্য বুঝে নিতে হবে। শঙ্কর তিন প্রকার সত্তার কথা বলেছেন—প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। স্বপ্ন অভিজ্ঞতায় এবং ভ্রম প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে যে বস্তুর অভিজ্ঞতা হয় তার প্রাতিভাসিক সত্তা আছে। স্বপ্ন অভিজ্ঞতায় আমাদের অনেক বস্তুর অভিজ্ঞতা হয় যেগুলি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে ভ্রম প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমের বেলায় সর্প সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু জাগ্রদবস্থার অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন স্বপ্ন অভিজ্ঞতা বাধিত হয় তখন স্বপ্ন অভিজ্ঞতার সত্যতা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। রজ্জুর

যথার্থ জ্ঞান হলে সর্পভ্রম আর থাকে না। শঙ্করের মতে প্রাতিভাসিক অভিজ্ঞতাকে, যা নিছক অলীক বা একান্ত অসৎ, তার থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। বন্ধ্যা নারীর পুত্রের বা শশক-শৃঙ্গের কোন সত্তাই নেই। এ নিছক অলীক, একান্তই অসৎ। এ কখনও জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না এবং অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হবার প্রশ্নও ওঠে না। এর তুলনায় অধ্যাসে অর্থাৎ রজ্জু সর্পভ্রমে সর্পের যে জ্ঞান হয় তার প্রাতিভাসিক সত্তা আছে, তা একেবারেই অলীক নয়। কেননা জাগ্রদবস্থার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হলেও তা জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। জাগ্রদবস্থার যে সব জাগতিক বস্তুর অভিজ্ঞতা আমাদের হয় তার ব্যবহারিক সত্তা আছে। জগৎ সৎ নয় সত্য, তবে শশকশৃঙ্গের মতো মিথ্যা নয়। এই অভিজ্ঞতার ওপর আমাদের লৌকিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে এই ব্যবহারিক জগতের সত্তাও বাধিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞানের তিরোধান একই সময়ে হয়। বস্তুতঃ, ব্রহ্মজ্ঞানে বিষয় ও বিষয়ীর কোন ভেদ থাকে না। কেননা শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্যই ব্রহ্ম। এই নির্বিশেষ চৈতন্য বা ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা আছে। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান অন্য জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জগৎকে সত্য বলতে হয়, জগতের অনুভব হয়। ব্যবহারে তার অস্তিত্ব অনুভূত হয় বলে এই অস্তিত্বকে ব্যবহারিক অস্তিত্ব বলা যেতে পারে। পারমার্থিক দৃষ্টিতেই জগৎ অসৎ। জগতের পারমার্থিক সত্তা নেই, জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত ও মায়িক।

কি অর্থে জগৎকে মিথ্যা বলা হয় তা ব্যাখ্যা করার জন্য শঙ্করের সত্তা ত্রৈবিধ্যবাদের ব্যাখ্যা

ঈশ্বর মায়াশক্তির সাহায্যে যে ক্রম অনুসারে এই জগৎ সৃষ্টি করলেন তা নিম্নরূপ : প্রথমে ঈশ্বর থেকে আকাশের আবির্ভাব হল এবং তারপর ক্রমশঃ একে একে বায়ু, অগ্নি, অপ এবং ক্ষিতির, এই পঞ্চতন্মাত্রের আবির্ভাব ঘটল। শঙ্করের মতে আকাশ কোন অভাবাত্মক পদার্থ নয়। আকাশের অবস্তুতা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়। আকাশকে বস্তু বলে গণ্য করতে হবে। শব্দ গুণের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব অনুমিত হতে পারে। (১) এই পঞ্চতন্মাত্রের পাঁচ প্রকার বিভিন্ন সংমিশ্রণ থেকে পঞ্চ-মহাভূতের আবির্ভাব ঘটে। মহাভূত আকাশ = $\frac{1}{2}$ আকাশ তন্মাত্র + $\frac{1}{8}$ বায়ু তন্মাত্র + $\frac{1}{8}$ অগ্নি তন্মাত্র + $\frac{1}{8}$ অপ তন্মাত্র + $\frac{1}{8}$ ক্ষিতি তন্মাত্র। অন্য মহাভূতের উৎপত্তিও ঐ একই ভাবে অর্থাৎ সেই মহাভূতের $\frac{1}{2}$ তন্মাত্র এবং অপর তন্মাত্রের—অর্থাৎ এক অষ্টমাংশের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। এরূপ মিশ্রণের নাম পঞ্চীকরণ। এভাবে পঞ্চীকৃত হলে তখন আকাশে শব্দগুণ ; বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শগুণ ; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ; ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সমূহ অভিব্যক্ত হয়। এই পঞ্চীকৃত

পঞ্চভূত থেকে চতুর্দশ লোকের আধার 'ব্রহ্মাণ্ড', ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চার প্রকার স্থূলদেহ এবং চার প্রকার দেহের উপযোগী অন্নপান উৎপন্ন হয়। মানুষের স্থূল শরীর পঞ্চমহাভূতের দ্বারা এবং সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চতন্মাত্রের দ্বারা গঠিত। জীব যতদিন মোক্ষ লাভ না করে ততদিন জীবের সূক্ষ্ম শরীর থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীরের জন্যই জীবের জন্মান্তর গ্রহণ সম্ভব হয়। জীবের কারণশরীর হল স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কারণ। এ হল জীবের অজ্ঞানতা যা তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায়। শঙ্কর সৃষ্টির উপরিউক্ত বর্ণনা স্বীকার করেছেন। তবে শঙ্করের মতে জগতের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই, ব্যবহারিক সত্তা আছে। কাজেই ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জগতের এই সৃষ্টি ক্রম এবং সৃষ্টবস্তুর সত্যতা স্বীকার করতে হবে।

(v) **ঈশ্বর ঃ** শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া উপাধি উপহিত হলে সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন। শঙ্করের মতে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যেতে পারে। একটি ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপরটি পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।[1] ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। জগতের অস্তিত্ব যেমন ব্যবহারিক, ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতিও তেমনি ব্যবহারিক। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সগুণ এবং সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, ঈশ্বর ভূতাধিপতি ও ঈশ্বর ভূতপালক। ঈশ্বর থেকেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। অচেতন প্রকৃতি বা পরমাণু জগতের উৎপত্তির কারণ নয়। এই ঈশ্বরই ভক্তের ভগবান, উপাসকের উপাস্য দেবতা, কিন্তু শঙ্করের মতে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ। ব্রহ্ম শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্য। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নিত্য, নিরবয়ব, স্বজাতীয়, বি-জাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা অবভাস নয়, জগৎ সত্য। ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। এ বর্ণনা হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ (accidental description)। কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতম্'। 'ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ। তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পান। উপরিউক্ত বর্ণনা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের (essential description) বর্ণনা।[2] একটি উদাহরণের সাহায্যে তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণের পার্থক্য বুঝে নেওয়া যেতে

সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর

ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই ব্রহ্ম সগুণ

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ

1. বেদান্তসার ঃ—সদানন্দ যোগীন্দ্র।
2 ব্রঃ সূঃ, শঙ্কর ভাষ্য, ২।১।১৪

পারে। একটি মেষপালক রঙ্গমঞ্চে রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করে, দেশ জয় করে, বিজিত দেশের শাসনকর্তা হয়। মেষপালক রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও, তাকে মেষ পালকরূপে বর্ণনা করা হলে তার স্বরূপ লক্ষণের এবং রাজা, বিজেতা ও শাসনকর্তারূপে বর্ণনা করা হলে তা তটস্থ লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হবে।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ঈশ্বরে ভেদ আরোপিত হয় কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি অদ্বয়

আবিদ্যক নাম রূপ উপাধির দ্বারা উপহিত হওয়ার জন্যই ঈশ্বরের 'ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিত্ব', কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি অদ্বয়। তত্ত্ব জ্ঞানের উদয়ে পরমাত্মার কোন ভেদমূলক ব্যবহার থাকে না বা তা উৎপন্নও হয় না।[1] পরমাত্মা স্বরূপতঃ নির্বিকার, কিন্তু মায়ার প্রভাবে প্রবর্তক হন।[2] তাই তিনি কর্মফলদাতা। তাই তিনি বামনী। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের উদয় হলে ঈশ্বরের বা জগতের কোন সত্তা থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা আছে এ জ্ঞান হয়। কাজেই পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মেরই কেবল সত্তা আছে, আর কোন কিছুর যথার্থ সত্তা নেই।

জাদুকরের ইন্দ্রজালের উল্লেখ করে শঙ্কর ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যারা অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁরাই জাদুকরের ইন্দ্রজাল প্রত্যক্ষ করে অভিভুত হয়ে পড়েন এবং জাদুসৃষ্টিকে সত্য মনে করেন। জাদুকরের ফাঁকি তাঁদের কাছে ধরা পড়ে না। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা জাদুকরের জাদুর ফাঁকি বুঝতে পারেন এবং জাদুকরের জাদু সৃষ্টিকে মিথ্যা বলে উপলব্ধি করতে পারেন। জাদুকরের প্রকৃতই যে কোন জাদুশক্তি নেই তা তাঁরা বোঝেন। সেরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিরাই জগৎ ও ঈশ্বর উভয়কে সত্য মনে করেন কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞ তাঁরা জানেন, জগৎ অবভাস মাত্র এবং প্রকৃতই কোন জগৎস্রষ্টার অস্তিত্ব নেই।

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই জগৎ ও ঈশ্বরকে সত্য মনে করেন

সর্ব উপাধি-বর্জিত পরমাত্মা বা ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য, মায়া উপাধিযুক্ত পরমাত্মা ঈশ্বর। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই ভক্তের ভগবান, জীবের উপাস্য দেবতা।[3] যখন পরমেশ্বরের নির্বিশেষ রূপ উপদিষ্ট হয় তখন শাস্ত্রে তাকে শব্দ-স্পর্শাতীত, অরূপ ও অব্যয় রূপে বর্ণনা করা হয় আর যখন তিনি উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হন তখন সর্বকারণ হেতু তাঁকে সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরূপ, সর্বরস ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিশেষিত করা হয়। উপাসনার জন্য নির্গুণকে সবিশেষ বা

উপাসনার জন্যই নির্গুণকে সগুণরূপে বর্ণনা করা হয়

1. ব্রঃ সূঃ, শঙ্কর ভাষ্য, ২।২।৭
2. ব্রঃ সূঃ, শঙ্কর ভাষ্য, ১।২।১৩
3. শঙ্কর ভাষ্য, ব্রঃ সূঃ, ১।১।২০

সগুণরূপে বর্ণনা করা হয়। ঈশ্বরোপাসনার মূলে আছে উপাস্য ও উপাসকের ভেদ। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান উদিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের পূজা করা হয়, উপাস্য ও উপাসকের ভেদজ্ঞান থেকে যায়। কাজেই ঈশ্বরোপাসনা ব্যবহারিক দৃষ্টিসম্ভূত।

শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরোপাসনা নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধির উপায়স্বরূপ। মায়াধীন জীব প্রথমে জগৎকে সত্য বলে মনে করে এবং পরে এক জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বরের কল্পনা করে তার পূজা করে। দীর্ঘকাল ঈশ্বরোপাসনার ফলে জীব ঈশ্বরকেই একমাত্র নিত্য বস্তু ও জগৎকে মিথ্যা ও মায়াময় মনে করে। এভাবে ধীরে ধীরে সে ব্রহ্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়। এই কারণেই শঙ্কর মনে করেন যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধির সোপান। ঈশ্বরোপাসনায় চিত্তশুদ্ধি ঘটে, চিত্তের মালিন্য দূর হয় এবং ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য মন প্রস্তুত হয়।

ঈশ্বরোপাসনা ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়স্বরূপ

(vi) **জীব ও ব্রহ্মঃ** "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম ; জীব ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়। শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদী। শঙ্করের মতে এক অদ্বয় ব্রহ্মেরই সত্তা আছে। জীবের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জীবের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবই ব্রহ্ম। শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্য বা ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ব্রহ্ম নিত্য, অক্ষয় ও অদ্বয়। মায়া প্রভাবে সগুণ ব্রহ্ম বহু জীবে নিজেকে প্রকাশ করেন। পরমাত্মা এক বা অদ্বয়। পরমাত্মা নিরবয়ব এবং বিভু। অন্তঃকরণ এই উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই এক আত্মা বহু জীব বলে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার পারমার্থিক সত্তা আছে। জীবের ব্যবহারিক সত্তা আছে। জীব মায়া বা অবিদ্যার সৃষ্টি। তত্ত্বজ্ঞানে অবিদ্যা দূরীভূত হলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ লোপ পায় এবং জীব ব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হয়।

জীবই ব্রহ্ম

অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য এক আত্মা বহু জীব বলে প্রতিভাত হয়

জীব জ্ঞাতা, ভোক্তা এবং কর্তা। জীব ধর্ম ও অধর্ম সঞ্চয় করে এবং কর্মফল ভোগ করে। জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি আছে, জন্ম-মৃত্যু আছে, বন্ধন মুক্তি আছে। জীবের ভোগ আছে। পরমাত্ম[1] স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, পরমাত্মা জ্ঞাতাও নয়, কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়। পরমাত্মার জন্ম, মৃত্যু, বন্ধন ও মুক্তি নেই। পরমাত্মার কোন ভোগ নেই। যদিও জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই তবু অবিদ্যাগত অনাদি দুর্বাসনা হেতু জীবে

1. ব্রঃ সূঃ, শঙ্কর ভাষ্য, ১।২।১১

মরণশীলতা ও ভয়ের আরোপ হয়েছে। কাজেই জীবের বাস্তব অমরত্ব ও অভয়ত্ব উৎপন্ন হতে পারে না।[1] জীব এবং পরমাত্মার মধ্যে কোন পারমার্থিক ভেদ নেই। অবিদ্যাহেতু অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধি উপহিত হওয়ার জন্যই আত্মাকে ভোক্তা ও কর্তারূপে প্রতীত হয়। পরমাত্মা সকল প্রত্যক্ষের সাক্ষিন্ বা দ্রষ্টা। অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত জীব ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন।

অবিদ্যার জন্যই আত্মাকে ভোক্তা ও কর্তারূপে প্রতীতি হয়

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হলেও বাহ্য দৃষ্টিতে জীব আত্মা ও দেহের সমষ্টি। জীবের একটি স্থূল শরীর এবং একটি লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর আছে। জীবের স্থূল শরীর পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি এবং সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ তন্মাত্রের সমষ্টি। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধির দ্বারা নির্মিত। জীবের মৃত্যু সময়ে স্থূল শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। জীবের দেহান্তর গমনের সময় আত্মার সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীরও উপস্থিত থাকে। জীবের দেহ সদ্বস্তু নয়, মিথ্যা অবভাস মাত্র। দেহাত্মজ্ঞান লুপ্ত হলে কেবল আত্মারই অস্তিত্ব থাকে। বস্তুতঃ, এই দেহ অপরিচ্ছিন্ন আত্মাই ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা' প্রভৃতি বাক্যের মাধ্যমে যখন জীব ব্রহ্মের ঐক্যের কথা বলা হয় তখন জীবের মধ্যে যে শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্য আছে তাকেই বোঝান হয়। 'তত্ত্বমসি এই বাক্যে 'তৎ' পদের দ্বারা ব্রহ্মকে বোঝায় এবং 'ত্বং' পদ দ্বারা জীবের অন্তর্নিহিত শুদ্ধ চৈতন্যকে বোঝায়। [2]'সেই দেবদত্ত এই'—এই বাক্যে সেই শব্দের দ্বারা পূর্বদৃষ্ট দেবদত্ত এবং এই শব্দের দ্বারা বর্তমানে দৃশ্যমান দেবদত্তকে বোঝায় অর্থাৎ উভয় অর্থই এক অভিন্ন পদার্থকে বোঝায়। সেরূপ তত্ত্বমসি বাক্যেও 'তৎ' পদের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য এবং ত্বম্ পদের দ্বারা প্রত্যক্ষ চৈতন্য অর্থাৎ উভয় অর্থই অভিন্নরূপে এক চৈতন্যমাত্র পদার্থকে বোঝায়। 'ব্রহ্ম শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ ; জীব পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট দুর্বল মলিন', তবু উভয়ের ঐক্যের কথা যখন বলা হয় তখন জীবের অন্তর্নিহিত শুদ্ধ চৈতন্যকেই বোঝান হয়। নতুবা 'সোহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই সব সাক্ষাৎ অনুভূতি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

বাহ্য দৃষ্টিতে জীব আত্মা ও দেহের সমষ্টি

দেহ অপরিচ্ছিন্ন আত্মাই ব্রহ্ম

জীব ব্রহ্মের মায়িক বিকাশ। জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে দুটি মতবাদ বর্তমান—একটি 'প্রতিবিম্ববাদ' এবং অপরটি 'অবচ্ছেদবাদ'। প্রতিবিম্ববাদ অনুসারে জীব

1. ব্রঃ সূঃ, শঙ্কর ভাষ্য ১ ২।১১
2. সদানন্দ যোগীন্দ্র—বেদান্তসারঃ।

ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। [1]এক জ্যোতির্ময় সূর্য এক হওয়া সত্ত্বেও যেমন বিভিন্ন জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিবিম্বিত হওয়ার জন্য বহু প্রতীয়মান হন তেমনি স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা এক হওয়া সত্ত্বেও বহু দেহে অনুগত হওয়ার জন্য বহু প্রতীয়মান হন।

প্রতিবিম্ববাদ

জলে যেমন সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়, সেরূপ ব্রহ্ম মায়াসৃষ্ট অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হন। সেই প্রতিবিম্বই জীব। জলে সূর্য প্রতিবিম্ব যেমন সূর্যের আভাস, তেমনি জীবও পরমাত্মার আভাস।[2] অবিদ্যা থেকেই আভাসের উৎপত্তি, সে কারণে ব্রহ্মের এই প্রতিবিম্বও অবিদ্যামূলক এবং জীবের সংসারলীলাও অবিদ্যাশ্রিত।[3] কোন কোন অদ্বৈতবেদান্তীর মতে জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নয়, জীব অদ্বিতীয় ও অখণ্ড ব্রহ্মের আংশিক অভিব্যক্তি। জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ। ঘটের অবচ্ছেদ বা আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ার জন্য যেমন মহাকাশকে ঘটাকাশ নাম দেওয়া হয়,

অবচ্ছেদবাদ

সেইরূপ অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে অখণ্ড অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জীব নামে অভিহিত হয়। 'ঘটাকাশ মহাকাশের সখণ্ড বা আংশিক অভিব্যক্তি, জীবও পরমাত্মার আংশিক বিকাশ।' এই মতবাদ 'অবচ্ছেদবাদ নামে' বেদান্তে অভিহিত হয়। [4]'অংশো নানা ব্যপদেশাৎ' এই সূত্রে ব্রহ্ম সূত্রকার জীবকে ঈশ্বরের অংশ হিসেবে অভিহিত করেছেন। অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন, ব্রহ্মের জীবভাবও তেমনি। তবে জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে বর্ণনা করা হলেও আসলে এই অংশ কাল্পনিক, বাস্তব নয়। কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব, সেহেতু নিরংশের অংশ কল্পনা করা যায় না। সূত্রকার নিজেই বলেছেন যে, অগ্নি এবং তার স্ফুলিঙ্গে উষ্ণতা বিষয়ে যেমন ভেদ নেই, তেমনি জীবের ও ঈশ্বরের চৈতন্যাংশে কোন ভেদ নেই।

মন্তব্য ঃ আমাদের কাছে প্রতিবিম্ববাদের তুলনায় অবচ্ছেদবাদই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। পরমাত্মারূপী সূর্যের প্রতিবিম্ব মহদাদি বিশিষ্ট আধারে জীবরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই জীব প্রতিবিম্ব পরমাত্মারূপী সূর্যের রশ্মির অণুমাত্র। সূর্য বিভু, জীব অণু—এইরূপ ভেদ প্রতীতি ঘটে এবং পরমাত্মারূপী সূর্যের সর্বশক্তি সর্বগুণ জীব-প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত হচ্ছে না, অতএব জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাধনের বিষয়ে প্রতিবিম্ববাদ সমীচীন নয়। [5]'তদনন্যত্বমারম্ভশব্দাদিভ্যঃ' এই ব্রহ্মসূত্র অনুযায়ী বিম্ব ও প্রতিবিম্বের অভেদত্ব ও অনন্যত্র প্রমাণ করা সুকঠিন। কারণ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম জীব প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাসিত হয়ে তদসাম্য নির্গুণত্ব গতি লাভ করে। ক্লেশ কর্ম

1. "অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ"—ব্রহ্ম সূত্র, ৩।২।১৮
2. "আভাস এব চ"—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৫০
3. ব্রঃ সূঃ, শঙ্কর ভাষ্য ২।৩।৫০
4. ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৪৩
5. ব্রঃ সূঃ, ২।১।১৪

বিপাক আশয় পরাবিষ্ট জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব লাভ করেও এক অদ্বৈত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। "নিরঞ্জনং পরমং সাম্যং উপৈতি ব্রহ্মণ"—উপনিষদের এই বাণী প্রমাণ করে যে [1]সাম্য সাদৃশ্য হতে পারে, অভিন্নতা সূচনা করতে পারে না।

অবচ্ছেদবাদ ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অধিকতর সমীচীন মতবাদ। অনন্ত সাগর বক্ষে একটি ঘটকে ডুবিয়ে তাকে জলে পরিপূর্ণ করা হল। ঘটটির অভ্যন্তরে, বাইরে, উপরে, নিম্নে সর্বত্র জল এবং এই জলের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কেবলমাত্র ঘটের আবরণী দ্বারা বেষ্টিত ঘট মধ্যস্থ জলকে সমুদ্রের জল থেকে পৃথক ভাবলে ভুল বোঝা হয়। কারণ আধার অনুযায়ী জলের উপাধি ভেদ মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত মাত্র। তেমনি অনন্ত অখিল রসসিন্ধু চিন্ময় ব্রহ্মের মধ্যে জীব অবিদ্যা কল্পিত। মায়া প্রভাবে দেহমন অন্তঃকরণের আবরণীর জন্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের মধ্যে জীবকে পৃথক বলে মনে হয়। সিন্ধু ও ঘটের জল যেমন এক, তেমনি জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। এটি অবচ্ছেদবাদের সমর্থনে দৃষ্টান্ত। ব্রহ্ম মহাকাশ, জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম অপার অনন্ত সিন্ধু, জীব সেই সিন্ধু মধ্যস্থিত একটি জলপূর্ণ ঘট। কেবল উপাধির ভেদমাত্র, স্বরূপতঃ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

অবচ্ছেদবাদ ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অধিকতর সমীচীন মতবাদ

(vii) **ঈশ্বর ও জীব ঃ** সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং জীব, উভয়ের কারও পারমার্থিক সত্তা নেই, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। কিন্তু জীবের জ্ঞান ও শক্তি সীমিত। ঈশ্বর এবং জীব, উভয়ই সগুণ ও সক্রিয়।[2] কিন্তু জীব যেরূপ সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, ঈশ্বর সেরূপ করেন না। জীব অবিদ্যাবশতঃ দেহাদিতে আত্মভাব আরোপ করে দেহের দুঃখে দুঃখী হয়; মোহবশতঃ আমি দুঃখী এরূপ মনে করে। ঈশ্বরের সেরূপ দুঃখবোধ ও দেহাদিত আত্মভাব নেই। অবশ্য জীবের যে দুঃখ তাও অবিদ্যাপ্রসূত, তা ভ্রমমূলক, পারমার্থিক নয়। অবিদ্যা, নামরূপ বিশিষ্ট দেহ উৎপাদন করেছে। জীব অধ্যাসহেতু তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করার জন্য দুঃখ অনুভব করছে। জীবদেহে আত্মভাব স্থাপন করার জন্য যেমন দুঃখ পায়, পুত্র-মিত্রাদির দুঃখ নিজের ওপর আরোপ করেও দুঃখ অনুভব করে। যদিও ঈশ্বর ও জীব পরব্রহ্মের আভাস, তবু তারা অভিন্ন নয়। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, জীব

ঈশ্বর ও জীব, কারও পারমার্থিক সত্তা নেই

জীব ও ঈশ্বরে পার্থক্য

1. তদ্ভিন্নত্বেসতি তদ্‌গতভূয়োধর্মবত্বং সাম্যম্—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ।
2. প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৪৬
"যথা জীবঃ সংসারদুঃখমনুভবতি, নৈবং পর ঈশ্বরোহনুভবতীতি প্রতিজানীমহে।"
—ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ২।৩.৪৬

স্রষ্টা নয়। ঈশ্বরের বন্ধন নেই, জীবের বন্ধন আছে। [1]জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জীব অবিদ্যাকল্পিত বিকারগুলিকে নিজের বলে মনে করে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জীব বন্ধন মুক্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করে। ঈশ্বর পূর্ণ,[2] তিনি সৎ কর্মের দ্বারা বড় হন না, অসৎ কর্মের দ্বারা ছোট হন না। ঈশ্বর যে জীবকে উদ্ধার করার ইচ্ছা করেন তাকে দিয়ে সৎ কর্ম করান, আর যাকে অধোগামী করার ইচ্ছা করেন তাকে দিয়ে অসৎ কর্ম করান। জীব কর্তা ও ভোক্তা। ঈশ্বর জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের কারয়িত্রী। ঈশ্বর নিয়ন্ত্রা, জীব ঈশ্বরের নিয়ম্য। জীব মায়ার অধীন, মায়া ঈশ্বরের অধীন। 'ঈশ্বরের উপাধি সমষ্টি মায়া, জীবের উপাধি ব্যষ্টি অবিদ্যা।' উপাধির জন্যই ভেদ, উপাধির বিলোপ ঘটলে ঈশ্বর জীব সবই ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। তখন আর কোন ভেদ থাকে না।

উপাধির লোপ হলে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়

(viii) **মায়া ও অবিদ্যা:** শঙ্কর মায়া ও অবিদ্যা এই দুটি পদকে এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, ব্রহ্মেরই কেবলমাত্র পারমার্থিক সত্তা আছে, অন্য কোন কিছুর পারমার্থিক সত্তা নেই। ব্রহ্ম বিজাতীয়, স্বজাতীয় ও স্বগতভেদ রহিত। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্ম এক ও অদ্বৈত স্বরূপ। ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্ত অদ্বৈত ও সর্বপ্রকার ভেদ রহিত। সে কারণে ব্রহ্মে দ্বৈত অবিদ্যা-প্রসূত। মায়া বা অবিদ্যার জন্যই ব্রহ্মে নামরূপাত্মক জগৎ অধ্যস্ত হয়। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম নির্বিকার। অবিদ্যা মায়ার জন্যই নির্বিকার ব্রহ্মে নামরূপাদি বিকার জীবের কাছে সত্য বলে মনে হয়। ব্রহ্মই সব। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই যথার্থ সত্তা নেই। ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা নামরূপাত্মক জগৎরূপে প্রতিভাত হন কিন্তু তার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বিকৃত হয় না।

মায়ার জন্যই নির্বিকার ব্রহ্মে জগৎ অধ্যস্ত হয়

জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, ব্রহ্মের বিবর্ত। অবিকারী পরব্রহ্ম অপরিণামী, তার স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি যা, তাই থাকেন অথচ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। একেই শঙ্কর বলেন অধ্যাস। অধ্যাস হল এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান। রজ্জুতে যেমন সর্পের অধ্যাস হয়, শুক্তিতে যেমন রজতের অধ্যাস হয় সেরূপ ব্রহ্মে জগৎ অধ্যস্ত হয়। জীবের মিথ্যা দৃষ্টিতে ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতীত হয়। জীব ব্রহ্মের সঙ্গে নামরূপাত্মক বিকারগুলিকে অভিন্ন করে দেখে, নামরূপের অন্তরালে যে অপরিনামী অবিকারী নিত্য,

1. ব্রঃ সূঃ, ২।১।১৪
2. ব্রঃ সূঃ, ১।১।২৮

অক্ষয়, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অধিষ্ঠানটি বিদ্যমান থাকে তাকে জানতে পারে না। যেমন রজ্জুর জ্ঞান দ্বারা সর্পভ্রম, শুক্তির জ্ঞান দ্বারা রজতভ্রম এবং মরীচির জ্ঞান দ্বারা মরীচিকা ভ্রম তিরোহিত হয় সেরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হলে ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগদ্‌ভ্রমও তিরোহিত হয়।

যার দ্বারা ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রমের উৎপত্তি হয় বা ব্রহ্মে জগৎ প্রপঞ্চ অধ্যস্ত হয় তা হল মায়া। এই মায়া হল অঘটন ঘটন পটিয়সী। মায়ার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। এই মায়াকে 'সৎ' বলা যায় না; কারণ তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে মায়ার কোন অস্তিত্ব নেই, আবার তাকে 'অসৎ' বলা যায় না; কারণ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হবার পূর্ব পর্যন্ত জগৎ প্রপঞ্চ সত্য বলে মনে হয় এবং অবিদ্যা বা মায়াই জগৎ প্রপঞ্চের কারণ। কাজেই এই মায়া 'সৎ' নয়; আবার 'অসৎ' নয়। আবার সদাসৎ নয়; কারণ এরূপ ধারণা আত্মবিরোধী[1]। সুতরাং অদ্বৈত বেদান্ত মতে এ হল 'অনির্বচনীয়'।

মায়া অনির্বচনীয়

শঙ্করের মতে মায়া ও অবিদ্যা অভিন্ন। মায়া ভ্রম উৎপাদনকারী অজ্ঞানতা। মায়া সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, মায়া অভাবস্বরূপ নয়, ভাবস্বরূপ। যে মায়ার জন্য জগৎ-ভ্রম সেই মায়ার স্বরূপকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। ঈশ্বরের দিক থেকে মায়া হল ভ্রম উৎপন্ন করার ইচ্ছা মাত্র। এর জন্য ঈশ্বর প্রতারিত হন না। আমাদের মত অজ্ঞান ব্যক্তি যারা এক ব্রহ্মের জায়গায় বহু বস্তু প্রত্যক্ষ করি। আমাদের কাছে মায়া হল ভ্রম উৎপাদনকারী অজ্ঞানতা। এই দিক থেকে মায়াকে 'অজ্ঞান' বা 'অবিদ্যা' নামেও অভিহিত করা হয় এবং মায়ার দুটি শক্তি স্বীকার করা হয়। প্রথমতঃ, ব্রহ্মের, যা জগতের অধিষ্ঠান, যথাযথ স্বরূপকে আবৃত করা এবং ব্রহ্মে জগৎভ্রম উৎপন্ন করা। যেহেতু মায়া ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম করায় সেইজন্য মায়াকে ভাবরূপ অজ্ঞানতা নামে অভিহিত করা হয়। যেহেতু মায়ার কোন আদি নেই, সেহেতু মায়াকে অনাদি নামেও আখ্যাত করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ব্রহ্মে জগৎভ্রম হয় না, তাঁরা শুধুমাত্র ব্রহ্মকে দেখেন। কাজেই তাঁদের দৃষ্টিতে ভ্রম উৎপাদনকারী মায়ার কোন অস্তিত্ব নেই। অবিদ্যা কল্পিত মায়াকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করা যায় না। নামরূপ ঈশ্বরে আত্মভূত।

এই ঈশ্বরাশ্রিত আবিদ্যক নামরূপকেই মায়া, শক্তি ও প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হয়। মায়া সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের শক্তি। অগ্নির দাহিকা শক্তিকে যেমন অগ্নি থেকে পৃথক করা যায় না। তেমনি মায়াকেও ঈশ্বর থেকে পৃথক করা যায় না। মায়ার দুটি শক্তি,

1. ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ২।১।১৪

একটি আবরণশক্তি ও অপরটি বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপকে আচ্ছাদন করে। প্রশ্ন করা যেতে পারে অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড, স্বপ্রকাশ শুদ্ধ চৈতন্যকে অবিদ্যা বা মায়া কিভাবে আচ্ছাদন করতে পারে? তার উত্তরে বলা হয় যে, মেঘখণ্ড যেমন সূর্যকে আবরণ করতে পারে না, দর্শকের চক্ষুকে আবরণ করে মাত্র, সেরূপ অবিদ্যা অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন জীবের দৃষ্টিকে আবরণ করে। অজ্ঞানের আবরণ দ্বারা আত্মার স্বরূপ আচ্ছন্ন হওয়াতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়েও ব্রহ্ম থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করে। বিক্ষেপশক্তির জন্য জীবের ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হয়। এই বিক্ষেপশক্তিকে ঐন্দ্রজালিকের জাদুশক্তির সঙ্গে তুলনা করে বোঝা যেতে পারে। ঐন্দ্রজালিক জাদুশক্তি বা মায়াশক্তির বলে দর্শকদের নানারকম ভেলকি দেখায়, যদিও আসলে সবই ফাঁকি। তেমনি ব্রহ্মও মায়াশক্তির দ্বারা জীবের চিত্তে জগদ্ভ্রম সাধিত করে। কিন্তু যাঁরা ঐন্দ্রজালিকের জাদুশক্তির প্রকৃত স্বরূপ জানেন তাঁরা যেমন ঐন্দ্রজালিকের মায়াবী শক্তি দ্বারা প্রতারিত হন না সেরূপ তত্ত্বজ্ঞানীও উপলব্ধি করেন যে, জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা, আসলে সবই ব্রহ্ম। জীবের মিথ্যা দৃষ্টি দূরীভূত হলে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করে। নামরূপ বিকারের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। জীব ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়।

মায়ার আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি

শ্বেতশ্বতোর উপনিষদ অনুসরণ করে রামানুজও মায়ার কথা বলেছেন। কিন্তু মায়া বলতে তিনি হয় তাকে যে অচিন্ত্যনীয় বিস্ময়কর শক্তির সাহায্যে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেন তাকে বুঝিয়েছেন অথবা ব্রহ্মের মধ্যে যে অচিৎ অংশ, যা জগতে রূপান্তরিত হয়, তাকে বুঝেছেন। শঙ্কর মায়াকে ঈশ্বরের শক্তিরূপে অভিহিত করেছেন কিন্তু এই সৃজনকারী শক্তি ঈশ্বরের কোন স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়, যেমন রামানুজ মনে করেন। শঙ্করের মতে মায়া হল ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছা যা ইচ্ছামাত্রই বর্জন করা যায়। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম ঘটে না, তাই তাঁরা ঈশ্বরকে ভ্রম উৎপাদনকারী মায়া শক্তির অধিকারী বলে মনে করেন না।

মায়াকে প্রকৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। তবে সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি বা প্রধানের সঙ্গে মায়াকে অভিন্ন করে দেখলে ভুল হবে। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি স্বাধীন, কিন্তু মায়া ঈশ্বরের অধীন। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি সত্য। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে মায়ার কোন অস্তিত্ব নেই। মায়াকে অব্যক্ত নামেও অভিহিত করা হয়। মায়া অব্যক্ত, কেননা মায়াকে 'সৎ' বা 'অসৎ কোন

মায়াকে প্রকৃতি অভিহিত করা হয়

রূপেই বর্ণনা করা যায় না। [1]"অব্যক্তা হি সা মায়া, তত্ত্বান্যত্ব নিরূপণস্যাশক্যত্বং"।

মায়ার আর এক নাম অব্যক্ত

মায়াকে অব্যক্ত বলার আর এক কারণ অবিদ্যারূপ বীজে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। মায়াকে সময় সময় আকাশ এবং কখনও বা অক্ষর বলা হয়। মায়াই অবিদ্যা।

পরবর্তী কালে কোন কোন অদ্বৈতবেদান্তী মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে প্রভেদ করেন। তাঁদের মতে অজ্ঞান দুপ্রকার—মায়া ও অবিদ্যা। মায়া হল শুদ্ধ সত্ত্ব, অবিদ্যা হল অশুদ্ধ সত্ত্ব। মায়া ঈশ্বরের উপাধি। অবিদ্যা জীবের উপাধি।

কুমারিল ভট্টের শিষ্য পার্থসারথি মিশ্র অদ্বৈত বেদান্তের অবিদ্যার সমালোচনা করেন। অবিদ্যা যদি মিথ্যা জ্ঞান হয়, তাহলে হয় এই অবিদ্যা ব্রহ্মে আছে কিংবা জীবে আছে। ব্রহ্ম পরিপূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ। ব্রহ্মে অবিদ্যা থাকতে পারেনা। জীব ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন নয়, সেহেতু জীবেরও মিথ্যা জ্ঞান থাকতে পারে না। সুতরাং অবিদ্যার কোন অস্তিত্ব নেই। যদি ব্রহ্ম ছাড়া অবিদ্যার স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা থাকে তাহলে অদ্বৈতবাদের হানি ঘটে, কাজেই অবিদ্যার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই।

(ix) **জীবের বন্ধন ও মুক্তি ঃ** জীবাত্মা স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাবশতঃ জীব অনাত্মা দেহের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। জীবের দেহের সঙ্গে একাত্মতা বোধই তার বদ্ধদশা। অজ্ঞানতাবশতঃ জীব নিজেকে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা মনে করে এবং জাগতিক সুখ-দুঃখ, রোগ-শোককে নিজের সুখ-দুঃখ বলে অনুভব করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন। আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানের অভাবই জীবের বদ্ধদশার কারণ।

আত্মার স্বরূপের জ্ঞানের অভাবই জীবের বন্ধনের কারণ

এই বদ্ধদশা থেকে মুক্তিলাভের উপায় কী? শঙ্করের মতে আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। জীব, আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। জীব উপলব্ধি করে যে, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন এবং তখনই জীবের মোক্ষলাভ ঘটে। শঙ্করের মতে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করা হয়। এসব যাগযজ্ঞ অজ্ঞানতা প্রসূত ও অদ্বৈতজ্ঞানের অন্তরায় স্বরূপ। তাছাড়া যাগযজ্ঞের ফল স্বর্গলাভ। এ ক্ষণস্থায়ী; সুতরাং এর দ্বারা জীবের মোক্ষলাভ ঘটে না।

আত্মজ্ঞানই বদ্ধদশা থেকে মুক্তিলাভের উপায়

---

1. ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য—১।৪ ৩

শঙ্করের মতে আত্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হওয়ার জন্য চতুর্বিধ সাধনার প্রয়োজন। যথা—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর ভেদাভেদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু এবং অন্যান্য সব বস্তু অনিত্য এই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। (২) ইহা মূত্রফল ভোগবিরাগ অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ সুখের প্রতি অনাসক্তি, (৩) শমদমাদিসাধন অর্থাৎ শম বা অন্তরীন্দ্রিয়ের সংযম; দম বা বহিরীন্দ্রিয়ের সংসম, উপরতি অর্থাৎ বিষয় ভোগ বাসনার প্রতি বিরাগ; তিতিক্ষা অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, সমাধান অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরু বাক্যে অবিচলিত আস্থা এবং (৪) মুমুক্ষুত্ব বা মুক্তিলাভের জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা। সাধনলব্ধ এই জ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। কারণ ব্রহ্ম 'অবাঙ্‌মানস গোচরম্'। বাক্য ও মন দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না। এই সাধন চতুষ্টয় মুমুক্ষু ব্যক্তিকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী করে। এই ভাবে প্রস্তুত হলে মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ বা গুরুর কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করার অধিকারী হন।

আত্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হওয়ার জন্য চতুর্বিধ সাধনা

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মজ্ঞান লাভের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রথমে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে গুরুর কাছ থেকে উপনিষদের বাণী শ্রবণ করতে হবে। তারপর যুক্তিতর্কের সাহায্যে এই উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। একে বলা হয় মনন। সর্বশেষে গুরুর কাছে থেকে লব্ধ এই জ্ঞান নিরন্তর ধ্যান করতে হবে। এই ভাবে আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানতা দূরীভূত হবে। তখন গুরু তাকে 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্যের উপদেশ দেবেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি এই উপনিষদের বাণী নিরন্তর ধ্যান করবেন এবং সর্বশেষে 'সোঽহম' অর্থাৎ 'আমিই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাবরূপ পরমানন্দ অনন্ত অদ্বয় 'ব্রহ্ম'—এই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ঘটবে। এইভাবে জীবের দেহাত্মবোধ দূরীভূত হবে এবং আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদত্ব উপলব্ধি হবে। আত্মা ও পরমাত্মার ভেদজ্ঞানই জীবের বদ্ধশার মূল কারণ। এই ভেদজ্ঞান দূরীভূত হলে জীবের আত্মজ্ঞান বা আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হয় এবং জীবের মোক্ষলাভ ঘটে।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন

জীবের মোক্ষলাভ ঘটলেও কিছুকালের জন্য জীবের দেহ ধারণ চলতে থাকে। মানুষের কর্ম তিন প্রকার—প্রারব্ধ, সঞ্চিত এবং সঞ্চীয়মান। প্রারব্ধ কর্ম হল সেই কর্ম যার ফল ইতিমধ্যেই কার্যকরী হতে শুরু করেছে। সঞ্চিত ফল হল যে কর্মফল সঞ্চিত রয়েছে এবং সঞ্চীয়মান কর্মফল হল বর্তমানে যে কর্ম করা হচ্ছে তার ফলে যে কর্মফল সঞ্চিত হচ্ছে।

মোক্ষলাভের পরেও প্রারব্ধ কর্মের জন্য দেহধারণ চলতে থাকে

তত্ত্বজ্ঞানে সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান কর্মফল বিনষ্ট হতে পারে কিন্তু প্রারব্ধ কর্মফল বিনষ্ট হতে পারে না। দেহ প্রারব্ধ কর্মের ফল। তবে জীবের দেহ ধারণ চলতে থাকলেও জীবের কোন দেহাত্মবোধ থাকে না, জগতের প্রতি তার কোন আসক্তি থাকে না। জগৎ প্রপঞ্চ আর তাকে প্রতারিত করতে পারে না। জগতের সুখ-দুঃখ তাকে বিচলিত করতে পারে না। জীবের দেহ চলাকালীন এই মুক্তিকে বলা হয় জীবন্মুক্তি। পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ সমাপ্ত হলে তার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় এবং তখন বিদেহ মুক্তি ঘটে।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি

মোক্ষলাভের পর জীব নিষ্কামভাবে কর্মসম্পাদন করতে পারে। মোক্ষের সঙ্গে নিষ্কাম কর্মসাধনের কোন বিরোধ নেই। গীতার উপদেশ অনুসরণ করে শঙ্কর বলেন যে, সকাম কর্মই বন্ধনের হেতু, নিষ্কাম কর্ম নয়। শঙ্করের মতে যাঁরা মোক্ষলাভ করেছেন তাঁদের নিষ্কাম কর্ম করার প্রয়োজন বদ্ধ জীবের কল্যাণের জন্য ; আর যাঁরা মোক্ষলাভ করেন নি তাঁদের নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে আত্মশুদ্ধি ঘটে।

মোক্ষের সঙ্গে নিষ্কাম কর্মসাধনের কোন বিরোধ নেই

শঙ্করের মতে মোক্ষ উৎপাদ্য নয়।[1] মোক্ষ স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ, মোক্ষ জন্মে না, মোক্ষ সর্বদা বা সর্বকালেই আছে। বেদবিহিত কার্য সম্পাদনে মোক্ষ উৎপন্ন হয় না। আত্মজ্ঞানের দ্বারাও মোক্ষ উৎপন্ন হয় না। মোক্ষ নিত্য ; তা সর্বদাই আছে। অজ্ঞান কেবল তাকে আবৃত করে রাখে। আত্মজ্ঞান সেই আবরণ দূর করে দিলে মোক্ষ তখন আপনি নিজেকে প্রকাশ করে। ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদত্বই মোক্ষ এবং সর্বকালেই এটি সত্য। এই সত্য বিস্মৃত হয়ে আত্মা ও ব্রহ্মের মিথ্যা ভেদ দর্শন করলে বন্ধন হয়, আর এই সত্য উপলব্ধ হলেই মোক্ষ হয়। এ যেন কণ্ঠদেশে হার পরিধান করে সেটিকে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়ান এবং পরে উপলব্ধি করা যে এটি কণ্ঠদেশেই রয়েছে। মোক্ষ উৎপাদ্যও নয়, বিকার্যও (modifiable) নয়। কারণ মোক্ষ যদি উৎপাদ্য বা বিকার্য হয় তাহলে মোক্ষ কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করবে, কিন্তু তাহলে মোক্ষ অনিত্য হয়ে পড়বে।[2] মোক্ষ আত্মারই স্বরূপ, সেহেতু মোক্ষ প্রাপ্য পদার্থ নয় ('স্বাত্মস্বরূপত্বে সত্যনাপ্যত্বাৎ'—ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ১।১।৪)। যদি স্বীকার করা যায় যে, মোক্ষ আত্মার স্বরূপ নয় তাহলেও মোক্ষ প্রাপ্য নয়। কেননা মোক্ষ সর্বগত, সর্বত্রই বিদ্যমান এবং আকাশের মত সদাপ্রাপ্ত।

মোক্ষের স্বরূপ

1, "অতএবানুষ্ঠেয়ফলবিলক্ষণং মোক্ষাখ্যমশরীরত্বং নিত্যমিতি সিদ্ধং"—ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ১।১।৪

মোক্ষ সংস্কার্য পদার্থও নয়। কারণ সংস্কারের অর্থ সংস্কার্য বস্তুতে উৎকর্ষ আনয়ন করা বা তার দোষ নিবারণ করা। কিন্তু মোক্ষ ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ, কাজেই ব্রহ্মে উৎকর্ষ আনয়ন করা বা ব্রহ্মের দোষ নিবারণ করা সম্ভব নয়।[1] নিত্যশুদ্ধ 'ব্রহ্মস্বরূপত্ব মোক্ষস্য'। মোক্ষকে আত্মার ধর্ম বলা যায় না। 'মোক্ষ আত্মার ধর্ম, আত্মার মধ্যে সুপ্ত থাকে এবং ক্রিয়ার দ্বারা প্রকটিত হয়—একথা বলা যেতে পারে না।' কেননা আত্মা কোন ক্রিয়ার আশ্রয় নয়। আত্মার ক্রিয়া স্বীকার করলে আত্মা অনিত্য বা অবিকারী হতে পারে না। ব্রহ্ম ও মোক্ষ একই কথা। 'ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ', ব্রহ্ম সকল ক্রিয়ার স্রষ্টা ; কাজেই ব্রহ্মে বা মোক্ষে কোন ক্রিয়া অনুপ্রবেশ করতে পারে না।[২] ব্রহ্ম ও জীবের অভেদত্বই মোক্ষ। জীব পরমাত্মার অংশ। জীবের দেহ সম্বন্ধ থাকার জন্য জীব যে পরমাত্মার অংশ এই জ্ঞান লুপ্ত হয়।[3] তত্ত্বজ্ঞানে জীব ব্রহ্মের অভেদত্বর জ্ঞান জন্মায়। তাই মোক্ষ। সুতরাং যা চিরসত্য তার উপলব্ধিই মোক্ষ। মোক্ষ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি মাত্র নয়, এক আনন্দঘন অবস্থা। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং জীব ব্রহ্মের অভেদত্ব জ্ঞানই ব্রহ্ম।

অদ্বৈত বেদান্তের সমালোচনা করে অনেকে বলেন যে, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য হয় এবং সব রকমের ভেদ মিথ্যা হয় তাহলে ন্যায় অন্যায়, পাপ, পুণ্য, সত্য, অসত্যের ভেদকে মিথ্যা বলতে হবে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, শঙ্কর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে পাপ পুণ্য, সত্য, অসত্য, ন্যায়, অন্যায় প্রভৃতির ভেদ অস্বীকার করেন নি। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এগুলির কোন সত্তা নেই। মুক্ত জীবের মধ্যে কোন দেহাত্মবোধ থাকে না। তিনি সকাম কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থাকেন।

মুক্ত জীবের অসৎ কর্মে কোন প্রবৃত্তি থাকে না

(ঘ) জ্ঞানতত্ত্ব (Theory of Knowledge) :

(i) পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা : শঙ্কর পারমার্থিক সত্তা এবং ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বিদ্যা বা পরাবিদ্যার সাহায্যেই পারমার্থিক সত্তাকে জানা যায়। অবিদ্যা বা অপরাবিদ্যার সাহায্যেই ব্যবহারিক সত্তার জ্ঞান লাভ করা যায়। শঙ্করের মতে একমাত্র ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা আছে এবং বিদ্যা বা পরাবিদ্যার সাহায্যেই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করা যায়। এই পরাবিদ্যা হল অনুভব (intuition), বিচারবুদ্ধি

পরাবিদ্যার সাহায্যেই পারমার্থিক সত্তাকে জানা যায়

1, ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ১।১।৪
2, ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ১।১।৪
3. ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ৩।২।৬

(reason) নয়। পরমাত্মা ব্রহ্মই হল নিত্য, নামরূপাত্মক জগৎ অনিত্য। অবিদ্যার জন্যই জীব অনাত্মাকে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে। বিদ্যা হল আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানেই অবিদ্যার বিলোপ হয়। অবিদ্যা হল আপেক্ষিক, ব্যবহারিক ও বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান। অবিদ্যায় জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পারস্পরিক ভেদ বর্তমান থাকে। অবিদ্যার সাহায্যে কোন কিছু জানতে হলে দেশ, কাল ও কার্যকারণ সম্পর্কের মাধ্যমে জানতে হয়। পরাবিদ্যা হল এমন জ্ঞান যা সর্বপ্রকার ভেদরহিত।

পরাবিদ্যা অনুভব বিচারবুদ্ধি নয়

পরাবিদ্যা হল সম্যক দর্শন যার দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। লৌকিক জ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করা যায় না। যদিও পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা বিরোধী, প্রথমটি অনপেক্ষ এবং দ্বিতীয়টি আপেক্ষিক, তবু শঙ্করের মতে আপেক্ষিক জ্ঞান অনপেক্ষ জ্ঞান লাভের সোপান স্বরূপ। বিচারবুদ্ধি অনুভবের উপায়স্বরূপ।

(i) শ্রুতি, তর্ক ও অনুভব: ব্রহ্মের জ্ঞান প্রথমে শ্রুতি থেকে লব্ধ হয়, তারপর যুক্তিতর্কের সাহায্যে তার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হয় এবং সর্বশেষে অনুভব বা সম্যগ্‌দর্শনের মাধ্যমে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ঘটে।[1] শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্রহ্ম জ্ঞানের তিনটি উপায়। ব্রহ্ম থেকেই শ্রুতির উৎপত্তি। শ্রুতি প্রদীপের মত সর্বাভাসক। শ্রুতি ছাড়া অন্য কোন কিছু থেকেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান লব্ধ হতে পারে না।[2] 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি শ্রুতি ছাড়া অন্য কোন প্রমাণেই জানা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রবেদ্য, অনুমানগম্য নয়। শ্রুতির প্রামাণ্য নিরপেক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ[3] (বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং)। যোজগ অনুভবের মাধ্যমে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়।[4] পরমতত্ত্বের অনুভবের কথা উল্লিখিত থাকার জন্য শ্রুতি প্রামাণ্য কিন্তু শঙ্কর বিচারবুদ্ধিকে উপেক্ষা করেন নি। শ্রুতিলব্ধ জ্ঞানের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার জন্য যুক্তিতর্কের প্রয়োজন আছে। কিন্তু শ্রুতির কথায় বিশ্বাস না থাকলে নিছক যুক্তিতর্কের দ্বারা আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। যে তর্ক শ্রুতির অনুগামী, সে তর্কই গ্রহণযোগ্য। শ্রুতিনিরপেক্ষ তর্ক তত্ত্বজ্ঞান লাভের পক্ষে

ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রবেদ্য, অনুমানগম্য নয়

শ্রুতিলব্ধ জ্ঞানের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার জন্য যুক্তিতর্কের প্রয়োজন

---

1. "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—ব্রঃ সূঃ ১।১।৩
2. "তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য শাস্ত্রমন্তরেণানবজম্যমানত্বাৎ"—ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ১।১।৪
3. ব্রঃ সূঃ, শং-ভাষ্য ২।১।১
4. ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ৩।২।২৪

সহায়ক হয় না, প্রতারণা করে মাত্র। (কেবলস্য তর্কস্য বিপ্রলম্ভকত্বং দর্শয়িষ্যতি)।[1] তর্কযুক্তি বা অনুমান শ্রুতির সাহায্যকারী মাত্র কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ বলে স্বীকৃত নয়।[2] যে তর্ক শাস্ত্রানুসারী নয়, নিছক বুদ্ধির সাহায্যে যে তর্কের উদ্ভাবন বা কল্পনা করা হয় সে তর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ কল্পনার কোন নিয়ামক নেই। যে লোক যেমন অনুভব করে সে তেমনই কল্পনা করে। এক ব্যক্তির তর্ক অন্য ব্যক্তি ভুল প্রমাণ করে এবং সেই ব্যক্তির তর্ক অপর ব্যক্তির দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। মানুষের বুদ্ধি একপ্রকার নয়, সেই কারণে তর্কও বিভিন্নরূপ হয়। তর্ক যেহেতু স্থির থাকে না সেহেতু অপ্রতিষ্ঠাদোষে দূষিত; সেকারণে তর্কের ওপর বিশ্বাস করে শাস্ত্রের অর্থ নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত নয়।[3] তর্কের দ্বারাও তর্কের স্থিরতা (প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব) স্থাপন করা যায় না। বেদ নিত্য। কাজেই বেদ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কালেই এক। শাস্ত্রানুসারী তর্কের দ্বারা ঈশ্বর বা সগুন ব্রহ্মের জ্ঞান লব্ধ হতে পারে। ঈশ্বর যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ তা জানা যেতে পারে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করা যায় না। পরব্রহ্ম শ্রুতিগম্য, তর্কগম্য নয়।' (শ্রুত্য-বগাহ্যমেবেদমতিগম্ভীরং পরং ব্রহ্ম, ন তর্কাবগাহ্যম্।[4])

তর্ক, যুক্তি বা অনুমান শ্রুতির সাহায্যকারী মাত্র; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ বলে স্বীকৃত নয়

তর্কের মধ্যে অপ্রতিষ্ঠা দোষ থাকার জন্য তর্কের ওপরে বিশ্বাস করে শাস্ত্র নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত নয়

একমাত্র অনুভবের মাধ্যমেই ব্রহ্মকে জানা যায়। বৌদ্ধিক জ্ঞানে বিষয়ীর ভেদ থাকে। কিন্তু পরব্রহ্ম অদ্বৈত, অনুভবের মাধ্যমে এই অদ্বৈতের জ্ঞান হয়। বিচারবুদ্ধি এই অদ্বৈতের যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না। যথার্থ জ্ঞান বুদ্ধির অধীন নয়, বস্তুর অধীন। তত্ত্বজ্ঞান বস্তুর অধীন। যে বস্তু যেমন সেরূপ জ্ঞান হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান।[5] অনুভবই যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে, বৌদ্ধিক জ্ঞান সবিকল্পক, অনুভব হল অবিকল্পক। কোন বিকল্পক ছাড়াই অনুভবের মাধ্যমে পরব্রহ্মকে জানা যায়। অনুভবে ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নতা উপলব্ধ হয়।

অনুভবের মাধ্যমেই অদ্বৈতের জ্ঞান হয়

(iii) সত্যতা ঃ শঙ্কর প্রমাতৃ, প্রমেয় এবং প্রমাণ—এই তিনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ব্যবহারিক জগৎ এই পার্থক্যের ওপর নির্ভর। যখন অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞান

1. ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ২।১।৬
2. "শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্যাপাভ্যুপেতত্বাৎ"—ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ১।২।২
3. তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ"—ব্রঃ সূঃ, ২।১।১১
4. ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ২।১।৩১
5. ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ১।১।২

হয় তখন প্রমাতৃ ও প্রমাণের আর কোন ভেদাভেদ থাকে না। শঙ্করের মতে অবাধিতত্ব (non-contradiction) হল সত্যতা নির্ণয়ের মাপকাঠি। অদ্বয়জ্ঞান যথার্থ, কারণ সে জ্ঞান অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না।[1] ভাববাদী দার্শনিকদের মতে সঙ্গতিই (coherence) হল সত্যতা নির্ণয়ের মাপকাঠি। কোন জ্ঞান নিজে নিজেই সত্য হয় না, অন্য জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে তা সত্য হয়। শঙ্কর ভাববাদী দার্শনিকদের এই অভিমত সমর্থন করেন। তবে সঙ্গতি ছাড়াও অনুরূপতা (correspondence) এবং প্রবৃত্তি সামর্থ্যও (practical efficiency) সত্যতা বিচারের মাপকাঠি হতে পারে। অনুরূপতা অর্থে যখন কোন ধারণা বস্তুর অনুরূপ হয় তখন ধারণা সত্য হয়। প্রবৃত্তি সামর্থ্য অর্থে যখন ধারণা সফল প্রবৃত্তির কারক হয় তখন ধারণা সত্য হয়। শঙ্করের মতে অনুরূপতা হল ব্যবহারিক সত্যতা নিরূপণ করার মাপকাঠি।

অবাধিতত্ব হল সত্যতা নির্ণয়ের মাপকাঠি

(iv) **ভ্রম :** ভ্রম সম্পর্কে অদ্বৈত বেদান্ত মত অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। ভ্রমজ্ঞানে দৃষ্ট বিষয়কে 'সৎ' বলা যায় না আবার 'অসৎ'-ও বলা যায় না। 'সদাসৎ'-ও বলা যায় না। যেমন শুক্তি-রজত ভ্রমে রজতকে অসৎ বলা চলে না। কেননা তাহলে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। আবার 'সৎ' বলা চলেনা। কারণ পরে শুক্তি জ্ঞানের দ্বারা রজতজ্ঞান বাধিত হয়। আবার সদাসৎ বলা যায় না। যহেতু এ সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরোধী। কাজেই রজত হল অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় রজত 'প্রাতিভাসিক'। যতক্ষণ পর্যন্ত শুক্তির জ্ঞান না হয় ততক্ষণ পর্যন্তই এই রজত ভ্রান্তদর্শীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। ভ্রম দূরীভূত হলে আর রজতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। অদ্বৈতবেদান্ত মতে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই চৈতন্যে অধিষ্ঠিত এবং শুক্তি যে চৈতন্যে অধিষ্ঠিত সেই চৈতন্য আশ্রিত অবিদ্যার তমোভাগ থেকেই অনির্বচনীয় রজতের উৎপত্তি। 'ভ্রমের উপাদান কারণ অবিদ্যা অনির্বচনীয়'। সুতরাং রজত এবং রজতের ভ্রান্ত জ্ঞানও অনির্বচনীয়। অদ্বৈতবেদান্ত মতে এই জগৎ প্রপঞ্চ ও অনির্বচনীয় এবং মিথ্যা। অবিদ্যার জন্যই শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, অবিদ্যার জন্যই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে, "শুক্তি রজতের উপাদান কারণ তুলা অবিদ্যা বা জীব চৈতন্যের উপাধি খণ্ড অবিদ্যা। আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কারণ মূল অবিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর চৈতন্যের উপাধিখণ্ড

ভ্রমজ্ঞানে দৃষ্ট বিষয় 'সৎ' নয় 'অসৎ' নয়; আবার 'সদাসৎ' নয়। একে অনির্বচনীয় বলতে হয়

1. ব্রঃ সূঃ, শং ভাষ্য ২।৩।২

অবিদ্যা। শুক্তি রজতের স্রষ্টা অজ্ঞ জীব ; মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চের স্রষ্টা সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর।[1] রজতের অধিষ্ঠান শুক্তির জ্ঞানে যেমন রজতের ভ্রান্ত জ্ঞান তিরোহিত হয়, তেমনি জগতের অধিষ্ঠান পরব্রহ্মের জ্ঞানে জগতের ভ্রান্ত জ্ঞান তিরোহিত হয়।

(v) প্রমাণঃ শঙ্কর ছটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। এই বিষয়ে শঙ্করের মত ভাট্ট মীমাংসকদের মতের অনুরূপ।

৩। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদঃ

(ক) ভূমিকাঃ রামানুজ স্বামী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবর্তক। রামানুজের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই পরমসত্তা, তবে চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মের দুই অংশ। অচিৎ অংশ থেকে জড় বস্তু এবং চিৎ অংশ থেকে চেতন জীবের সৃষ্টি। যদিও রামানুজ চিৎ এবং অচিৎ-এর সত্তা স্বীকার করেছেন, তিনি তাদের স্ব-নির্ভর সত্তা স্বীকার করেন নি। কারণ ব্রহ্মের শরীররূপেই চিৎ এবং অচিৎ-এর সত্তা আছে। তাদের কোন স্বাধীন সত্তা নেই। চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম তাদের আত্মা এবং নিয়ামক। ব্রহ্ম ছাড়া তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। চিৎ এবং অচিৎ অংশ নিয়ে

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অর্থ

ব্রহ্ম এক পরম ঐক্য। এই ঐক্যের বহির্ভূত অন্য কোন কিছুর সত্তা নেই, কাজেই রামানুজের মতবাদ অদ্বৈতবাদ (advaita or non-dualism)। তবে এই অদ্বৈতবাদ নির্বিশেষ নয়, বিশেষ (qualified) ; কারণ রামানুজ বহুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। রামানুজের মতে পরমাত্মা 'অনন্ত জগৎ এবং জীবসমূহের বিভিন্ন আকারে নিজেকে বিভক্ত করে তাদের অন্তরাত্মারূপে বর্তমান থাকেন। এই কারণেই রামানুজের অদ্বৈতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়।[2]

'চরম অদ্বয় ও ঈশ্বরবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই' বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দর্শনের পরমব্রহ্মকে ভক্তের ভগবানরূপে কল্পনা করে তিনি বেদান্তদর্শনে ভক্তিবাদের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়েছেন। অবশ্য অদ্বয় ও ঈশ্বরবাদের এই সমন্বয়ের পরিচয় রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পূর্বেও বৈদিক সাহিত্যে, ভগবদ্ গীতায়

1. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যশাস্ত্রী : বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪২৬

2. "So Ramanuya's theory is an advaita or non-dualism 'though with qualification (viscsa), viz. that it admits plurality, since the supreme spi subsists in a plurality of forms as souls and matter. It is therefore call Visistadvaita or qualified non-dualism."

—S. Radhakrisnan, Indian Philosophy Vol, II. Page, 6

মহাভারতের নারায়ণী অধ্যায়ে ও বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়। রামানুজ তাঁর 'বেদার্থ সংগ্রহে' ও বেদান্ত সূত্রভাষ্য 'শ্রীভাষ্যে' স্বীকার করেছেন যে, তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈত মত তাঁর পূর্ববর্তী লেখক ও উপদেষ্টা—যথা, বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রবিড়, গুহদেব, কপরদিন এবং ভারুচী প্রমুখের মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মসূত্রের ওপর রচিত বোধায়ন বৃত্তিটি এখন আর পাওয়া যায় না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে দর্শনের অদ্বয় ও ঈশ্বরবাদের সমন্বয়

[1]হিরিয়ানা (*Hiriyanna*) বলেন যে, একদিকে উপনিষদ ও পুরাণ এবং অপরদিকে তামিল ভাষায় রচিত দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য, এ দুটি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উৎস। এই দুটি উৎসের কথা ভেবেই রামানুজের দর্শনকে 'উভয় বেদান্ত' নামে অভিহিত করা হয়। রামানুজের পূর্বে যাঁরা বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্তন করেছেন তাঁদের মধ্যে **নাথমুনির** (১০০০ খ্রীস্টাব্দ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'ন্যায়তত্ত্ব' এবং 'যোগরহস্য' নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে এই গ্রন্থগুলি এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্তকের নাম **আলবন্দার** বা **যমুনাচার্য** (১০৫০ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি নাথমুনির পৌত্র। তিনি 'আগম প্রামাণ্য', 'সিদ্ধিত্রয়' 'মহাপুরুষ নির্ণয়' এবং 'গীতার্থ সংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে 'সিদ্ধার্থত্রয়' একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এর পরেই **রামানুজ স্বামীর** (১০১৭—১১৩৭ খ্রীস্টাব্দ) নাম করা যেতে পারে। রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের ওপর 'শ্রীভাষ্য' এবং ভগবদ্গীতার ওপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। এ ছাড়াও তিনি 'বেদান্তদীপ', 'বেদান্তসার', 'বেদার্থ-সংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। রামানুজের পরে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্তক **সুদর্শন সূরীর** নাম করা যেতে পারে। তিনি রামানুজের শ্রীভাষ্যের ওপর 'শ্রুত প্রকাশিকা' নামে একটি টীকা রচনা করেন। বিশিষ্টাদ্বৈত মতের তত্ত্ববিদ্যার ওপর **লোকাচার্যের** 'তত্ত্বত্রয়' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এর পরে **বেঙ্কটনাথ** বা **বেদান্তদেশিকের** নাম করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন রামানুজের মতের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে 'তত্ত্বটীকা' (শ্রীভাষ্যের ওপর রচিত একটি অসম্পূর্ণ টীকা), 'তাৎপর্য চণ্ডিকা', ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন', 'তত্ত্বমুক্তাকল্প' এবং তার ওপর টীকা 'সর্বার্থসিদ্ধি', 'শতদূষনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। **শ্রীনিবাসচার্যের** (১৭০০ খ্রীস্টাব্দ) 'যতীন্দ্র মত দীপিকা' বিশিষ্টাদ্বৈত মতের ওপর রচিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতের দুটি উৎস

নাথমুনি

যমুনাচার্য

রামানুজ স্বামী

সুদর্শন সূরী

বেঙ্কটনাথ

নিবাসচার্য

1. H. Hiriyanna: Outlines of Indian Philosophy; Page 384

(খ) তত্ত্ববিদ্যা ঃ (i) ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ঃ রামানুজের মতে তত্ত্ব তিন প্রকার; যথা—চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই পরম সত্তা। রামানুজের মতে ব্রহ্ম জগৎবিশিষ্ট। চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (প্রকৃতি) ব্রহ্মের দুটি অংশ, ব্রহ্ম বিশেষণযুক্ত এবং সগুণ ব্রহ্মই সত্য। রামানুজের মতে গুণ ছাড়া পদার্থ বা পদার্থ ছাড়া গুণ থাকতে পারে না। সগুণ পদার্থ ই কেবলমাত্র আমাদের অনুভবের বিষয় হতে পারে, সে কারণে নির্গুণ পদার্থের কোন সত্তা নেই এবং তা আমাদের অনুভূতির বিষয় হতে পারে না, সেহেতু ব্রহ্ম নির্গুণ হতে পারেন না। ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলা হয়। শঙ্কর নির্গুণ কথার অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে, নির্গুণ অর্থে 'নিরং নাস্তি গুণং যস্য, তৎ নির্গুণং।' যাঁর কোন গুণ নেই তিনিই নির্গুণ। কিন্তু রামানুজের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ বলতে বোঝায় ব্রহ্মের কোন অসৎ গুণ নেই। ব্রহ্ম নির্বিশেষ অর্থে শঙ্করাচার্য মনে করেন যে, ব্রহ্মের কোন বিশেষণ নেই। কিন্তু রামানুজ 'নির্বিশেষ' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—'নির্গতো বিশেষঃ যস্মাৎ, তৎ ইতি নির্বিশেষ।' কাজেই ব্রহ্ম নির্বিশেষ নয়, বিশেষণযুক্ত। ব্রহ্ম জগৎবিশিষ্ট। ব্রহ্ম সবিশেষ এবং সগুণ। ব্রহ্ম অসংখ্য সদ্‌গুণের আধার। ব্রহ্ম হলেন পুরুষোত্তম। তিনি সচেতন পুরুষ। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সক্রিয়। ব্রহ্ম বিশেষণযুক্ত; চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মের বিশেষণ। বিশেষণ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। বিশেষণের নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা নেই, কাজেই যে জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম হল বিশেষ্য। সেই ব্রহ্ম এক পরম ঐক্য। সেই জন্যই এই সমগ্রের (বিশিষ্টের) তারা অন্তর্ভুক্ত, মতবাদের নাম 'বিশিষ্টাদ্বৈত'।[1]

ব্রহ্মের দুটি অংশ—চিৎ এবং অচিৎ

সগুণ ব্রহ্মই সত্য

ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থে ব্রহ্মের কোন অসৎ গুণ নেই

ব্রহ্ম অসংখ্য সদ্‌গুণের আধার

রামানুজ ব্রহ্মের স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ স্বীকার করেন না। কেবলমাত্র স্বগত ভেদ স্বীকার করেন। একটি অশ্বের সঙ্গে আর একটি অশ্বের যে ভেদ তা হল স্বজাতীয় ভেদ এবং ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় ও সনাতন। ব্রহ্মের সদৃশ কিছু থাকতে পারে না; কাজেই ব্রহ্মের কোন স্বজাতীয় ভেদ নেই। একটি অশ্বের সঙ্গে একটি হস্তীর যে ভেদ তা হল বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্মের কোন বিজাতীয় ভেদ থাকতে পারে না। কারণ ব্রহ্মের অসদৃশ কিছুই নেই। একটি অশ্বের বিভিন্ন অঙ্গের যে পারস্পরিক ভেদ তা হল

ব্রহ্মের স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নেই, স্বগতভেদ আছে

1. "Because the Visesanas cannot by hypothesis exist by themselves or separately, the complex whole (visistha) in which they are included is described as a unity, Hence the name 'visistadvaita,'
—M. Hiriyanna ; Outlines of Indian Philosophy ; Fifth Impression, Page, 298

স্বগতভেদ। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের দুটি অংশ, সে কারণে ব্রহ্মের কেবলমাত্র স্বগতভেদ আছে।

ব্রহ্ম হল পরমতত্ত্ব। শঙ্করের মত ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। রামানুজের মতে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের গুণ। ব্রহ্ম 'সত্য' অর্থে বোঝায় ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু। ব্রহ্ম নিত্য ও অপরিণামী। পরিবর্তন ও পরিণামের অধিষ্ঠান হলেন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলতে বোঝায় তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি সকল প্রকাশের প্রকাশ, ব্রহ্ম অনন্ত আনন্দের আধার। ব্রহ্ম নিত্য, স্বয়ম্ভূ, অসীম, অনন্ত ও দোষমুক্ত। ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা। সৃষ্টিকার্য, পালন ও ধ্বংসের জন্য ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী। ব্রহ্ম সকল কার্যের কারণ। ব্রহ্ম হল আদি কারণ।[1] ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রহ্ম সর্ববস্তুর আধার এবং নিয়ন্তা। ব্রহ্ম হল শেষী। 'শেষী' শব্দের অর্থ গন্তব্যস্থল। ব্রহ্মই আমাদের গন্তব্যস্থল এবং অভিলষিত আদর্শ। ব্রহ্ম কর্মফলদাতা। বিশ্বের নৈতিক শাসনকর্তারূপে তিনি জীবকে তার কর্মানুযায়ী কর্মফল দান করেন। চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মেই অন্তঃস্থিত। চিৎ অচিৎ নিয়ে এই বিশ্বজগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ, প্রকার (modes) বা শরীর। ব্রহ্ম বহুর মধ্যে এক, ভেদের মধ্যে অভেদ। ব্রহ্ম 'সর্ববস্তুতে অনুস্যূত, তাদের অধিষ্ঠান এবং তাদের অন্তঃস্থ তাৎপর্য'। ব্রহ্ম অন্তর্যামী, সর্বজীবে তাঁর অধিষ্ঠান। ব্রহ্ম একাধারে উপায় এবং উপেয়। ব্রহ্মের পরিতৃপ্তির জন্যই চিৎ এবং অচিতের অস্তিত্ব। চিৎ এবং অচিতের পরিণামে ব্রহ্মের পরিণাম ঘটে না।[2]

সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের গুণ

ব্রহ্ম হলেন 'শেষী'

রামানুজ সৎকার্যবাদের সমর্থক। সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে। সৃষ্টির পূর্বে জীব চিৎশক্তিরূপে এবং জড়জগৎ অচিৎ-শক্তিরূপে ব্রহ্মেই নিহিত থাকে। উর্ণনাভ যেমন নিজের দেহের অভ্যন্তর থেকেই তন্তু নির্গত করে জাল তৈরি করে ব্রহ্মও তেমনি নিজের অভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। রামানুজের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত নয়, পরিণাম। পরিণামবাদ অনুসারে কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম। সৃষ্ট-জগৎ মিথ্যা নয়। ব্রহ্মের সৃষ্টি কার্যও মিথ্যা নয়। প্রলয়কালে যখন জগৎ ধ্বংস হয় তখন চিৎ এবং অচিৎ অব্যক্তভাবে ঈশ্বরে অবস্থান করে। তখন ব্রহ্মকে বলা হয় **কারণ ব্রহ্ম**। আবার সৃষ্টির পরে যখন ব্রহ্মের চিৎ অংশ এবং অচিৎ অংশ যথাক্রমে জীবজগৎ এবং জড়জগৎরূপে প্রকাশিত হয় তখন ব্রহ্মের এই

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত নয়, পরিণাম

1. রামানুজ, বেদান্তদীপ, ১.৩।৮ 2. রামানুজ, বেদার্থসংগ্রহ, পৃষ্ঠা ১১৪

অবস্থাকে বলা হয় **কার্য ব্রহ্ম**। উপনিষদে যে ব্রহ্মকে 'অবাঙমানসগোচর' বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে এই অব্যক্তরূপকেই নির্দেশ করে।[1]

রামানুজের মতে জীব ও প্রকৃতি ব্রহ্মের অংশ। তাহলে প্রকৃতির পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মেরও পরিণাম কি স্বীকার করতে হয় না? ব্রহ্ম কি জীবের সুখ-দুঃখের অধীন হন না, জগতের দোষত্রুটিকে কি ব্রহ্মের দোষত্রুটি বলে স্বীকার করা যাবে না? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য রামানুজ বিভিন্ন উপমার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। কখনও বা তিনি দেহ-আত্মার উপমার সাহায্যে জড়দ্রব্য ও জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। দেহে অন্তঃস্থিত থেকে আত্মা যেমন দেহকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি ব্রহ্মও জীব ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। দেহের দোষত্রুটিতে আত্মার পরিবর্তন হয় না, তেমনি এই বিশ্বজগতের অপূর্ণতায় ব্রহ্ম এই বিশ্বের অন্তর্যামী। ঈশ্বরের পূর্ণতার হানি ঘটে না। ব্রহ্ম বিশ্বের অন্তঃস্থিত হয়েও বিশ্বের অতিবর্তী। কখনও বা রামানুজ রাজা-প্রজার উপমার সাহায্যে এই সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। প্রজার সুখ-দুঃখ রাজার সুখ-দুঃখ নয়, তেমনি অচিৎ-এর পরিণামে ব্রহ্ম পরিণামী হয়ে পড়েন না। জড়দ্রব্য ও জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য রামানুজ কখনও বা অংশ-অংশী, দেহ-আত্মা বা রাজা-প্রজার উপমা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের যথার্থ স্বরূপ তিনি সুস্পষ্টভাবে কখনও ব্যাখ্যা করেননি। চিৎ এবং অচিৎ যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, বা ব্রহ্মের বিশেষণ হয় তাহলে চিৎ এবং অচিৎ-এর পরিণামেও ব্রহ্ম কিভাবে অপরিণামী থাকতে পারেন তা বোঝা কঠিন।

বিভিন্ন উপমার সাহায্যে ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা

ব্রহ্ম, আত্মা, জগৎ দেহ; ব্রহ্ম রাজা, জগৎ প্রজা

রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন। ঈশ্বর সচেতন পুরুষ। তিনি পুরুষোত্তম বা বাসুদেব বা ভগবান। তিনি জীবের উপাস্য। ঈশ্বর পরম করুণাময়, তিনি ভক্তবৎসল। তিনি ভক্তকে তার বাঞ্ছিত ফলদান করেন। তিনি অজ্ঞকে জ্ঞান দেন, শক্তিহীন জীবকে শক্তি দেন, অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করেন। ঈশ্বরপ্রাপ্তিই জীবের লক্ষ্য। ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া জীবের পক্ষে মোক্ষলাভ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে তুষ্ট করে তার কৃপা লাভ করতে পারলেই জীব মোক্ষলাভ করে।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন

ঈশ্বর প্রাপ্তি জীবের লক্ষ্য

1. শ্রীভাষ্য, ১।১।১, ১।১।২, ২।১।১৫

(ii) **জগৎ**: রামানুজের মতে ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় ও সনাতন। তিনি বহু হবার জন্য ইচ্ছা করেন এবং নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য এই নামরূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন। কোন বাহ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেন নি। ঈশ্বর পূর্ণ, সেহেতু আপ্তকাম। ঈশ্বরের কোন অভাব নেই। ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য ঈশ্বরের লীলা।

ব্রহ্মের বহু হবার ইচ্ছা থেকেই এই জগতের সৃষ্টি

রামানুজ সৎকার্যবাদের সমর্থক। সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে। সৎকার্যবাদের দুটি রূপ—পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ বাস্তবিকই কার্যে পরিণত হয় না অর্থাৎ কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম নয়, কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম ঘটে তখন রজ্জু প্রকৃতপক্ষে সর্পে পরিণত হয় না। রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ থেকে যখন কার্যের উৎপত্তি হয় তখন কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। মৃত্তিকা থেকে যখন ঘটের উৎপত্তি হয় তখন মৃত্তিকা প্রকৃতই ঘটে পরিণত হয়। ঘট মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম। চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মের দুই অবিচ্ছেদ্য অংশ। অচিৎ অংশ থেকে জড় জগতের উৎপত্তি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, পুরাণ ও স্মৃতির অনুসরণে এই অচিৎকে রামানুজ প্রকৃতি নামে অভিহিত করেছেন। তবে সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকে নিত্য ও অজ বলা হয়েছে। প্রকৃতি বিশ্বের অমূল মূল। প্রকৃতি এক স্বনির্ভর সত্তা। কিন্তু রামানুজের মতে প্রকৃতি ঈশ্বর-নির্ভর। প্রকৃতি ঈশ্বরের অংশ। আত্মা যেমন ভিতর থেকে দেহকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি ঈশ্বরও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন।[1] প্রকৃতিকে মায়া এবং অবিদ্যা বলা হয়; কারণ প্রকৃতি যথার্থ জ্ঞানলাভে বাধা সৃষ্টি করে। প্রকৃতি থেকে এই নামরূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি হয় বলে প্রকৃতিকে মায়া বলে। প্রলয়কালে প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং অবিভক্তভাবে ঈশ্বরের শরীররূপে ঈশ্বরের মধ্যে বিরাজ করে। এই অর্থেই প্রকৃতি অজ। সৃষ্টির সময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রকৃতি নামরূপাত্মক জগতে পরিণত হয়। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি। প্রকৃতি যেহেতু অচেতন, সেহেতু ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া প্রকৃতি কাজ করতে পারে না। শেষ প্রলয়ের পূর্ববর্তী জগতে জীব যেভাবে কর্ম করেছে সেই কর্মানুসারেই ঈশ্বর এক বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন। জীবের কর্মানুসারেই ঈশ্বর তাদের সুখ-দুঃখ প্রদান করেন। **সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের** ইচ্ছায় অবিভক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতি থেকে মহৎ বা বুদ্ধির উৎপত্তি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ

চিৎ অংশ থেকে জীবের ও অচিৎ অংশ থেকে জড় জগতের উৎপত্তি

সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি ও রামানুজের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য

1. শ্রীভাষ্য, ১।১।১

গুণের প্রাধান্য অনুসারে এই মহৎ বা বুদ্ধি সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস তিন প্রকার হতে পারে। বুদ্ধির পরিণাম হল অহংকার। অহংকার তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনের উদ্ভব। তামস অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি।[1] বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পঞ্চীকরণ মতবাদ সমর্থন করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কোন দ্রব্য নয়। এ হল তিনটি গুণ। সত্ত্ব জ্ঞান এবং আনন্দ উৎপাদন করে। রজঃ আসক্তি, বাসনা ও ক্রিয়া এবং তমঃ মিথ্যা জ্ঞান, অমনোযোগ, আলস্য ও নিদ্রা উৎপাদন করে।

প্রকৃতি থেকে মহৎ বা বুদ্ধির উৎপত্তি

শঙ্কর মতে সৃষ্ট জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। সৃষ্টি মিথ্যা। রামানুজের মতে ব্রহ্ম যেমন সত্য, ব্রহ্মের সৃষ্ট জগৎও অনুরূপ সত্য। উপনিষদ ব্রহ্মকেই একমাত্র সদ্বস্তু বলে অভিহিত করে এবং বহুর সত্তা অস্বীকার করে একথা যখন বলা হয়, তখন রামানুজ বলেন যে, উপনিষদে প্রকৃতপক্ষে বস্তুর বহু সত্তা অস্বীকার করা হয় নি। উপনিষদের বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য হল বহু বস্তুতে একই ব্রহ্ম বিদ্যমান অর্থাৎ সব বস্তুই তাদের অস্তিত্বের জন্য ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল। রামানুজ একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সব স্বর্ণনির্মিত বস্তু যেমন তাদের অস্তিত্বের জন্য স্বর্ণের ওপর নির্ভরশীল তেমনি সব বস্তুই তাদের অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল।

সৃষ্টজগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত।

উপনিষদে বহুর অস্তিত্বের কথা বলা হয়নি, সব বস্তুই ব্রহ্মের ওপর অস্তিত্বের জন্য নির্ভর, একথাই বলা হয়েছে

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরকে মায়াবী বলা হয়েছে। রামানুজের মতে মায়া অবিদ্যা বা জ্ঞানের অভাব নয়। মায়া হল এক ভাব পদার্থ। যে অচিন্তনীয় বিস্ময়কর শক্তির সাহায্যে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেন তাই হল মায়া। রামানুজের মতে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের সৃষ্ট এই জগৎ, উভয়ই সত্য, কোনটিই মিথ্যা নয়।

মায়া অবিদ্যা বা জ্ঞানের অভাব নয়, মায়া এক বিস্ময়কর শক্তি

(iii) **মায়া ঃ** শঙ্করের মতে মায়া এক অনির্বচনীয় শক্তি। মায়া সৎ নয়। কেননা তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মই সত্য। জগৎ সত্য নয়, মায়াও নয়। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অবিদ্যার নাশ হয়, তখন জগতের কোন সত্তা থাকে না। রামানুজের মতে মায়া অসৎ নয়, সৎ। মায়া হল এক ভাব-পদার্থ। যে অচিন্ত্যনীয়, বিস্ময়কর শক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি

শঙ্করের মতে মায়া অসৎ

1. লোকাচার্যঃ তত্ত্বত্রয়, পৃষ্ঠা ৭৯

করেন তাই হল মায়া। রামানুজের মতে সৃষ্ট জগৎ ও ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য উভয়েরই সত্যতা আছে। কোনটি মিথ্যা বা ভ্রান্তি নয়। রামানুজ তাঁর শ্রীভাষ্যে শঙ্করের মায়া বা অবিদ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সপ্তধা অনুপপত্তি' বা সাত প্রকার দোষ দেখিয়েছেন। আমরা এই সাত প্রকার অনুপপত্তি ও তার বিরুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তীদের উত্তরগুলি একে একে আলোচনা করব :

রামানুজের মতে যে বিস্ময়কর শক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন তাই হল মায়া

(১) **আশ্রয়ত্বানুপপত্তি** : রামনুজের মতে শঙ্করের অবিদ্যার কোন আশ্রয় থাকতে পারে না। জীব বা ব্রহ্ম কাউকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে না। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্বরূপ। কাজেই জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের বিরোধ থাকায় অবিদ্যারূপী অজ্ঞান জ্ঞানের কাছে থাকতে পারে না। কাজেই ব্রহ্ম কখনও অবিদ্যা বা অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারেন না।[1] জীব অবিদ্যারই সৃষ্টি বা কার্য। কার্য কিভাবে কারণের আশ্রয় হতে পারে? কাজেই জীব অবিদ্যার আশ্রয় হতে পারে না।

আশ্রয়ত্বানুপপত্তি

অদ্বৈতবেদান্তীরা এর উত্তরে বলেন যে, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হলেও অজ্ঞান বা অবিদ্যার আশ্রয় হতে পারে। ব্রহ্মের মায়াশক্তিকে যখন অবিদ্যা বলা হয় তখন তার যথার্থ অর্থ হল এই শক্তি জীবের মধ্যে অজ্ঞানতা উৎপন্ন করে। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল শক্তি যেমন অজ্ঞ দর্শককে প্রতারিত করে, ঐন্দ্রজালিক, নিজে যেমন তার ছলনায় প্রতারিত হন না, তেমনি ব্রহ্মের মায়াশক্তি অজ্ঞ ব্যক্তিকেই প্রতারিত করে, ব্রহ্ম তার দ্বারা প্রতারিত হন না। তাছাড়াও শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে। কারণ অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিফলিত হলে জ্ঞানে এমন এক শক্তি সঞ্চারিত হয় যা অজ্ঞানতা সৃষ্টি করে। 'জ্ঞানের বৃত্তিসম্পর্কই অজ্ঞানের নাশক।' জীবকেও অজ্ঞানের আশ্রয় বলা যেতে পারে। বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, বীজ যেমন অঙ্কুরের আশ্রয়, অঙ্কুরও তেমন বীজের আশ্রয়, কাজেই জীব জীবত্বের জন্য অবিদ্যার ওপর নির্ভর এবং অবিদ্যাও আশ্রয়ের জন্য জীবের ওপর নির্ভর, একথা বলার কোন বাধা নেই।

অদ্বৈতবেদান্তীদের উত্তর

(২) **স্বরূপানুপপত্তি** : রামানুজ বলেন যে, অদ্বৈতবেদান্তীরা যে অবিদ্যারূপ দোষের কথা বলেন সেই অবিদ্যারূপ দোষ কি সত্য, না মিথ্যা? এই দোষ সত্য নয়, কেননা শঙ্কর নিজেই স্বীকার করেছেন যে, অবিদ্যা সৎ নয়। যদি অবিদ্যাকে সৎ বলে স্বীকার করা হয় তাহলে ব্রহ্ম ছাড়াও অপর একটি সৎ বস্তু স্বীকার করার জন্য অদ্বৈতবাদ

1. জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বিরোধাদেব ন জ্ঞানাশ্রয়ত্বম্।"—শ্রীভাষ্য, পৃষ্ঠা ১৬৮

দ্বৈতবাদে পরিণত হয় ও অদ্বৈতবাদের হানি হয়। এই অবিদ্যাকে মিথ্যাও বলা চলে না। কারণ এই অবিদ্যা কি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বা জ্ঞানস্বরূপ তা নিরূপণ করা দরকার। এই তিন শ্রেণীর বস্তু ছাড়া অপর কোন বস্তু কল্পনা করা যায় না।

স্বরূপানুপপত্তি

অদ্বৈত বেদান্ত মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পারমার্থিক বা সত্য নয়, কেবল জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য। এই অবিদ্যাদোষ জ্ঞানস্বরূপ হতে পারে না; কারণ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের কোন ভেদ স্বীকার করা চলে না। আবার অবিদ্যাদোষের কারণ স্বরূপ অন্য কোন অবিদ্যাদোষের কল্পনা করা হলে 'অনবস্থা দোষ' ঘটবে। যদি এই অনবস্থা দোষের পরিহারের জন্য ব্রহ্মকেই দোষরূপী কল্পনা করা হয় তাহলে ব্রহ্ম যেহেতু নিত্য সেই দোষের আর নিবৃত্তি হবে না। সুতরাং দোষ যদি বিনষ্ট না হয়, মুক্তিলাভও সম্ভব হবে না, তাছাড়া ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন তাহলে তিনি জগৎপ্রপঞ্চের প্রতীতির মূল কারণ হতে পারেন, প্রপঞ্চের ন্যায় অপর একটি অবিদ্যা কল্পনার কি প্রয়োজন? কাজেই ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবিদ্যার সত্যতা স্বীকার না করলে জগৎ ভ্রান্ত বা মিথ্যা হতে পারে না। কাজেই অবিদ্যার স্বরূপ প্রমাণ করা যায় না।

এর উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন, অবিদ্যা পরব্রহ্মের শক্তি। জগৎপ্রপঞ্চ এই শক্তিরই পরিণাম। শুদ্ধ চৈতন্য এই অবিদ্যার অধিষ্ঠান, যাকে আশ্রয় করেই অবিদ্যার পরিণাম ঘটে। শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া অবিদ্যা-দোষের কারণ হিসেবে অন্যান্য দোষের কল্পনার কোন প্রয়োজন নেই।

(৩) **অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি:** শঙ্কর অবিদ্যাকে অনির্বচনীয় বলেছেন। কারণ অবিদ্যা 'সৎ-ও' নয় আবার 'অসৎ-ও' নয়। রামানুজ বলেন যে, 'সর্বাচ প্রতীতিঃ সদসদাকারা'।[1] সৎ বা অসৎ রূপেই পদার্থের প্রতীতি হয়।

অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি

পদার্থ হয় সৎ কিংবা অসৎ হবে, কিন্তু সৎ-ও নয় অসৎ-ও নয়, এরূপ পদার্থের অস্তিত্ব নেই। কাজেই অদ্বৈতবেদান্তীরা যখন অবিদ্যাকে অনির্বচনীয় বলেন তখন তার সমর্থনে কোন যুক্তি নেই।

অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন যে, পদার্থ যে অনির্বচনীয় হতে পারে প্রত্যক্ষ ও অনুমান থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভ্রমের বেলায় শুক্তিতে রজত প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষই অনির্বচনীয় অবিদ্যার প্রমাণ।

অদ্বৈতবেদান্তীদের উত্তর

শুক্তিতে যখন রজত প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাকে একেবারে অলীক বলা চলে না। কারণ আকাশকুসুমের মত বা বন্ধ্যাপুত্রের মত তা নিছক অলীক নয়, আবার শুক্তির জ্ঞান হলে যখন রজতের মিথ্যা দূরীভূত হয়, তখন তাকে 'সৎ'-ও বলা

1. শ্রীভাষ্য, পৃষ্ঠা, ১৭

যায় না। কাজেই রজত 'অসৎ'-ও নয়, আবার 'সৎ'-ও নয়। সুতরাং একে অনির্বচনীয় বলা ছাড়া কোন উপায় নেই।

(৪) **তিরোধানানুপপত্তিঃ** অদ্বৈত বেদান্ত মতে অবিদ্যা ব্রহ্মের প্রকাশকে আবৃত করে। কিন্তু রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ। কাজেই অবিদ্যা যদি ব্রহ্মের প্রকাশকে আবৃত করে তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ব্রহ্মের প্রকাশের তিরোধান বা বিলোপ ঘটে।

তিরোধানানুপপত্তি

এর উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন যে, গাঢ় মেঘে যখন সূর্য আবৃত হয় তখন তা প্রকৃত পক্ষে সূর্যকে আবরণ করে না, দ্রষ্টার প্রত্যক্ষকে আবৃত করে মাত্র। মেঘের আবরণে, প্রকাশময় সূর্যের তিরোধান ঘটে না। মেঘ অন্তর্হিত হলেই সূর্য প্রকাশিত হয়। অবিদ্যার আবরণে ব্রহ্মের প্রকাশের তিরোধান ঘটে না। ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ জীবের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না, এই মাত্র।

অদ্বৈতবেদান্তীদের উত্তর

(৫) **প্রমাণানুপপত্তিঃ** রামানুজ বলেন যে, অবিদ্যা যে ভাব পদার্থ তা প্রমাণ করার জন্য অদ্বৈতবেদান্তীরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম, অর্থাপত্তি প্রভৃতি উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এই সব প্রমাণ অবিদ্যার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। যেমন অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন যে, 'আমি অজ্ঞ' বা 'আমি আমাকে কিংবা অপর কাউকেও জানিনা'—এই সব প্রত্যক্ষই প্রমাণ করে যে, অবিদ্যা ভাব পদার্থ। এ সকল ক্ষেত্রে যে অজ্ঞানের প্রতীতি হয় তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়। এই অজ্ঞান অভাব পদার্থ নয়, ভাব-পদার্থ। 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি অনুভব বা জ্ঞান কখনও আত্মগত জ্ঞানাভাবের বিষয় হতে পারে না; কারণ এই 'অজ্ঞত্ব' অনুভব যখন থাকে তখন আত্মার জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে, নতুবা আত্মার দ্বারা নিজের অজ্ঞতা কখনও অনুভূত হতে পারে না। অতএব এই অজ্ঞান 'ভাব' পদার্থ। রামানুজ বলেন যে, 'আমি অজ্ঞ'—এই প্রত্যক্ষ, জ্ঞানের অভাব সূচনা করে। কাজেই প্রত্যক্ষ ভাবরূপ অবিদ্যার প্রমাণ হতে পারে না। রামানুজের মতে অজ্ঞান অ-জ্ঞান বা জ্ঞান নয়—এই ভাবেই সিদ্ধ হবে, 'অজ্ঞান' বলে একটি পৃথক বস্তুরূপে স্বয়ংসিদ্ধ হবে না। জ্ঞানাভাব বললে 'জ্ঞান নেই' এরূপ অভাব রূপেই জ্ঞানাভাব কথাটিকে লোকে ব্যবহার করে, সেরূপ 'আমি অজ্ঞ,' 'আমি আমাকে এবং অপর কাউকেও জানি না' ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই অজ্ঞানকে অভাবরূপেই স্বীকার করা কর্তব্য, অভাববস্তুর অতিরিক্ত ভাববস্তুরূপে কল্পনার কোন কারণ দেখা যায় না।

প্রমাণানুপপত্তি

এর উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন যে 'আমি অজ্ঞ'—এই প্রত্যক্ষ, জ্ঞানের অভাব সূচনা করে না। অভাবের জ্ঞান পরোক্ষভাবে হয়। অনুপলব্ধি প্রমাণের সাহায্যেই অভাবের জ্ঞান হয়। জ্ঞাতা যখন বলেন যে, আমি অজ্ঞ তখন তিনি নিজের অজ্ঞতা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করেন।

অদ্বৈতবেদান্তীদের উত্তর

(৬) **নিবর্তকানুপপত্তিঃ** শঙ্করের মতে নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-জ্ঞান থেকেই অবিদ্যার নিবৃত্তি সাধন হয়। রামানুজের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানে অবিদ্যা দূরীভূত হতে পারে না। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হয় নি, সবিশেষ সগুণই বলা হয়েছে। রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের জ্ঞানই জীবের বন্ধন মুক্তির উপায়। জীব ব্রহ্মের ঐক্যের জ্ঞান যা অবিদ্যা নাশ করতে পারে বলে অদ্বৈতবেদান্তীরা মনে করেন, তা মিথ্যা। কাজেই মিথ্যা জ্ঞানকে দূর করতে হলে অপর এক জ্ঞানের প্রয়োজন হবে।

নিবর্তকানুপপত্তি

এই অভিযোগের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন যে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে নির্গুণ ও সগুণ উভয় প্রকার ব্রহ্মেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সগুণ ব্রহ্ম অবিদ্যা কল্পিত, তবে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ।

অদ্বৈতবেদান্তীদের উত্তর

(৭) **নিবৃত্ত্যানুপপত্তিঃ** রামানুজের মতে অবিদ্যার নিবৃত্তি সম্ভব নয়, কারণ এমন কোন জ্ঞান নেই যার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হতে পারে। সকাম কর্মের জন্যই জীবের অজ্ঞানতা, কাজেই ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ বা একত্ব জ্ঞানে সে অবিদ্যার নিবৃত্তি হতে পারে না।

নিবৃত্ত্যানুপপত্তি

অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। অজ্ঞানতা-বশতঃ অনাত্মার সঙ্গে আত্মার একাত্মতা অনুভব করার জন্যই জীবের বদ্ধদশা, আত্মজ্ঞানের উদয় হলেই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়।

অদ্বৈতবেদান্তীদের উত্তর

(iv) **আত্মাঃ** রামানুজের মতে জীব দেহবিশিষ্ট আত্মা। ঈশ্বরের অচিৎ অংশ থেকেই জীবের দেহের সৃষ্টি, সে কারণে দেহ অসীম নয়; সসীম। আত্মাও ঈশ্বরের অংশ, সেহেতু অসীম নয়। আত্মা দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি থেকে পৃথক। আত্মা সক্রিয় এবং জ্ঞাতা ও ভোক্তা। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, জ্ঞান ছাড়াই আত্মা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। জ্ঞানের দ্বারা আত্মা প্রকাশিত হয় না। আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়। আত্মা সর্বব্যাপী বলতে বোঝায় যে, আত্মা যেহেতু খুব সূক্ষ্ম, সেহেতু যে কোন অচেতন দ্রব্যের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। একটি প্রদীপ যেমন

জীব দেহবিশিষ্ট আত্মা

আত্মা সক্রিয়, জ্ঞাতা ও ভোক্তা

সমস্ত কক্ষটিকে আলোকিত করতে পারে, সেইরূপ আত্মা যে দেহে অধিষ্ঠিত হয় সেই দেহের সমগ্র অংশকেই চৈতন্যের আলোকে আলোকিত করে তোলে। আত্মা নিত্য ও অনুপরিমাণ। চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ নয় বা চৈতন্য আত্মার স্বরূপও নয়। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক নিত্যগুণ। সুষুপ্তি অবস্থায় এবং মোক্ষ-কালেও আত্মা অহংরূপে প্রকাশিত হয়।

চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক নিত্যগুণ

আত্মা নিত্য। আত্মা অজ এবং অমর। আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আত্মাকে দেখা যায় না। আত্মা অপরিণামী। দেহের পরিবর্তনে বা পরিণামে আত্মার পরিণাম ঘটে না। আত্মা কোন অংশের সমন্বয়ে গঠিত নয়। জ্ঞান আত্মার নিরূপক-ধর্ম। জীব ঈশ্বরের বিশেষণ বা প্রকার (mode)। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ঈশ্বর সব জীবের অধিষ্ঠান। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের দাস-প্রভু সম্পর্ক। জীব ঈশ্বরের ওপর নির্ভর।

আত্মা নিত্য, অজ এবং অমর

জীব ঈশ্বরের ওপর নির্ভর

আত্মা চৈতন্যের অধিষ্ঠান। চৈতন্য বস্তুকে জানে। শঙ্কর শুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। রামানুজের মতে যে চৈতন্য বস্তুকে জানে না, সেই শুদ্ধ চৈতন্যের কোন অস্তিত্ব নেই।[1] আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নয়। চৈতন্য আত্মার গুণ। আত্মা বস্তুকে উপলব্ধি করে। জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী। জ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি এবং ধ্বংস আছে। কিন্তু সব জ্ঞানের সাক্ষীরূপে আত্মা স্থায়ী। আত্মা অতীত বিষয় স্মরণ করে এবং অতীত অভিজ্ঞতার বিষয়কে চিনতে পারে।

শুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই

স্মৃতি এবং প্রত্যভিজ্ঞা স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। 'আমি অতীতে এই বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম'—এই স্মরণক্রিয়াই প্রমাণ করে আত্মা জ্ঞাতা, কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ নয়। আত্মা সব সময়ই জ্ঞানের কর্তা, আত্মা কখনও জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। জ্ঞাতা আত্মাকে জ্ঞেয় বস্তুরূপে ধারণা করা বন্ধ্যা মাতার ধারণার মত স্ববিরোধী ধারণা। শঙ্করের মতে অবিদ্যার জন্যই শুদ্ধ চৈতন্যকে জ্ঞাতা বলে ভ্রম হয়। রামানুজ বলেন যে, এই মতবাদ যথার্থ নয়। কারণ 'আমি অনুভব করি' এই উপলব্ধিই আমাদের হয়ে থাকে, 'আমিই অনুভব', এরূপ উপলব্ধি হয় না।[2] জ্ঞাতৃত্ব মিথ্যা হতে পারে না। জ্ঞাতা যদি মিথ্যা হয়, জ্ঞানও মিথ্যা হবে। নিছক অনুভবের

আত্মা জ্ঞাতা জ্ঞেয় বস্তু হতে পারে না

1. "ন চ নির্বিষয়া কাচিৎ সংবিদ অস্তি, অনুপলব্ধ।"—শ্রীভাষ্য, ১।১।১
2. শ্রীভাষ্য, ১।১।১

কোন অস্তিত্ব নেই, অনুভব কর্তারূপেই আত্মার অস্তিত্ব আছে, যার অনুভব হয়। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, আবার জ্ঞানের আশ্রয়।[1] শঙ্করের মতে চৈতন্যের প্রতিফলনের জন্য অচেতন অহংকারকে জ্ঞাতা মনে হয়।[2] রামানুজের মতে অহংকার চৈতন্যে প্রতিফলিত হতে পারে না। কারণ অহংকার অচেতন, তার পক্ষে জ্ঞাতা হওয়া সম্ভব নয়। অচেতন অহংকার চেতনার কাছাকাছি থাকার জন্য কখনও চেতন হতে পারে না। অহংকারের দ্বারা চেতনা প্রকাশিত হতে পারে না। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ অচেতন অহংকার তাকে প্রকাশ করতে পারে না। অহংকারই চেতনার দ্বারা প্রকাশিত হয়। চেতনা অহংকারের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। কাজেই আত্মা শুধুমাত্র জ্ঞানস্বরূপ নয়। আত্মা জ্ঞাতা, সুষুপ্তিতে আত্মা জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হয় না, কারণ তখন অনুভবের বা জ্ঞানের কোন বস্তু থাকে না।

অহংকার চৈতন্যে প্রতিফলিত হতে পারে না

শঙ্করের মতে চেতনা স্বয়ংপ্রকাশ এবং চেতনা অন্য চেতনার বিষয় হতে পারে না। রামানুজের মতে যখন আত্মা কোন বস্তুকে প্রকাশ করে তখন এর চেতনাকে স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয়। কিন্তু আত্মা নিজের অতীত চেতনাকে এবং অপরের চেতনাকে বিষয়রূপে জানতে পারে। চেতনাকে বিষয়রূপে জানলেও চেতনার স্বরূপের কোন হানি ঘটে না। অচেতন বস্তু এবং চেতনা উভয়েই চেতনার বিষয় হতে পারে।

আত্মা নিজের চেতনাকে নিজে জানতে পারে

রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও জীব একান্তভাবে অভিন্ন নয়। জীব ব্রহ্মের অংশ। কাজেই অংশের সঙ্গে অংশীর একান্ত অভেদ কল্পনা করা যেতে পারে না। আবার জীবকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলা চলে না, কারণ অংশের অংশী থেকে গুণের দ্রব্য থেকে এবং চেতন দেহের আত্মা থেকে পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কাজেই ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহল ভেদ ও অভেদের সম্বন্ধ। একই ব্রহ্মের দুটি ভিন্ন রূপের অভেদের কথাই রামানুজ স্বীকার করেছেন। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি'—এই শ্রুতি বাক্যের আসল তাৎপর্য হল—দুই প্রকার গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ। "তৎ" শব্দের দ্বারা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান জগৎস্রষ্টা ব্রহ্ম এবং 'ত্বম্' শব্দের দ্বারা জীব শরীরধারী ব্রহ্মকে বুঝতে হবে। সুতরাং এ হল বিশিষ্টের অদ্বৈত বা জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মের সঙ্গে জীবরূপী ব্রহ্মের অভিন্নতা। এই কারণে রামানুজ-দর্শনকে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে অভিহিত করা হয়।

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন নয়

---

1. শ্রীভাষ্য, ১।১।১
2. শ্রীভাষ্য, ১।১।১

(v) **জীবের বন্ধন ও মুক্তি ঃ** রামানুজের মতে কর্মফল ভোগহেতু জীবের বদ্ধদশা। নিজ নিজ কর্মানুযায়ী প্রতিটি জীবাত্মা একটা জড় দেহ ধারণ করে। আত্মার বদ্ধদশা মানেই হল আত্মার দেহ ধারণ। অবিদ্যা, কর্ম, বাসনা এবং রুচি বদ্ধদশার কারণ। আত্মা যে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর, এই জ্ঞানের অভাবই অবিদ্যা। অজ্ঞানতাবশতঃ যে কর্ম করা হয় তাও বন্ধনের কারণ। কর্ম যে অবচেতন সংস্কার সৃষ্টি করে তা হল বাসনা। সংস্কার যে আসক্তি সৃষ্টি করে তাই হল রুচি। অবিদ্যা ও অবিদ্যাজাত বিষয়গুলিই আত্মাকে মন-দেহ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করে। আত্মা তার নিজ স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানতার জন্যই দেহের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। একেই বলা হয় অহংকার। অহংকারবশতঃই আত্মা জাগতিক সুখের জন্য লালায়িত হয় এবং জাগতিক সুখভোগে নিমগ্ন হয়। এরই জন্য তাকে সকাম কর্ম সম্পাদন করতে হয় এবং তার ফলে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়।

কর্মফল ভোগহেতু জীবের বদ্ধদশা

অবিদ্যাবশতঃ আত্মা দেহের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করে

বেদান্ত পাঠের দ্বারা এই অবিদ্যা দূরীভূত হলেই জীব উপলব্ধি করে যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অংশ। কর্ম এবং জ্ঞান উভয়ের সংযোগে মোক্ষলাভ ঘটে। নিষ্কামভাবে বেদবিহিত নিত্য কর্মগুলি সম্পাদন করলে অতীত কর্মের সঞ্চিত ফল বিনষ্ট হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছা জাগে। রামানুজের মতে কর্ম-মীমাংসা অধ্যয়ন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়ার প্রস্তুতি পর্ব। কর্ম-মীমাংসা অধ্যয়ন ও নিষ্কামভাবে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেই মুমুক্ষু ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে, কর্মের দ্বারাই শুধু মাত্র মোক্ষলাভ ঘটে না। মোক্ষের জন্য জ্ঞান লাভও অপরিহার্য ; সে কারণে তার বেদান্ত অধ্যয়নের ইচ্ছা জাগে। বেদান্ত পাঠে তিনি অবহিত হন যে ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা এবং জীবাত্মা ও দেহ অভিন্ন নয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি আরও উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। ঈশ্বর যেহেতু করুণাময় সেহেতু ভক্তকে তিনি তার বাঞ্ছিত ফল দান করেন।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ লাভ হয় সত্য কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান মানে উপনিষদের আক্ষরিক জ্ঞান নয়। যথার্থ জ্ঞান হল ঈশ্বরের অনুক্ষণ স্মরণ বা ধ্রুবাস্মৃতি। একেই ধ্যান, উপাসনা, ভক্তি প্রভৃতি নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রামানুজের মতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করাকে রামানুজ বলেছেন আর্ত-প্রপত্তি। এর

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু

অভাব ঘটলে কৃপালাভ করা যায় না। ভক্ত যখন ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে নিরন্তর প্রেমময় ঈশ্বরের ধ্যান করে তখনই ভক্তের ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ঘটে। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হলে ঈশ্বর প্রসাদে ভক্তের মধ্যে পূর্ণ জ্ঞানের উদ্ভব হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তখন জীব সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। রামানুজের মতে জীবন্মুক্তি সম্ভব নয়, বিদেহমুক্তি সম্ভব। মোক্ষলাভের পরেও জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না; কারণ সসীম জীবাত্মার পক্ষে অসীম ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা সম্ভব নয়। তবে মোক্ষ অবস্থায় জীবের চৈতন্য দোষমুক্ত হওয়াতে ব্রহ্মের সদৃশ হয়। একেই উপনিষদে জীবের ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা বলে।

(গ) জ্ঞানতত্ত্ব (Theory of knowledge):

রামানুজ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই তিনটিকেই বিশেষভাবে প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। অবশিষ্ট প্রমাণগুলির ওপর তিনি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। রামানুজ সম্প্রদায় প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সাক্ষাৎকারি প্রমা প্রত্যক্ষম্।'[1] প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান, সেহেতু অনুমান বা শব্দ প্রমাণের সাহায্যে যে জ্ঞান লব্ধ হয় তার থেকে পৃথক। প্রত্যক্ষ হল প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান; সে কারণে শুক্তিতে রজত প্রত্যক্ষরূপ ভ্রান্তজ্ঞান থেকে পৃথক। যে যথার্থ জ্ঞানের মূলে অন্য কোন জ্ঞান কারণরূপে বর্তমান থাকে না, সেরূপ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ দুপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সব বস্তু নিত্য প্রত্যক্ষণ করেছেন। একে বলা হয় নিত্য প্রত্যক্ষ। আর আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে অনিত্য প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। অনিত্য প্রত্যক্ষ দুপ্রকার—যোগজ ও অ-যোগজ প্রত্যক্ষ। যোগশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু সম্পর্কে যোগীদের যে মানস প্রত্যক্ষ হয় তাহল যোগজ প্রত্যক্ষ; চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজ নিজ বিষয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধহেতু যে জ্ঞান হয় তাকেই অ-যোগজ প্রত্যক্ষ বলে।

প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা

প্রত্যক্ষ দুপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য

অনিত্য প্রত্যক্ষ দু প্রকার—যোগজ ও অ-যোগজ

রামানুজ সম্প্রদায় নির্বিকল্প এবং সবিকল্প—এই দুপ্রকার প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ মানে এই নয় যে, সব রকম 'বিশেষ ভাব বর্জিত বস্তুর জ্ঞান।' এই প্রকার জ্ঞান কখনও লাভ করা যায় না। আসলে নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রভেদ হল একটি জ্ঞেয় বস্তুর যত রকম বিশেষ ভাব বা ধর্ম প্রত্যক্ষে উপস্থিত হয়, তাদের সবগুলি নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে উপস্থিত হয় না। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে বিশেষ

1. বেঙ্কটনাথ—ন্যায়পরিশুদ্ধি; পৃষ্ঠা ৭০

কয়েকটি ভাবের প্রতীতি হয় মাত্র। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে আমরা কোন বস্তুকে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করি এবং যদিও আমরা তার সামান্য ধর্ম প্রত্যক্ষ করি, আমরা উপলব্ধি করি না যে সেই সামান্য ধর্ম উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সব বস্তুরই সাধারণ ধর্ম। যেমন, প্রথম যখন আমরা গরু দেখি তার গোত্ব আমরা প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু সেই গোত্ব যে সব গরুরই সাধারণ ধর্ম তা আমরা বুঝি না। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার বা চতুর্থবারে যখন আমরা গরু দেখি তখন সকল গরুতেই যে গরুর সাধারণ ধর্ম গোত্ব বর্তমান আছে তা উপলব্ধি করি। এই দ্বিতীয় প্রকার প্রত্যক্ষকেই সবিকল্প প্রত্যক্ষ বলে।

নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষ

অনুমান হল একটি সাধারণ 'সত্য' থেকে লব্ধ জ্ঞান। বস্তুতঃ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকেই সাধারণ সত্যটি পাওয়া যায়। একাধিক দৃষ্টান্তে সংশয় দূরীভূত হয়। তর্কের সাহায্যে এবং সদর্থক ও নঞর্থক দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে আমরা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে অপসারণ করি এবং সাধারণ সত্যটি প্রতিষ্ঠা করি। রামানুজ শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, শাস্ত্র থেকেই ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করা যায়। অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান কেবলমাত্র শাস্ত্র থেকে পাওয়া যেতে পারে, যদিও শাস্ত্রের সমর্থনে বিচারবুদ্ধিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বেদ নিত্য, ঈশ্বরই বেদের স্রষ্টা। পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মের জ্ঞান বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে লব্ধ হয় না। নিরন্তর ঈশ্বর ধ্যানের ফলেই পরমতত্ত্বের বা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ঘটে।

অনুমান

ভ্রম ঃ রামানুজের মতে শুধুমাত্র সদ্বস্তুরই জ্ঞান হতে পারে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে সময় সময় আমাদের জ্ঞান বস্তুর অনুরূপ হয় না কেন? ভ্রান্ত জ্ঞানকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? 'ভ্রম' সম্পর্কে রামানুজের মতবাদ 'সৎখ্যাতিবাদ' নামে পরিচিত। রামানুজের মতে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণে যে বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা অলীক নয়, সদ্বস্তু। যখন রজ্জুতে সর্পের প্রত্যক্ষণ হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে কোন অসৎ বস্তুর প্রত্যক্ষণ হয় না। রামানুজের মতে যখন শুক্তি দেখে 'ইদং রজতং' এভাবে রজত-জ্ঞানের উদয় হয় তখন শুক্তির মধ্যে রজতের যে অংশ আছে তাকে ভিত্তি করেই রজত জ্ঞানের উদয় হয়। রামানুজের মতে যাবতীয় জড়বস্তুই ক্ষিতি, অপ, তেজঃ—এই তিনটি ভূতের মিশ্রণে গঠিত। ক্ষিতির মধ্যে জল ও তেজের, জলের মধ্যে ক্ষিতি ও তেজের এবং তেজের মধ্যে জল ও ক্ষিতির অংশ বিদ্যমান আছে। তবে যেটিতে যার অংশের অস্তিত্ব বেশী তার থেকেই তার নাম হয়েছে। জগতের সব জড় বস্তুর মধ্যেই এই মৌলিক উপাদানগুলি

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণে যে বস্তু প্রত্যক্ষ করা হয় তা সদ্বস্তু

কম-বেশী মাত্রায় বর্তমান। শুক্তিতে রজতের উপাদানও আছে। উভয়ের মৌলিক উপাদানের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সেকারণে শুক্তি দেখে যখন রজত ভ্রম হয় তখন শুক্তির মধ্যে কিছু মাত্রায় বিদ্যমান রজতের অংশ দেখেই এই ভ্রম হয়। কাজেই রামানুজের মতে মরু-মরীচিকার জলের জ্ঞান, রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান, শুক্তিতে রজতের জ্ঞান প্রভৃতি কোনটিই অসদ্‌বস্তুর জ্ঞান নয়। সূর্যকিরণের মধ্যে জলের যে অংশ বিদ্যমান থাকে, রজ্জুর মধ্যে সর্পের যে অংশ এবং শুক্তির মধ্যে রজতের যে অংশ থাকে, তাকে ভিত্তি করেই যথাক্রমে জলের, সর্পের এবং রজতের জ্ঞানের উদয় হয়। কাজেই কোন 'অসৎ' বস্তুকে অবলম্বন করে এই জ্ঞানের উদয় হয় না। রামানুজের মতে স্বপ্নকালে ব্যক্তির যে সব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয় তাও সদ্ বস্তুর জ্ঞান। তবে ভ্রমে যদি সদ্ বস্তুর জ্ঞান হয় সে জ্ঞান মিথ্যা কেন? তার উত্তরে বলা হয়, শুক্তিতে যে রজতের প্রত্যক্ষ হয় তা ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনে অসমর্থ হয় বলেই মিথ্যা জ্ঞান। শুক্তিতে দৃষ্ট রজতের দ্বারা রজত নির্মিত অলংকার, বাসন প্রস্তুত করা চলে না।

শুক্তিতে রজতের অংশ থাকার জন্যই রজত ভ্রম হয়

রজত সৎ নয়, অসৎ নয়, আবার সদাসদ নয়, সেহেতু অনির্বচনীয়

'ভ্রম' সম্পর্কে রামানুজের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় অনুমোদন করেন নি। যদি স্বীকারই করা যায় যে, জগতের প্রতিটি বস্তুতে অপরের অংশ বিদ্যমান আছে এবং যেহেতু শুক্তি অংশে শুক্তির অংশ বেশী, রজতের অংশ কম আছে, তাহলে শুক্তি দেখে শুক্তির জ্ঞান না হয়ে রজতের জ্ঞান হয় কেন? সূর্যকিরণে অল্পমাত্রায় জলের অংশ আছে, তেজের অংশ বেশী আছে তবে মরু-মরীচিকায় কিরণের জ্ঞান না হয়ে জলের জ্ঞান হয় কেন? সংখ্যাতিবাদের সমর্থকবৃন্দ এর কোন সদুত্তর দেননি।

অদ্বৈতবেদান্তীরা 'ভ্রম' সম্পর্কে উপরিউক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। তাঁরা বলেন যে, কতকগুলি উপাদান শুক্তি ও রজত উভয়ের মধ্যে বর্তমান থাকার জন্য উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে সত্য, কিন্তু উভয়ের মধ্যে অসাদৃশ্যও আছে, নতুবা জগতের সব বস্তুই একরূপ প্রতিভাত হত। কাজেই বিভিন্ন বস্তুতে একই উপাদান বর্তমান থাকলেও বিভিন্ন বস্তু যে বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হয় সে কথা অস্বীকার করা চলে না। শুক্তি যখন শুক্তির মত প্রতিভাত হয় তখন সে জ্ঞান যথার্থ, কিন্তু শুক্তি যখন রজতের মত প্রতিভাত হয় তখন তাকে অযথার্থ মনে হয়। অদ্বৈতবেদান্তীদের মতে অধ্যাসে সাক্ষাৎ প্রতীতির বিষয় আছে। যখন বলি 'এই হল রজত' তখন আমাদের এই জ্ঞানকে আমরা ভ্রান্ত অনুমানের ফল

রামানুজ মতের সমালোচনা

বলে মনে করি না। ভ্রম সম্পর্কে অদ্বৈত বেদান্ত মত অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নামে পরিচিত।

সত্যতা ঃ রামানুজের মতে সব জ্ঞানই সদ্বস্তুর জ্ঞান, তবে তা পূর্ণ সত্যের জ্ঞান নয়। আমাদের জ্ঞান সাধারণতঃ আংশিক এবং অপূর্ণ। যখন আমরা শুক্তিকে রজত বলে ভ্রম করি তখন শুক্তিতে আমরা রজতের কোন কোন বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করি এবং অবশিষ্টগুলি প্রত্যক্ষ করি না। বেঙ্কট তাঁর 'ন্যায়পরিশুদ্ধিতে' বলেছেন যে, যে জ্ঞান যথার্থ ব্যবহারের উপযোগী তাই প্রমা।[1] জ্ঞান শব্দের ব্যবহারে অনুভব ও স্মৃতি উভয়ই প্রমার অন্তর্ভুক্ত। ব্যবহারের অনুকূল না হলে যথার্থ জ্ঞান হলেও তাকে রামানুজ সম্প্রদায় প্রমা বলবেন না। জ্ঞাতব্য বিষয়টি যেমন সেভাবে তাকে জানলেই জ্ঞান সত্য। একটি বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে জানাই মিথ্যা জ্ঞান। শুক্তিকে শুক্তি বলে জানাই সত্য জ্ঞান, রজত বলে জানাই মিথ্যা জ্ঞান। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানে জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত রূপের অবধারণ হয়। রামানুজ সম্প্রদায় জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন। যথার্থ জ্ঞান এবং ভ্রান্ত জ্ঞান উভয়ই অসম্পূর্ণ জ্ঞান। প্রথমটি আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধন করতে সমর্থ, দ্বিতীয়টি অসমর্থ। যথার্থ জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির কারক বা ব্যবহারের অনুকূল। মরীচিকা মিথ্যা, কারণ মরীচিকায় যে জল প্রতিভাত হয় তা আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না, যদিও মরীচিকাতে জলের প্রত্যক্ষণ হয়। জ্ঞান সদ্বস্তুরই জ্ঞান, তবু পরম সত্যে উপনীত না হলে সে জ্ঞান সম্পূর্ণ ও সর্বত্রুটিমুক্ত হয় না। পূর্ণ সত্যে উপনীত না হলেই ভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়। অবশ্য ব্যবহারিক জগতে বা সংসার অবস্থায় জ্ঞান অপূর্ণ থাকে। জীব যখন মোক্ষলাভ করে তখন পরম সত্যের জ্ঞান লাভ করে। যখন জ্ঞান চরম স্তরে উপনীত হয় তখন একটি মাত্র সুসংবদ্ধ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়। বস্তুতঃ এই জ্ঞানই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার।

যে জ্ঞান ব্যবহারের অনুকূল তাই যথার্থ জ্ঞান

প্রমাতত্ত্ব (Theory of Judgment) ঃ রামানুজের মতে অবধারণের উদ্দেশ্য ও বিধেয় নিছক একই বস্তুর নির্দেশক এ কথা চলে না, তাহলে 'ক হয় খ' এই অবধারণাটি সত্য হবে না। আমাদের বলতে হবে—'ক হয় ক'। রামানুজ বলেন, অবধারণের উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মধ্যে তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক নয়, পৃথক। কোন অবধারণ সম্ভব নয়, যদি অবধারণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ না থাকে, তবে এতে যে অভেদ ব্যক্ত হয় তা ভেদবর্জিত নয়, ভেদযুক্ত। তাদাত্ম্য হল একটি সম্পর্ক এবং দুটি পদ ছাড়া কোন

1. 'যথাবস্থিত ব্যবহারানু গুণং জ্ঞানাং প্রমা'—ন্যায় পরিশুদ্ধি ; পৃষ্ঠা ৭৬

সম্পর্কের উৎপত্তি ঘটতে পারে না। পদ দুটি পৃথক না হলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক হতে পারে না। সর্বপ্রকার ভেদবর্জিত হলে তাদাত্ম্য সম্পর্কের কোন প্রশ্ন ওঠে না। শঙ্কর বলেন যে, 'তত্ত্বমসি' এই বেদবাক্যে, 'ত্বং' এবং 'ত্বমের' মধ্যে যে পার্থক্য তা প্রাতিভাসিক; বস্তুতঃ অবধারণটি উভয়ের যথার্থ অভেদের প্রকাশক। কিন্তু রামানুজের মতে সব অভেদই 'ভেদের মধ্যে অভেদ' এবং প্রতিটি অবধারণই এই সত্য প্রকাশ করে। যেমন, 'আকাশ হয় নীল'—এই অবধারণে 'আকাশ' এবং 'নীল' অভিন্ন নয়, আবার সম্পূর্ণ ভিন্নও নয়। বস্তু এবং তার নীলবর্ণ গুণটি একত্রে অবস্থান করে কিন্তু উভয় পদের তাৎপর্য পৃথক। রামানুজের মতে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করার পক্ষে সম্পর্কের মাধ্যমে তাকে উপলব্ধি করাই যথার্থ। শঙ্করের মতে একটি সম্পর্ককে বুঝতে হলে আর একটি সম্পর্কের প্রয়োজন হবে, এর ফলে অনবস্থা দোষ ঘটবে। রামানুজ বলেন, এই দোষ দূর হতে পারে যদি মনে করা যায় সে সত্তা স্বয়ংপ্রকাশ। এক বা অভিন্ন হলেই সম্পর্ক বর্জিত হতে হবে বা যেখানে সম্পর্ক রয়েছে সেখানে ঐক্যের বা অভিন্নতার স্থান নেই এমন সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। ঈশ্বর এবং জগৎ উভয়ই সদ্বস্তু এবং একের মধ্য দিয়েই অপরটি সৎ। পরম সত্য যেমন সৎ, পরম সত্তার অংশও সৎ। তবে পরম সত্তা সর্ববস্তু ও জীবের সত্তার সত্তারূপে তাদের ধারণ করে আছে।

অবধারণের মধ্যে যে অভেদ থাকে তা ভেদবর্জিত নয়

সব অভেদই ভেদের মধ্যে অভেদ

(ঘ) উপসংহার: শঙ্করের অদ্বৈতবাদ শুধুমাত্র ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে নয়, বিশ্বের দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক পরম মূল্যবান সম্পদ। তাত্ত্বিক গভীরতা, সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার যে গভীর পরিচয় শঙ্কর-দর্শনে পাওয়া যায় তা এক কথায় অতুলনীয়। যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে তিনি প্রতিপক্ষের মতামতগুলি খণ্ডন করেছেন তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাঁর চিন্তাধারা বয়ে চলেছে এবং এইভাবে তিনি তাঁর দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমন সুসঙ্গত ও সুসমন্বিত এই মতবাদ যে, এর খণ্ডন এক দুঃসাধ্য কার্য। যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বান্বেষী মনের কাছে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের আবেদন যতখানি, সাধারণ মানুষের কাছে ততখানি নয়; কারণ দার্শনিক চিন্তাধারার যে উচ্চস্তরে তিনি নিজেকে উপনীত করেছেন সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই স্তরে উপনীত হওয়া কঠিন। সে কারণে শঙ্করের নির্বিশেষ শুদ্ধ চেতনা সাধারণ মানুষের ধর্মচেতনার আকুতি পরিতৃপ্ত করতে পারে না। কিন্তু সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নিজমত প্রতিষ্ঠা করার সময় শঙ্কর সাধারণ মানুষের এই ধর্ম-আকুতির ওপর তেমন গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনবোধ করেন নি। শঙ্করের মহত্ত্বের

কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, শঙ্কর আমাদের সত্যকে ভালবাসতে, যুক্তিকে শ্রদ্ধা করতে এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছেন।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। চিৎ ও অচিৎ অংশের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক রামানুজস্বামী সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি সত্য, কিন্তু জীব মাত্রেই যে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পারে একথা বলে তিনি সাধারণ মানুষের ধর্ম-চেতনার আকুতিকে পরিতৃপ্ত করেছেন। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কল্পনা এবং ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারের কথা বলার জন্য রামানুজের দর্শন সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ পরম তত্ত্বকে যতখানি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে চায়, ততখানি বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করতে চায় না। তাই রামানুজের দর্শন শঙ্কর দর্শনের তুলনায় সাধারণ মানুষের কাছে বেশী আকর্ষণীয়। কিন্তু যুক্তিতর্ক বিচারের ওপর নির্ভর করে শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, মুক্তিকামী মানুষের কাছে তার আবেদন চির অক্ষুণ্ণ থাকবে।

---

* বেদান্ত দর্শনের রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

1. Chatterjee and Dutta—*An Introduction to Indian Philosophy*
2. S. Radhakrisnan—*Indian Philosophy. Vol. II*
3. Dr. J. N. Sinha—*History of Indian Philosophy Vol. II*
4. M. Hiriyanna—*Outlines of Indian Philosophy.*
5. Deussen—*The System of Vedanta*
6. Dr. A Roy Choudhury—*The Doctrine of Maya.*
7. ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী—বেদান্ত দর্শন—(অদ্বৈতবাদ) ; প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড।
8. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ (ভারত সরকারের শিক্ষাধিকারিক বিভাগের উদ্যোগে লিখিত ও প্রকাশিত)।
9. বেদান্তদর্শনম্—(শঙ্করের শারীরিক ভাষ্য ও বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী টীকাসহ)—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত।
10. শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী—অদ্বৈতবাদ, (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
11. রামানুজ : শ্রীভাষ্য।
12. হীরেন্দ্রনাথ—বেদান্ত পরিচয়।
13. তারকচন্দ্র রায়—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (২য় খণ্ড)

পরিশিষ্ট

১। ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব (God in Indian Philosophy) ঃ

ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায়গুলির মধ্যে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য এবং মীমাংসা দর্শন কোন জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে না। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। যা প্রত্যক্ষগোচর তারই অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষগোচর নয়, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। চার্বাক মতে জড় মহাভূত সকল নিজ নিজ স্বভাববশে ক্রিয়া করে এবং তারই ফলে এই বিশ্বজগতের আবির্ভাব। সুতরাং, কোন জগৎকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নয়।

জৈন দার্শনিকরাও নিরীশ্বরবাদী। তাঁরা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষগোচর নন্, সেহেতু অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। জৈন দার্শনিকদের মতে কোন জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের কল্পনা অযৌক্তিক, কেননা, জগৎ যে একটি কার্য তারই প্রমাণ নেই, কাজেই জগৎকর্তা ঈশ্বরের কল্পনা যুক্তিযুক্ত নয়। দেহী তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে কার্য উৎপন্ন করেন; কিন্তু ঈশ্বর যখন বিদেহী, তখন ঈশ্বর কিভাবে কার্য করতে পারেন? 'সর্বশক্তিমত্তা' গুণটি অন্যান্য গুণের সঙ্গে ঈশ্বরে আরোপ করা হয়। কিন্তু ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন তাহলে তিনি সব কিছুরই স্রষ্টিকর্তা হতেন, কিন্তু ঘট, পট প্রভৃতি অনেক বস্তুই তো ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না। ঈশ্বর পূর্ণ, তাঁর মধ্যে কোন অভাব থাকতে পারে না, তবে তিনি জগৎসৃষ্টি করবেন কেন? ঈশ্বর করুণাবশতঃই যদি জগৎসৃষ্টি করেন তবে জগতে এত দুঃখ কেন? জৈন দার্শনিকরা বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। জৈন দর্শনে সিদ্ধ পুরুষরাই ঈশ্বরসুলভ গুণের অধিকারী এবং তাঁরাই পূজার যোগ্য। সিদ্ধ পুরুষরাই জৈনদর্শনে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছেন।

বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। পরিণতি কারণ (final cause) রূপে কোন জগৎকর্তার অস্তিত্ব নেই, কেননা পরিণতি কারণ বলে কিছুই নেই। বৌদ্ধদের মতে কর্মের থেকে বড় কিছু নেই; কর্মের ফলেই জীবের উদ্ভব। জীবের সৃষ্টিকর্তা-রূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধদের মতে জগতের কারণ জগৎ নিজেই, কোন পরিণতি কারণরূপে জগৎস্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণা অযৌক্তিক। তাছাড়া ঈশ্বর পূর্ণ, কাজেই তিনি কিভাবে এই অপূর্ণ জগতের সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন?

হীনযানীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। মহাযানীরা ধর্মকায়রূপে বুদ্ধকে ভগবানের আসনে বসিয়ে সাধারণ মানুষের ঈশ্বরের অভাব পূরণ করেছেন।

সাংখ্য দর্শনও নিরীশ্বরবাদী। সাংখ্য দর্শন মতে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে জগতের অভিব্যক্তি। প্রকৃতিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ঈশ্বরের প্রেরণা ভিন্ন প্রকৃতির জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হবে কেন? সাংখ্য দার্শনিকদের মতে অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তির মূলে কোন স্বার্থ নেই, কোন করুণাও নেই, কেবল আছে পরার্থতা। পুরুষের ভোগমোক্ষ সম্পাদনের জন্যই প্রকৃতির সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্তি হয়। শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে, তা মুক্তাত্মা ও সিদ্ধাত্মার প্রশংসা ছাড়া কিছুই নয়। সাংখ্য মতে ঈশ্বর এই জগতের কারণ নয়, যেহেতু ঈশ্বর অপরিণামী। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কোন ঈশ্বরের কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নেই, যে উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে তিনি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। জীবের স্বাধীন সত্তা ও অমরত্বও ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করে। ঈশ্বর অসিদ্ধ, কারণ তিনি মুক্ত বা বদ্ধ কোন পুরুষই নন।

মীমাংসাদর্শনও নিরীশ্বরবাদী। প্রাচীন মীমাংসকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কিছুই বলেননি। পরবর্তী মীমাংসকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। মীমাংসকগণ জগৎস্রষ্টা হিসেবে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কেননা, জগতের কোন আদি অন্ত নেই। মীমাংসকগণ বিভিন্ন দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন সত্য, কিন্তু এই দেবতারা জগৎকর্তা নন। যে যে মন্ত্রে দেবতার আবাহন করা হয়েছে সেই সেই মন্ত্রকেই দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে।

নৈয়ায়িকদের মতে ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন এবং ধ্বংস করেন। জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উপাদান কারণ যদি হয় ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ প্রভৃতির পরমাণু, তাহলে এদের নিমিত্ত কারণ কে? কোন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কর্তাই হলেন এদের নিমিত্ত কারণ এবং তিনি ঈশ্বর। জীবের সঞ্চিত পাপপুণ্যকেই অদৃষ্ট বলা হয়। অচেতন অদৃষ্টশক্তির একজন নিয়ন্ত্রক আছেন যিনি জীবের কর্মানুযায়ী তার পাপপুণ্যের বিচার করে ফলভোগের ব্যবস্থা করেন। এই নিয়ন্ত্রক হলেন ঈশ্বর। বেদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, কারণ বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ আছে। আবার একথা বলা হয় যে, বেদ প্রামাণ্য, কিন্তু বেদ প্রামাণ্য হতে পারে যদি কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ পরমাত্মা বেদের রচয়িতা হন। এই পরমাত্মাই ঈশ্বর।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও আরও একটি তত্ত্ব স্বীকার

করেছেন। সেটি হল ঈশ্বরতত্ত্ব। যোগদর্শনে ঈশ্বরকে পুরুষ বিশেষ বলা হয়েছে। ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ঈশ্বর নিত্য, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা এবং সর্ব জ্ঞানের আকার। শাস্ত্রে ঈশ্বরকে পরমাত্মা, পরমপুরুষ, পরমতত্ত্ব ও জ্ঞান কর্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রুতি অভ্রান্ত প্রমাণ। সুতরাং, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। শ্রুতির কর্তা হিসেবেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য ; কেননা, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষেই শ্রুতির রচয়িতা হওয়া সম্ভব। এমন কোন পুরুষ আছেন যাঁর মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির চরমোৎকর্ষ ঘটেছে। একমাত্র সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই তা সম্ভব। জীবের কর্মফলানুযায়ী জগৎ সৃষ্টির জন্যও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা স্বীকার করেন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মই সৎ, জগৎ মিথ্যা ; ব্রহ্ম নিগুর্ণ ও নির্বিশেষ। জগৎ যেহেতু মিথ্যা অবভাস, সেহেতু জগৎস্রষ্টারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়। শঙ্করের মতে মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সগুণ ব্রহ্মের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্রহ্ম জগৎবিশিষ্ট এবং সগুণ ব্রহ্মই সত্য। রামানুজের মতে পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর। ঈশ্বর জগৎকর্তা, জ্ঞান ও ঐশ্বর্যযুক্ত এবং প্রেমস্বরূপ। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে ঈশ্বরের নিরন্তর ধ্যান করলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার ঘটে। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া জীবের মোক্ষলাভ সম্ভব নয়।

ঈশ্বরবাদী দার্শনিক মাত্রেই ঈশ্বরকে জগৎকর্তা বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু জীবের মোক্ষসাধনার ব্যাপারে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা সব দর্শনে সমানভাবে স্বীকৃত হয়নি। যোগদর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকৃত হলেও যোগশাস্ত্রকার যোগদর্শনের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ককে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কৈবল্য লাভের জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর কৈবল্যলাভে সহায়তা করেন মাত্র। ঈশ্বরপ্রণিধানের মাধ্যমে ভক্ত কেবলমাত্র ঈশ্বরের করুণালাভে সমর্থ হন। তিনি ভক্তের কৈবল্যলাভের পথে যেসব বাধাবিঘ্ন আছে, সেগুলিকে দূর করে দিয়ে ভক্তের কৈবল্যলাভের পথকে সুগম করে দেন। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর করুণাময় এবং ভক্তবৎসল। ভক্তকে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। জীবের ঈশ্বরভক্তিই জীবকে মুক্তি দান করে।

২। ভারতীয় দর্শনে প্রমাণ (Sources of knowledge in Indian Philosophy) ঃ

ভারতীয় দর্শনে যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় 'প্রমা' এবং যথার্থ জ্ঞানলাভের যে প্রণালী

তাকে বলা হয় প্রমা। বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় এক বা একাধিক প্রমাণ স্বীকার করে নিয়েছেন। চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করে, অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে না। বৌদ্ধদর্শনে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়কেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয়। সাংখ্য দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ—এই তিনটিই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়েছে। ন্যায়-দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ—এই চারটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে। প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে প্রমাণ হল পাঁচটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান এবং অর্থাপত্তি। ভাট্ট মীমাংসক এবং অদ্বৈত বেদান্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেছে।

৩। পরতঃপ্রামাণ্যবাদ এবং স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ (Theory of Extrinsic Validity and Intrinsic Validity) :

পরতঃপ্রামাণ্যবাদ অনুসারে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ নয়, পরতঃ, অর্থাৎ অন্য শর্তের ওপর নির্ভর। জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত থাকে না। জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদ অনুসারে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন শর্তের ওপর নির্ভর নয়।

নৈয়ায়িকরা জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করে। নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করা, জ্ঞান নিজে নিজেই যথার্থ বা অযথার্থ হতে পারে না। জ্ঞানের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের প্রামাণ্য অন্য শর্তের ওপর নির্ভরশীল। প্রবৃত্তিসামর্থ্যই জ্ঞানের মাপকাঠি, অর্থাৎ জ্ঞান যদি সফল প্রবৃত্তির কারক হয় তবেই জ্ঞান যথার্থ হবে, নতুবা নয়। যে শর্তের ওপর জ্ঞানের উদ্ভব নির্ভর করে সেই শর্তস্থিত কোন উৎকর্ষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে যথার্থ করে এবং অপরদিকে শর্তের মধ্যে প্রকৃত দোষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে অযথার্থ করে।

জৈন দার্শনিকদের মতেও জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে যদি জ্ঞানের মিল থাকে তাহলে জ্ঞান প্রামাণ্য এবং জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে যদি জ্ঞানের মিল না থাকে তাহলে জ্ঞান অপ্রামাণ্য। জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জ্ঞানের কারণের দোষ ও গুণের ওপর নির্ভর করে। জৈন দার্শনিকদের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি পরোক্ষ জ্ঞান। সে কারণে এই সব জ্ঞানের যাথার্থ্য অন্য শর্তের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মুক্ত পুরুষরা যে কেবল জ্ঞানের অধিকারী হন তার প্রামাণ্য অন্য শর্তের বা কারণের ওপর নির্ভরশীল নয়। সে কারণে এক্ষেত্রে জৈন দার্শনিকরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকার করেন।*

* বিস্তৃত আলোচনার জন্য "বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে যে জ্ঞান বিষয়ানুযায়ী হয়, সে জ্ঞানই যথার্থ। জ্ঞান বিষয়ানুযায়ী হয়েছে কিনা বোঝা যাবে যদি জ্ঞান অনুসারে বিষয়প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ জ্ঞান যদি সফল প্রবৃত্তির কারক হয়, তবে জ্ঞান যথার্থ, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ভর করে জ্ঞানের মধ্যে নয়, অন্য শর্তের ওপর। সুতরাং বৌদ্ধ দার্শনিকেরা জ্ঞানের পরতঃ-প্রামাণ্য স্বীকার করেন।

সাংখ্য দার্শনিকরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য এবং স্বতঃঅপ্রামাণ্য স্বীকার করেন। জ্ঞানের যথার্থতা এবং অযথার্থতা জ্ঞানেই নিহিত থাকে। যথার্থ জ্ঞান নিজের যথার্থতা নিজেই প্রমাণ করে এবং ভ্রান্তজ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই অযথার্থরূপে প্রকাশিত হয়। যথার্থ জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির কারক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য সফল প্রবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল।

মীমাংসকগণ জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য (intrinsic validity) এবং পরতঃ-অপ্রামাণ্য (extrinsic invalidity) স্বীকার করে। জ্ঞানের কারণগুলি যদি দোষমুক্ত হয়, তাহলে জ্ঞান যথার্থ হয় এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বপ্রকাশ। জ্ঞানের কারণগুলিতে কোন বিশেষ দোষের উদ্ভবের জন্য জ্ঞান যথার্থ হয় না এবং জ্ঞানের যাথার্থ্য সফল প্রবৃত্তির কার্যকারিতার ওপর নির্ভরশীল নয়। জ্ঞান নিজে নিজেই যথার্থ হয়, অন্য জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের যাথার্থ্য প্রমাণ করার দরকার নেই। কিন্তু জ্ঞানের অপ্রামাণ্য জ্ঞানের কারণগুলিতে কোন দোষের উদ্ভবশতঃ ঘটে থাকে এবং কারণের মধ্যে যে দোষ আছে, সেগুলির জ্ঞানই জ্ঞানের অযাথার্থ্য প্রমাণ করে বা অন্য জ্ঞানদ্বারা বাধিত হওয়ার জন্যও জ্ঞানের অপ্রামাণ্য ধরা পড়ে। অদ্বৈতবাদীরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করলেও, তাকে ততক্ষণই প্রামাণ্য মনে করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তা অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। যখন রজ্জুতে সর্প বা শুক্তিতে রজতভ্রম ঘটে, তখন সর্প বা রজতজ্ঞান ভ্রান্ত হলেও জ্ঞান, কিন্তু পরে রজ্জু বা শুক্তির যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলে পূর্বজ্ঞান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মজ্ঞানের উদয় হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বজগতের জ্ঞান যথার্থ প্রতীয়মান হয় কিন্তু আত্মজ্ঞানের উদয় হলে ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্তা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, এই যথার্থ জ্ঞান জন্মায় এবং এই জ্ঞানের দ্বারা পূর্বজ্ঞান বাধিত হয় বলে অযথার্থ প্রমাণিত হয়।

৪। ভারতীয় দর্শনে ভ্রম সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of Error in Indian Philosophy) :

(১) **অসৎখ্যাতিবাদ :** মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের মতে ভ্রমে অসৎ সৎরূপে দৃষ্ট হয়। যেমন, শুক্তিরজত ভ্রমে রজতের প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নেই, সেহেতু

রজত অসৎ। শুক্তির স্থানে অসৎ রজত দৃষ্ট হয়, এই মতবাদ অসৎখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত।

এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা অধ্যাস বা ভ্রমের ক্ষেত্রে একটা অধিষ্ঠান থাকে। কোন অধিষ্ঠান ছাড়া ভ্রম উৎপন্ন হতে পারে না। যা সর্বতোভাবে অসৎ তা কখনও সংরূপে দৃষ্ট হতে পারে না, শুক্তিতেই রজতভ্রম ঘটে. শূন্যকে রজতভ্রমের অধিষ্ঠান মনে করা যেতে পারে না, তাহলে 'শূন্যই রজত', এই ভ্রম ঘটত। তাছাড়া. ভ্রম নিবারিত হলে শূন্য দৃষ্ট হত, কিন্তু শুক্তিতে রজতভ্রম নিবারিত হবার পরে কোন শূন্য দৃষ্ট হয় না।

(২) **আত্মখ্যাতিবাদ :** বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভ্রমে মনের ভাব বা ধারণাই বাহ্যবস্তু হিসেবে দৃষ্ট হয়। শুক্তির রজতভ্রমে, রজত যা নিছক মনের ধারণা তাই অস্তিত্বশীল বাস্তব বস্তু হিসেবে দৃষ্ট হয়। এই মতবাদ 'আত্মখ্যাতিবাদ' নামে পরিচিত।

এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা, 'রজত' যদি নিছক মনের ধারণা হয় এবং এই ভ্রমের কারণস্বরূপ যদি কোন বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা না যায়, তাহলে শুক্তিতে রজতভ্রম না হয়ে অন্য যে কোন ভ্রম ঘটতে পারত।

(৩) **অখ্যাতিবাদ** বা **বিবেকখ্যাতিবাদ :** প্রভাকর মীমাংসকরা এই মতবাদের সমর্থক। তাঁদের মতে যে কোন ভ্রমের ক্ষেত্রে দু'প্রকার জ্ঞান লক্ষ্য করা যেতে পারে—(ক) প্রত্যক্ষ (Perception) এবং (খ) স্মৃতি (Recollection)। শুক্তিতে যখন রজতভ্রম ঘটে তখন আমরা শুক্তি প্রত্যক্ষ করি, যে শুক্তির যথার্থ অস্তিত্ব আছে। সেই সঙ্গে রজতের স্মৃতি আমাদের মনে জাগরিত হয়, যেহেতু রজতের সঙ্গে শুক্তির সাদৃশ্য আছে। শুক্তির প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি উভয়ের পার্থক্য বা বিবেকের অখ্যাতি (Non-apprehension) আমাদের ক্রিয়া করায়। যা সত্য, প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে তা সফল প্রবৃত্তির কারক। যে জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির কারক নয় তাই অসত্য বা ভ্রম। এই মতবাদ অখ্যাতিবাদ বা বিবেকখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত।

এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ভ্রম অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত না হয় ততক্ষণ সেই ভ্রম যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়। যে জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির কারক নয় তা যথার্থ হতে পারে না। কাজেই, এক্ষেত্রে অখ্যাতি (Non-apprehension) নয়, শুক্তি এবং রজতের অভেদগ্রহের (Identity) খ্যাতিই (apprehension) ক্রিয়া করায়। 'এই হল রজত'—এই ভ্রমজ্ঞান পরে 'এ রজত নয়'—এই যথার্থজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। যথার্থ জ্ঞান কখনও অন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হতে পারে না।

(৪) **অন্যথাখ্যাতিবাদ** বা **বিপরীতখ্যাতিবাদঃ** নৈয়ায়িক এবং ভাট্ট মীমাংসকরা এই মতবাদের সমর্থক। তাঁদের মতে ভ্রমের ক্ষেত্রে একটি বস্তুকে আর একটি বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করা হয়, কাজেই ভ্রম হল ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। যখন শুক্তিতে রজতভ্রম ঘটে তখন শুক্তি অন্যথা, অর্থাৎ অন্য বস্তু বা রজতরূপে দৃষ্ট হয়। খ্যাতির অর্থ জ্ঞান। একটি বস্তুর জ্ঞানের পরিবর্তে অন্য বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলে এই মতবাদকে অন্যথাখ্যাতিবাদ নামে অভিহিত করা হয়।

এই মতবাদ যথার্থ নয়, কেননা, চেতনায় একটি বস্তু কখনও অন্য বস্তুরূপে প্রতিভাত হতে পারে না। তাহলে যথার্থ জ্ঞান কিভাবে সম্ভব হবে?

(৫) **সদাসৎখ্যাতিবাদঃ** সাংখ্য দার্শনিকরা এই মতবাদের সমর্থক। এদের মতে যখন শুক্তিকে রজত মনে করে আমরা বলি 'ইদং রজতং', তখন এই ভ্রমাত্মক জ্ঞানে 'ইদং' রূপে যে জ্ঞান হয় তা 'সং' বিষয়ক এবং 'রজতং' রূপে যে জ্ঞান হয় তা অসৎ বিষয়ক।

(৬) **অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদঃ** অদ্বৈতবেদান্ত মতে ভ্রম বলে যাকে প্রত্যক্ষ করা হয় তা অনির্বচনীয়। তাকে সৎও বলা চলে না, অসৎও বলা চলে না বা সদাসদ্‌ও বলা চলে না। যেমন, শুক্তি-রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে রজতকে অসৎ বলা চলে না, কেননা তাহলে প্রত্যক্ষ হয় না। আবার 'সং' বলা চলে না, তাহলে পরে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা রজতজ্ঞান বাধিত হয় না। আবার সদাসদ্ বলা চলে না, যেহেতু এ সিদ্ধান্ত হল পরস্পরবিরোধী। কাজেই 'রজত' সৎ নয়, অসৎও নয়, সদাসদ্‌ও নয়—এ হল অনির্বচনীয়।

কিন্তু এ মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা, যখন আমরা বলি, 'এই হল রজত' তখন তাকে অনির্বচনীয় কিভাবে বলা যেতে পারে?

প্রশ্নাবলী

Introduction

1. Explain in general terms certain common features found in the different systems of Indian Philosophy. Can we describe these systems as pessimistic because of their emphasis on the fact of human misery ?

2. Give some of the distinguishing features of Indian Philosophy.

3. Is Indian Philosophy pessimistic ? Discuss the question with reference to some systems of Indian Philosophy.

4. Consider the criticism that proper emphasis on morality is not laid in Indian Philosophy.

5. Discuss the place of authority and reasoning in Indian Philosophy with reference to some systems.

6. Explain the nature and status of the law of Karma in Indian Philosophy.

7. 'It is said that pessimism in Indian thought though initial, is not final.'—Discuss.

8. How do you meet the charges against Indian Philosophy that it is wholly ethico-religious ?

9. It is generally said that all Indian Philosophy aims at moksa. Discuss the validity of the statement.

10. What are the places of Authority and Reasoning in Indian Philosopny ? Is the charge of dogmatism against Indian Philosophy justified in your opinion ?

11. What is dogmatism ? Are the philosophical systems of India dogmatic ?

12. What is moksa ? How do the Indian system of Indian Philosophy conceive its nature ?

13. "The outlook of the Indian system of philosophy was synthetic."—Fully explain the statement.

14. Explain briefly the common characters of the Indian systems of Philosophy.

15. Explain fully the doctrine of Karma. Is it true to say that Indian Philosophy has become fatalistic because of its adherence to the doctrine.

16. Explain the distinction between the heterodox and orthodox schools of Indian Philosophy and show briefly (a) if these two groups share any common features and (b) how Indian thonght as a whole consists in the intermingling of these two trends.

17. Is an effeet something essentially different from its cause? Discuss with reference to the Indian theories of causality.

18. Give a brief and critical account of the conception of liberation as it is found in the systems of Indian Philosophy.

———

Nyaya-Vaisesika System

1. How does the Nyaya System prove the existence of God ?

2. Explain the Five-membered Syllogism of Nyaya school. What are its merits ?

3. How many Categories (Padarthas) are recognised by the Vaisesika School ? What are they ? Explain any two of them.

4. Explain clearly the Nyaya conception of the Soul.

5. Give a critical account of Vaisesika Atomism.

6. State clearly the classification of perception in Nyaya system. Is extraordinary perception a genuine case of perception ?

7. Explain the Nyaya definition and classification of perception.

8. What is alaukika pratyaksa as recognised in the Nyaya system ? Explain its different kinds with examples.

9. Explain the Nyaya definition of inference and the distinction ebtween Svartha and Parartha inference with illustrations.

10. What is Vyapti and what is Nyaya method of establishing it ?

11. Explain and illustrate the Vaisesika categories of Samanya and Samavaya.

12. Why do the Vaisesikas recognise Samavaya as a distinct Padartha ? How is Samavaya different from Samjoga ?

13. Discuss the Nyaya theory of the nature of self. How does it differ from the theory of self in the Advaita Vedanta ?

14. Discuss critically the nature of Nyaya Theism.

15. 'The effect is contained in the cause'. How would the Nyaya criticise the statement ?

16. Explain the Nyaya theory of self and its relation to knowledge.

17. How does the Naiyayika distinguish between samyoga and samavaya ? Discuss the doctrine of samavaya.

18. What is samavaya ? Give a critical estimate of the grounds which have been put forward in support of its postulations.

19. What does the Vaisesika mean by Padarthas ? What is Abhava ? What are its different kinds ?

20. Explain the nature of Abhava as expounded in the Vaisesika system. Discuss in this connection whether there is any justification for recognizing Abhava as a fact.

21. Explain the Nyaya-Vaisesika theory of Samanya or generality and Visesa or particularity.

22. Explain the Vaisesika category of Universal (Samanya). How does the Vaisesika meet the Buddhist's objection to his view of the universal ?

23. Explain the Categories of Dravya (substance), Guna (quality) and Samanya (universal) according to the Vaisesika system.

24. What is Dravya according to the Vaisesikas ? Explain its different kinds.

25. State and examine the Vaisesika conception of substance (dravya) with special reference to space (dik) and time (kala).

26. What is the Vaisesika theory of substance ? How substance is related to attributes ?

27. Explain the Nyaya-Vaisesika concept of samavaya. Is samavaya a necessary relation ? Is it an external relation ? Discuss.

28. Explain fully the Nyaya theory of extraordinary perception (alaukika pratyaksa).

29. State and explain the Nyaya arguments for the existence of God. Do you consider their argumeuts to be satisfactory ?

30. Explain the Nyaya definition of perception and distinguish between indeterminate and determinate perception with suitable examples.

31. Explain with an example the five members of Inference in the Nyaya.

32. Discuss after Nyaya Upamana and Sabda as sources of valid knowledge.

33. What is Hetvabhas ? What are the different kinds of Hetvabhas ? Explain with examples.

34. Explain and illustrate the Nyaya syllogism. How does it differ from the western syllogism ?

35. Write notes on the following :

Samavaya, Guna, Nirvana, Vyapti, Abhava, Visesa, Samadhi, Pratityasamutpada, Panca-skandha, Hinayana, Mahayana, Samanyalaksana, Samanya, Hetvabhasa.

36. Explain the Nyaya theory of self and liberation.

37. What is the nature of a liberated soul according to Nyaya ? How does the Nyaya theory differ from the Advaita theory ?

———

Vedanta System

1. What do you mean by Vedanta ? How did the Vedanta develop through the Vedas and the Upanisads ?

2. How dose Sankara refute the Sankhya theory of creation ?

3. Enumerate briefly Sankara's criticism of the Vaisesika theory of the world ?

4. Briefly enumerate Sankar's criticism of the Buddhist subjective Idealism or Vijnavada ?

5. Clearly Sankar's conception the external world.

6. In what sense does Sankara call the world unreal ?

7. Enumerate Sankara's conception of God ?

8. Explain the relation of Brahman to the world and jivas as enumerated by Sankara in Vadanta Philosophy.

9. What part dose the doctrine of Maya play in Advaita Vedanta ?

10. Compare and contrast Sankara's doctrine of maya with Ramanuja's.

11. Explain briefly the philosophy of Sankara.

12. Explain Sankara's conception the Self, Bondage and Liberation.

13. Explain Advaita theory of Error.

14. Explain Advaita theory of Moksa.

15. State briefly how the teachings of Vedanta are interpreted by Ramanuja,

16. Explain clearly Ramanuja's concaption of the external world.

17. Explain the difference between Sankara and Ramanuja on the question of the metaphysical states of the world.

18. Enumerate Ramanuja's concption of God.

19. How dose Ramanuja criticise the Advaita theory of Illusion ?

20. Explain Ramanuja's theory of Self. Bondage and Liberation.

21. What is the nature of jiva according to Sankara ? How does Ramanuja criticise him ?